ইতিহাসের কাহিনী

(ভারতবর্ষ)

H15 IV(A)

শ্রী নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত
ও
ডঃ নৃত্যলাল বসাক

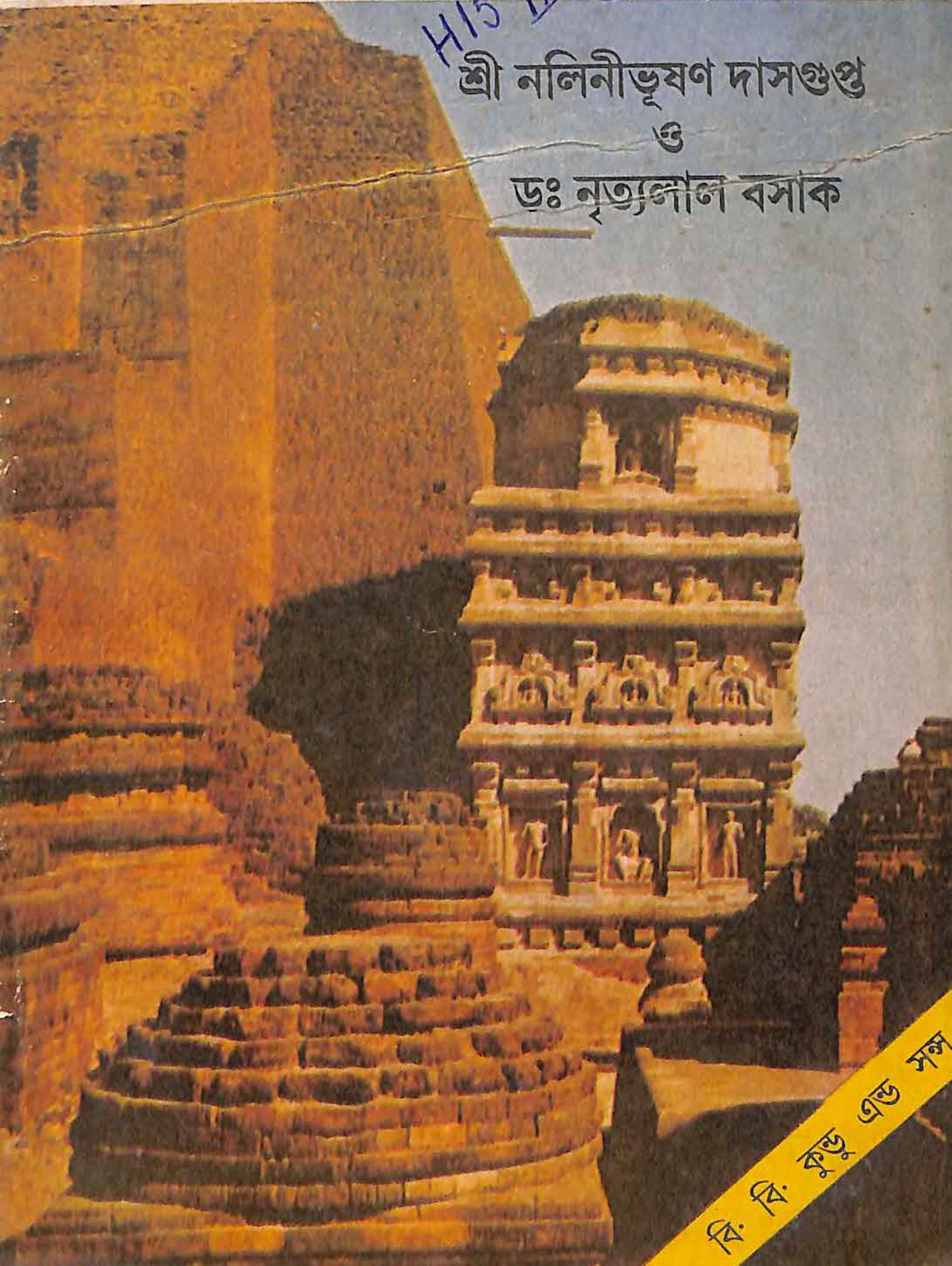

বিং বিং কুণ্ডু এণ্ড সন্স

4459
29. 6. 89

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ১৯৮৮ শিক্ষাবর্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বিদ্যালয় সমূহের নবম শ্রেণীর
ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত।
Vide T. B. No. Syll/H/IX/87/22, dated 16. 11. 87

ইতিহাসের কাহিনী

(ভারতবর্ষ)

[নবম শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
প্রাক্তন অধ্যক্ষ : নিখিল বঙ্গ শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) ;
ইউনিভারসিটি বি. টি. অ্যান্ড ইভ্‌নিং কলেজ, কোচবিহার ; শ্রীরামকৃষ্ণ বি. টি.
কলেজ, দার্জিলিং ; গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী।
প্রাক্তন অধ্যাপক : ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলকাতা।

ও

ডঃ নৃত্যলাল বসাক
প্রাক্তন অধ্যক্ষ : শিমুরালি কলেজ অব এডুকেশন ; প্রাক্তন অধ্যক্ষ : গভর্নমেন্ট
কলেজ অব এডুকেশন, বর্ধমান ; প্রাক্তন অধ্যাপক : ডেভিড হেয়ার
ট্রেনিং কলেজ, কলকাতা।

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

বি. বি. কুণ্ডু এণ্ড সন্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬২।১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীবিভূতিভূষণ কুন্ডু
বি. বি. কুন্ডু এন্ড সন্স
৬২/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 29-6-89
Acc. No. 4459
H IX
NAL

প্রথম সংস্করণ ঃ মে ১৯৮৭
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ১৯৮৭

দাম ঃ ২৫·০০ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশন্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৩/ডি, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

নিবেদন

শিক্ষায় পাঠ্যসূচী একটি পরিবর্তনশীল বস্তু। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন ধারণা এবং সমাজের পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যসূচীর ক্রম-মূল্যায়ণ ও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যসূচীর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে বরাবরই তাদের সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান পরিবর্তিত (নবম-দশম শ্রেণীর) পাঠ্যসূচীটি পর্ষদ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী **১৯৮৮-৮৯ সাল** থেকে চালু হবে। প্রচলিত পাঠ্যক্রমের তুলনায় নতুন এই পাঠসূচীটি নানাদিক থেকে বিস্তৃততর বিষয়সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ

পাঠ্যসূচী বিস্তৃত হওয়ায় সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠার মধ্যে বিষয়বস্তু যথাযথভাবে পরিবেশন করা নিঃসন্দেহে কিছুটা কষ্টসাধ্য।

অষ্টমশ্রেণীর পাঠ্যসূচীর পরে নবম শ্রেণীর জন্য ভারতের ইতিহাসের উপরে এত বিস্তারিত আলোচনা কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে একটু ভারী হবে বলে আশঙ্কা করছি, কিন্তু পাঠ্যসূচীর উপরে সুবিচার করতে হলে প্রাসঙ্গিক গবেষণামূলক ইতিহাস গ্রন্থের উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। তাই পুস্তকের প্রতি অধ্যায়ে কিছু কিছু পাদটীকা (Foot-Note) দেওয়া হয়েছে। আশা করি, এতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কিছু উপকার হতে পারে এবং এর ফলে অধিকতর অগ্রসর ছাত্রছাত্রীরাও পাঠে আরও উৎসাহ পাবে।

নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা ইতিমধ্যেই বাংলাভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে, তাই পুস্তকের ভাষা তাদের ভাল লাগলে তারা পুস্তকখানি পড়তে আরও বেশী উৎসাহী হবে। নিজেরা পাঠে উৎসাহী হলে বইয়ের পৃষ্ঠা সামান্য বাড়লেও ছাত্রছাত্রীদের তেমন অসুবিধা হবে না।

পুস্তকে চিত্র ও মানচিত্রের সংখ্যা বেশী না দেওয়া হলেও যতটা দেওয়া হয়েছে তাতে বইয়ের ঐতিহাসিক মান বজায় রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীরা বইখানি পড়ে আনন্দ লাভ করলে শ্রম সার্থক মনে করবো। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এ পুস্তকের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে অভিমত প্রকাশ করবেন, পরবর্তী সংস্করণে তাদের সংযুক্ত করতে উদ্যোগী হব।

আশা করি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করে সহৃদয় শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ পুস্তকটির গুণাগুণ ও গ্রহণযোগ্যতা বিচার করবেন।

রাসপূর্ণিমা
নভেম্বর, ৫, ১৯৮৭

নিবেদক
গ্রন্থকারদ্বয়

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

77/2, Park Street, Calcutta-16.

HISTORY SYLLABUS FOR CLASS IX

Chapter—I : Geography & History :

(a) Chief physical features of the Indian subcontinent and its main othnic elements ;

(b) Influence of Geography on History ;

(c) The Fundamental unity ;

(d) Source of ancient Indian History.

Chapter—II : Dawn of Indian Civilisation :

(a) Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stage of cultures ;

(b) Harappan Civilisation (Chalcolithic) chief features—its antiquity (with special reference to its extent, urban character, town planning, and social, economic and religious life), relations with outside world.

Chapter—III : The Vedic Age :

(a) The "Aryans"—their original homeland ; Their first literary work in India—the Rig-Veds ;

(b) Vedic literature ; Later *samhitas*, *Brahmans*, *Aranyakas*, *Upanishadas* and *Sutras* ;

(c) Life of the people as reflected in the Vedic literature—

(i) Social, economic and religious life and political and administrative activities of the people as known from the Rig-Veds ;

(ii) later developments ;

(d) Expansion of Vedic culture in the subcontinent ;

(e) Beginning of the Iron Age.

Chapter—IV : Protest Movement :

(a) Social, economic and religious causes of the beginning of the movements protesting against the dominance of the age-old Vedic or Brahmanical culture ;

(b) Jainism and Buddhism ;

(c) Lives and teachings of the Buddha and Mahavir.

Chapter—V : The Age of Imperialism and Political Unification :

(a) Reference to sixteen Mahajanapadas ;

(b) A bare outline of the history of the growth of the power of Magadha from the days of Bimbisara to the rise of the Mauryas ;

(c) History of the Maurya empire—with special reference to the periods of Chandragupta (his achievements, administration of the age as known from the account of Megasthenes and the *Arthasastra* of Kautilya dated generally to the Maurya Age) and Asoka (his conquest of Kalinga, limits of his empire, propagation of Buddhism and his Dharma, his humanitarian work, his contacts with outside world and his place in world history) ;

(d) Invasions of India by foreigners—

(i) Reference only to the extension of the Achaemenid empire to parts of the Indian subcontinent, Alexandar's invasion and its effects.

(ii) After the fall of the Mauryas—reference to the rule of the Indo-Greeks, Sakas and Pahlavas ;

(iii) Social and economic condition—with reference to agriculture, trade and industry —foreign elements in the population—contacts with the outside world—Mauryan Art.

(e) History of the Kushana empire with special reference to the reign of Kahiskha (his probable date, his conquests, limit of his empire, his patronage of Buddhism and Indian art and culture) and to India's contact with the outside world in the Kushana age ; cultural importance of the Kushana period in Indian History ;

(f) The Satavahana empire—

(i) its extent,

(ii) the achievements of its greatest ruler—Gautamiputra Satakarni ;

(g) History of the Gupta empire—with special reference to—

(i) The periods of Sumudragupta (his con-

quests and achievements, war against the Saka Kshatrapas ; (his other achievements), Chandragupta II a legendary figure. Evidence of Fa-Hien ; Kumargupta I and Skandhagupta (his success against the Hunas) ;

(ii) Causes of the downfall of the Gupta Empire. Distinctive features of the Gupta culture.

Chapter—VI : Struggle for Domination :

(a) North India—

(i) Reference to the Hunas—Yasodharman ;

(ii) Rise of Gauda under Sasanka, his relations with Bhaskarvarman of Kamarupa and Harshavardhana of Thaneswar and Kanauj ;

(iii) Conquests of Harshavardhana, limits of his kingdom,—account of Huan-tsang ;

(iv) Rise of the Pratihara and Pala empires—brief reference—to the tripartite struggle and its outcome ;

(v) Important Pala and Sena rulers—Dharmapala, Devapala, Mahipala I, Ramapala, Vijayasens and Lakshmansens.

(b) Deccan—

(i) The early Chalukyas of Badami ;

(ii) Achievements of Pulakesi II ;

(iii) The Rashtrakutas ;

(iv) Achievements of Govinda III and Krishna III. Later Chalukyas of Kalyans ; and achievements of Vikramaditya VI (C A.D. 1076-1128).

(c) South India—

(i) The Pallavas of Kanchi—some notable rulers and their achievements—the Long-drawn conflict between the Pallavas and Chalukyas ;

(ii) The Cholas of Tanjore ;

(iii) Achievements of Rajaraja I and Rajendra I with special reference, to their overseas campaigns.

Chapter—VII : (a) Social, economic and cultural life from the 7th Century to the 12th Century A. D. under the Palas, the Senas, the Chalukya, the Rashtrakutas, the Chandellas, the greater Gangas of Orissa and the Pallavas and the Cholas of the far South ;

(b) Commercial and cultural contacts with outside world.

MEDIVAL INDIA 80 pages till 1707

1. Why should we call it 'Medieval India' rather than Muslim India ?
2. A brief note on the types of sources ; the Sultanate period.
3. Advent of Islam in India : the Arab conquest of Sind—its impact negligible.
4. Beginning of Muslim rule : condition of Northern and Western India on the eve of the Muslim invasions—Sultan Mahmud—Results of his invasions—Al-Biruni on Indian culture and civilisation.
5. From Invasion to Empire—building ; Foundation of the Delhi Sultanate by Qutbuddin—Iltutmish and Balban : nature of the external and internal threats—consolidation of the Sultanate.
6. Khalji Imperialism : growth of the empire under Alauddin (no detailed account of his campaigns), his attempts at consolidating the authority of the Central Government—his economic measures and their results.
7. A short assessment of Muhammad bin Tighluq's rule—Nature of the changes during Firuz Shah's rule : some of his beneficient measures.
8. Invasion of Timur—effects—disintegration of the Sultanate : the Sayyids and Lodis (only a brief outline).

9. Rise of some regional powers :

   (a) Bengal under Ilias-Sahi rulers : Hussain Shah and Nasarat Shah ; cultural developments.

   (b) The Bahmani kindom (no detail)—split up into five kingdoms.

   (c) The nature of the Bahamani—Vijayanagar conflict (details of the wars to be omitted).

   (d) Vijaynagar empire—Dev Rai and Krishna Rai—special emphasis on the administrative system—and the social, cultural and a economic life.

10. Impact of Islam on India during this period—with particular stress on the impact on the cultural life—the initial orthodox reaction ; gradual synthesis of cultures—the Bhakti cult—Sufism—Religious reference—their message. Art and architecture—development of vernacular literature and regional art and culture—patronage of literature etc., by the ruling groups—growth of Urdu.

THE MUGHAL AGE : 1526-1707 :

1. A brief note of the types of sources.
2. Origins of the Mughals : foundation of the Padshahi, by Babar,—Panipath, Khanna and Ghogra—(detail of wads to be omitted), Babar's memoirs.

   (a) Mughal—Afghan contest—its nature—a brief narrative of the building up of an empire by Sher Shah—special stress on the administrative and revenue systems. Sher Shah's contributions—a brief reference to the re-establishment of the Mughal power.

   (b) Widening of the empire and its consolidation by Akbar : Stress on the methods by which Akbar achieved it : (detail of the wars to be omitted)—foundation of a new administrative system : Jagirdari system—revenue system—cultural life ; Din-i-Ilahi-Akbar's Court—His building activities.

   (c) Jahangir and Shahjahan : Assessment as rulers : particular stress on their patronage of art and architecture— heir policy towards European traders.

(d) Aurangzeb : a short note on the wars of succession—stress on two developments in the political sphere ; further widening of the empire on the one hand, and the emergence on the other of certain conditions which tended to weaken the imperial authority : Roots and nature of his troubles in Northern and North-western India ; the Deccan polity—Shivaji and the first phase of the Mughal-Maratha conflict—organisation of the civil and military administration by Shivaji—assesment of Shivaji as a ruler—the far-reaching consequences of Aurangazeb's Deccan wars—organisation by Aurangazeb of the civil and military administration—His religious policy—his character and personality—a brief estimate as a ruler.

(e) Activities of the European Trading companies (a brief outline).

3. India under the Mughals : Political unification of a large part of India—measures in connection with the assertion of the Central Authority—the Mughal rulers and Jagirdars—land revenue system—the ruler society of India in the eyes of foreigners—trade, industry and commerce—European traders—special emphasis on the cultural life : art, architecture, paintings, literature—history writing—music—some reference to some distinctive regional cultures.

HISTORY OF INDIA : 1707-1857 :

1. Decline and disintegration of the Mughal Empire—beginning of the process during Aurangzeb's time—threats to the Mughal Empire from different quarters—drain on the imperial finances due to wars—implications of the fast increasing jagirs, while the revenue income did not increase—increased—factionalism in the Mughal Court—different parties and factions—Weakness of the successors of Aurangzeb—power struggle—the nobles etc., further consolidated their powers—Central control over the different Subas and regions gradually disappeared,—effects of the invasion of Nadir Shah.

2. Growth of regional power (emphasis on those, whose encounters with the British affected the later political scene).
   (i) The regions to be particularly studied Bengal, Hyderabad, Mysore, Awadh, the rise of the Sikhs upto Guru Govind—
   (ii) Growth and decline of Marathas (till 1761)—Expansion of the Maratha Power—Third battle of Panipath (1761)—its impact.

3. Growth of European Commerce and conflict among European trading Companies—Anglo-French conflict—Carnatic: the first area of the Anglo-French rivalry in Europe and else-where—War of Austrian succession and Seven Years' war—Reaction of Carnatic rulers to the growing conflict—Result of the Wars—causes of French failure.

4. Growth of English East India Company's Commerce and political power in Bengal till 1765 —Growth of English trade in Bengal in the first half of 18th Century—Farman of 1717—frictions with the Nawabs—conflict between the English and Siraj from 1756 to Plassey—its results—conflict with Mir Qasim: Buxer (1764)—Dewani (1765).

5. 1767-1857

   British Imperial Expansion

   (The war operations to be described as briefly as possible. The main stress should be given on (a) The British Motive, (b) The decisive factors in the British victory)—
   (a) Marathas (one long narrative)
   (b) Mysore (—do—)
   Subsidiary Alliance (1798) as an instrument of British political control.
   (c) Other conquests, (excluding relationship with the Sikhs—Anglo-Sikh relations till the death of Ranajit Singh.
   (d) Annexation of the Punjab.
   (e) Dalhousie and British imperial expansion—Novel features.

6. Administrative Foundations
   (i) Nature of the growth of British political power till 1765 (two short paragraphs)—

Implications of Diwani of 1765—and of Diarchy in 1772.

(ii) Growth of centralisation: (Hastings to Cornwallis).

(iii) Organisation of a new and judicial and police system.

(iv) Need for an increased income from land—revenue—Types of arrangements in this connection—their broad effects.

7. **Industry and Trade**

Expansion of India's foreign trade and decline of some Indian industries—(To stress, cotton—goods during the period, 1765-1857)

8. **The Cultural Scene**

(i) Brief note on the old educational system: The changes: English Education—Decline of vernacular Education. Contact with western culture:

(ii) A history of social and cultural Movements with special reference to Bengal and Maharashtra.

9. **Peasant unrest and uprisings**

(a) Peasant Rebellions—Ferazi—Wahabi Movement;

(b) Tribal Movements—Kols—Santhals

10. **The Revolt of 1857—causes—**

Extent of popular participation—leadership—Nature of the Revolt.

বিষয়সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠা

অবতরণিকা — ক—খ

প্রথম অধ্যায়ঃ ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জন-সমষ্টি — ১—১১

(ক) **ভৌগোলিক পরিবেশ**—ভারতের সীমা ১, ভারতের জন-সমষ্টি—নৃতাত্ত্বিক উপাদান ২, আদিবাসী ২, নর-নারীর বৈচিত্র্য ৪

(খ) **ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক প্রভাব**—আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময় ৭

(গ) **মৌলিক ঐক্য** ৭

(ঘ) **ভারত-ইতিহাসের উপাদান**—প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক উপাদান ৮

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ — ১২—২০

(ক) **প্রাচীন প্রস্তর যুগ, মিসোলিথিক্ যুগ ও নব্য-প্রস্তর যুগ,** প্রাচীন প্রস্তর যুগ ১২, মিসোলিথিক্ যুগ ১২, নতুন প্রস্তর যুগ ১৩,

(খ) **সিন্ধু-সভ্যতা বা হরপ্পা-সভ্যতা**—তাম্রযুগ ১৪, সুপ্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা ১৫, সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতি ১৫, সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ১৬, নাগরিক সভ্যতা ১৬, নগর পরিকল্পনা ১৬, সামাজিক জীবন ১৭, অর্থনৈতিক জীবন ১৮, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ২০, সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস ২0

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বৈদিক যুগ — ২১—২৮

(ক) **আর্যদের ভারতে আগমন**—ভারতে বসতিবিস্তার ২২

(খ) **বৈদিক সাহিত্য** ২৩

(গ) **বৈদিক যুগের সমাজজীবন**—সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন ২৫ ধর্ম জীবন ২৫, বৈদিক যুগে রাজনৈতিক জীবন ২৬

(ঘ) **পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্য সভ্যতার সম্প্রসারণ**—লৌহ যুগ ২৭

(ঙ) **লৌহ যুগের সূচনা** ২৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ধর্মসংস্কার আন্দোলন—জৈন ও বৌদ্ধধর্ম — ২৯—৩৬

(ক) **ধর্মসংস্কার আন্দোলনের কারণ**—সামাজিক কারণ ২৯, ধর্মীয় কারণ ৩0

(খ) **জৈন ও বৌদ্ধধর্ম** ৩0

(গ) **মহাবীর ও বুদ্ধের জীবনী ও শিক্ষা**—জৈনধর্মের উৎপত্তি ৩১, বর্ধমান মহাবীর ৩১, জৈনধর্মের শিক্ষা ৩২. বৌদ্ধধর্ম প্রচারক গৌতম বুদ্ধ ৩২, বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা ৩৪, জাতক ৩৫, বৌদ্ধ সংঘ ৩৫, জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মধ্যে তুলনা ৩৫, বৌদ্ধ সংগীতি ৩৬

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায় : সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের যুগ ৩৭—৮০

(ক) **ষোড়শ মহাজনপদ** ৩৭

(খ) **মগধের অভ্যুত্থান**—বিম্বিসার থেকে মৌর্যবংশের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত—বিম্বিসার ৩৯, অজাতশত্রু ৪০, নন্দবংশ ৪০

(গ) **মৌর্য সাম্রাজ্যের বিবরণ**—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও তার কৃতিত্ব ৪১, চন্দ্রগুপ্ত কতৃক মৌর্য সভ্যতার বিস্তার সাধন ৪৩, মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ৪৩, অশোকের কলিঙ্গ জয় ৪৬, অশোকের সাম্রাজ্যের আয়তন ৪৬, অশোকের শিলালিপির নমুনা ৪৭, অশোকের পররাষ্ট্রনীতি ৪৮, অশোকের শাসন ব্যবস্থা ৪৮, অশোকের ধর্ম ৪৮, অশোকের পরধর্মসহিষ্ণুতা ৪৯

(ঘ) **ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ ও ভারতীয় সভ্যতার উপরে তার প্রতিক্রিয়া**—উত্তর পশ্চিম ভারতে পারস্যের অ্যাকিমিনীয় সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তার ৫১, আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ ও তার ফলাফল ৫২, ভারতে ব্যাক্ট্রিয়ান গ্রীকদের অধিকার ৫৫, ভারতের শক অধিকার ৫৬, মৌর্যোত্তর যুগে সমাজব্যবস্থা ৫৮, অর্থনৈতিক অবস্থা ৫৯, শিল্প বাণিজ্য ৬০

(ঙ) **ভারতে কুষাণ অধিকার**—কণিষ্ক ৬৪, কণিষ্কের সাম্রাজ্যের আয়তন ৬৪, কণিষ্কের কৃতিত্ব ৬৬, কণিষ্কের বংশধরগণ ৬৬, কুষাণ যুগে ভারতীয় সভ্যতা ৬৭

(চ) **সাতবাহন সাম্রাজ্য—সাম্রাজ্যের বিস্তার—সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির কীতত্ব**—গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি ৬৮

(ছ) **গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস**—গুপ্তবংশের উত্থান ৬৯, সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয় ৭০, সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব ৭২, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৭৩, ফা-হিয়েনের বিবরণ ৭৫, স্কন্দগুপ্ত ৭৫, বুধগুপ্ত ৭৬, তোরমান ও মিহিরকুল ৭৬, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ৭৬, গুপ্তযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায় : গুপ্তোত্তর যুগে প্রাধান্য লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৮১—১০২

(ক) **উত্তর ভারত**—হূনদের আক্রমণ ৮১, যশোধর্মন ৮১, গৌড়ে শশাঙ্ক ৮২, হর্ষবর্ধন ৮৩, হর্ষবর্ধনের পর উত্তর ভারত ৮৮, বাংলায় পাল ও সেন রাজত্ব ৯১, ধর্মপাল ৯১, প্রথম মহীপাল ও দ্বিতীয় মহীপাল ৯২, বিজয় সেন ৯৩, বল্লাল সেন ৯৩, লক্ষণ সেন ৯৩

(খ) **দাক্ষিণাত্য**—চালুক্য বংশ ৯৪

(গ) **দক্ষিণ ভারত**—তাঞ্জোরের চোলগণ ৯৯

বিষয় | পৃষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায় : সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ১০৩—১১৭

(ক) পাল ও সেন যুগে সমাজ ও সংস্কৃতি ১০৩, সেন যুগে বাঙালী সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পকলা ১০৫, বিভিন্ন রাজবংশের আমলে দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ১০৫, সুদূর দক্ষিণ ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি ১০৯, চোলরাজদের আমলে সমাজ সংস্কৃতি ১১০

(খ) **বহির্ভারতের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক**—মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ১১২, ভারত ও দূরপ্রাচ্য ১১২, ভারত ও তিব্বত ১১২, ভারত ও ব্রহ্মদেশ ১১২, ভারত ও থাইল্যান্ড ১১৩, কম্বুজ রাজ্য ১১৩, চম্পা রাজ্য ১১৪, শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য ১১৫, ভারত ও সিংহল ১১৬, বৃহত্তর ভারত ১১৭

অষ্টম অধ্যায় : মধ্যযুগে ভারত ১১৮—১৬২

সুলতানী যুগের ইতিহাসের উৎস ১১৯, ভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশ—আরবীদের সিন্ধু বিজয় ১২১, ভারতে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ১২২, দিল্লীর সুলতানী আমল ১২৬, খলজী বংশ ১৩১, তুঘলক বংশ ১৩৫, তৈমুরলঙ ১৩৯, বাংলায় ইলিয়াসশাহী বংশ ১৪০, হুসেন শাহ ১৪১, নসরৎ শাহ ১৪২, বাহমনি ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উদ্ভব ১৪৩, বাহমনি-বিজয়নগর দ্বন্দ্ব ১৪৬, বিজয়নগর সাম্রাজ্য ১৪৮, সুলতানী যুগে ভারতের উপর ইসলামের প্রভাব ১৫৩

নবম অধ্যায় : মুঘল যুগ ১৬৩—২১২

ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা ১৬৫, মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১৬৭, শেরশাহ ১৬৮, আকবর ১৭২, জাহাঙ্গীর ১৮২, শাহজাহান ১৮৪, ঔরঙ্গজেব ১৮৭, শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের অভ্যুদয় ১৯১, মুঘল আমলে ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ২০০, মুঘলযুগে ভারত ২০৩

দশম অধ্যায় : মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ২১৩—২২১

ঔরঙ্গজেবের আমলে সাম্রাজ্যে ভাঙন ২১৩, ক্ষমতাসীন অভিজাত সম্প্রদায় ২১৬, রাজশক্তির অধঃপতন ২১৭, প্রদেশে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অবসান ২১৯, বৈদেশিক আক্রমণ ২২০

একাদশ অধ্যায় : আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ২২২—২৩০

আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যসমূহ ২২২, হায়দরাবাদে স্বাধীন নিজামশাহী ২২৩, শিখ শক্তির অভ্যুত্থান ২২৫, মারাঠা শক্তির বিস্তার ২২৬

দ্বাদশ অধ্যায় : ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠির বাণিজ্য সম্প্রসারণ ২৩১—২৩৮

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি সংঘর্ষ ২৩১, ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ২৩১, ফরাসী ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ২৩২, রবার্ট ক্লাইভ ২৩৫

বিষয় পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ বাংলাদেশে ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠা লাভ ২৩৯—২৪৫

বাদশাহী সনদ ২৩৯, নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সাথে বিবাদ ২৩৯, কলকাতা অধিকার ২৪০, কলকাতা পুনরুদ্ধার ২৪০, চন্দননগরে ফরাসী শক্তি ২৪১, পলাশীর যুদ্ধ ২৪১, নবাব মীরজাফর ২৪৩, নবাব মিরকাশীম ২৪৩, কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ২৪৪

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তার ২৪৬—২৫৯

ওয়ারেন হেস্টিংস ২৪৬, লর্ড ওয়েলেসলী ২৪৬, ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ ২৪৭, ইঙ্গ-মহীশূর সংঘর্ষ ২৫২, অন্যান্য রাজ্য অধিকার ২৫৪, পাঞ্জাবে শিখশক্তি ২৫৫, ডালহৌসীর অবদান ২৫৮,

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ ব্রিটিশ কোম্পানীর আমলে শাসনব্যবস্থা ২৬০—২৬৬

শাসনব্যবস্থার প্রথম যুগ ২৬০, ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ২৬১, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ২৬১, ভারত-শাসনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভূমিকা ২৬১, লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট ২৬২, পিটের ভারত-শাসন আইন ২৬২, ওয়ারেন হেস্টিংস ২৬৩, লর্ড কর্নওয়ালিস ২৬৪, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ২৬৫

ষোড়শ অধ্যায় ঃ ব্রিটিশ আমলে শিল্প ও বাণিজ্য ২৬৭—২৭০

বাণিজ্যে বাংলার অর্থের বিনিয়োগ ২৬৭, দেশীয় শিল্পের পতন ২৬৮

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি ২৭১—২৮৪

ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ২৭১, ইসলামী শিক্ষা ২৭১, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ২৭১, শিক্ষার মাধ্যম ২৭৪, দেশীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ২৭৫, সমাজ সংস্কার-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ২৭৮, সতীদাহ প্রথা ২৭৮, রাজা রামমোহন রায় ২৭৯, রাজা রাধাকান্ত দেব ২৮০, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৮০, কেশবচন্দ্র সেন ২৮১, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৮১, দয়ানন্দ সরস্বতী ২৮২, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ২৮২ স্বামী বিবেকানন্দ ২৮৩, আলিগড় আন্দোলন ২৮৪

অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ কৃষক-আন্দোলন ২৮৫—২৯০

তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবী-আন্দোলন ২৮৫, ফারায়েজী আন্দোলন ২৮৬, উপজাতিদের নেতৃত্বে আন্দোলন ২৮৭, কোল-হো-মুণ্ডা আন্দোলন ২৮৮, সাঁওতাল আন্দোলন ২৮৮, বীরসিংহ মাঝির নেতৃত্ব ২৮৮, মোপলা কৃষক অভ্যুত্থান ২৮৯

উনবিংশ অধ্যায় ঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ২৯১—৩০০

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ২৯১, ব্যাপক বিদ্রোহ ২৯৪, বিদ্রোহের বিস্তার ২৯৫, বিদ্রোহ দমন ২৯৬, সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ২৯৭, ভারত শাসনে পরিবর্তন ২৯৮, বিদ্রোহের প্রকৃতি ২৯৮

অনুশীলনী i—xxx

ভারতবর্ষ

পৌরাণিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, হিমালয় পর্বত থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিশাল ভূভাগকে ভারতীয়রা ভারতবর্ষ অথবা 'ভরত রাজা'র দেশ নামে অভিহিত করতেন।*

প্রাচীন পারশিক ও গ্রীকেরা সিন্ধুনদের নাম খুবই শুনেছিলেন; তাঁরা 'সিন্ধু' নামেই ভারতকে জানতেন। প্রাচীন পারশিকেরা এ দেশটিকে 'হিন্দু' (HINDU) বলত—যেমন তারা সপ্তসিন্ধুকে বলত 'হপ্তহিন্দু'। গ্রীকেরা সিন্ধুকে 'ইন্ডস্' নামে উচ্চারণ করতেন। তাই পরবর্তী যুগে ইংরেজীতে ভারতকে বলা হয় 'ইন্ডিয়া'। ভারতবর্ষের পরিবর্তে 'হিন্দুস্থান' নামটি মধ্যযুগের ঐতিহাসিকেরা বেশির ভাগ ব্যবহার করতেন। ভারতকে একটি উপমহাদেশ বলাই সর্বদিক থেকে সমীচীন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা বুঝতে হলে এখানকার প্রাচীন ধর্মদর্শনের সংগে কিছুটা পরিচিত হতে হবে। সূর্যের আলোকে যেমন দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়, তেমনি ভারতীয় জীবন উদ্ভাসিত হয়েছে বৈদিক দর্শনের আলোতে—জনসাধারণের জীবনে তারই প্রভাব বেশী।

বর্তমান বিশ্বে ভারত একটি বিশাল রাষ্ট্র। আয়তনের দিক দিয়ে অন্য কোন বড় রাষ্ট্রের সংগে কম-বেশি হেরফের হলেও সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার ষষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে আছে আমাদের দেশটি। সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শে সমাজ গঠনে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে ভারত এগিয়ে চলেছে। এখানকার অধিবাসীরা প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। জন্মভূমিকে এরা ভালবাসে। ভারতের অধিবাসীরা অদ্ভুত রকমের বুদ্ধিমান; কিন্তু রহস্যবাদী। সৌজন্যে তুলনাহীন—শান্তি-ধর্মে বিশ্বাসী, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে উদাসীন। বেশী আগ্রহশীল ঐশ্বরিক পবিত্রতার দিকে। ভারতবাসীমাত্রই আদর্শবাদী। তারা জড়বাদীও নয়, বস্তুবাদীও নয়।

---

*'উত্তরম্ যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্
বর্ষম্ তদ্ ভরতম্ নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।

—বিষ্ণুপুরাণ II, 3·1

ভারতবর্ষ
(প্রাকৃতিক)
তিব্বত
হিমালয় পর্বত
সিন্ধু সমভূমি
দিল্লী
গাঙ্গেয় সমভূমি
ব্রহ্মপুত্র নদ
মধ্য ভারতের মালভূমি
বিন্ধ্য পর্বত শ্রেণী
নর্মদা নদ
বঙ্গদেশ
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
সিংহল
ভারত মহাসাগর

॥ ১ ॥

ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জন-সমষ্টি

[ক] ভৌগোলিক পরিবেশ

ভারতের সীমা : ভারতের উত্তর হতে দক্ষিণে বিস্তৃত অঞ্চল রয়েছে প্রায় **২,৯০০** কিলোমিটার (১৮০০ মাইল)। পূর্ব হতে পশ্চিমে বিস্তৃত অঞ্চলটি প্রায় **২,১৯০** কিলোমিটার (প্রায় ১৩০০ মাইল)। হিমালয়ের বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে রয়েছে প্রায় ২,৪০০ কিলোমিটার (১৫০০ মাইল)।

ভৌগোলিক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতকে সম্পূর্ণ পৃথক পাঁচটি অংশে ভাগ করা চলে :

(১) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল :**

ভারতীয় পুরাণে এই অঞ্চলকে বলা হয়েছে 'পর্বতাশ্রীণ'। তরাই-এর জঙ্গল থেকে মিহালয়ের উচ্চ শিখর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে কাশ্মীর, কাংড়া, কুমায়ুন, নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চলের পরিধি প্রায় চার হাজার কিলোমিটার।*

(২) **সমতল প্রদেশ :**

সিন্ধু-গঙ্গা যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত উর্বর সমতল উপত্যকাভূমি শস্য-শ্যামল সম্পদে সমৃদ্ধ। ধান ও গম চাষের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চল। আর্য সভ্যতা ও বিভিন্ন ধর্ম-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এটাই উৎসভূমি। সকল প্রকার রাজনৈতিক সংঘর্ষের পক্ষেও এ স্থানটি ছিল উপযুক্ত। সিন্ধু-উপত্যকার একটি প্রধান অংশ বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত পূর্ব অঞ্চলটিও পাকিস্তানের অধীনে ছিল, কিন্তু সম্প্রতি এখানে 'বাংলাদেশ' নামে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) **মধ্যভারতের মালভূমি অঞ্চল :**

সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে এই নামে অভিহিত করা হয়। প্রাচীনকালে আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হ'য়ে কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিম অধিবাসীরা এই পর্বত-সুরক্ষিত অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের রক্ষা করেছিল।

(৪) **দক্ষিণ ভারতের মালভূমি :**

উত্তর ভারতের বিশাল সমতলভূমির দক্ষিণাংশে সুবৃহৎ মালভূমি অবস্থিত। এই মালভূমি দুটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত। একটি হলো, বিন্ধ্য-সাতপুরার পার্বত্য অঞ্চল, অপরটি হলো দক্ষিণ-ভারতীয় উপদ্বীপ।

* Hindusthan Year Book 1986, P. 13

বিন্ধ্য-সাতপুরার পার্বত্য অঞ্চল থেকে মালভূমি শুরু হ'য়ে মধ্য ভারতের এক বিশাল অংশে বিস্তৃত রয়েছে এবং তার দক্ষিণে রয়েছে দাক্ষিণাত্যের বিরাট অধিত্যকা প্রদেশ।

আলোচ্য ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। এই অঞ্চলের সমতলভূমি দক্ষিণ দিকে শুরু হয়ে উত্তর দিকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, তারপরেই দেখা যাবে বিন্ধ্য-সাতপুরার পর্বতশ্রেণী। এই দুর্গম প্রদেশের মধ্য দিয়েই পশ্চিমে নর্মদা ও তাপ্তী এবং পূর্বে মহানদী প্রবাহিত হয়েছে। দক্ষিণাপথের অধিত্যকা প্রদেশও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ রয়েছে। পূর্বে পূর্বঘাট এবং পশ্চিমঘাট পর্বত —পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি সুবৃহৎ প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। এখানে নদ-নদীও রয়েছে প্রচুর। সব কয়টি নদ-নদীর কি সুন্দর নাম—গোদাবরী, কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা, কাবেরী, আর তাদের শাখা-প্রশাখারই বা কত নাম! দক্ষিণাপথের ইতিহাস এই নদী-উপত্যকায় বিস্তীর্ণ জনপদের ইতিহাস।

(৫) সমুদ্র উপকূলভাগ ঃ

ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। তারই শাখাস্বরূপ আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর ভারতের দুটি প্রধান জলপথ। সুদীর্ঘ উপকূল ভাগের নানা স্থানে বাণিজ্য-বন্দর গড়ে উঠেছিল। সমুদ্রপথেই ভারতের মানুষ প্রাচীন যুগেই দেশ-বিদেশের সাথে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ভারতবাসী বহু দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। সেখানে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব হয়েছিল। সমুদ্রপথেই এসেছিল পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ প্রভৃতি সম্প্রদায়।

ভারতের জনসমষ্টি—নৃতাত্ত্বিক উপাদান

ঐতিহাসিকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, সুপ্রাচীন ভারতীয় ভূ-খণ্ডে প্রাগৈতিহাসিক এবং অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের আদিম মানুষদের দেহাস্থির নিদর্শন খুব কমই পাওয়া গিয়াছে। নৃতত্ত্ববিদদের বিচারে বহু মানবজাতির রাশীকরণে সৃষ্টি হয়েছে ভারতবাসী। বহু মানব এখানে এসেছে, বসতি স্থাপন করেছে এবং এক দেহে লীন হয়েছে।

আদিবাসী ঃ

নৃতত্ত্ববিদদের বিচারে আদিবাসী উপজাতিদের 'Tribes' বলা যেতে পারে। সংস্কৃত 'জন' শব্দ ইংরেজী 'Tribe'-এর প্রায় সমার্থক। আদিবাসী উপজাতিরা বসতি হিসেবে বেছে নিয়েছে সাধারণতঃ বনভূমি, দুর্ভেদ্য পার্বত্য অঞ্চল, যেখানে তথাকথিত সভ্য মানুষ উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি না ক'রে বাস করতে চাইবে না। উপকূল এবং নদী-উপকূলের খাড়া অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে বর্তমান কালেও তাদের

অধিকাংশ বসবাস করছে। অনেক সময়ে কোন এক জন্তুর প্রতীককে তারা তাদের পূর্বপুরুষ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে।*

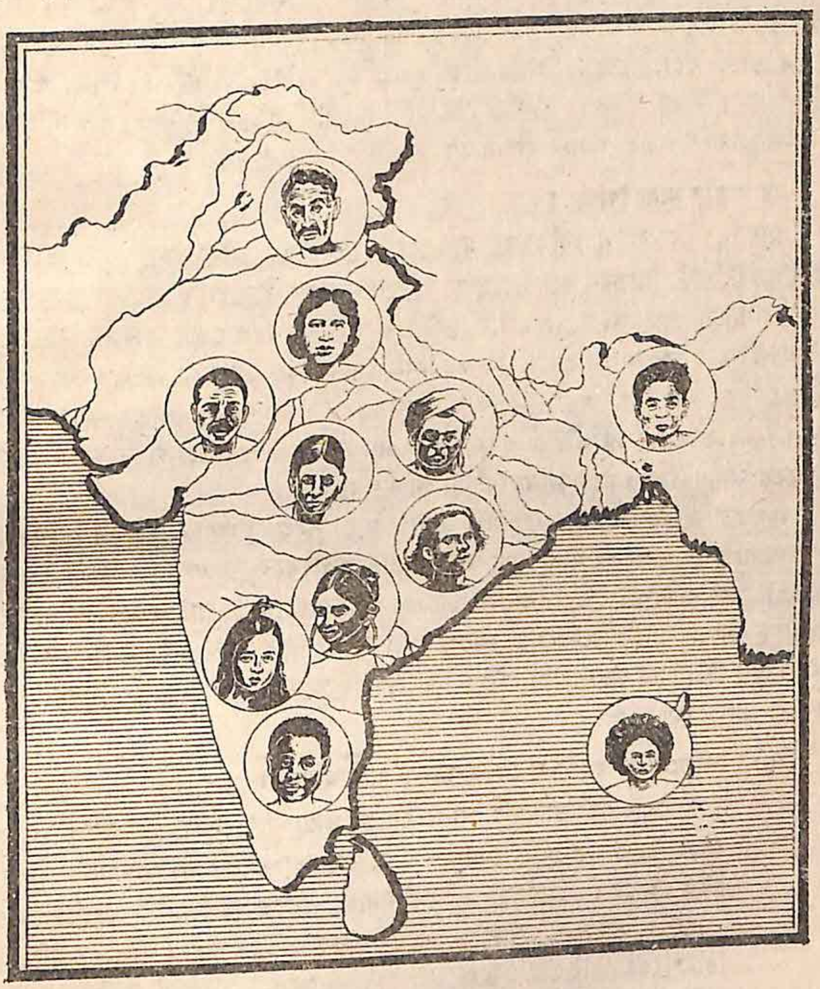

ভারতবর্ষ (আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল)

*"Tribe denotes a group of people with a common aboriginal ancestors living in a more or less difficultly accessible common locality, mostly cut off or away from a general population of the country with a much lower standard of civilization or culture. Some of them have their origin even from a common emblem of totem including an animal figure for several generations."

[Quoted from the Foreword, *Tribes of Ancient India*—Dr. Mamata Chowdhury, written by Dr. P. Roy, Director of Indian Association for the Cultivation of Science.]

প্রাচীন বৈদিক পুরাণশাস্ত্রসমূহে কিরাত, নিষাদ, শবর, গন্ধর্ব, কম্বোজ, রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি সকলকেই বলা হয়েছে অনার্য বা দাস। তারা সকলেই কৃষ্ণবর্ণের ; কিন্তু আর্যরা ছিলেন গৌর বর্ণের। দেহাকৃতি দিয়ে আর্য ও উপজাতি আদিবাসীদের পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অসুর, পিশাচ প্রভৃতি 'মহাকায়' ; নিষাদ, রাক্ষস প্রভৃতি 'লম্বকর্ণ' ; শবর, কিরাত প্রভৃতি 'অনাস' বা স্থূল নাসিকা-বিশিষ্ট ; রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি 'রক্তদন্ত'—এরূপ নানা বর্ণনা আর্যদের গ্রন্থাদিতে রয়েছে।

নর নারীর মধ্যে বৈচিত্র্য :

আধুনিক কালে নৃতত্ত্ববিদেরা মানুষের মস্তকাকৃতি, অস্থি-গঠন, বর্ণ, ভাষা ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে ভারতীয়দের শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

ডঃ হাটন প্রজাতিগত (racial) ভাষা ও কৃষ্টিগত দিক থেকে ভারতের মানুষকে বিশ্লেষণ ক'রে বলেন : কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠীকেই ভারতের মাটিতে জাত ব'লে চিহ্নিত করা যায় না, সব মানুষই বহিরাগত। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সময়ে বাইরে থেকে ভারতে এসে সংমিশ্রিত হ'য়ে ভারতীয় মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।

বিখ্যাত নৃতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ ডঃ বি. এস্. গুহ সমস্ত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা ক'রে ভারতের মানুষদের **ছয়টি প্রধান প্রজাতিতে** বিভক্ত করেছেন। তিনি ডঃ হাটনের আলপাইন্ বা অ্যালপিনয়েড উপজাতিদের উল্লেখ করেননি। কারণ দেহাস্থি বর্ণনায় ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের মিল নেই। বর্তমানে ভারতীয় পণ্ডিতমহলে ডঃ গুহের অভিমতই গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়েছে। ডঃ গুহের চিহ্নিত ছয়টি মানব-প্রজাতি হল :

(১) **নেগ্রিটো বা আফ্রিকা থেকে আগত আদিমতম মানুষ :**

বর্তমানে ভারতের মাটি থেকে তারা প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। এদের একটি ছোট সম্প্রদায়, যেমন—ওঙ্গি, জারোয়া, সেন্টিনাল আন্দামানে এখনও টিকে আছে। জারোয়া ও সেন্টিনাল প্রভৃতি আদিবাসী এখনও সভ্য মানুষের সাধারণ জীবনের সাথে পরিচিত হতে চাইছে না। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের পার্বত্য অঞ্চলে 'কাদার', 'পালয়ান', 'ইরলা' প্রভৃতি উপজাতি নেগ্রিটোদের বংশধর। আসামের 'অঙ্গামি নাগা' ও রাজমহল পার্বত্য অঞ্চলেও এই প্রজাতিভুক্ত কিছু উপজাতির সন্ধান পাওয়া যায়।

(২) **প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড :**

এই গোষ্ঠীর মানুষেরা পূর্ব-ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে এসেছে। এরা খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, লম্বাকৃতি—নাকের অগ্রভাগ চেপ্টা বা দুপাশে ছড়ানো। বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলের নিষাদ প্রভৃতি অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে এরা মিশে গেছে। বহু প্রাচীনকালেই এদের একটি শাখা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে চলে যায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এদের একটা বড় অংশ নিম্নবর্ণ বা নিম্ন শ্রেণীর

অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। মধ্য ভারতের 'কোল', 'ভীল', 'মুণ্ডা' এবং আসাম, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোচীনের মন্-খ্মার গোষ্ঠীভুক্ত 'খাসিয়া', 'জয়ন্তিয়া' প্রভৃতি প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড প্রজাতিভুক্ত। অন্ধ্রপ্রদেশের 'গাণ্ড', 'কই', 'ওরাও' প্রভৃতি উপজাতিকেও এই প্রজাতির মানুষ ব'লে মনে করা হয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হলুদ ও সিঁদুরের ব্যবহার এই প্রজাতীয় মানুষের কাছ থেকেই এসেছে। ধান ও আখের চাষের কৃতিত্বও এদের প্রাপ্য।

(৩) **মঙ্গোলয়েড ঃ**

পীতবর্ণ, খর্বাকৃতি এই শ্রেণীর আদিবাসী উপজাতি ভারতের উত্তর ও পূর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এই প্রজাতির মানুষের দুই রকম মস্তকাকৃতি দেখা যায়—লম্বাকৃতি ও গোলাকৃতি। যাদের মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা তারা বেশির ভাগ আসাম ও ভারত-ব্রহ্মবাসীদের নানা উপজাতিভুক্ত মানুষ—যেমন চাক্মা প্রভৃতি। "টিবেটো-মঙ্গোলয়েড" গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা, যেমন—নেপালী, ভুটিয়া, লেপ্চা প্রভৃতি উপজাতি, উত্তর-পূর্ব ভারতের 'কিরাত' সম্প্রদায় প্রভৃতিও মঙ্গোলয়েড প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

(৪) **মেডিটারেনিয়ান ঃ**

এদের প্রায় সকলেই লম্বাকৃতি মস্তকবিশিষ্ট, মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ও হাল্কা দেহগঠনযুক্ত। পরবর্তীকালে এই উপজাতির মানুষেরা সভ্য ও উন্নত দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রজাতির মানুষ বেশির ভাগ দেখা যায় কন্নাড়, তামিল ও মলয়ালম্-ভাষী অঞ্চলে। এদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় ও যাদের গাত্রবর্ণ কিঞ্চিৎ পরিষ্কার তাদের দেখা যায় পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে।

(৫) **ব্র্যাকীসেফেলাস্ ঃ**

এই প্রজাতির মানুষেরা বেশীর ভাগ নিগ্রেয়েডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এই প্রজাতির সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন বহু উপজাতীয় মানুষের বাসস্থান বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল গাঙ্গেয় উপত্যকা, কানাড়া, তামিল, গিলগিট, চিত্রাল প্রভৃতি স্থানে রয়েছে।

(৬) নর্ডিক প্রজাতির গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী, উন্নত নাসা মানুষেরা 'বৈদিক আর্য জাতি'র অন্তর্ভুক্ত। তাঁরাই 'আর্য' সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তক এবং আর্য সভ্যতার বাহক।

[খ] ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক প্রভাব

ভারতের ভুপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে ভারত-ইতিহাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ হবে না। প্রাচীনকাল থেকেই বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর দিকের অংশ 'উত্তরাপথ'

বা 'আর্যাবর্ত' এবং দক্ষিণ দিকের গোটা উপদ্বীপটি 'দক্ষিণাপথ' বা 'দাক্ষিণাত্য' নামে প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষ চারদিক দিয়ে প্রাকৃতিক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। এ-ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর ফলে ভারতবাসীর চরিত্রে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করার মতো।

ভৌগোলিক ব্যবধানের ফলে ভারতের সংগে বিশ্বের অন্যান্য দেশ একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এরকম বিচ্ছিন্নতার ফলে ভারত-ইতিহাসের বৈচিত্র্য কমে গেছে বটে; কিন্তু তার স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এ কারণেই ভারতের রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি এক স্বতন্ত্র পথে সর্বদাই চলেছে।

উত্তর ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত সমতলভূমি এবং দক্ষিণ ভারতের পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের পাদমূলে বিস্তৃত নিম্নভূমি উর্বরতায় প্রসিদ্ধ ও শস্য-সম্পদে অতুলনীয়। ভারতে খনিজ সম্পদও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হওয়ায় অতীতকালের ভারতবাসীর জীবনে প্রচুর অবসর ছিল। তাই অবসর সময়ে ভারতবাসী সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলার অনুশীলন করে সভ্যতার ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে।

এই প্রচুর ঐশ্বর্য কিন্তু ভারতবাসীর জীবনে অভিশাপও ডেকে এনেছে। ভারতবাসী কিছুটা শ্রমবিমুখ ও শক্তিহীন হ'য়ে পড়েছিল। ভারতের ঐশ্বর্যে প্রলুব্ধ হ'য়ে অনেক বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল এবং ভারতবাসী সেই আক্রমণ প্রতিহত ক'রে অনেক সময়ই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেনি।

ভারতের চারদিকে দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক প্রাচীর থাকলেও, কিছু কিছু দুর্বল রন্ধ্রপথও ছিল। খাইবার, বোলান, মাকরান প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ-গুলি ধরে বিদেশী আক্রমণকারীরা উত্তর ভারতের সমতলভূমির উপরে দুর্বার বেগে অভিযান চালিয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ পথ ধরেই বিদেশের সংগে ভারতের বাণিজ্য চলতো। উত্তরদিকে হিমালয় বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারলেও, দক্ষিণ দিকে বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী বিদেশী আক্রমণকারীদের গতিবেগ বেশ কয়েকশো বছর ধরে ঠেকিয়ে রেখেছিল। এই কারণেই প্রাক-মুসলমান যুগে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে বৈদেশিক প্রভুত্ব স্থাপনে অসুবিধে হ'য়েছিল।

ভারতের এই ভৌগোলিক অবস্থা দেশের অভ্যন্তরেও রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করেছিল। রাজপুতনার মরু অঞ্চল ও বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে এবং নদীবহুল স্থানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা সহজ হয়নি। ভারতের ভূখণ্ডের বিশালতা, যানবাহনের অপ্রতুলতার জন্যও ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয়েছে। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সংখ্যা এ-কারণেই বেশি ছিল।

প্রাকৃতিক বৈষম্যের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতবাসীর চরিত্রে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছে। পার্বত্য ও মরু অঞ্চলের অধিবাসীরা সমতল প্রদেশের অধিবাসীদের ন্যায় সহজ সরল জীবনযাত্রার সুবিধে পায়নি। তাই তারা অধিকতর কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু।

আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময় ঃ

ভারতের প্রাকৃতিক সীমারেখা বহির্জগতের সংগে ব্যবধান সৃষ্টি করলেও আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময়ের পথকে অবরুদ্ধ করতে পারেনি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ ধরে বিদেশীরা যেমন ভারতে প্রবেশ করেছিল তেমনই ঐ পথেই বহু ভারতবাসী বিদেশে গিয়েছিল তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করতে। অনেক বিদেশী পরিব্রাজকও ভারতে এসেছিলেন ভারতের আর্থিক ও পরমার্থিক ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হ'য়ে। কুষাণ রাজাদের আমলে মধ্য-এশিয়ায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহুল প্রচার সম্ভব হয়েছিল। চীন, কোরিয়া, জাপান, খোটান, তিব্বত প্রভৃতি দেশ থেকে বহু তথ্যানুসন্ধানী অনেক কষ্ট করে ভারতে এসেছিলেন শিক্ষালাভ করতে। ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধও এ দেশগুলির সংগে বহু প্রাচীনকাল থেকেই স্থাপিত হয়েছিল।

সাগরের পথে ভারতের সংগে সর্বপ্রথমে পরিচয় হয় প্রতিবেশী দ্বীপপুঞ্জের। এই পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল যে, ভারতের নামেই তারা পরিচিত হতে লাগল। দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, মালয়, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু উপনিবেশসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু-সভ্যতার প্রচার সাগরের পথেই সম্ভব হয়েছিল।

[গ] মৌলিক ঐক্য

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের সংগে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। আর্য-ভাষা সংস্কৃত থেকে ভারতের বহু ভাষার উৎপত্তি হলেও একথা সত্য যে বর্তমান যুগেও আমরা এক অঞ্চলের ভারতবাসী অন্য অঞ্চলের ভারতবাসীর কথা বুঝতে পারি না। বহু ভাষা-ভাষী ভারতবাসীকে বাধ্য হয়ে বিভিন্নতার পথে যেতে হয়েছে।

ভারত বহু ভাষা ও বহু ধর্মের দেশ। ভারতবাসীর জীবনে নানা অসাম্যের মধ্যেও ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়ধর্মী উদার চরিত্রই লক্ষণীয়। তাই প্রাকৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ভারতবাসী এক বলিষ্ঠ আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে সর্বদাই এগিয়ে চলেছে। তারা সর্বদাই সাধনা করেছে ভারতীয়ত্ব বা ভারতীয় সত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে।

বিভিন্ন সংস্কৃতি-গোষ্ঠীর ভাব-বৈচিত্র্যের জন্যই ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রে নানা বৈশিষ্ট্য এসেছে, তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হলে ঐক্য বা জাতীয় সংহতি দৃঢ় করা সম্ভব হবে না। এখানে বিলোপের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হলো সমন্বয়ের, যার যেটুকু বৈশিষ্ট্য আছে তাকে সেটুকুর মর্যাদা দিতে হবে। অগণিত ভারতবাসীকে সমন্বয়ের পথ ধ'রে ভারতীয় সত্তায় বিশ্বাসী করতে হবে। এই ঐক্য হল ঃ মনের ঐক্য—ভাবের ঐক্য—সংস্কৃতির ঐক্যবন্ধন।

বিভিন্ন ধর্মের অনুপ্রবেশ ভারতে হয়েছে। এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু হিন্দু ধর্ম নানাভাবে সংস্কৃত হয়ে একটি উদার ধর্মমতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই

উদারতার আশ্রয় নিলেও হিন্দুধর্ম তার প্রাচীন বৈদিক ধর্মের দৃঢ়মূল থেকে বিচ্যুত হয়নি কখনও।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাই জাতীয় সংগ্রামে ভারতবাসী দৃঢ়সংকল্প নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদের কাছে ইংরেজ শক্তিকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

[ঘ] ভারত-ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ঐতিহাসিকেরা ভারত-ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন, যথা—প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। ঐতিহাসিকেরা বহু পরিশ্রম করে প্রমাণ-নির্ভর নানা ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। তথ্যাদির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে তাদের শ্রেণী-বিন্যাস করেছেন। এগুলিকেই ঐতিহাসিক উপাদান বলা হয়। তাদের সাহায্যেই ইতিহাস-রচনার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক উপাদান :

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদ রচনা শুরু হয় আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। এ সময় থেকেই ভারতে আর্য-প্রজাতি বৈদিক যুগের সূচনা। ইতিহাসের লিখিত উপাদান এ সময় থেকেই কিছু কিছু উদ্ধার হয়েছে।

প্রাচীন যুগের উপাদানসমূহকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

(১) **প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান :**
  - (ক) শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি।
  - (খ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন।
  - (গ) মুদ্রা।

(২) পরিব্রাজকদের ভ্রমণ কাহিনী।

(৩) প্রাচীন সাহিত্য ও সমসাময়িক দেশীয় লেখকদের রচনা।

[১] **প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান :**

এই জাতীয় উপাদানের মধ্যে অনেক শিলালিপি ও তাম্রলিপির লিপিমালার পাঠোদ্ধার করা হয়েছে, বিভিন্ন ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় এগুলির অনুবাদও করা হয়েছে।

(ক) শিলালিপি প্রসঙ্গে সম্রাট অশোকের শিলালিপিসমূহের উল্লেখ সর্বপ্রথমেই করতে হয়। এই শিলালিপিগুলিতে যে লিপিমালা ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি ছিল ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী লিপি। বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত জেমস্ প্রিন্সেপ্ কঠোর পরিশ্রম করে লিপিমালার পাঠ-সংকেত এবং লিখিত তথ্যের পাঠোদ্ধার করেছেন।

গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের সভাকবি হরিষেণ এলাহাবাদে একটি স্তম্ভলিপিতে সম্রাটের

দিগ্বিজয় সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রশস্তি রচনা করে গেছেন। গুপ্তযুগের ইতিহাস রচনায় এটি একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান।

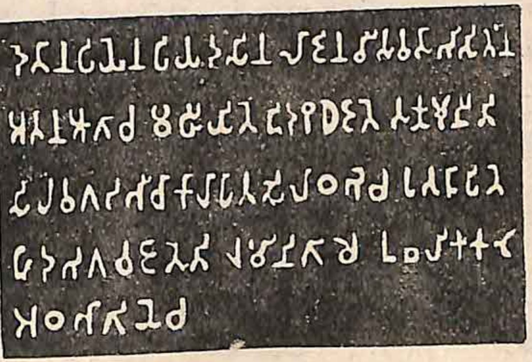

অশোকের শিলালিপি

(খ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন : ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় লর্ড কার্জনের আমলে। ১৯২২ সালে জন্ মার্শাল ও অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সিন্ধু-উপত্যকায় মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার বিস্তীর্ণ অঞ্চল খননের ফলে প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতার অনেক মূল্যবান নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে। মধ্য ভারতে সাঁচী ও বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথে খননকার্যের ফলে মৌর্য ও বৌদ্ধযুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বিহার রাজ্যে নালন্দা মহাবিহারের খননকার্য ও পরিকল্পনামত চলার ফলে এখান থেকে বহু শিলালিপি ও তাম্রলিপি. অর্ধদগ্ধ কিছু কিছু পুঁথি, সীলমোহর, নানা ধরনের বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। রাজসাহী জেলার (বর্তমান বাংলা দেশ) অন্তর্গত পাহাড়পুরের বিখ্যাত সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানকার মহাস্থান নামক অঞ্চলে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। এইভাবে খননকার্যের ফলে উত্তর ভারতের শ্রাবস্তী, কৌশম্বী, মথুরা, অহিচ্ছত্র. ভারহুত, সাঁচী, সারনাথ, বুদ্ধগয়া, খজুরাহো, কোণারক প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের মহাবলিপুরম্, অজন্তা. ইলোরা, অমরাবতী প্রভৃতি স্থান থেকেও অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে। শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতির ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হলো যে পরবর্তীকালেও তাদের অদল-বদল করার কোন উপায় থাকে না।

বিদেশী প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে জন্ মার্শাল-সহ আলেকজান্ডার কানিংহাম্, বুকানন্ হ্যামিল্টন্, ফার্গুসন্ প্রমুখের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য। আলেকজান্ডার কানিংহাম্ গ্রীক ও চৈনিক পরিব্রাজকদের লেখা নানা বিবরণী পাঠ ক'রে প্রাচীন ভারতের অনেক জনপদের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন।

(গ) **মুদ্রা ঃ** প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার আর একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হলো মুদ্রা। গ্রীক লেখকদের বিবরণী পাঠ ক'রে আলেকজান্ডার কানিংহাম্ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনেক স্থান হ'তে বহু মুদ্রা ও মূর্তি উদ্ধার করেছেন। মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপিমালার পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। মূর্তিসমূহের নির্মাণ-সৌকর্যে গ্রীক্ প্রভাব প্রমাণিত হয়েছে। মুদ্রা থেকে রাজাদের নাম এবং সমসাময়িক আর্থিক ও

প্রাচীন মুদ্রা

সামাজিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। গুপ্ত বংশের সমুদ্রগুপ্ত থেকে তাঁর পরবর্তী বংশধরদের নামাঙ্কিত বহু মুদ্রা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রীক্, পহ্লব, শক ও কুষাণ্ নৃপতিদের নামাঙ্কিত বহু মুদ্রাও ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গিয়েছে।

[২] পরিব্রাজকদের ভ্রমণকাহিনী ঃ

প্রাচীন পর্যটকদের বিবরণীর মধ্যে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণী (ইন্ডিকা) সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর বিবরণীর উপরে নির্ভর করে পরবর্তী যুগের জাস্টিন, স্ট্রাবো প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকেরা ভারত সম্বন্ধে অনেক বিবরণী লিখেছেন।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস্ অব্ দি ইরিথ্রিয়ান সী' পাঠে জানা যায় যে, মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া থেকে যাত্রা করে ইরিথ্রিয়ান বা আরব সাগরের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে সে যুগের নাবিকেরা বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করতেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক ভৌগোলিক টলেমীর লেখায় ভারতের অনেক ভৌগোলিক অঞ্চলের বিবরণ পাওয়া যায়।

রোমের সংগে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্কের কাহিনী গ্রীক ঐতিহাসিক স্ট্রাবোর লেখা থেকে জানতে পারা যায়। রোমের ঐতিহাসিক প্লিনি খুব দুঃখ ক'রে লিখে গেছেন যে, রোমের বিলাসী নাগরিকেরা প্রচুর মূল্য দিয়ে ভারতীয় মস্‌লিন, সুগন্ধি দ্রব্য ও মসলা ক্রয় করায় রোমের প্রচুর টাকা ভারতে চলে আসতো।

প্রত্নতাত্ত্বিক অরেল স্টেইন নানা নিদর্শনের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, ভারতের

সিন্ধু উপত্যকার সংগে মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ভারতের সংগে এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ-গুলোর পরিচয় বৃদ্ধি পাওয়ার মূলে ছিল বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রচার। চীন দেশ থেকে ভারতে অনেক পরিব্রাজক আসেন। তাঁদের মধ্যে ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ ও ইৎ সিঙের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের বৌদ্ধতীর্থগুলো ভ্রমণ ও এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন—এ দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা চীন দেশীয় পরিব্রাজকেরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁদের লেখা বিবরণী সমসাময়িক ভারত-ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে বৌদ্ধ মহাযান মতবাদ প্রচারের ফলে তিব্বতের সংগে ভারতের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাস রচনায় তিব্বতীয় পণ্ডিতদের লেখা তথ্যাদির ঐতিহাসিক মূল্য সকলেই স্বীকার করেন।

[৩] প্রাচীন সাহিত্য ও সমসাময়িক দেশীয় লেখকদের রচনা ঃ

আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' গ্রন্থাদি থেকে ভারতভূমিতে আর্যদের ভৌগোলিক বাসস্থান, তাঁদের ধর্মচর্চা, সমাজ ও অর্থনীতির বেশ কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। আর্যদের ধর্মদর্শনের মধ্যে প্রধান হলো উপনিষদ্। উপনিষদেও তৎকালীন আর্যদের জীবনযাত্রার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৌদ্ধজাতক ও জৈন ধর্মশাস্ত্র, হিন্দু-পুরাণ প্রভৃতি থেকে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। এ সমস্ত গ্রন্থে কাহিনী ও কিংবদন্তি প্রভৃতির সংখ্যা বেশি হলেও তাদের মধ্য থেকেই ইতিহাসকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ (৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের উপাদানের জন্য উল্লেখিত প্রাচীন সাহিত্যের উপরে অধিক পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। রামায়ণ ও মহাভারত—এ দুখানি মহাকাব্যে তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চিত্র পাওয়া যায়। বিভিন্ন পুরাণে প্রাচীন রাজবংশাবলীর ও রাজাদের ইতিহাস বর্ণিত রয়েছে। মোট আঠারটি পুরাণের মধ্যে বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এবং ভগবত-পুরাণ হতে যে সকল ঐতিহাসিক কাহিনী ও কিংবদন্তি উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার না করে পারা যায় না। মৌর্যযুগে রচিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' এবং বিশাখাদত্তের 'মুদ্রা রাক্ষস'—গ্রন্থ দুখানি থেকে সমসাময়িক ইতিহাসের অনেক তথ্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষায় লিখিত কিছু কিছু জীবন-বৃত্তান্ত দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাসে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। প্রাচীন জীবনচরিত-গুলির মধ্যে বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত', বাক্‌পতির 'গৌড়বহ', কলহনের 'রাজ-তরঙ্গিণী', বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্ক-চরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রাম-চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

॥ ২ ॥

ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ

[ক] প্রাচীন প্রস্তর যুগ, মিসোলিথিক্ যুগ ও নব্য-প্রস্তর যুগ

প্রাচীন প্রস্তর যুগ ঃ প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহৃত কিছু কিছু পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান ভারতের নানাস্থানে পাওয়া গিয়েছে। তাদের উদ্ধার করে দেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রাখা হয়েছে। গ্রীক্‌শব্দ 'পেলিওলিথিক্'-কে বাংলাতে বলা হয় 'প্রাচীন-প্রস্তর যুগ'। এ যুগের মানুষেরা সর্বপ্রথম বন্যজন্তুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতো। বনের পশুর মাংস খেয়ে তারা বাঁচতো। বন্যজন্তুদের মত তারা বনে-জঙ্গলে, বৃক্ষশাখায়, পার্বত্য ঝরনার ধারে, পর্বত-গুহায় বাস করতো। আগুনের ব্যবহার তারা জানতো না। তারা ছিল কাঁচা মাংসভোজী। প্রাচীন প্রস্তর যুগের আদিম অধিবাসীদের পাথরের

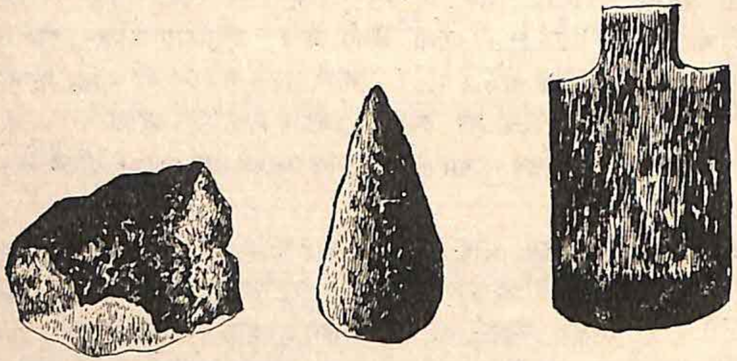

প্রাচীন প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্র

অস্ত্রগুলি নির্মিত হতো 'কোয়ার্টজাইট্' জাতীয় শক্ত পাথর দিয়ে।* তাই ভারতের প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষকে 'কোয়ার্টজাইট্ মানুষ'ও বলা যায়। এ যুগের মানুষেরা নেগ্রিটো জাতিভুক্ত। আন্দামানের আদিবাসী-উপজাতিদের দেখলে এদের কিছু পরিচয় মিলবে।

মিসোলিথিক্ যুগ ঃ পণ্ডিতেরা প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নতুন প্রস্তর যুগের মধ্যবর্তী সময়ে একদল মানুষের অস্তিত্বের খোঁজ পেয়েছেন। এ যুগের মানুষদের বলা হয়

* *Advanced History of India*, **R. C. Majumdar, H. C. Roy Chaudhury, K. Datta —page 3.**

'মিসোলিথিক্ মানুষ'। গ্রীক শব্দ '*Meso*'র ইংরেজী প্রতিশব্দ 'middle', বাংলায় 'মধ্যবর্তী'। এ যুগের মানুষেরা প্রাচীন ও নতুন প্রস্তর যুগের মধ্যবর্তী সময়ে বাস করতো বলে তাদের মিসোলিথিক যুগের মানুষ বলা হয়। ঐতিহাসিকেরা লক্ষ্য করেছেন যে, তাদের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রগুলি ছিল খুবই ক্ষুদ্র। বেশির ভাগই ছিল এক ইঞ্চি পরিমাণ। তাই গ্রীক 'মাইক্রো' (*Micro*), বাংলা 'ক্ষুদ্র' থেকে এ অস্ত্রসমূহকে 'মাইক্রোলিথ্' বলা হয়। এই প্রজাতির মানুষেরা 'কোয়ার্টজাইট্' জাতীয় শক্ত পাথর ব্যবহার না ক'রে শ্বেতবর্ণের বালুর ভাগ বেশি এমন বালুকাত্মক নরম পাথরের দ্বারা অস্ত্র নির্মাণ করতো।

নতুন প্রস্তর যুগ ঃ নতুন প্রস্তর যুগের আবির্ভাব হতে প্রায় বেশ কয়েক হাজার বছর লেগেছিল। তাই নতুন প্রস্তর যুগের মানুষদের প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের বংশধর বলা ঠিক হবে না। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা এবিষয়ে আরও কিছু আলোকপাত করতে পারেন।

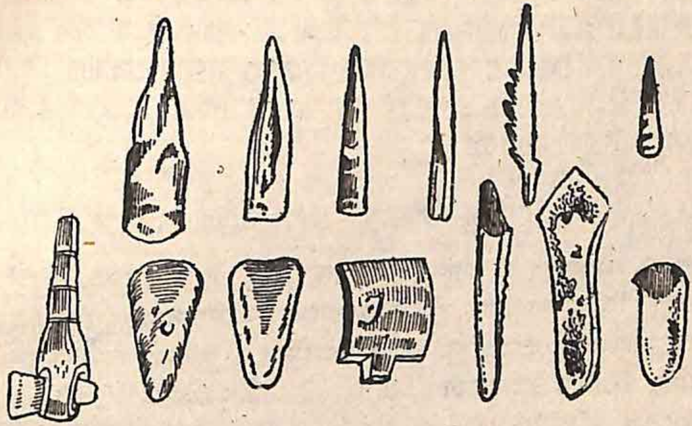

নব্যপ্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি

'নিওলিথিক্' শব্দটি 'গ্রীক'। নিওলিথিক্ যুগকে ইংরেজীতে 'New Stone Age'—বাংলায় 'নতুন প্রস্তর যুগ' বলা যায়। তখনও মানুষেরা ধাতুর ব্যবহার জানতো না। হয়তো সোনা তারা দেখে থাকবে কিন্তু তার ব্যবহার জানতো না। তারা পাথর মসৃণ করে ধারালো করার কৌশল আবিষ্কার করলো। বিভিন্ন ধরনের মসৃণ পাথরের জিনিস তারা তৈরি করে নানা কাজে ব্যবহার করার রীতি জানলো। এ যুগের মানুষের অস্তিত্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়েছে। মাদ্রাজের বেলারী জেলায় নতুন প্রস্তর যুগের অস্ত্র-নির্মাণের একটি কারখানার খোঁজ মিলেছে।

ধীরে ধীরে তারা চাষ-আবাদ ও পশুপালন করতে শিখল এবং একস্থানে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বহু গ্রাম গড়ে উঠলো। চাষ-আবাদের সুবিধার জন্য অনেকে বিভিন্ন জন্তু পুষতে লাগলো। এখন হতে মানুষ কাপড়-বোনা শুরু করলো। মাটির পাত্র তৈরি এবং খাদ্যদ্রব্য রান্না করতে লাগলো।

বাড়িঘর নির্মাণ করতে তারা বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিল। বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার পক্ষে পর্বত-গুহা নিরাপদ নয়। নির্ভয়ে বাস করতে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ ঘর তৈরি করে তার চারদিকে বেড়া দিয়ে বন্যজন্তুর আক্রমণ হ'তে নিজেদের রক্ষা করতো। গাছের উপরেও অনেক সময় ঘর প্রস্তুত করতো। নদী এবং হ্রদের তীর হতে একটু দূরে জলের মধ্যে বড় বড় গাছের খুঁটি পুঁতে, তার উপর কাঠের বাড়ি তৈরি করতো।

ধাতুর ব্যবহার প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন মানুষের উন্নতি হতে লাগল। প্রথমে তামার ব্যবহার শুরু হয়। কুড়াল, কাস্তে প্রভৃতি চাষ-আবাদের উপযোগী যন্ত্র তামা দিয়ে তৈরি করা হল। তামার অস্ত্র বেশি মজবুত ছিল না। তাই তামা ও টিন গলাইয়া 'ব্রোঞ্জ' নামে এক নতুন ধাতু প্রস্তুত হল; ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি অনেক বেশী ধারাল ও মজবুত ছিল।

একেবারে শেষে লোহার ব্যবহার শুরু হলো। সম্ভবতঃ প্রায় তিন হাজার বছর আগে মানুষ লোহার ব্যবহার শিখেছিল। লোহা ব্যবহার করে মানুষ যুদ্ধ-বিদ্যায় নিপুণ হ'য়ে উঠলো। যারা প্রথমে লোহার ব্যবহার শিখল, তারা অন্যদের হারিয়ে তাদের দেশ অধিকার করে নিল।

[খ] সিন্ধু-সভ্যতা বা হরপ্পা-সভ্যতা

মিশরের নীলনদের উপত্যকায়, মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস্-ইউফ্রেটিস্ উপত্যকায় এবং ভারতের সিন্ধু উপত্যকায়, প্রায় একই সময়ে নদীমাতৃক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল।

সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো খননের ফলে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে। এই আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, আর্য-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্বেই এক উন্নত ধরনের সভ্যতা ভারতে গড়ে উঠেছিল। এ-সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা-সভ্যতা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

তাম্র যুগ ঃ সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতাকে তাম্রযুগীয় সভ্যতা বলা হয়। নব্য-প্রস্তর যুগের শেষের দিকে তাম্র-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র ব্যবহৃত হ'তে থাকে। এই কারণে ঐতিহাসিকেরা নব্য-প্রস্তর-পরবর্তী যুগকে তাম্র-যুগ আখ্যা দিয়েছেন। ভারতে তাম্র-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর সাথে ব্রোঞ্জ-নির্মিত কিছু কিছু বস্তুও আবিষ্কৃত হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রোঞ্জ-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদির যেমন বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, ভারতে ততটা পাওয়া যায়নি। তাই ভারতের ইতিহাসে ব্রোঞ্জ যুগের তেমন কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই।*

---

* "Bronze implenments of early date have been found in India only with those of copper, but it does not appear that, that metal was ever generally used in India to the exclusion of copper." —*Advanced History of India*, H. C. Raychaudhury, K. Datta, p. 13. Reprinted, 1973, 1974.

সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতা :

পূর্বে ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক যুগ হতেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বৈদিক যুগের বহু পূর্বে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে এ-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

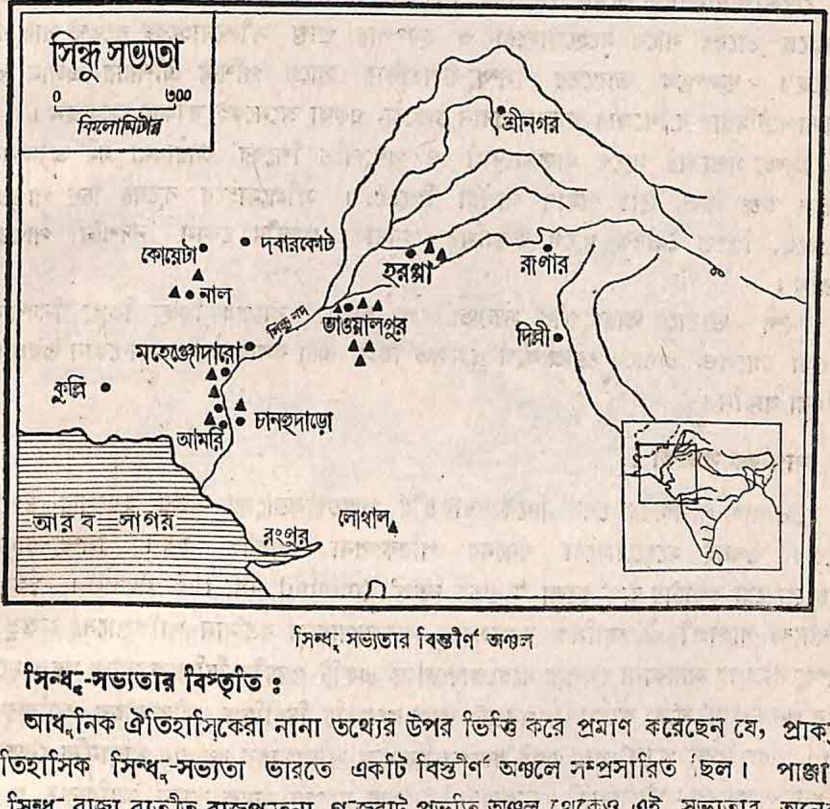

সিন্ধু সভ্যতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল

সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তৃতি :

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা নানা তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রমাণ করেছেন যে, প্রাক্-ঐতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতা ভারতে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সম্প্রসারিত ছিল। পাঞ্জাব ও সিন্ধু রাজ্য ব্যতীত রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও এই সভ্যতার অনেক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে। কালিবাঙ্গা, রূপার, লোথাল, রংপুরে প্রাপ্ত নিদর্শন-সমূহের সাথে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে।

বিশ্ব-ইতিহাসে সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসাবে যে সামান্য কয়টি দেশের নাম করা যায়, তাদের মধ্যে ভারতের নাম সর্বপ্রথমেই করতে হবে। মিশর, মেসোপটেমিয়া ব্যতীত প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে চীন, গ্রীস, ইটালী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে, এ-সকল দেশে বর্তমান অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় প্রাচীন সভ্যতার তেমন কোন প্রভাব দেখা যায় না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের ধর্ম-কর্মে এখনও ভারতবাসী তাদের প্রাচীন সভ্যতায় বিশ্বাসী।

সিন্ধু-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ঃ

পল্লী অঞ্চলকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল বৈদিক সভ্যতা, আর নাগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সিন্ধু-সভ্যতা। সিন্ধু-উপত্যকায় প্রাপ্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ উন্নত নাগরিক সভ্যতার প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

মেসোপটেমিয়াতে সুমের সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে যে সব সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে তাদের সাথে মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলমোহরের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। স্থলপথে ভারতের সিন্ধু-উপত্যকার সাথে পশ্চিম এশিয়ায় এলাম ও মেসোপটেমিয়ার বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলতো, একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন।

সিন্ধু সভ্যতার যুগে মাতৃকাদেবী ও পশুপতি শিবের আরাধনা ধর্ম-জীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সীলমোহরে বৃষের চিত্র পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু বৈদিক যুগে উল্লিখিত গোমাতা গাভীর কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

সিন্ধু-সভ্যতাকে তাম্রযুগীয় সভ্যতা বলা হয়। ব্রোঞ্জের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও, এখানে ব্রোঞ্জ-যুগ প্রচলিত ছিল, এটা বলার মত তেমন কোন তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।

নাগরিক সভ্যতা ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের নজর হরপ্পার উপরে পড়ে। তখনই মহেঞ্জোদরো খননের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সিন্ধু-ভাষায় মহেঞ্জোদরো কথাটার অর্থ হলো 'মৃতের স্তূপ' (mound of the dead)। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধু রাজ্যের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদরোতে একটি প্রাচীন ঢিপিকে বৌদ্ধ স্তূপ মনে করে খনন-কার্য শুরু করেন। খননের ফলে কয়েকটি চিত্রাঙ্কিত সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়। এর কিছু পূর্বে প্রায় একই ধরণের চিত্রযুক্ত সীলমোহর দয়ারাম সাহানীর নেতৃত্বে পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী (মুলতান) জেলার হরপ্পা নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কৃত সীলমোহরসমূহ তুলনা করে ভারতের তদানীন্তন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান স্যার জন মার্শাল ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত সীলমোহরসমূহ একই প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতার নিদর্শন। যে-সব নিদর্শন এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তার সবটাই হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন।

নগর পরিকল্পনা ঃ

ঐতিহাসিকদের বহু উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার নগর নির্মাণে উন্নত স্থাপত্যরীতি লক্ষ্য

করার মত। নগর-পরিকল্পনায় ইটের তৈরি সিঁড়ি-সংযুক্ত দোতলা, তেতলা বাড়ি নাগরিকদের বসবাসের জন্য নির্মিত হয়েছিলো। নগরের গৃহনির্মাণ পদ্ধতি দেখে মনে হয় যে তার কতগুলো ছিল আবাস-গৃহ এবং কতগুলো ছিল সর্বসাধারণের জন্য সরকারী গৃহ। বাড়িতে পাতকুয়া, স্নানের জন্য আলাদা ঘর, ময়লা ফেলার জন্য বড় বড় পাত্র ছিল। মাটির নালা বা পাইপ দিয়ে রাজপথের ড্রেনের সংগে বাড়িগুলো সংযুক্ত করা হতো, যাতে ময়লা জল সহজে বের হতে পারে।

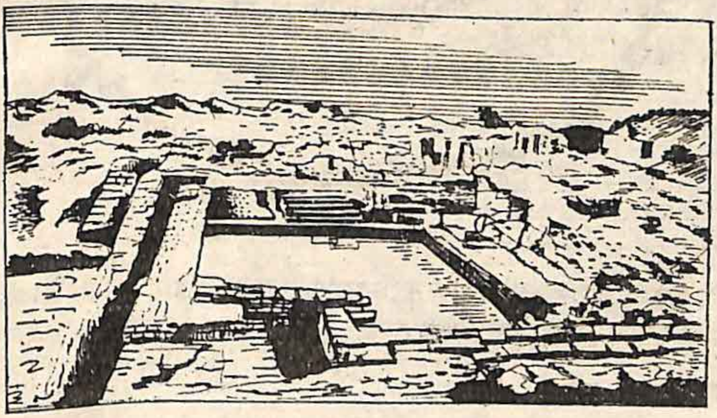

মহেঞ্জোদরোতে স্নানাগার

মহেঞ্জোদরোতে একটি স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। যার দৈর্ঘ্য ছিল ৩৯ ফুট, প্রস্থ ২৩ ফুট এবং গভীরতা ছিল ৮ ফুট পরিমাণ। মনে হয় সাঁতার কাটার পুকুরটি সর্বদা জলপূর্ণ রাখার জন্য নিকটবর্তী সরোবর থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। বৃহৎ স্নানাগারটির চারদিকে দর্শকদের বসবার আসনের ব্যবস্থা ছিল।

সামাজিক জীবন ঃ

ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীর নরনারী নিয়ে এ যুগের সমাজ গঠিত হয়েছিল। নাগরিকরা ছিলেন সুরুচিসম্পন্ন। মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত কিছু নরনারীর মূর্তি পরীক্ষা করে সে-যুগের অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে বেশ ধারণা করা যায়। পুরুষেরা পরতেন ধুতি ও উত্তরীয়, মহিলারা পরতেন ঘাগরা ও কটিদেশে ধারণ করতেন মেখলা। অলঙ্কারের মধ্যে আংটি, বালা, হার, নাকছাবি, চুলের কাঁটার বেশ প্রচলন ছিল। চিরুনি ও প্রসাধনের দ্রব্যসমূহ সযত্নে ছোট ছোট কৌটোয় রাখা হতো।

ভূমির উর্বরতার জন্য মহেঞ্জোদরোকে সিন্ধুদেশের উদ্যান বলা হতো। খাদ্যের মধ্যে গম, যব প্রভৃতি শস্য, খেজুর প্রভৃতি ফল, এবং নানাপ্রকার পশু-পক্ষীর মাংস

ছিল প্রধান। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ছিল গরু, ভেড়া, কুকুর, মোষ ও হাতী।

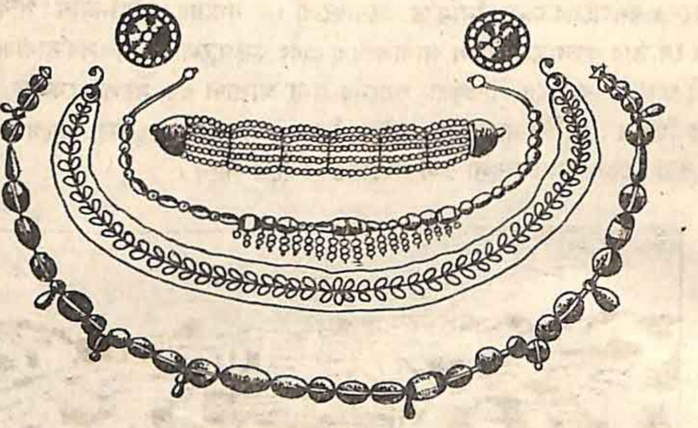

অলংকার (মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত)

এ-যুগে অশ্বের উল্লেখ স্বরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। নাগরিকদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি ও পশুপালন।

অর্থনৈতিক জীবন

এখানকার অধিবাসীদের আর একটি বৃত্তি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। স্থলপথে বিভিন্ন স্থানের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো বলে মনে করা যায়। সিন্ধু উপত্যকা থেকে মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একই ধরনের সীলমোহর যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া

সীলমোহর

সীলমোহর

গিয়েছে। সীলমোহরগুলি সম্ভবতঃ মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অরেল স্টেইন্ মনে করেন যে, সিন্ধু উপত্যকার সংগে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে জলপথেও পারস্য ও মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল। এখানে

কারিগরি শিল্প খুবই উন্নত ছিল। কাদামাটি দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় নানাপ্রকার জিনিস তৈরি করার জন্য এখানকার লোকেরা কুমোরের চাক ব্যবহার করতেন। বাড়ী-ঘর প্রভৃতির জন্য পাঁজায় পোড়ানো ইট বা রোদে শুকনো ইট ব্যবহার করা হতো। তাঁদের তৈরি ধুতি ও শাড়ি তাঁরা পরিধান করতেন।

যোগীমূর্তি

নাগরিকেরা সৈনিকের বৃত্তিও গ্রহণ করতেন। অস্ত্রশস্ত্রের নিদর্শন হিসাবে তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি কুঠার ও বর্শা বেশ কিছু সংখ্যায় পাওয়া গেলেও তীর, ধনুক, তরবারী, বর্ম প্রভৃতি লৌহ-নির্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া যায়নি।

শিল্প-সৃষ্টিতে এখানকার অধিবাসীরা বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। সীলমোহরের উপরে খোদাই-করা নানা ধরনের পশুর প্রতিকৃতি ও মনুষ্য-মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখে শিল্পীদের পরিমিতি জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মাটির পাত্রের উপরে নানা কারুকার্য তাঁরা খোদাই করে রেখেছেন। সীলমোহরের চিত্র-রীতির শিল্প-সৌকর্য প্রশংসা করার মত। হরপ্পায় প্রাপ্ত কয়েকটি প্রস্তর মূর্তি গ্রীক্ ভাস্কর্যের সাথে তুলনীয়।* মাটির পাত্রে বিচিত্র অঙ্গ-সজ্জা, সীলমোহরে উৎকীর্ণ জীবজন্তুর চিত্র ও বিভিন্ন মূর্তির গঠন-পদ্ধতিতে এ-যুগের অধিবাসীদের সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় দেয়। ব্রোঞ্জ-নির্মিত একটি নর্তকী-মূর্তি মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া গিয়েছে। এখানে বহু সীলমোহর পাওয়া গেলেও উৎকীর্ণ লিপিমালার পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন যে, লিপি-সমূহ দ্রাবিড় জাতির আদি-লিপি। লিপি-সমূহের পাঠ সম্ভব হলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে নূতন আলোকপাত সম্ভব হতো।

নর্তকী

* 'A few stone images found at Harappa recall the finish and excellence of Greek Statues and show a high degree of development in the sculptor's art'.
—*Advanced History of India*, p. 19

ধর্মীয় অনুষ্ঠান :

দেব-দেবীর পূজা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। বৃক্ষ ও নাগ-নাগিনীর অর্চনা করা হতো। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনার্য প্রভাব সম্পূর্ণ বিদ্যমান ছিল।

পশুপতি শিব

পশুপতি শিব ও জগন্মাতা পার্বতীর পূজা প্রচলিত ছিল। সীলমোহরে উৎকীর্ণ একটি চিত্রে দেখা যায় এক যোগাসীন দেবমূর্তি তাঁর মাথায় তিনটি শিং এবং তাঁর চারদিকে স্তব-স্তুতিপরায়ণ বেশ কয়েকটি জীবজন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, দেব-মূর্তিটি পশুপতি শিবের। মহেঞ্জো-দরোতে প্রাপ্ত বেশ কিছু দেবীমূর্তিকে জগন্মাতা পার্বতীর মূর্তি বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০-এর মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ঠিক কি ভাবে বা কারা এই সভ্যতা ধ্বংস করেছিল তা আমরা সঠিক ভাবে এখনও জানতে পারিনি।

সিন্ধু-উপত্যকায় বৃষ্টিপাত কমে গেলে পানীয় জল ও কৃষি কার্যের জন্য জলের অভাব দেখা দেয়। ফলে সিন্ধু উপত্যকায় কিছু নগর ও গ্রাম মরুভূমিতে পরিণত হয়। সিন্ধু নদে পলি জমতে থাকায় বন্যার জল শহরে ঢুকতে শুরু করে। প্রায়ই প্লাবন দেখা দিতে লাগল এবং নাগরিকেরা শহর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এদিকে ভূমিকম্পের ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিল। শহরের এক বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের এটাও অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত নর-কঙ্কালগুলির উপরে কিছু ধারালো অস্ত্রের আঘাত স্পষ্টত দেখা যায়। পন্ডিতেরা অনুমান করেন যে সিন্ধু-উপত্যকার উপরে কোন শক্তিশালী জাতি অভিযান চালিয়েছিল। আক্রমণকারীদের হাতে এখানকার অনেক নাগরিক নিহত হয়েছিলেন। ইতিহাসের পণ্ডিতেরা মনে করেন যে উত্তর অঞ্চল থেকে বহিরাগত আর্য-গোষ্ঠীর সাথে এখানকার অধিবাসীদের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হয়েছিল। যুদ্ধে সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা পরাজিত হলেন। আর্যদের আক্রমণের ফলেই সম্ভবত সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার পতন ঘটেছিল।

॥ ৩ ॥

বৈদিক যুগ

আর্যভাষা বা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' রচিত হয়েছে। বেদ পদ্যে রচিত এবং সুর-সংযোগে গীত হতো।* আর্য সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতা বলা হয়। সিন্ধু-সভ্যতার অবক্ষয়ের কালে সম্ভবতঃ আর্যদের আক্রমণে এ সভ্যতার পতন ঘটেছিল।

[ক] আর্যদের ভারতে আগমন

আর্যদের আদি নিবাস সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে ভারতই আর্যদের পিতৃভূমি। এখান থেকেই তাঁরা পারস্য ও ইউরোপের নানা অঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তার করেছিলেন। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্য হোল তার ভূ-প্রকৃতি। এখানে যাযাবর জীবন সহজেই স্থিতিশীল হয়ে পড়ে। তবে সংস্কৃতি-প্রচারের অভিযানে আর্যরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনে এগিয়ে গিয়েছিলেন, এ-যুক্তি গ্রহণীয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আর্যগোষ্ঠী ভারতের বাইরে থেকে এ দেশে এসেছিল। তাঁদের অধিকাংশের মতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বা বল্কান অঞ্চল অথবা ভিশ্চুলা নদীর উপকূলভাগে আর্য গোষ্ঠীর আদি বাসস্থান ছিল। তাঁদের মতে একসময় আর্যদের একটি শাখা পারস্য থেকে যাত্রা করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করে। অপর একটি শাখা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রথম দিকে আর্যদের বসতি-বিস্তার সম্বন্ধে প্রমাণ-নির্ভর তথ্যাদির অভাবের জন্যই পণ্ডিতেরা নানা অভিমত প্রকাশ করেছেন। এশিয়া মাইনরের কাপাডোসিয়া অঞ্চলে বোঘাজ কুই লিপিতে দেখা যায় যে, আনুমানিক ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই অঞ্চলে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাশত্য প্রভৃতি আর্য দেবতার নামে শপথ করে কয়েকজন আর্যনামধেয় নৃপতি একটি সন্ধির শর্ত-পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। লিখিত ভাষণ হিসাবে এই লিপিটির বিশেষ উল্লেখ করা হয়।**

* 'The earlist Aryan people were essentially a people of the voice...They were perhaps the first great artists of the ear......'

—*The Outlines of History*. H. G. Wells, pp. 276 277

** 'In the chaotic state of early Aryan Chronology, it is a welcome relief to turn to Asia Minor and other countries in Western Asia and find in certain tablets of the fourteenth century B. C., discovered at Baghaz-Keui and other places, references to kings who borne Aryan names and invoked the gods Indra, Mitra, Varuna and the Nasatyas to witness and safeguard treaties.'
—*Advanced History of India*, p. 25.

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 29. 6. 89
S.C.E.R.T., West Bengal Library

ভারতে বসতি বিস্তার ঃ

আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ 'ঋগ্বেদ' রচনার সময়ে আর্যরা সিন্ধু ইত্যাদি সাতটি নদীর উপকূলে অর্থাৎ 'সপ্তসিন্ধু' অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এই সাতটি নদী হলো—শতদ্রু, বিপাশা, ঝিলাম, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা (পাঞ্জাবের পঞ্চনদী), সিন্ধু, সরস্বতী। গাঙ্গেয় উপত্যকার কিছু

প্রাচীন ভারতবর্ষ (আর্য বসতি বিস্তার)

অংশও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চলটি তখন কাবুল থেকে থানেশ্বরের নিকটবর্তী সরস্বতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখনকার 'সপ্তসিন্ধু অঞ্চল' বলতে

বোঝাতো আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও রাজপুতনার কতকাংশ।

ঋগ্বেদে 'দস্যু' বা 'দাস'দের সাথে আর্যদের যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্য-সাহিত্যে অনার্যদের হীন প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অনার্যরা সভ্যতার দিক দিয়ে বেশ উন্নত ছিল। আর্য-বিরোধী সংগ্রামে অনার্যদের দ্রাবিড় শাখার কৃতিত্ব কম ছিল না।

উত্তর ভারতে আর্য-উপনিবেশ বিস্তারের প্রথম পর্যায়ে কেকয়, শিবি, যদু, তুর্বস (সিন্ধু ও পাঞ্জাব), ভরত, পুরু, ভৃৎসু (মধ্যদেশ—সরস্বতী নদীর দক্ষিণ থেকে অযোধ্যার সরযূ নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ), মৎস্য, চেদী (রাজপুতনা ও মালব) ইত্যাদি কয়েকটি স্থানে আর্যদলের প্রভুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

[খ] বৈদিক সাহিত্য

'বেদ' আর্যদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। 'বেদ' শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান। হিন্দুদের মতে 'বেদ' অপৌরুষেয়, কোন মানুষের রচিত নয়। স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী বৈদিক ঋষিদের দ্বারা শ্রুত হয়েছিল বলে বেদের আর এক নাম 'শ্রুতি'। বেদ বা শ্রুতির সূক্ত (মন্ত্র বা স্তোত্র) সংখ্যা যখন দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন বেদের সূক্ত-সমূহকে 'সংহিত' করা হলো, তাই বেদকে 'সংহিতা' বলা হয়। শ্রুতি বা বেদ-সংহিতার সূক্তসমূহ শ্রেণী-বিভাগের ফলে ঋক্ সংহিতা, যজু সংহিতা ও সাম সংহিতা—এই তিনটি বিশেষ নামে পরিচিত হলো।

ঋগ্বেদ হোল আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। গদ্য, পদ্য ও সঙ্গীত—এই তিনটি বিভাগে মন্ত্রসমূহ সংহিত হওয়ায় পদ্য-সংগ্রহ 'ঋক্', গদ্য-সংগ্রহ 'যজুস্' এবং সঙ্গীত সংগ্রহ 'সামন্' নামে অভিহিত হয়েছে। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ—বেদের এই তিনটি ভাগ। পরে আর একটি বেদকে 'অথর্ববেদ' বা 'অথর্ব সংহিতা' নাম দেওয়া হয়েছে। এই বেদের মন্ত্রসমূহ পার্থিব বিষয় সম্পর্কিত, যেমন—শত্রুনাশ, রোগনাশ ও উপসম, ধর্মলাভের উপায় প্রভৃতি বিষয়। 'সংহিতা'সমূহ পদ্যে রচিত। প্রত্যেক 'সংহিতা'য় যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত মন্ত্রসমূহের গদ্য-অংশকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়।

প্রত্যেক বেদের চারটি অংশ রয়েছে, যেমন—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্।

'বানপ্রস্থ' অবলম্বন করে আর্যরা বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে একসময় অরণ্যবাসী হতেন। এ সময়ে ক্রিয়াবহুল যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হতো না। তাঁদের জ্ঞান-পিপাসা মিটাবার জন্য বৈদিক যুগে অনেক দার্শনিক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এই সাহিত্যসমূহ 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদ্' নামে অভিহিত। 'আরণ্য'কে যে দার্শনিক আলোচনা শুরু হয়েছিল, তা পূর্ণতা লাভ করে 'উপনিষদে'। তাই

উপনিষদকে বলা হয় 'বেদান্ত'—বেদের অন্ত বা শেষ অংশ। এর পরে যেন আর কিছু রচনার থাকলো না।

বেদ-সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি পাবার ফলে তাদের সারমর্ম সংকলন ও পরস্পরের সঙ্গতি রক্ষার জন্য রচিত হলো 'সূত্র-সাহিত্য' বা ধর্ম-সূত্র বা স্মৃতি। 'শ্রুতি' (সংহিতা) ও 'স্মৃতি'র মধ্যে 'শ্রুতি'ই প্রামাণ্য। সূত্র-সাহিত্য পুনরায় 'বেদাঙ্গ' ও 'দর্শন',—এ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়। বেদাঙ্গ ব্যতীত বেদ-পাঠ ও বৈদিক কর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হ'তে পারতো না। শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প—এই ছয় ভাগে বেদাঙ্গ বিভক্ত হয়েছে। পরে অথর্ব সংহিতা নামে আর একটি সংহিতার সৃষ্টি হোল। মনু প্রভৃতি প্রাচীন লেখকেরা মাত্র তিন বেদের উল্লেখ করেছেন। সংহিতা-সমূহের মধ্যে অথর্ব সংহিতা পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল।

বৈদিক সাহিত্যের আর একটি বিশিষ্ট অবদান হলো হিন্দুদের ছয়খানি দর্শন ঃ কপিল মুনির 'সাংখ্য', পতঞ্জলির 'যোগ', গৌতমের 'ন্যায়', কণাদের 'বৈশেষিক', জৈমিনীর 'পূর্ব-মীমাংসা' ও ব্যাসের 'উত্তর-মীমাংসা' বা 'বেদান্ত'।

[গ] বৈদিক যুগের সমাজজীবন

প্রথমভাগে মাত্র দুটি শ্রেণীবিভাগ দেখা যায় ঃ গৌরবর্ণ আর্য জাতি এবং কৃষ্ণবর্ণ অনার্য জাতি। আর্যেরা বিজেতা, আর অনার্যেরা বিজিত অর্থাৎ পরাজিত। বর্ণের ভিত্তিতেই আর্য সমাজে বর্ণ-বিভাগের সূত্রপাত হয়।

ঋগ্বেদ রচনার সময়ে সম্ভবতঃ আর্য সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র ও বিশ (পরবর্তী বৈশ্য জাতি)—এ তিনটি শ্রেণী বা জাতি বিদ্যমান ছিল। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে কর্ম ও গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র—এ-চারটি সামাজিক শ্রেণীর উল্লেখ আছে। আধ্যাত্মিক কার্য, যাগ-যজ্ঞ করতেন ব্রাহ্মণ, দেশ-রক্ষার কাজ করতেন রাজন্য বা ক্ষত্রিয়, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যাদিতে পারদর্শী ছিলেন বিশ বা বৈশ্য। সমাজের উপরের এই তিন শ্রেণীর সেবা করতো শূদ্র বা অনার্য। বৃত্তি অনুসারে আর্য ও অনার্যেরা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হলেও তখন জাতিভেদ ছিল না। সামাজিক আচার-আচরণে বিশেষ বৈষম্য তখনও প্রবর্তিত হয়নি।

আর্যদের সমাজ-জীবন সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। সমাজের মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের বয়োজেষ্ঠ ছিলেন পরিবারের কর্তা। চারটি আশ্রমে (চতুরাশ্রম) তাঁরা তাদের গোটা জীবনকে বিভক্ত করেছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছিল অধ্যয়নের কাল। গার্হস্থ্যাশ্রম ছিল গৃহী হয়ে সংসার-যাত্রা নির্বাহের সময়। বানপ্রস্থাশ্রম ছিল সংসার পরিত্যাগ করে নির্জনে অধ্যাত্ম-চিন্তায় সময় যাপন, যতি বা সন্ন্যাস আশ্রম ছিল মোক্ষ বা মুক্তি-কামনায় অবশিষ্ট জীবনযাপন।

বৈদিক সমাজে নারী, পুরুষের ন্যায় তুল্য মর্যাদা লাভ করতেন। পরিবারের 'গৃহপতি' অপেক্ষা 'গৃহিণীর' সম্মান কোন অংশে কম ছিল না। নারী ও পুরুষ এক

সংগে যজ্ঞ-কার্যে উপস্থিত থাকতেন, তাই স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্মিণী। নারীরা বস্ত্র-বয়ন, সূচী-শিল্প ও অন্যান্য সংসারী কাজে সময় যাপন করতেন। আর্য-সমাজে স্বয়ম্বর প্রথা এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। নারীরা প্রখর বুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। ঋগ্বেদের স্তোত্র রচয়িতার মধ্যে ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, যমী ইত্যাদি বহু গুণসম্পন্না নারীদের উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের শেষের দিকেও মৈত্রী, গার্গেয়ী প্রভৃতি রমণীরা সেযুগের অলঙ্কারস্বরূপা ছিলেন।

সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন ঃ

বৈদিক সাহিত্য থেকে আর্যদের সাধারণ অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়।

আর্যদের প্রধান বৃত্তি ছিল পশুপালন ও কৃষি। গাভী ছিল তাঁদের প্রধান সম্পদ। গাভীর অধিকার নিয়ে তাঁদের মধ্যে অনেক সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটতো।

শিল্প-নির্মাণেও তাঁরা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। ধাতু-শিল্পী, সূত্রকার, তন্তুবায়, চর্মকার প্রভৃতি বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের উল্লেখ রয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তাঁরা সমুদ্রযাত্রা করতেন।

গম, যব ছিল সে যুগের প্রধান খাদ্যশস্য। আর্যরা নিরামিষ খাদ্য বেশি পছন্দ করতেন, তবে যজ্ঞে পশুবলির পরে মাংসও তাঁরা খেতেন। গো-দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তাঁদের প্রিয় খাদ্য ছিল। যজ্ঞ ও উৎসবের সময়ে তাঁরা সোমরস পান করতেন।

পোশাক-পরিচ্ছদে তাঁরা আড়ম্বর পছন্দ করতেন না। উৎসবের সময়ে তাঁরা পশমী বস্ত্র ও জরির কাজ-করা পোশাক পরতেন। অনেক মূল্যবান অলঙ্কারও তাঁরা অঙ্গে ধারণ করতেন।

অবসর বিনোদনের জন্য তাঁরা নানা রকমের উৎসবে মত্ত থাকতেন। আর্যরা ছিলেন যুদ্ধ ও উৎসবপ্রিয়। মৃগয়া, ঘোড়দৌড় তাঁদের অবসর বিনোদনের অঙ্গ ছিল। নৃত্যোৎসবে আর্য নারীরা যোগ দিতেন। দ্যূতক্রীড়া বা পাশাখেলা ব্যসনে পরিণত হয়েছিল। বাজি ধরে খেলা চলতো। এটা প্রায় নেশার সামিল হয়ে পড়েছিলো।

ধর্ম-জীবন ঃ

প্রত্যেক সংহিতার সূক্ত বা মন্ত্র বা স্তোত্রসমূহ ছিল আর্য দেব-দেবীর মহিমা-কীর্তন, তাঁদের উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতি। আর্যদের প্রথম উপনিবেশ সপ্তসিন্ধু অঞ্চল ছিল প্রকৃতির রম্য-নিকেতন। প্রকৃতির ঐশ্বর্য ও রূপে মুগ্ধ হয়ে আর্যরা প্রকৃতির মাঝে দেখলেন ঐশী বা দিব্য শক্তি। আর্য ঋষিদের মননে, ধ্যান-ধারণায় এই ঐশী শক্তির অনেক রূপ-বহু মূর্তি প্রতিভাত হলো।

জগৎ-পিতা দ্যৌ, বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ক্ষেত্রপতি ইন্দ্র, জলের দেবতা বরুণ, অগ্নি, মরুৎ, সূর্য, রুদ্র প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে আর্য-ঋষিগণ বহু স্তোত্র রচনা করেছেন। উষা, সরস্বতী, অদিতি প্রভৃতি দেবীর উপাসনা হতো। উষা দেবীকে তাঁরা বলেছেন—

কল্যাণী ঊষা, রাত্রির অন্ধকার বা অজ্ঞানতা বিদূরিত করে আলোর দিশারী মনোরমা ঊষা।

আর্যরা বহু দেব-দেবীর উপাসনা করলেও ঐশী বা দিব্য শক্তির একত্ব সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ছিল দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। ঋক্-সংহিতায় বর্ণিত বিভিন্ন দেব দেবী যেন একই ঐশী শক্তির বিভিন্ন অংশ, একের বিভূতি বহুর মধ্যে প্রকাশিত, মহত্ত্ব অনুসারে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করেছেন মাত্র। বৈদিক সংহিতায় একেশ্বরবাদের যে মতাদর্শের উৎপত্তি হলো, উপনিষদের উন্নত চিন্তাধারায় তা আরও স্পষ্ট হ'য়ে পরিণত আধ্যাত্মিকতায় সম্পূর্ণ হোল। বৈদিক যুগে মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল না।

বৈদিক যুগে রাজনৈতিক জীবন ঃ

বৈদিক যুগে পল্লী বা গ্রাম থেকে শুরু করে বিস্তীর্ণ জনপদের শাসন-ব্যবস্থাকে সংহত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করার মতো।

গ্রাম শাসন করতেন 'গ্রামণী', তাঁর উপরেই ছিল পল্লী-শাসনের সবটুকু দায়িত্ব। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো 'বিশ' বা 'জন'। 'জন' থেকেই 'জনপদ'। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে সংগঠিত হতো একপ্রকার ভৌগোলিক সীমা—জনপদ। 'বিশ' বা 'জন'-এর অধিপতিকে বলা হতো 'বিশপতি' বা 'রাজন' বা 'রাজা'।

রাজন্ বা রাজা ছিলেন তাঁর দলের প্রতিনিধি। রাজ্যের প্রজাদের সর্বপ্রকার মঙ্গলবিধানের দায়িত্ব ছিল তাঁর। যুদ্ধের সময়ে তিনি হতেন সেনাপতি, শান্তির সময়ে তিনি বিচার পরিচালনা করতেন, আবার যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়েও তাঁকে উপস্থিত থাকতে হতো।

বৈদিক যুগের প্রথমভাগে আর্যদের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর ছোট ছোট রাজারা পরবর্তী কালে শক্তি সঞ্চয় করে বৃহৎ জনপদের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ সময় থেকে রাজার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রাজপদ ছিল প্রায়ই বংশগত। 'রাজতন্ত্র' প্রচলিত থাকলেও রাজারা স্বেচ্ছাচারী হতেন না। রাজকার্য ধর্মকার্যের অঙ্গ হিসাবে দেখা হতো। রাজ্যাভিষেকের সময়ে প্রত্যেক রাজাকে ব্রাহ্মণদের প্রতি এবং সভা-সমিতির প্রতি কর্তব্য-পালনের শপথ নিতে হতো।

রাজাকে রাজকার্যে সাহায্য করতেন 'পুরোহিত', 'সেনানী', 'গ্রামণী' প্রভৃতি কর্মচারীরা। পুরোহিতেরা সাধারণতঃ হতেন ব্রাহ্মণ। ধর্ম-কার্যে তাঁরাই রাজাদের সাহায্য করতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহে রাজাকে সাহায্য করতেন সেনানী বা সেনাপতি। তীর, ধনুক, বর্শা, তলোয়ার, কুঠার, গদা ইত্যাদি নিয়ে আর্য-বীরেরা যুদ্ধ করতেন। এ সময়ে লৌহ ধাতু প্রবর্তনের ফলে যুদ্ধাস্ত্রগুলো ছিল সুতীক্ষ্ম। গ্রামণীদের পরামর্শ মতো রাজা গ্রামগুলো শাসন করতেন। সভা বা সমিতি নামে জন-প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ ও সাহায্য রাজা পেতেন।

বৈদিক যুগে 'গণ' ও 'গণ-জ্যেষ্ঠ'-র উল্লেখ পাওয়া যায়। গণ-প্রতিনিধিরা যে

রাজ্য শাসন করতেন তাকে বলা হতো 'গণ', শাসকগোষ্ঠীর প্রধানকে বলা হতো 'গণ-জ্যেষ্ঠ'। বৈদিক-যুগে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না।

রাজা, রাজপরিবার ও রাজকর্মচারীদের পোষণের জন্য প্রজারা রাজভাণ্ডারে 'বলি' (কর, রাজস্ব ইত্যাদি উপহার) প্রদান করতেন।

[ঘ] পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্য-সভ্যতার সম্প্রসারণ

পরবর্তী বৈদিক যুগে পূর্ব ভারতে আর্যদের উপনিবেশ আরও বিস্তৃত হয়েছিল। আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই কাশী, কোশল, বিদেহ, মগধ, বঙ্গ প্রভৃতি অনার্য অঞ্চলে আর্যপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। উপনিবেশ বিস্তারে আর্য-ক্ষত্রিয় জাতির পরাক্রম উল্লেখযোগ্য। শাসনব্যবস্থায় এ সময়ে 'রাজতন্ত্র' প্রবর্তিত হয়। শক্তিশালী ক্ষত্রিয় নৃপতিরা বহু রাজ্য জয় করে 'রাজ চক্রবর্তী' বা 'সম্রাট' নামে অভিহিত হতেন। 'রাজসূয়', 'অশ্বমেধ', 'বাজপেয়' প্রভৃতি যজ্ঞ সগৌরবে অনুষ্ঠান করে 'সম্রাট' নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতেন। সমগ্র উত্তর ভারত 'আর্যাবর্ত' নামে পরিচিত হলো। বৈদিক সভ্যতা ভারতে দৃঢ়মূল হলো।

দক্ষিণ ভারতে আর্য-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে বেশ সময় লেগেছিল। সম্ভবতঃ গোদাবরী নদী অতিক্রম করে আর্যরা অন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য জাতির সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলে তামিল, কানাড়ী, মালোয়ালী প্রভৃতি অনার্য জাতির আধিপত্য বহু বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

পরবর্তী বৈদিক যুগের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান হলো দুখানি মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত। হিন্দুদের দার্শনিক ধর্মগ্রন্থ, 'ভগবদ্গীতা' মহাভারতের অংশবিশেষ। পরবর্তী বৈদিক যুগের আর্যদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মজীবনের একটি সুন্দর আলোচনা মহাকাব্য দুখানিতে পাওয়া যায়। সমাজে চারটি বর্ণের প্রাধান্য থাকলেও এ যুগে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন লক্ষ্য করার মতো। মহাকাব্যের যুগে ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলেই আর্য-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

লৌহ যুগ ঃ

তাম্রযুগের পরবর্তী সময়ে লৌহযুগের সূচনা হয়। পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন যে ঋগ্বেদ রচনার সময় থেকেই ভারতের ইতিহাসে লৌহযুগের প্রবর্তন ঘটেছে। এ সময় থেকে প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদানও সংগৃহীত হয়েছে। উন্নত ধরনের লৌহ অস্ত্রে শক্তিশালী আর্যদের হাতে অনার্যদের পরাজয় ঘটলেও সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে অনার্য সভ্যতার বিস্ময়কর অবদানে ভারতের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে।

[ঙ] লৌহ যুগের সূচনা

পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে নবপ্রস্তরযুগের মানুষেরাই সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করে। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল

ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার যার ফলে জীবন যাপনের ব্যাপারে মানুষ উন্নততর সোপানে এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়। তবে প্রস্তরের যুগ থেকে ধাতুর যুগে উত্তরণ সহসা হয় নাই। এই উত্তরণ যে দীর্ঘদিন ধ'রে ধাপে ধাপে ঘটেছিল তার অন্ততঃ দুটি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এক, প্রস্তর এবং ধাতুনির্মিত অস্ত্রাদির পাশাপাশি ব্যবহার ; দুই, প্রথম যুগেও ধাতুনির্মিত অস্ত্র ও নবপ্রস্তরযুগে ব্যবহৃত প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রের মধ্যে নিকট-সাদৃশ্য।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধাতুর ব্যবহার কিন্তু ঠিক একই সময়ে একই রকমে ঘটে নাই। উত্তর ভারতে প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণের পরিবর্তে প্রথমে সাধারণভাবে তামার ব্যবহার আরম্ভ হয়। দেশের নানা স্থানে তাম্রনির্মিত কুঠার, তরবারি, বর্শা ও অন্যান্য নানা ধরনের তামার উপকরণ পাওয়া গেছে। এরও অন্ততঃ কয়েক শতাব্দী পরে লৌহের আবিষ্কার হয় এবং তামার পরিবর্তে লোহার প্রচলন শুরু হয়। ঐতিহাসিকেরা উত্তর ভারতে একটি তাম্র যুগ এবং আদিম লৌহ যুগের মধ্যে পার্থক্য করেন। দক্ষিণভারতে কিন্তু ঐতিহাসিকেরা প্রস্তর যুগ ও লৌহযুগের মধ্যবর্তী একটি তাম্রযুগের অস্তিত্ব পান নি। এক্ষেত্রে প্রস্তর যুগের অব্যবহিত পরেই লৌহযুগের সূচনা হয়, প্রমাণ দৃষ্টে এইরূপ মনে করা হয়। ইউরোপের কয়েকটি দেশে নব প্রস্তর যুগের পর একটি ব্রোঞ্জ যুগের কথা বলা হয়েছে। তামা অপেক্ষা ব্রোঞ্জ তামা ও টিনের মিশ্রণে তৈরি শক্ত এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরির পক্ষে অধিক উপযোগী। তাম্রনির্মিত নানা উপকরণের সঙ্গে অতি প্রাচীন যুগের তৈরি কিছু ব্রোঞ্জের উপকরণ পাওয়া গেলেও ভারতে ব্যাপকভাবে ব্রোঞ্জের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল তা মনে হয় না। ঐতিহাসিকদের সাধারণ অভিমত হল যে ঋগ্বেদ রচিত হওয়ার পূর্বেই লৌহযুগের সূচনা হয়েছিল। যদিও লোহা-পাথরের সন্ধান মানুষ প্রথমে পায় সম্ভবতঃ নবপ্রস্তর যুগের গোড়ার দিকেই তবু খনিজ লোহা-পাথর থেকে পৃথকভাবে লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতি মানুষ আবিষ্কার করে অনেক পরে। তুরস্ক ও এশিয়া মাইনরের আর্মেনীয় পার্বত্যাঞ্চলে হিটাইট নামে এক যাযাবর জাতির মানুষই প্রথম লোহা-পাথর আগুনে গালিয়ে দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী করেছিল। আঃ ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঋগ্বেদ রচিত হওয়ার পূর্বেই সাধারণভাবে লোহার ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে লৌহযুগের সূত্রপাত হয়—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তামা ও ব্রোঞ্জ এবং অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা লোহা অনেক বেশি মজবুত হওয়ায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী নানা উপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্রাদির অধিকার মানুষের আয়ত্তে এসে গেল—সভ্যতার ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রগতি অনেক বেশি ত্বরান্বিত হোল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন—জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

পরবর্তী বৈদিক যুগে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য বর্ণের শৌর্য-বীর্যের ফলে আর্য উপনিবেশ আরও বিস্তারলাভ করলো। এ সকল উপনিবেশে অ-ব্রাহ্মণ ও অনার্য জাতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা এ-যুগের আর্য-ধর্মকে কেবলমাত্র আচার-অনুষ্ঠানেই পর্যবসিত করে ফেললেন। জাতি-ভেদের কঠোরতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর নরনারী সমাজে উপেক্ষিত ও ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়লো। শ্রেণী-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেলো।

এক অনুদার ধর্ম-ব্যবস্থার ফলে জন-চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়লো। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জটিল ও অনুদার ক্রিয়া-কর্মের এক অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হলো।

[ক] ধর্মসংস্কার আন্দোলনের কারণ

সামাজিক কারণ ঃ ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পিছনে অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল। আর্য-সমাজে তখন ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তিই ছিল একচেটিয়া। সামাজিক বিধিনিষেধ কঠোরতর হতে থাকলো। সব জীবই এক ব্রহ্মের সন্তান—পুরাণে বর্ণিত এ উপদেশের মূল্য কেউ দিতে চাইতো না। বর্ণান্তর ও বৃত্তি-পরিবর্তন নিষিদ্ধ ছিল। গ্রীক্ বিবরণীতে জানা যায় যে, নিম্ন বর্ণের ব্যক্তিরা 'হীন জাতি' হিসাবে গণ্য হতো। ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। বেগার খাটানো সামাজিক রীতি হিসাবে স্থান পেয়েছিল। সাধারণ লোকেরা পল্লী অঞ্চলে মাটির কুটিরে বসবাস করতো। রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা বাস করতেন 'পুর' বা নগরের সংরক্ষিত অঞ্চলে। এ সময়ে চম্পা (ভাগলপুরের নিকটবর্তী), রাজগৃহ (পাটনা জেলায়), শ্রাবস্তী, শাকেত (অযোধ্যা), বৈশালী (এলাহাবাদ অঞ্চলে), বারাণসী প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ নগর গড়ে উঠেছিল।

সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ধনী সম্প্রদায় সাড়ম্বরে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। সাধারণ লোকেরা এ সকল কাজে তেমন উৎসাহ পেতেন না। তাছাড়া এত অর্থ তাঁরা কোথায় পাবেন ? সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভাব-বৃদ্ধি পেলেও বৈশ্য সমাজ কিন্তু কৃষি ও বাণিজ্যের দ্বারা ধন-সম্পদে বলীয়ান হয়ে উঠতে লাগলো। পূর্বদেশে উপনিবেশ বিস্তৃত হয়েছিল ক্ষত্রিয়দের পরাক্রমে। পশ্চিম ভারতে ছিল ব্রাহ্মণের প্রাধান্য আর পূর্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত হলো ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য। এ-দুয়ের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠলো।

আর্থিক কারণ ঃ আর্য সভ্যতা ছিল পল্লীকেন্দ্রিক। চাষ-বাসই ছিল তাদের প্রধান বৃত্তি। তাঁতি, ছুতোর মিস্ত্রী, কুমোর প্রভৃতি নিজেদের বৃত্তিতেই জীবিকা নির্বাহ

করতেন। বাসিন্দাদের বৃত্তি অনুসারে গ্রামগুলো পৃথক পৃথক নামে চিহ্নিত হতো। পারিবারিক বৃত্তিই বংশানুক্রমে চলতো। গ্রামগুলো স্বায়ত্তশাসিত ছিল ; তবে রাজার প্রাধান্য মেনে নিতে হতো এবং তাঁকে প্রাপ্য রাজস্ব দিতে হতো। কৃষিক্ষেত্রের বেশির ভাগ মালিক ছিলেন পুরোহিত ও উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা। গ্রামাঞ্চলে এক শ্রেণীর স্বাধীন কৃষক বা 'গৃহপতি' চাষবাস করে ধনী হয়ে উঠলেন। রাজকর্মচারীরাও তাঁদের সম্মান দেখাতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে বণিক বা শ্রেষ্ঠীগোষ্ঠী সম্পদশালী হয়ে উঠলেন। এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে বৈশ্যরা ধনবান হলেও তেমন মর্যাদা পেতেন না। জাতিভেদের নিষ্ঠুরতার শিকার তাঁরাও হতেন।

ধর্মীয় কারণ ঃ

বেদ-সংহিতার সংগে ব্রাহ্মণ-ভাগ সংযুক্ত হওয়ায় যজ্ঞীয় ক্রিয়া-কর্মে অনেক পরিবর্তন দেখা দিল। যজ্ঞকার্যে পারদর্শী ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হলেন। আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডই ধর্ম হিসাবে পরিগণিত হলো। ভক্তির অভাবে তা ধর্মপ্রাণহীন আচারসর্বস্ব হয়ে পড়লো। যাগ-যজ্ঞে পশুবলির নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল। ধর্মের জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারতেন না।

ধর্মসাধনায় মানবতাবাদী একটি সরল পথের সন্ধানে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। ক্রিয়াবহুল যাগ-যজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উপনিষদের ঋষিরা পূর্বেই করেছিলেন। তাঁরা মানুষকে যথার্থ জ্ঞানলাভের উপদেশ দিয়েছিলেন। যাগ-যজ্ঞে পশুবলির নিন্দা করেছিলেন। একদল পরিব্রাজক এ-সময়ে দুঃখ হ'তে মানুষের প্রকৃত মুক্তিলাভের পথনির্দেশে স্বাধীন মতাদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। জনসাধারণের ভাষায় তাঁরা তাঁদের মতবাদ প্রচার করছিলেন। তাঁদের কথায় সহজেই জনচিত্ত আকৃষ্ট হলো। পূর্ব-ভারতের ক্ষত্রিয় নৃপতিবৃন্দ তাঁদের রাজসভায় উপনিষদের আলোচনায় যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তীব্র সমালোচনা হতে লাগলো। ব্রাহ্মণ-বিরোধী মনোভাব দিন দিনই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেতর অধ্যুষিত গাঙ্গেয় উপত্যকায় ব্রাহ্মণ-বিরোধী ভাব প্রবল হলো। এক নতুন সমাজগঠন ও নতুন ধর্মদর্শনের প্রতিষ্ঠায় জনমত গড়ে উঠতে লাগলো।

[খ] জৈন ও বৌদ্ধধর্ম

বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ, দুজন ধর্মনায়ক জৈন ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন। তাঁরা ধর্মসংস্কারক নামে বিশ্বের ইতিহাসে পরম মর্যাদার অধিকারী।

দুজনেই তাঁরা পূর্ব-ভারতের ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত, প্রায় সমসাময়িক। দুটি ধর্মই প্রকাশ্যে বেদ-বিরোধী, সমকালীন সমাজ-অর্থনীতি ধর্মনীতির বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ। অথচ বৈদিক সাহিত্য উপনিষদ থেকেই ধর্মসংস্কারের মূল প্রেরণার উদ্ভব হয়েছিল। দুটি ধর্মই মানবতাবাদী। যাগ-যজ্ঞ করে মানুষকে ভ্রান্তপথে চালাচ্ছেন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা। দুঃখ-নিবৃত্তির পথের সন্ধান তাঁরা দিতে পারেননি।

দুটি ধর্মের মূল কথা হলো, মানবের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন। তাঁরা দুঃখ-নিবৃত্তির কথা বলেছেন জনসাধারণের সহজ ভাষায়। তাঁদের ধর্মমতের জনপ্রিয়তা সম্ভব হয়েছিল এই কারণেই। মানবমুক্তির সহজ সরল পথের সন্ধান দিয়েছেন এই দুজন মহান ধর্ম-প্রচারক।

[গ] মহাবীর ও বুদ্ধের জীবনী ও শিক্ষা

জৈন ধর্মের উৎপত্তি ঃ

বর্ধমান মহাবীর জৈন ধর্মমত জনসাধারণের কাছে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু জৈন ধর্মশাস্ত্রাদি থেকে জানা যায় যে, তাঁর পূর্বে তেইশ জন তীর্থংকর বা মুক্তিপথ-প্রদর্শক ধর্ম-প্রচারকদের চেষ্টার ফলে জৈনধর্ম পূর্ব থেকেই সমৃদ্ধ ছিল। তীর্থংকরদের মধ্যে প্রথম ছিলেন ঋষভ। ২৩তম তীর্থংকর ছিলেন পার্শ্বনাথ। বর্ধমান মহাবীর ছিলেন ২৪তম এবং শেষ তীর্থংকর। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কাশীর জনৈক রাজপুত্র পার্শ্বনাথ ছিলেন জৈনধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক। তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন ঃ কাউকে হিংসা করবে না ; কখনও মিথ্যে কথা বলবে না ; চুরি করবে না ; অন্যের কোন জিনিস দান হিসাবেও গ্রহণ করবে না। এ উপদেশ-সমূহই পরবর্তীকালে জৈনধর্মের 'চতুর্যাম' নামে পরিগণিত হয়েছিল।

বর্ধমান মহাবীর ঃ সর্বশেষ তীর্থংকর বর্ধমান মহাবীর এই ধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি ৫৪০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে উত্তর বিহারের বৈশালী নগরের কুন্দপুর নামক স্থানের 'জ্ঞাতৃক' নামে এক ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ, মাতার নাম ছিল ত্রিশলা। তিনি ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে রাজপ্রাসাদের সুখভোগ পরিত্যাগ করে তিনি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি রিপু জয় করে 'জিন' বা বিজিতেন্দ্রিয় হলেন ও কৈবল্য বা সিদ্ধিলাভ করলেন। এই সময় থেকে তিনি মহাবীর নামে প্রসিদ্ধ হন।

বর্ধমান মহাবীর

মহাবীরের অনুগামী শিষ্যদের 'নির্গ্রন্থ' (সংসার বন্ধনমুক্ত) বলা হত। সংসারের মায়া, মোহ, লোভ প্রভৃতি থেকে তাঁরা হলেন গ্রন্থিহীন বা বন্ধনহীন। তার 'জিন' উপাধি থেকেই পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যরা 'জৈন' নামে প্রসিদ্ধ হলেন। তিনি কোশল, মগধ, বিদেহ, অঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। আনুমানিক

খ্রীঃ পূঃ ৫২৮-২৭ থেকে ৪৬৭ অব্দের মধ্যে দক্ষিণ-বিহারে পাবা বা পাবাপুরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

জৈনধর্মের শিক্ষা : পার্শ্বনাথ-প্রবর্তিত চতুর্যামের সঙ্গে মহাবীর ব্রহ্মচর্য বা জিতেন্দ্রিয়তার সঙ্কল্প যোগ করেছিলেন। জৈনদের মতে প্রত্যেক 'জিনই' পরম দেবতা বলে অভিহিত হতে পারেন, কেননা মানবাত্মার অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ তাঁর মধ্যেই হতে পারে। তিনি জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধপুরুষ হ'য়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দধামে প্রবেশ করতে পারেন। এটাই জৈনদের মতে নির্বাণ বা মোক্ষ। মহাবীরের অনুগামী শিষ্যগণ (জৈন) বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না। প্রাণী হিংসাকে তাঁরা মহাপাপরূপে গণ্য করেন। বৌদ্ধদের তুলনায় জৈনদিগের অহিংসানীতি অনেক বেশি কঠোর ও ব্যাপক। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিশ্বের সকল বস্তুরই আত্মা আছে। একজন সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর দয়ার উপরই মানুষের মুক্তি নির্ভর করে একথা তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে মানুষের আত্মার মধ্যে যে শক্তিসমূহ সুপ্ত আছে সেই শক্তিসমূহের সর্বোচ্চ পূর্ণতম এবং শ্রেষ্ঠ বিকাশই হল ঈশ্বরত্ব। তাঁরা হিন্দুদিগের কর্মফলবাদে বিশ্বাসী। অতীত জীবন থেকে পাওয়া যাবতীয় কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই পরম মুক্তি বা মোক্ষ। তপশ্চর্যা ও ক্লেশ সহ্য করে দেহকে পীড়ন করলেই দেহের মধ্যস্থিত আত্মা শক্তিশালী হবে। এই হল তাদের বিশ্বাস।

মহাবীর স্বয়ং 'দিগম্বর' ছিলেন। উদ্দেশ্য—পরিধেয় বস্ত্রের প্রতিও যেন তাঁর কোন আসক্তি না জন্মায়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জৈনরা 'শ্বেতাম্বর' নামে আর একটি শাখার সৃষ্টি করলেন। পরবর্তীকালে জৈন ধর্মাবলম্বীরা বস্ত্রাদি পরিধান করতে থাকেন।

মহাবীরের প্রধান শিক্ষা হলো যে, অনাসক্ত ও কর্মফলত্যাগী হতে পারলেই 'সিদ্ধশীল' হওয়া সম্ভব। তখন 'কৈবল্য' বা 'মোক্ষ' লাভ হবে। 'মোক্ষ' বা মুক্তির পথের জন্য 'ত্রিরত্ন' পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'ত্রিরত্ন' বা তিনটি পন্থা হলো : সৎ-বিশ্বাস, সৎ-আচরণ ও সৎ-জ্ঞানের অনুসরণ করা।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাটলিপুত্রের জৈন সভায় মহাবীরের উপদেশসমূহকে দ্বাদশটি অঙ্গ বা দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুজরাটের অন্তর্গত বলভীতে আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় জৈনশাস্ত্রের আরও সংকলন হয়। অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র—এই চারটি ভাগে জৈন-ধর্ম-শাস্ত্রাদি বিভক্ত হয়েছে। এই ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কাহিনী, কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। এগুলি 'পরিশিষ্ট', 'পার্বণ' প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারক গৌতম বুদ্ধ

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জটিল ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে জৈনধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল, বৌদ্ধধর্মের বেলাতেও প্রায় তা-ই দেখা যায়।

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধও গাঙ্গেয় উপত্যকায় ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ

করেছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নগরে শাক্য বংশের নায়ক শুদ্ধোদনের পুত্র ছিলেন গৌতম। তাঁর মায়ের নাম ছিল মায়াদেবী। আর তাঁর আদি নাম ছিল সিদ্ধার্থ।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে কপিলাবস্তুর কাছে লুম্বিনীর উদ্যানে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের অব্যবহিত পরেই মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। নবজাতকের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন তাঁর মাতৃস্বসা ও বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী। এই কারণে তাঁর অপর নাম হয় গৌতম। মহারাজ অশোক নির্মিত 'রুম্মিনদেই' স্তম্ভ এখনও সিদ্ধার্থের পবিত্র জন্মস্থানের নিদর্শন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

বাল্যকাল থেকেই সিদ্ধার্থ চিন্তাশীল ও সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। শুদ্ধোদন এটা লক্ষ্য করে রাজকুমারকে সর্বদাই আনন্দ-উৎসবের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চাইতেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে গোপা বা যশোধরা নামে এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ হয়। উনত্রিশ বছর বয়সে সিদ্ধার্থের একটি ছেলে হলো। তার নাম রাহুল।

সমসাময়িক যুগের দুঃখবাদ ও নৈরাশ্যের প্রভাব গৌতমের প্রকৃতিকে অভিভূত করে তুললো। মানুষের জীবনে দুঃখের অভাব নেই। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু—মানবজীবনের এই পরিণতি দেখে তিনি ক্রমেই বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিভাবে মানুষকে দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করা যায় সেই চিন্তাই তাঁকে পেয়ে বসলো।

গৌতম বুদ্ধ

বৈদিক যাগ-যজ্ঞের দ্বারা জীবের দুঃখ নাশ হয় না। তাই দুঃখ-নিবৃত্তির পথের সন্ধানে তিনি ব্যাকুল হলেন। গৌতমের অন্তরকে তৎকালীন ধর্মের নৈরাশ্যবাদ প্রভাবিত করেছিল।

সারথি ছন্দককে সংগে নিয়ে রাজকুমার সিদ্ধার্থ ভ্রমণে বের হয়ে কয়েক দিন পর পর এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, এক ব্যাধিপীড়িত মানুষ, একটি শবদেহ ও একটি সৌম্য যোগী মূর্তি দেখলেন। এই দৃশ্যগুলি সিদ্ধার্থের মনে জীবের দুঃখ সম্বন্ধে গভীর রেখাপাত করলো। পুত্রের জন্মের সঙ্গে মায়ার বাঁধন আরও দৃঢ় হবে মনে করে, এক গভীর নিশীথে তিনি রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। বৌদ্ধদের মতে এটাই 'মহাভিনিষ্ক্রমণ'।

সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে যুগোপযোগী বৈদিক শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন, কঠোর তপস্যা ও

কৃচ্ছ্রতা সাধনে গৌতম ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বসূরীদের কর্ম ও চিন্তা তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। উপনিষদের পুনর্জন্মবাদ ও কর্মফলবাদের দার্শনিক ভাবধারা তাঁর অন্তরকে সমৃদ্ধ করে তুলল। পুনঃ পুনঃ জন্মাবার ফলে মানুষ দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হয়। এ দুঃখের হাত থেকে মুক্তি লাভের উপায় হলো পরিপূর্ণ মোক্ষলাভ। বৌদ্ধদর্শনে এটাই হলো 'নির্বাণ'। গৌতমকে এ যুগের বিজ্ঞতম ও মহত্তম হিন্দু এ কারণেই সম্ভবতঃ বলা হ'য়েছে।*

সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ জ্ঞানলাভের জন্য দীর্ঘ ছয় বছর ধরে কঠোর তপস্যায় রত হলেন। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পেলেন না। পরিশেষে গয়ার বিখ্যাত বোধি-বৃক্ষের তলে পূর্বমুখী হয়ে বসে দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন,—বুদ্ধত্ব অর্জন না করা পর্যন্ত তিনি আসন পরিত্যাগ করবেন না। এই স্থানেই তাঁর অন্তরে 'বোধি' বা 'দিব্য' জ্ঞানের উদয় হয়। এই সময়েই তিনি প্রথম তাঁর বাণী প্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্মে এটাই হলো 'ধর্মচক্র প্রবর্তন'।

দীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচার করে ৮০ বছর বয়সে উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত কুশীনগরে বুদ্ধদেব নির্বাণলাভ করেন। বুদ্ধের 'মহাপরিনির্বাণ' সম্বন্ধে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৪ অব্দে দেহত্যাগ করেন, আবার কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৬ বা ৪৮৩ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা ঃ গৌতম বুদ্ধের ধর্মমত ছিল সহজ ও সরল। এই ধর্মের গোড়ার কথা হলো দুঃখনিবৃত্তির উপায় সাধন। মানুষের জন্ম, রোগ, বার্ধক্য ও মৃত্যু সবই দুঃখের। দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় এই চারটি বৌদ্ধধর্মে **'আর্য-সত্য'** নামে অভিহিত। তৃষ্ণাই (কামনা-বাসনা) দুঃখের মূল কারণ। দুঃখ-উৎপত্তির মূল কারণ নির্ণয় করে তার নিবৃত্তির জন্য উপযুক্ত পথে চলতে পারলে মানুষ নির্বাণ বা অনাবিল আনন্দের অধিকারী হতে পারে। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা বা প্রচুর ভোগবিলাসের মধ্যে এই মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্য তিনি 'মধ্যপন্থা' অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মধ্যপন্থা হিসাবে বুদ্ধদেব আটটি পথ বা অষ্টাঙ্গিক মার্গের নির্দেশ দিয়েছেন। সম্যক দৃষ্টি, সদ্বাক্য, সৎকর্ম, সম্যক্ সমাধি, সৎ সঙ্কল্প, সৎ-জীবন, সদ্ব্যায়াম বা চেষ্টা, সৎ স্মৃতি—এগুলিই অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই পথে চলতে পারলে কামনা-বাসনার বিনাশ হয় এবং আত্মশুদ্ধি লাভ হয়। তারপরে জীবকুলকে আর জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করতে হবে না। বুদ্ধের মতে এটাই 'নির্বাণ'। বুদ্ধ-প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গিক মার্গে যে ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে, তার অর্থ সর্বজীবে মৈত্রী বা প্রেম, জীবের দুঃখে করুণা এবং মুদিতা বা সন্তোষ। বস্তুতঃ প্রেম বা অহিংসাই বৌদ্ধ-ধর্মের মূল বাণী।

---

* '... ..without the intellectual work of the predecessors his (Bhddha's) own work however original would have been impossible......He was the greatest and wisest and best of the Hindus and throughout his career, a characteristic Indian'. —*American Lectures*, Rhys Davids, pp. 116-117.

বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ, বেদের অপৌরুষেয়তা বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি। তাঁর নির্দেশে বুদ্ধশিষ্যরা বৌদ্ধসংঘে অবস্থান করে বুদ্ধ-নির্দিষ্ট পথে চলতেন। বৌদ্ধ 'সংঘে' কোন জাতিভেদ ছিল না। 'সুত্র-পিটক', 'বিনয়-পিটক' ও 'অভিধম্মপিটক'—এই ত্রিপিটকে বুদ্ধের উপদেশসমূহ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থগুলি পালি ভাষায় রচিত। সুত্রপিটকের অন্তর্গত ছিল প্রসিদ্ধ 'ধম্মপদ'। ত্রিপিটক ছাড়া 'জাতকের গল্প'সমূহ বৌদ্ধ সাহিত্যের বিশেষ অবদান। বুদ্ধদেবের আগের জীবনের বহু কাহিনী নিয়েই জাতকের গল্প রচিত হয়েছে।

জাতক : বৌদ্ধদিগের পবিত্র ধর্মসাহিত্যের মধ্যে 'জাতক' সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধদিগের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী 'বুদ্ধত্ব (পরম জ্ঞান) লাভ করবার পূর্বে গৌতম বুদ্ধ বিভিন্ন পূর্বজন্মে নানা অলৌকিকভাবে 'মারে'র (শয়তানের) ভীতিপ্রদর্শন উপেক্ষা করে ধর্মের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং শেষজন্মে বুদ্ধত্বলাভ করেন। 'বোধিসত্ব' রূপে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজীবনের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত কাহিনীগুলি 'জাতক' নামে পরিচিত। ধর্মনিষ্ঠ বৌদ্ধদিগের নিকট এই জাতক কাহিনীগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। জাতকসাহিত্য থেকে প্রাচীন যুগের ভারতের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। অজন্তার বিভিন্ন গুহাগাত্রে গৌতম বুদ্ধের 'বোধিসত্ব' জীবনের নানা চিত্র খোদিত আছে।

বৌদ্ধসংঘ : বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসীরা দারিদ্র্য, পবিত্রতা এবং নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করে নানাস্থানে সংঘ গঠন করেছিলেন। প্রার্থনাকালে বৌদ্ধদের তিনটি শপথবাক্য উচ্চারণ করতে হয়, যেমন—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" (বুদ্ধের শরণ নিলাম), "ধর্মং শরণং গচ্ছামি" (ধর্মের শরণ নিলাম) এবং "সংঘ শরণং গচ্ছামি" (সংঘের শরণ নিলাম)। সংঘভুক্ত সন্ন্যাসীরা ভারতের ভিতরে এবং বাইরে নানাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতেন। এইজন্যই বৌদ্ধধর্ম দ্রুত বিস্তারলাভ করেছিল।

জৈনধর্মমত	বৌদ্ধধর্মমত	হিন্দুধর্মমত
১। বেদ ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী, তাই অপৌরুষেয়—জৈনেরা তা স্বীকার করেন না।	১। বেদ অপৌরুষেয় এবং প্রামাণ্য তা বিশ্বাস করেন না।	১। বেদ অপৌরুষেয় তা বিশ্বাস করেন।
২। সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। হিন্দুদের কোন কোন দেবদেবী, যেমন গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজা করেন।	২। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব—বুদ্ধদেব কিছু বলেন নাই। মূর্তিপূজাবিরোধী।	২। সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

জৈনধর্মমত	বৌদ্ধধর্মমত	হিন্দুধর্মমত
৩। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাস করেন।	৩। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাস করেন।	৩। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাস করেন।
৪। অহিংসা নীতি কঠোর ভাবে মেনে চলবার পক্ষপাতী। তাঁরা বিশ্বাস করেন পশুপাখী, গাছপালা, পাথর এবং জলেও প্রাণ আছে।	৪। যাগযজ্ঞ ও পশুবলির নিন্দা করেন।	৪। যাগযজ্ঞ ও পশুবলি হিন্দুধর্ম মতে নিন্দনীয় নয়, বরং এগুলি হিন্দুধর্মের অঙ্গ।
৫। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা মানেন না।	৫। জাতিভেদ প্রথা মানেন না।	৫। জাতিভেদ প্রথা মানেন, তবে বর্তমানে এর কঠোরতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।
৬। আত্মার মুক্তির জন্য কঠোর তপশ্চর্যা ও দৈহিক কৃচ্ছ্রতা সাধনের পক্ষপাতী।	৬। ভোগ ও ত্যাগের মধ্যবর্তী "মঝ্‌ঝিম পথ"—মধ্যম পথ অনুসরণের পক্ষপাতী।	৬। সমন্বয়ধর্মী হিন্দুধর্মের মধ্যে সকল রকম মতেরই স্থান আছে।

বৌদ্ধ সংগীতি ঃ বুদ্ধের মহানির্বাণের পরে তাঁর অনুগামী শিষ্যেরা রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধসংগীতি আহ্বান করে ত্রিপিটকের সংকলন করেন। রাজগৃহ-সম্মেলনের প্রায় একশো বছর পরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি আহূত হয়। এখানে ধর্মমতের পুনরায় ব্যাখ্যা হয়। অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে তৃতীয় এবং কণিষ্কের সময়ে পুরুষপুর বা পেশোয়ারে চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি আহূত হয়েছিল। এই সংগীতিতে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান—এই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। মহাযান-মতবাদই ভারতের বাইরে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের যুগ

ভারতের ইতিহাস মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কখনও কেন্দ্রানুগত্যের শক্তি প্রবল হ'য়ে দেশে সাম্রাজ্যিক ঐক্য ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এনেছে এবং সেই সঙ্গে উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছে। আবার অন্য সময়ে দেখা যাবে এর বিপরীত চিত্র, যখন বিভেদকামী আঞ্চলিকতার শক্তিগুলি প্রাধান্য লাভ করে দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করেছে এবং সেইসঙ্গে নিয়ে এসেছে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বৈদেশিক আক্রমণের বিভীষিকা এবং পরাধীনতার অভিশাপ। আঞ্চলিক শক্তিগুলির পারস্পরিক হানাহানির মধ্যে যখন কোন রাজশক্তি প্রবল হ'য়ে দেশে রাজনৈতিক ঐক্য এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে তখনই জাতির জীবনে শুরু হয়েছে নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, নানা দুর্দৈব ও বিভেদকামী শক্তির হানাহানির মধ্যেও ভারতের মৌলিক ঐক্যের আদর্শ কখনও বিলুপ্ত হ'য়ে যায় নাই। ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপনের প্রয়াসে সফল নৃপতিগণ বিভিন্ন সময়ে একরাট্, সম্রাট্, রাজচক্রবর্তী প্রভৃতি আখ্যায় অভিনন্দিত হয়েছেন। ভাষা ও ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঐক্যের আদর্শ ভারতবাসীকে সর্বদাই প্রভাবিত করেছে।

[ক] ষোড়শ মহাজনপদ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ, পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস চমকপ্রদ ঘটনায় পূর্ণ। এই যুগেই ভারতে প্রথম বড় বড় রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং তারপর প্রাধান্য লাভের জন্য এরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়।

বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থাদির ভিত্তিতে জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি উত্তর ভারতে 'ষোড়শ মহাজনপদ' (সোলস মহাজনপদা) বা ষোলটি বৃহৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। অবশ্য এগুলির মধ্যে উত্তর ভারতের তৎকালীন সকল রাষ্ট্রই যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তা নয়। বস্তুতঃ এই অঞ্চলে তখন মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা ষোল'র চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ষোল সংখ্যাটি দিয়ে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিকেই বুঝানো হয়েছে। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত এই ষোলটি রাষ্ট্রের অধিকাংশই ছিল মধ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে উল্লিখিত ষোলটি মহাজনপদ হল—কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বজ্জি সাধারণতন্ত্র, মল্ল, চেদী, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অস্মক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজরাজ্য।

ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখে এটা স্পষ্ট যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। উত্তর ও মধ্যভারত তখন পরস্পর-বিবদমান অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এটাও লক্ষণীয় যে ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে উত্তর ও মধ্য ভারতের বাইরে আসাম, উড়িষ্যা, গুজরাট, সিন্ধু ও সুদূর দক্ষিণ ভারতের কোন

রাজ্যের উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ গঙ্গা-যমুনার উপত্যকাই ছিল তখন ভারতের রাজনৈতিক ভারসাম্যের কেন্দ্র।

'মহাজনপদে'র যুগে রাজনৈতিক সংগঠন প্রধানতঃ রাজতন্ত্র-শাসিত হলেও বজ্জি,

ষোড়শ মহাজনপদ

মল্ল, শাক্য, মোরীয় প্রভৃতি কয়েকটি শক্তিশালী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রও তখন ছিল। তবে মগধের সম্প্রসারণশীল নীতির চাপে প্রজাতন্ত্র-শাসিত রাষ্ট্রগুলি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অচিরেই মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ষোলটি মহাজনপদ-এর মধ্যে অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ—এই চারটি রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। চণ্ড প্রদ্যোতের নেতৃত্বে অবন্তী রাষ্ট্রটি পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। বৎসরাজ উদয়ন পার্শ্ববর্তী 'ভগ্গ'দিগের রাজ্য অধিকার করে প্রভুত্ব বিস্তার করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শক্তি সংগ্রহ করে কাশী ও শাক্যরাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু মগধের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোশল ও অবন্তীরাজের উচ্চাশা পূর্ণ হয় নাই।

[খ] মগধের অভ্যুত্থান—বিম্বিসার থেকে মৌর্যবংশের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত

মগধের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল সুবিধাজনক। পর্বতবেষ্টিত থাকায় স্বাভাবিক প্রতিরক্ষার সুযোগে সুরক্ষিত ছিল। ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি একমত যে বার্হদ্রথ বংশের শেষ নৃপতি মন্ত্রীর হস্তে নিহত হলে 'হর্যঙ্ককুলে'র বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শিশুনাগ নামে যে নৃপতির কথা জানা যায় তিনি বিম্বিসারের অনেক পরে রাজত্ব করেছিলেন। বিম্বিসারের "সেণিক" (শ্রেণীক) উপাধি থেকে মনে হয় তিনি প্রথম জীবনে সম্ভবতঃ একজন সেনাপতি ছিলেন।*

বিম্বিসার (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৫৪৫/৫৪৪-৪৯৩) ঃ

মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বিম্বিসার (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৫৪৫—) রাজ্যের বিস্তার সাধনে উদ্যোগী হলেন। তিনি অঙ্গরাজ্যটি অধিকার করলেন। বিম্বিসারের সামরিক বিজয়ের ফলে মগধের পরবর্তী রাজ্যজয়ের নীতির ভিত্তি রচিত হল।

বিম্বিসার শুধু রণনিপুণ ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাজনীতি-বিশারদ। রাজ্যের সম্প্রসারণে তিনি কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের নীতির উপর নির্ভর করেন নাই। বিবাহ-বন্ধনের মাধ্যমে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন ক'রে তিনি নিজ শক্তিবৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন। কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগ্নীকে বিবাহ করে তিনি কাশী 'গ্রাম' ও লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা লাভ করলেন। বৈশালীর লিচ্ছবিবংশীয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করে তিনি হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তারের পথ সুগম করেন। বিদেহ রাজকন্যা ও মদ্ররাজকন্যাকে (মধ্য পাঞ্জাবের) বিবাহ করে তিনি যথাক্রমে মগধের উত্তরাঞ্চলে এবং পশ্চিমদিকে পাঞ্জাব অঞ্চলে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি করেন।**

---

* ঐতিহাসিক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে ইংলণ্ডে রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের ক্ষেত্রে ওয়েসেক্স রাজ্য যে ভূমিকা নিয়েছিল এবং জার্মানীর ঐক্যসাধনের ক্ষেত্রে প্রাশিয়া যে ভূমিকা নিয়েছিল, ভারতে রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের ক্ষেত্রে অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল মগধ রাজ্য।

** সুদূর গান্ধার রাজ্যের সহিতও বিম্বিসার মৈত্রীদূত বিনিময় করেছিলেন। এইর পে যুদ্ধ ও শান্তি উভয় প্রকার নীতি অনুসরণ করে বিম্বিসার মগধের শক্তি ও মর্যাদাকে যথেষ্ট বৃদ্ধি করলেন। ঐতিহাসিক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে বিম্বিসারের রাজ্যসীমা ৩০০ লীগ বা ২৩০০ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত ছিল।

বিম্বিসার সুদক্ষ প্রশাসক ছিলেন। কর্মচারীদের কাজকর্ম তিনি কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর রাজ্যভুক্ত গ্রামগুলি শাসিত হত 'গ্রাম সভা' দ্বারা।

রাজানুকূল্য লাভ করায় বিম্বিসারের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। তাঁর সময়ে গৌতম 'বুদ্ধ' (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৫৬৬/৫৬৭-৪৮৬) এবং মহাবীর 'জিন' (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৫৪০-৪৬৮) উভয়েই জীবিত ছিলেন। জৈন ধর্মগ্রন্থে বিম্বিসারকে জৈন-ধর্মের পরিপোষকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

মগধ সাম্রাজ্যের স্রষ্টা এবং সংগঠক হিসাবে বিম্বিসারের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সেই রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে তিনি বিবাহ সম্পর্কের মাধ্যমে যে সম্প্রীতির নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা থেকে তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অজাতশত্রু :

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ৪৯৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিম্বিসার, পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত, কারারুদ্ধ এবং নিহত হন।

সিংহাসনে আরোহণ করে অজাতশত্রু সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হন। তিনি কোশলনৃপতি প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলার পর প্রসেনজিতের কন্যাকে বিবাহ করে তাঁর সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হলেন। শক্তিশালী লিচ্ছবিদের বিরুদ্ধেও অজাতশত্রু এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। লিচ্ছবিদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তিনি পাটলিগ্রাম নামে একটি দুর্গ-নগর নির্মাণ করেন। এই দুর্গ-নগরই পরে রাজধানী পাটলিপুত্র নামে পরিচিত হয়।

লিচ্ছবিদিগের বিরুদ্ধে অজাতশত্রুর সংগ্রাম ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে একটি জোটবদ্ধ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এইরূপ বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নাই।

অজাতশত্রুর সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতি সফল করবার পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াল অবন্তীর চণ্ড প্রদ্যোত, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও বৈশালীর লিচ্ছবিগণ। অজাতশত্রু অপূর্ব সাহস ও রণকৌশল প্রদর্শন করে শত্রুদিগকে পর্যুদস্ত করলেন।

অজাতশত্রু প্রথম জীবনে বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। পরে পিতৃহত্যাজনিত অপরাধ বোধে অনুতপ্ত হয়ে বুদ্ধের চরণে আত্মনিবেদন করেছিলেন। বৌদ্ধমতে হর্যঙ্ককুলের শেষ নৃপতি ছিলেন নাগদশক (অনেকের মতে পুরাণে উল্লিখিত দর্শকের সঙ্গে অভিন্ন)।

অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর (আঃ ৪৬১ খ্রীঃ পূঃ) উদয়ভদ্র (পৌরাণিক মতে উদয়ী) মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নন্দবংশ :

নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতাকে পুরাণে বলা হয়েছে "মহাপদ্মপতি" অর্থাৎ বিপুল সৈন্যের বা বিপুল সম্পদের অধিকারী। বৌদ্ধগ্রন্থে তাঁকে বলা হয়েছে "উগ্রসেন" (গ্রীক

লেখকদিগের উল্লিখিত "Agrammes" বা ঔগ্রসৈন্য)। পুরাণ মতে মহাপদ্ম নন্দসহ নয়জন নন্দ রাজা ("নবনন্দ") একশত বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।*

মহাপদ্ম নন্দ প্রভুত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর হস্তে পরাভূত পাঞ্চাল, কাশী, কুরু, অস্মক, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজবংশের উল্লেখ করে পুরাণে তাঁকে "ক্ষত্রিয়ান্তক" বলা হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন মহাপদ্ম নন্দই উত্তর ভারতের প্রথম ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন।

নন্দ বংশের শেষ নৃপতি ধননন্দ আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে (৩২৭-৩২৫ খ্রীঃ পূঃ) মগধে ক্ষমতাসীন ছিলেন। গ্রীক লেখকদিগের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বিপাশার পূর্ব দিকে গাঙ্গেয় ও প্রাচ্যের ব্যাপক এলাকায় ("Gangaridae and Prasii"), নন্দ সম্রাট "Xandrammes" ("Agrammes") ও তাঁর বংশধরগণ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁর শক্তির ভয়ে ভীত হয়েই আলেকজান্ডারের রণক্লান্ত সৈন্যরা ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে রাজী হয় নাই।

প্রবল সামরিক বাহিনী ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেও নন্দ সম্রাটের জনপ্রিয়তা ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যাচারী ও ঘৃণিত শাসক। শেষ পর্যন্ত মৌর্য ("মোরীয়") চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক তিনি সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন (খ্রীঃ পূঃ ৩২৪) এবং মগধে প্রতিষ্ঠিত হয় "মৌর্য" বংশ।

শোচনীয় পরিণতি সত্ত্বেও নন্দ রাজাদের কৃতিত্বকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে নন্দবংশীয় নৃপতিগণই বিম্বিসার ও অজাতশত্রু কর্তৃক রচিত ভিত্তির উপরে সর্বপ্রথম এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।**

[গ] মৌর্য সাম্রাজ্যের বিবরণ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রীঃ পূঃ ৩২৪-৩০০) ও তাঁর কৃতিত্ব

মৌর্য বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রীক লেখক জাস্টিন চন্দ্রগুপ্তকে 'নীচবংশজাত' বলেছেন। জৈন সূত্রে জানা যায় 'ময়ূর-পোষক' সম্প্রদায়-অধ্যুষিত গ্রামে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়েছিল। পৌরাণিক সূত্রে জানা যায় কৌটিল্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ নন্দ বংশের উচ্ছেদ করে চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। পুরাণের জনৈক টীকাকার সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন যে চন্দ্রগুপ্ত

* ঐতিহাসিকদিগের মতে পুরাণে বর্ণিত শিশুনাগ বংশের নন্দীবর্ধন ও মহানন্দিনকে "পুরাতন" নন্দরূপে গণ্য করতে হবে। আর মহাপদ্ম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশকে "নব" বা নতুন নন্দ বংশরূপে মনে করতে হবে।

**ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত ইতিহাসগ্রন্থে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, "মগধের এই (নন্দ ও মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসানের পরেও এমন একটি মূল্যবান ঐতিহ্য এর পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল যে, অনুরূপ অবদানবিশিষ্ট (তুলনায় কিঞ্চিৎ নিম্নমানের হলেও) দ্বিতীয় আর একটি সাম্রাজ্যের আবির্ভাব পরবর্তী পাঁচশত বৎসরের পূর্বে ঘটে নাই।"

নীচবংশজাত ছিলেন, তাঁর মাতা মুরা নন্দরাজার পত্নী ছিলেন এবং মুরার নামানুসারেই তাঁর বংশের নাম 'মৌর্য' হয়। 'মৌর্য' নামের এই পৌরাণিক ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই।

প্রচলিত প্রাচীন মত অনুসারে নন্দ রাজবংশ থেকেই মৌর্যদের উৎপত্তি হয়েছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং নাকি নন্দরাজার সন্তান ছিলেন, কোন কারণে নন্দরাজের বিরাগভাজন হওয়ায় রাজপ্রাসাদ থেকে নির্বাসিত হন। নির্বাসিত অবস্থায় দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে নন্দরাজ কর্তৃক অপমানিত, প্রতিশোধপরায়ণ ব্রাহ্মণ চাণক্যের সাক্ষাৎ হয় এবং এই সাক্ষাতের ফলেই উভয়ে নন্দরাজকে সিংহাসনচ্যুত করবার পরিকল্পনা করেন।

সিংহলী সূত্রে জানা যায়, চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন এবং দেশের কয়েকটি অঞ্চল থেকে ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করেন। শীঘ্রই চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়।

বৌদ্ধ ও জৈন সূত্রে জানা যায়, নন্দরাজবংশকে উৎখাত করবার জন্য চন্দ্রগুপ্তের প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হয়। আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ ভারত ত্যাগ করে যাবার পরই পরিস্থিতি চন্দ্রগুপ্তের অনুকূলে আসে।

আলেকজান্ডার তাঁর অধিকৃত ভূখণ্ড কয়েকটি সামন্ত-রাজ্যে বিভক্ত করেছিলেন কিন্তু তিনি দেশের দিকে ফিরে যাবার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় এবং গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের নানাস্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ ও অন্তঃকলহ আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর (৩২৩ খ্রীঃ পূঃ) তীব্র আকার ধারণ করে। ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শেষ গ্রীক সামন্তরাজ যখন ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তখন কার্যতঃ চন্দ্রগুপ্ত হয়ে দাঁড়ালেন পাঞ্জাবের অধীশ্বর। মুদ্রারাক্ষস নাটক এবং একটি জৈনগ্রন্থ থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত 'শক', 'যবন', 'কিরাত', 'কম্বোজ' প্রভৃতি পার্বত্য জাতির সহায়তায় একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করতে সমর্থ হন।

মগধের সিংহাসন অধিকার করবার জন্য চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। পাটলিপুত্র অবরোধ করে চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজ ধননন্দকে নিহত করলেন এবং মগধের সিংহাসন অধিকার করলেন (খ্রীঃ পূঃ ৩২৪)। পৌরাণিক সূত্রে জানা যায় ব্রাহ্মণ চাণক্য নন্দদিগের ধ্বংস সাধন করেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। নন্দরাজের পরাজয়ে চন্দ্রগুপ্তের সাহস ও সামরিক নৈপুণ্যের তুলনায় চাণক্যের কূটনৈতিক কৌশল কম দায়ী ছিল না।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল সিরিয়ার শাসনকর্তা সেলুকাস নিকেটরের সঙ্গে যুদ্ধ ও (সম্ভবতঃ) জয়লাভ এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদন।

লিখিত তথ্য থেকে জানা যায় সেলুকাস ৩০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী সহ সিন্ধুতীরে উপনীত হয়েছিলেন, সম্ভবতঃ তার পরেই চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে

তাঁর যুদ্ধ হয়। ফলাফল সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু জানা যায়, সেল্যুকাস্ ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় তার শর্তানুসারে চন্দ্রগুপ্ত সেল্যুকাসের নিকট তিনটি প্রদেশ—'আরিয়া', 'আরাকোশিয়া' ও 'পরোপানিসদায়' (রাজধানী যথাক্রমে বর্তমানের হিরাট্, কান্দাহার ও কাবুল) এবং 'জেড্রোশিয়া' (সম্ভবতঃ বালুচিস্তান) লাভ করেন। বিনিময়ে তিনি সেল্যুকাস্‌কে পাঁচশত রণহস্তী প্রদান করেন। সন্ধিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সেল্যুকাস্ কর্তৃক চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্রে মেগাস্থিনিস্‌কে দূতরূপে প্রেরণ। স্পষ্টতঃই সন্ধিচুক্তি চন্দ্রগুপ্তের অনুকূল ছিল এবং যুদ্ধে তাঁর সাফল্যের ইঙ্গিত প্রদান করে।*

চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তারসাধন ঃ

সেল্যুকাসের সহিত সন্ধির ফলে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায়, পশ্চিম ভারতে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র এবং অবন্তী ও সম্ভবতঃ কোঙ্কন মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। অশোকের শিলালিপির ভিত্তিতে অনুমিত হয়, চন্দ্রগুপ্ত মহীশূর ও মাদ্রাজের অনেকাংশ জয় করেছিলেন এবং তাঁর সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমা দক্ষিণে মহীশূর ও মাদ্রাজ এবং পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চন্দ্রগুপ্ত কেবলমাত্র বিজেতা হিসাবেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই, সুসংহত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানেও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। এজন্য কেউ কেউ তাঁকে 'ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা' রূপে অভিহিত করেছেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা

গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও কৌটিল্যরচিত অর্থশাস্ত্র এবং অশোকের শিলালিপি ও অন্যান্য সূত্র অবলম্বনে আমরা মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত করতে পারি।**

মৌর্য আমলে রাজা ছিলেন আইন প্রণয়নের একমাত্র অধিকারী। রাজার নির্দেশে ও রাজার নামেই শাসন পরিচালিত হত। রাজা স্বয়ং প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীকে (যেমন মন্ত্রী, অমাত্য, সচিব, মহামাত্র প্রভৃতি) নিযুক্ত করতেন। তিনি ছিলেন

*এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেল্যুকাস্ এবং চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাখ্যায় পরবর্তী কালে চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক সেল্যুকাসের কন্যাকে বিবাহ করার যে কাহিনী প্রচলিত হয়েছে তার কোন তথ্যানুমোদিত ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

**উল্লেখ্য, মেগাস্থিনিসের রচিত 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া না গেলেও এই পুস্তক থেকে অন্যান্য গ্রীক ও রোমান লেখকদিগের উদ্ধৃতির সাহায্যে চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

রাজস্ব সংগ্রহ বিভাগের প্রধান এবং দেশের প্রধান বিচারকর্তা। রাজার দেহরক্ষী বাহিনী নিযুক্ত করার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হত কারণ তখন রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই বিষয়ে মেগাস্থিনিস্ লিখেছেন—"দুষ্ট ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার ভয়ে রাজা দিবাভাগে নিদ্রা যান না, এমন কি রাত্রেও মাঝে মাঝে বিশ্রামস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।"*

মৌর্য রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত প্রধান পুরোহিতের। রাজা তাঁর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে রাজকার্যের জন্য সাহায্যকারী নির্বাচন করতেন। ষড়যন্ত্রের ভয়ে সমগ্র দেশে গুপ্তচরদিগের জালবিস্তার ক'রে রাখা হত। রাজা ছিলেন প্রধান সেনাধ্যক্ষ। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী রাজার সৈন্যদল ছিল বিস্ময়কর। চন্দ্রগুপ্তের ছয় লক্ষের বেশি সৈন্য ছিল। এ ছাড়া ছিল বিরাট সংখ্যক রণহস্তী ও রথ প্রভৃতি।

রাজ্য পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল 'পরিষদ' নামে রাজার মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর। অর্থশাস্ত্রে একে বলা হয়েছে 'মন্ত্রি-পরিষদ'। এই পরিষদের কাজ ছিল সমগ্র শাসনব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং রাজার নির্দেশ কার্যকর করা। স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে (মন্ত্রীকে) নিয়ে গঠিত হত আর একটি ছোট গোপন পরিষদ। জরুরী প্রয়োজনে উভয় পরিষদই একত্রে মিলিত হত।

'সভা' নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সংগঠন রাজ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তব্য নিষ্পন্ন করত। পরে অবশ্য 'সভার' কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং ক্রমে এটি উপদেষ্টা পর্ষদে পরিণত হয়।

মৌর্যযুগে উৎপাদিত শস্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজস্বরূপে আদায় করা হত। যে সমস্ত অঞ্চলে জমির উর্বরতা বেশি ছিল এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হত সেখানে ফসলের এক-চতুর্থাংশ, এমনকি এক-তৃতীয়াংশও রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হত। অর্থশাস্ত্রের ভাষ্য অনুযায়ী অর্থনৈতিক সংকটের সময় রাজা নিজ রাজকোষ পূর্তির জন্য মন্দির থেকে মূল্যবান্ অলঙ্কার ইত্যাদি গ্রহণ করবার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু যজন-যাজনে রত ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতবৃন্দ এবং রাজার 'অনুচরবৃন্দ' কর প্রদানের দায় থেকে রেহাই পেতেন।

মৌর্যরাজারা সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ক'রে প্রশাসন ব্যবস্থা সংগঠিত করেছিলেন। মৌর্য সাম্রাজ্যে কয়েকটি বিভাগ ছিল, যেমন—উত্তর-পশ্চিম বিভাগ ঃ রাজধানী—তক্ষশীলা ; পশ্চিম বিভাগ ঃ রাজধানী—উজ্জয়িনী ; পূর্ব-বিভাগ বা কলিঙ্গ ঃ রাজধানী—তোসালি এবং দক্ষিণ বিভাগ ঃ রাজধানী—সুবর্ণগিরি। এই চারটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন রাজকুমারেরা। তাঁদের বলা

* "রাজা যখন শিকারে বের হন তখন তিনি পরিবৃত থাকেন স্ত্রীলোকদের দ্বারা, আর এই নারী সঙ্গিনীদের ঘিরে থাকে বর্শাধারী দেহরক্ষীদের ব্যূহ।......কোন হঠকারী ব্যক্তি এই ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করলে তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়।"

হত কুমারামাত্য। দক্ষিণ বিভাগের বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় এখানে শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হতেন 'আর্যপুত্র' বা যুবরাজ স্বয়ং। সাম্রাজ্যের বিভাগগুলি যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। বিভাগীয় শাসনকর্তা রাজকুমারগণ তাঁদের অধীন কর্মচারীদিগের কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য পরিদর্শক পাঠাতেন। রাজ্যের প্রতিটি বিভাগ কয়েকটি 'জনপদে' এবং প্রতিটি জনপদ কয়েকটি আহাল (আহার) বা জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল। শাসনব্যবস্থার নিম্নতম স্তরে ছিল গ্রামগুলি। 'রজ্জুক', 'স্থানিক', 'যুত', 'মহামাত্র' প্রভৃতি কর্মচারীরা প্রাদেশিক শাসন পরিচালনা করতেন। জনপদগুলির শাসনদায়িত্বে থাকতেন প্রধানতঃ 'স্থানিক' নামক কর্মচারিগণ। চন্দ্রগুপ্তের আমলে গ্রামীণ কর্মচারীদের মেগাস্থিনিস 'অ্যাগ্রোনোমোই' (গ্রামণী) নামে অভিহিত করেছেন (অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছেন 'গোপ' নামে)। সীমান্তে প্রহরার কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের 'অন্ত্যমহামাত্র' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় রাজধানী পাটলিপুত্র ও অন্যান্য শহর শাসিত হত পাঁচ-সদস্যবিশিষ্ট ছয়টি করে পর্ষদের দ্বারা। প্রতিটি পর্ষদ্ তত্ত্বাবধান করত নাগরিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন—কারুশিল্প, বিদেশীদের আগমন-নির্গমন, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি। কারুশিল্পীদের তৈরি পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের পূর্বে সীলমোহর প্রদানের ব্যবস্থা এবং বিক্রীত পণ্যের মূল্যের উপর এক দশমাংশ রাজকর আদায় করা হত। এখানে উল্লেখ্য যে নগর প্রশাসনে বিভিন্ন যৌথ পর্ষদের সদস্যরা এ সময়ে প্রাচীন যুগের মত জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হতেন না।

মৌর্য শাসনাধীনে নাগরিকদিগের জীবন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। প্রত্যেক গৃহস্বামীকে অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা রাখতে হত। সন্ধ্যার পর বিনা অনুমতিতে কেউ শহরের বাইরে যেতে পারত না। কেউ আইন ভঙ্গ করলে মোটা রকম অর্থদণ্ড দিতে হত।

নগর প্রশাসনের ন্যায় সামরিক বিভাগগুলিও (যেমন—নৌ, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ, রণহস্তী, পরিবহণ প্রভৃতি) পাঁচ-সদস্যবিশিষ্ট ছয়টি ক'রে পরিষদের দ্বারা পরিচালিত হত।

মূলতঃ স্বৈরতান্ত্রিক হলেও মৌর্য নৃপতিদিগের কঠোর নিয়মনীতি ছিল জনকল্যাণমূলক। এই জন্যই কোন কোন ঐতিহাসিক মৌর্যদিগের শাসনচরিত্রকে 'প্রজাকল্যাণে নিয়োজিত স্বৈরতন্ত্র' ('Benevolent Despotism') ব'লে অভিহিত করেছেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায়, প্রসারণে, সংগঠনে এবং সংরক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনে আরোহণ করেন (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৩০০)। গ্রীক লেখকগণ তাঁকে 'Allitrochades', 'Amitrochates' অর্থাৎ 'অমিত্রখাদক' বা 'অমিত্রঘাতক' ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করেছেন।

বিন্দুসারের রাজত্বকালের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। একটি তিব্বতীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমান করা হয় বিন্দুসার দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন। জানা যায়, মিশর ও সিরিয়া প্রভৃতি রাজ্যের গ্রীক নৃপতিদিগের সঙ্গে তিনি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। বিন্দুসার সম্ভবতঃ ২৭-২৮ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

অশোকের কলিঙ্গ জয়

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক [বৌদ্ধ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ভ্রাতাদের নিহত করে] সিংহাসনে আরোহণ করেন (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩)। সিংহাসনে আসীন হয়ে অশোক পিতা ও পিতামহ কর্তৃক অনুসৃত দিগ্বিজয়ের নীতি অনুসারে দক্ষিণ-পূর্বের উপকূলবর্তী কলিঙ্গ রাজ্যটি আক্রমণ করেন। কলিঙ্গ ছিল বর্তমান উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে একটি শক্তিশালী রাজ্য। কলিঙ্গের সেনাবাহিনীও নগণ্য ছিল না।

অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপি থেকে জানা যায় রাজ্যাভিষেকের অষ্টম বর্ষে অশোক কর্তৃক কলিঙ্গ বিজিত হয়েছিল এবং কলিঙ্গবাসীর প্রতিরোধ চূর্ণ করতে অশোককে এক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক সৈন্যহত্যা ও ব্যাপক প্রাণহানির উল্লেখ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। অশোক তাঁর শিলালিপিতে বলেছেন, "এই যুদ্ধে দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী হয়েছিল, এক লক্ষ নিহত হয়েছিল এবং আরও কয়েক লক্ষ মানুষ (অন্যভাবে) প্রাণ হারিয়েছিল। এই বিপুল প্রাণহানি এবং ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে কলিঙ্গ অধিকৃত হওয়ার পর থেকে 'দেবতাদিগের প্রিয়' (রাজা) বিশেষ উৎসাহ সহকারে 'ধর্মে'র নীতি পালন করেছেন, 'ধর্মে'র প্রতি এবং ধর্ম শিক্ষা দানের বিষয়ে তাঁর অনুরাগ বর্ধিত হয়েছে। কলিঙ্গ যুদ্ধে যত মানুষ নিহত হয়েছিল বা অন্য ভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল বা বন্দী হয়েছিল তার শতাংশ বা সহস্রাংশের এক অংশও যদি এখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা হলেও সেটা 'দেবতাদিগের প্রিয়'র নিকট অধিক দুঃখজনক বিবেচিত হবে।" ত্রয়োদশ শিলালিপিতে অশোকের এই উক্তি থেকেই বুঝা যায় কলিঙ্গ যুদ্ধে বিপুল প্রাণহানি ও মানুষের দুঃখকষ্ট অশোককে কি গভীরভাবে বিচলিত করেছিল।

অশোক

অশোকের সাম্রাজ্যের আয়তন

কলিঙ্গ যুদ্ধের ফলে অশোকের সাম্রাজ্যের আয়তন আরও বিস্তৃত হল। বর্তমান আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানসহ তাঁর সাম্রাজ্য উত্তর পশ্চিমে পারস্যের সীমান্ত পর্যন্ত

প্রসারিত হল। এই সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের চতুঃসীমা ছিল পূর্বে ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে আরব সাগর এবং উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বত থেকে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত।

অশোকের শিলালিপির নমুনা ঃ

অশোকের বিভিন্ন শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান থেকেই তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পেশোয়ার ও হাজারা জেলায় প্রাপ্ত (শাহবাজগহ্‌রা ও মানসেরা লিপি), নেপালের শিলা স্তম্ভলিপি, কাথিয়াবাড়ের জুনাগড়ে প্রাপ্ত গিরনার শিলালিপি, বোম্বাই-এর থানে জেলায় প্রাপ্ত সোপারা শিলা-

লিপি, উড়িষ্যার জৌগড় ও ধৌলি শিলালিপি, মহীশূরের সিদ্দাপুর, ব্রহ্মগিরি ও নাসিক শিলালিপি প্রভৃতির অবস্থান অশোকের ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যের আয়তন সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না। **সাম্রাজ্যের বাইরে** অবস্থিত সুদূর দক্ষিণের 'চোড়' (চোল), 'পাণ্ড্য', 'কেরলপুত্র', 'সত্যপুত্র এবং 'তাম্রপর্ণি'র (সিংহলের) উল্লেখ করেছেন। এই সব তথ্য থেকে জানা যায়, দক্ষিণের চোল প্রভৃতি কয়েকটি ছোট স্বাধীন রাজ্য* ব্যতীত অশোকের সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপীই বিস্তৃত ছিল।

অশোকের পররাষ্ট্রনীতি ঃ

পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অশোক সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সকল দেশের সঙ্গে সৌহার্দ্যের নীতি অনুসরণ করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য চের, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যে এবং ভারতের বাইরে তাম্রপর্ণী (সিংহল) ও পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজ্যগুলিতে, মিশরে এবং উত্তর আফ্রিকায় ও গ্রীসের এপিরাসে দূত প্রেরণ করেছিলেন। তিনি পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে (মতান্তরে ভ্রাতা ও ভগ্নীকে) ধর্মপ্রচারের জন্য সিংহলে প্রেরণ করেন। এবং প্রধানতঃ তাঁদের প্রয়াসেই সিংহলে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। ব্রহ্মদেশ ও দূর-প্রাচ্যের দেশগুলিতেও এই সময়েই বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়।

অশোকের শাসন ব্যবস্থা ঃ

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেও অশোক তাঁর বিশালায়তন সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনায় শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই, প্রশাসনিক কঠোরতা তিনি হ্রাস করেন এবং দণ্ডদান ব্যবস্থা নমনীয় করেন। প্রজার নৈতিক উন্নতির জন্য 'ধর্মযুত' ও 'ধর্মমহামাত্র' নামক কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তাঁর নির্দেশে প্রতি পাঁচ ও তিন বৎসর অন্তর রাজকর্মচারিগণ নিজ নিজ এলাকা পরিভ্রমণ করে প্রজাদিগের অভাব-অভিযোগের বিচার করতেন। অশোক নিজেও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করতেন।

অশোকের ধর্ম ঃ

অশোক তাঁর শিলালিপিতে "ধম্ম" ও "ধম্মমঙ্গলে"র আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন। কলিঙ্গযুদ্ধে বিপুল প্রাণহানি ও দুঃখদুর্দশার মর্মান্তিক দৃশ্যে অনুতপ্ত হ'য়ে তিনি চিরতরে হিংসার পথ পরিহার করেন এবং "ধম্মবিজয়ে"র (নৈতিক বিজয়ের) আদর্শ গ্রহণ করেন। অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং এই ধর্মের প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(১) সাম্রাজ্যের সকল গুরুত্বপূর্ণস্থানে (পর্বতপাত্রে, স্তম্ভগাত্রে বা গুহাগাত্রে) বুদ্ধের বাণী ও শিক্ষা কথ্যভাষায় (পালি) খোদিত করে জনসাধারণ্যে প্রচার করা ;

* এইসব ছোট ছোট রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ ছিল কলিঙ্গযুদ্ধের পরে অশোক কর্তৃক "যুদ্ধজয়ে"র নীতির পরিবর্তে "ধর্মবিজয়ে"র নীতি গ্রহণ। কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে অশোক যদি যুদ্ধের নীতি পরিহার না করতেন তাহলে এই সব ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় থাকত কিনা সন্দেহ।

(২) "ভেরি ঘোষে"র পরিবর্তে "ধম্মঘোষে"র (ধর্মপ্রচারের) ব্যবস্থা করা।

(৩) "বিহার যাত্রা"র পরিবর্তে "ধর্মযাত্রা"র ব্যবস্থা করা ;

(৪) বুদ্ধের জীবনের সহিত জড়িত সকল স্থান পরিভ্রমণ করা, বুদ্ধের জন্মস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা এবং ধর্মযাত্রা উপলক্ষে দান-দক্ষিণার ব্যবস্থা করা ;

(৫) রাজ্যের সর্বত্র (রাজপ্রাসাদসহ) প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ করা ;

(৬) ধর্মের মূলনীতি আলোচনার জন্য অ-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট "ধর্মমহামাত্র" নামে সচ্চরিত্র কর্মচারী প্রেরণ করা ;

(৭) বিদেশে (উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশে) দূতের মাধ্যমে ধর্মের মূলনীতিগুলি ব্যাখ্যা করার ব্যবস্থা করা ;

(৮) বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিরোধ-বিতর্কের অবসান কল্পে রাজধানী পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি আহ্বান করা।

অশোকের এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মৌর্যযুগে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার হয়। এই দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে বিশ্বের নানা দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে এবং বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মের মর্যাদালাভ করে।

বিভিন্ন শিলালিপিতে অশোক "ধম্মে"র প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ এবং "ধম্মে"র উন্নতি সাধনে তাঁর নিরন্তর প্রয়াসের কথা বলেছেন। 'ধম্ম" বলতে অশোক প্রকৃতপক্ষে কি বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। অশোকের শিলালিপিগুলিতে বৌদ্ধধর্মের মূলনীতিগুলি যেমন অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ, বুদ্ধের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতির উল্লেখ না থাকায় কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন অশোকের ধর্মমত খাঁটি বৌদ্ধধর্ম ছিল না। ইহা ছিল এক উদার মানবধর্ম যার বিশ্বজনীন আবেদন আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ডঃ ভাণ্ডারকর মনে করেন অশোকের ধর্ম ছিল লৌকিক বৌদ্ধধর্ম যা গৃহস্থরা পালন করতেন।*

অশোকের পরধর্মসহিষ্ণুতা ঃ

অধ্যাপক ভাণ্ডারকর ও অপরাপর ঐতিহাসিকগণ অশোকের "ধম্ম"কে বৌদ্ধধর্ম ব'লেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী হলেও পরমতসহিষ্ণুতা ছিল অশোকের প্রচারিত "ধম্মের" মূলনীতি। সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দিতেন অশোক। তিনি বলেছেন, "আপন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ এবং অপরের ধর্মকে হীন মনে করা পাপ।"

অশোক বুঝিয়েছিলেন আচার-আচরণের ও নীতিনিষ্ঠ জীবনযাপনের নিয়মকানুনকে,

* অশোক যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ তাঁর শিলালিপিতে (Minor Rock Edict) তিনি বলেছেন, "এক বৎসরের অধিককাল আমি সঙ্ঘভুক্ত হইয়া বাস করিয়াছি এবং সেই সময়ে (ধর্মপালনে) বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছি।"

যার অন্তর্গত ছিল—পিতামাতার প্রতি বাধ্যতা, গুরুজনকে শ্রদ্ধানিবেদন, জীবে দয়া, প্রাণী হিংসা থেকে বিরত হওয়া ইত্যাদি—এই নীতিগুলি বিশেষ কোন ধর্মমতের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না। অশোক দয়াপ্রদর্শন, দান, সত্যকথন, পবিত্রতা পালন প্রভৃতি নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন সকলকে। বস্তুতঃ অশোক মনেপ্রাণে অহিংসানীতি অনুসরণ করেছিলেন এবং এই নীতিকেই তাঁর ধর্মমতে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিলেন।

শাসক হিসাবে অশোকের প্রজারঞ্জনকারী ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর জনকল্যাণকর কাজগুলির মধ্যে ছিল—পথিপার্শ্বে কূপ খনন, পান্থশালা নির্মাণ, ছায়াপ্রদ বৃক্ষরোপণ, চিকিৎসালয় স্থাপন ইত্যাদি। অশোক প্রজাদের নিকট নিজেকে ঋণী মনে করতেন, নানাভাবে তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি বিধান করে সেই ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। রাজ্যের সর্বত্র শাসন ও বিচারকার্য যথাযথ ভাবে চলছে কিনা তা পরিদর্শন করে যথাকর্তব্য করার জন্য তিনি ধর্মমহামাত্র নামে বিশেষ এক শ্রেণীর সচ্চরিত্র কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। শুধু নিজ রাজ্যের প্রজাদের মধ্যেই অশোক তাঁর কর্তব্য পালন সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁর রাজ্যের বাইরে অন্য রাজ্যের সকল মানুষের কল্যাণ সাধন করাও তিনি কর্তব্য জ্ঞান করতেন। বস্তুতঃ সকল জীবের প্রতিই অশোক তাঁর দায়িত্বপালনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। উদার মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি বলেছিলেন, "সবে মুনিষে পজা মমা"। অর্থাৎ সকল মানুষই আমার সন্তান। সংক্ষেপে, অশোক ছিলেন প্রজাবৎসল নৃপতি, যিনি প্রজার সর্বপ্রকার হিতসাধনে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

ইতিহাসে অশোকের স্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত যে—তিনি ছিলেন সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি। প্রজাবর্গের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ-সাধন করবার আদর্শ অশোক ভিন্ন অপর কোন নৃপতি বাস্তবে রূপায়িত করতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায় না। সব রকম মঙ্গলসাধন ক'রে সকল মানুষ ও অন্যান্য সকল জীবের প্রতি ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলেন অশোক এবং সেই ঋণ পরিশোধের কাজেই তিনি উৎসর্গ করেছিলেন নিজেকে।

তাঁর সাম্রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে দেশে বহিরাক্রমণ ঘটে নাই। এদিক থেকেও তাঁর কৃতিত্ব 'অনস্বীকার্য'। কিন্তু অশোকের কৃতিত্ব অস্বীকার না করলেও কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোকের শান্তির নীতি আংশিকভাবে অন্ততঃ দায়ী ছিল। তাঁদের মতে অশোকের এই নীতির জন্য মৌর্য সাম্রাজ্যের সামরিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অশোকের মৃত্যুর (২৩২ খ্রীঃপূর্ব) অল্পদিন পরেই (২০৬ খ্রীঃপূঃ) বহ্লীকরাজ অ্যান্টিয়োকস্ কাবুল উপত্যকা অধিকার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এইচ্. জি. ওয়েলস্-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : তিনি লিখেছেন, "ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে হাজার হাজার নাম ভিড় করে, তাহাদের

মহিমা, করুণা ও পবিত্রতা এবং রাজকীয় মর্যাদার মধ্যে অশোকের নাম একক জ্যোতিষ্কের ন্যায় জাজ্বল্যমান"।

[ঘ] ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ ও ভারতীয় সভ্যতার উপরে তার প্রতিক্রিয়া

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারস্যের অ্যাকীমিনীয় সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তার

ভারতের উর্বরা ভূমি ও ঐশ্বর্যের আকর্ষণ বার বার প্রলুব্ধ করেছে বিদেশী জাতিকে ভারত আক্রমণ করতে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাইরাস (৫৫৮-৫৩০ খ্রীঃ পূঃ) পারস্যে শক্তিশালী অ্যাকিমিনীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং সীমান্তের ভারতীয় রাজাদের তাঁর শাসনাধীন করেন। কাইরাস তাঁর বিজয় বাহিনী সহ সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং গান্ধারের কাপিশ নগরী ধ্বংস করেন। কাইরাসের অভিযানের ফলে সিন্ধুর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল পারসিক সাম্রাজ্যের করদ প্রদেশে পরিণত হয়। কাইরাসের বংশধর প্রথম দারায়ুসের (খ্রীঃপূঃ ৫২২-৪৮৬) শিলালিপি থেকে জানা যায়, সম্রাট দারায়ুস সেনাপতি স্কাইল্যাক্সের অধীনে জলপথে সিন্ধুনদ পর্যন্ত অভিযান প্রেরণ করেছিলেন এবং রাজপুতনা পর্যন্ত পারসিক অধিকার বিস্তৃত হয়। অনুশাসন থেকে জানা যায়, পারসিক সম্রাটের "বিংশতিতম ক্ষত্রপ-শাসিত" ভারতীয় প্রদেশটি ছিল জনাকীর্ণ ও সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এবং অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিক কর সংগৃহীত হত এই প্রদেশ থেকেই। দারায়ুসের পার্সি-পলিস্ ও নকস্-ই-রুস্তম শিলালিপি থেকে জানা যায় তাঁর পুত্র ক্ষয়ারসস্ (৪৬৮-৪৬৫ খ্রীঃপূঃ) ও তাঁর বংশধরদিগের আমলে ভারতীয় প্রদেশগুলির (গান্ধার ও সিন্ধু প্রদেশের) উপর পারসিকদিগের নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। ক্ষয়ারসসের সেনা-বাহিনীতে "গান্ধারীয় ও ভারতীয়" সৈন্য একসাথে যুদ্ধ করেছিল। জানা যায় যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের বীরত্বের জন্য পারসিক সম্রাট আরও ভারতীয় সেনা সাহায্যলাভের চেষ্টা করেছিলেন এবং ভারতীয় সেনারা পারসিক সেনাপতির অধীনে গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

ক্ষয়ারসসের পরবর্তী পারসিক সম্রাটদিগের সময় গান্ধার অঞ্চল ছোটছোট সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একরকম স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করতে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সিন্ধু উপত্যকার রাজনৈতিক চিত্র ছিল অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল। এই অবস্থা বিদেশী আক্রমণকারীর পথ প্রশস্ত করল। পশ্চিম এশিয়ার গ্রীকরা ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ হল। তাদের আক্রমণের পথ অবশ্য প্রশস্ত করলেন কিছু সংখ্যক ভারতীয় রাজা—প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ যাঁদের দেশের স্বার্থের প্রতি করে তুলেছিল অন্ধ।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক অধিকার খ্রীঃ পূঃ ৩৩০ পর্যন্ত বজায় ছিল। শেষ

অ্যাকিমিনীয় সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস আলেকজান্ডারের আক্রমণ প্রতিহত করতে ভারতীয় সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ (খ্রীঃপূঃ ৩২৭-৩২৫) ও তার ফলাফল ঃ

ইউরোপের গ্রীসদেশের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ম্যাসিডন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন আলেকজান্ডার। পর পর দুটি যুদ্ধে (৩৩৩ ও ৩৩১ খ্রীঃপূঃ) পারসিক সম্রাট তৃতীয় দারায়ুসকে পরাজিত ক'রে তিনি পূর্ব দিকে অগ্রসর হলেন। ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম ক'রে তিনি ওই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতিগুলিকে একে একে পরাজিত করেন। আলেকজান্ডার নৌসেতুর সাহায্যে ওহিন্দের নিকট সিন্ধু নদ অতিক্রম ক'রে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশে উদ্যোগী হলেন (আঃ খ্রীঃ পূঃ ৩২৬)। এই সঙ্কটকালে সিন্ধু উপত্যকার ভারতীয় নৃপতিগণ ঐক্যবদ্ধভাবে বিদেশী আক্রমণকারীকে বাধাদানে ব্যর্থ হলেন। তক্ষশীলার রাজা আম্ভি নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আক্রমণকারীকে পরম সমাদরে রাজধানীতে অভ্যর্থনা করলেন। আলেকজান্ডার ভীরু ভারতীয় রাজাদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করলেন, নানাবিধ মূল্যবান্ উপঢৌকন দিয়ে তুষ্ট করলেন তাঁদের। এরপর আলেকজান্ডার সহজেই ঝিলম (বিতস্তা) নদী পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। আম্ভি ও অন্যান্য রাজাদের কাপুরুষের ন্যায় আচরণে চরম অপমানিত বোধ করেছিলেন পুরু। আত্মসমর্পণের আহ্বান ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন দৃপ্ত পুরুরাজ। শত্রুকে জানিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, তবে রণাঙ্গনে। অস্ত্রের মুখেই তাঁর পরিচয় পাবেন তিনি।

ক্ষোভে, লজ্জায় অধীর হয়ে বিদেশী, নির্লজ্জ হানাদারকে সমুচিত শিক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হলেন পুরু। ব্যূহাকারে সজ্জিত বিশাল বাহিনী (৩০ হাজার পদাতিক, ৪ হাজার অশ্বারোহী, ৩০০ রথ ও ২০০ রণহস্তী) নিয়ে ঝিলমের অপর তীরে যুদ্ধের জন্য শত্রুর অপেক্ষায় রইলেন পুরুরাজ 'জ্যেষ্ঠ পুরু'।* পুরুর বিশাল বাহিনীর প্রতিরোধের সম্মুখে নদী অতিক্রম করা দুঃসাধ্য বুঝতে পেরে আলেকজান্ডার নানা অপকৌশলে পুরুর সৈন্যদিগের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করে তাঁদের তাঁবু থেকে ১৭ মাইল দূরে রাত্রির অন্ধকারে নদী পার হলেন।

ঝিলম নদের তীরে বিশাল প্রান্তরে পরস্পরের সম্মুখীন হল দুই প্রতিপক্ষ—ভারতের এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি, আত্মরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরু আর আক্রমণকারী সমরনায়ক ম্যাসিডনরাজ আলেকজান্ডার। পুরুর অধীনে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক সমন্বিত বিশাল বাহিনী, অপর পক্ষে আলেকজান্ডারের অধীনে সুদীর্ঘ বর্শাধারী

---

* ব্যূহাকারে সজ্জিত পুরুর এই বাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন তিন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ মজুমদার, ডঃ রায়চৌধুরী এবং ডঃ দত্ত। তাঁরা লিখেছেন, "পুরুর বিশাল বাহিনী দেখিতে ছিল একটি নগরের ন্যায়, যার প্রাকারে অবস্থিত দুর্গগুলি দেখিতে ছিল যেন হস্তীযূথ আর যার শস্ত্রধারী প্রহরারত সৈনিকের সারি দেখিতে ছিল যেন নগরের প্রাচীর বেষ্টনী।"

পদাতিক বাহিনী ও দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী সেনাসহ রণনিপুণ বাহিনী। ঐতিহাসিকদিগের অনুমান এই সময় আলেকজান্ডারের অধীনে সর্বমোট ত্রিশ সহস্রের অধিক সৈন্য ছিল না। ঝিলম নদের তীরে সংঘটিত এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'হিদাস্পিসের' (ঝিলমের) যুদ্ধ নামে খ্যাত (খ্রীঃ পূঃ ৩২৬)।

যুদ্ধ পরিচালনায় কিন্তু পুরু কৌশলগত ভুল করলেন। নিজে আক্রমণ শুরু না ক'রে শত্রুকে তিনি প্রথমে আক্রমণের সুযোগ দিলেন। আলেকজান্ডারের দুর্ধর্ষ রণদক্ষ ঘোড় সওয়ার সেনার প্রচণ্ড আক্রমণে পুরুর বাহিনীর দুইপার্শ্বের রথারোহী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য বিপর্যস্ত হল, শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড তীরবর্ষণে আহত হয়ে পুরুর দুর্ভেদ্য হস্তীযূথ সম্মুখদিকে ধাবিত হল, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শত্রুমিত্র নির্বিচারে উভয় পক্ষেরই সৈন্যকে নির্মমভাবে নিষ্পিষ্ট করল, আলেকজান্ডারের সুশিক্ষিত সেনাদলের প্রবল আক্রমণের সম্মুখে পুরুর সৈন্যদল পর্যুদস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হল। পরাজিত পুরুরাজ কিন্তু পলায়ন করলেন না। গুরুতর আহত হয়েও হস্তীপৃষ্ঠে একাকী যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর হস্তে বন্দী হলেন।

বন্দী পুরু আলেকজান্ডারের সম্মুখে আনীত হলে বিজয়ী গ্রীক নৃপতি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করেন। "রাজার প্রতি রাজার আচরণ"—দৃপ্তভঙ্গীতে এই উত্তর দিলেন পুরু। বন্দীর এইরূপ পৌরুষদৃপ্ত উত্তরে আলেকজান্ডার মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন এবং পুরুর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলেন। ঝিলমের যুদ্ধে পুরুর পরাজয় একটি সত্যকে প্রমাণিত করল। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সৈন্যসংখ্যার বিপুলতা বা ব্যক্তিগত শৌর্য যথেষ্ট নয়, যুদ্ধজয়ের জন্য কৌশলগত উৎকর্ষও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ঝিলমের যুদ্ধে জয়লাভের পর আলেকজান্ডার ঝিলম ও চিনাব নদীর মধ্যবর্তী ছোট ছোট রাজ্যগুলি অধিকার করলেন। প্রবল বাধাদান সত্ত্বেও প্রজাতান্ত্রিক 'শিবি', 'মালব', 'ক্ষুদ্রক' প্রভৃতি রাজ্যগুলি শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করে। তাঁর রণক্লান্ত সৈন্যদিগের অগ্রগমনে অনীহার জন্য আলেকজান্ডার বিপাশা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন। তিনি স্বয়ং একদল সৈন্যসহ স্থলপথে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেন। সৈন্যদলের অপর অংশকে নৌসেনাপতি নিয়ারকাসের অধীনে জলপথে প্রেরণ করেন। পথে ব্যাবিলন পৌঁছে আলেকজান্ডার মৃত্যুমুখে পতিত হন (৩২৩ খ্রীঃ পূঃ)।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফল :

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। প্রথমতঃ তাঁর আক্রমণের ফলে সাময়িকভাবে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কিছু অংশ গ্রীক অধিকারভুক্ত হয়। ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের পথ নতুন করে উন্মুক্ত হওয়ায় গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির নতুন করে যোগ সাধিত হল। ভারতীয় শিল্পে যেমন গ্রীক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল, তেমনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানও ভারতের

গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আলেকজান্ডারের আক্রমণের একটি প্রত্যক্ষ ফল এই হয়েছিল যে তাঁর অভিযানের পথ অনুসরণ ক'রে পরবর্তীকালে ব্যাক্ট্রিয়া (বহ্লীক), গ্রীক,শক, পার্থিয়ান (পারদ), কুষাণ্ প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ হয় এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হয়। ক্রমে তারা হিন্দুকুশের অপরপারে কিছু উপনিবেশও স্থাপন করে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণে সাফল্য ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্যজনিত দুর্বলতা বিদেশীদের নিকট বিশেষভাবে প্রকট করে দিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে ব্যাক্ট্রিয়ান (বহ্লীক) গ্রীক, শক ও পহ্লব (পারদ বা পার্থিয়ান)-দিগের অধিকার স্থাপন

সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর (আঃ ২৩২ খ্রীঃপূঃ) নানা কারণে মৌর্য সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে এর পতন ঘটে। অশোকের বংশধরদিগের মধ্যে রাজ্য পরিচালনার যোগ্যতা কারও ছিল না। পারিবারিক ষড়যন্ত্র, যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের স্বাধীনতা ঘোষণা, অধস্তন কর্মচারীদিগের শৃঙ্খলাহীনতা, বিদেশী আক্রমণ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য, মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কেউ কেউ কঠোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, গুরু করভার এবং অশোকের অত্যধিক বৌদ্ধ-প্রীতির ফলে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি কারণগুলিও উল্লেখ করেন। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক অশোকের শান্তি ও অহিংসার নীতিকে মৌর্য সাম্রাজ্যের সামরিক দুর্বলতার জন্য দায়ী করেন। তাঁদের মতে অশোকের অত্যধিক অহিংসা-প্রীতি মৌর্যদিগের সামরিক শক্তি দুর্বল করে দেয় এবং বিদেশী হানাদারগণ সাম্রাজ্য আক্রমণে সাহসী হয়। বস্তুতঃ আমরা জানি বহ্লীক গ্রীক নৃপতি আন্তিয়োকস্ মহান্ (Antiochus the Great) অশোকের মৃত্যুর মাত্র ২৫।২৬ বৎসরের মধ্যে মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনা করে পাটলিপুত্রের প্রায় দ্বারদেশে উপনীত হয়েছিলেন। তবে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোককে আদৌ দায়ী করা যায় কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত নন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের তাৎক্ষণিক কারণ অবশ্য ছিল ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ কর্তৃক শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের হত্যা ও পাটলিপুত্রে নতুন শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা (খ্রীঃপূঃ ১৮৭)। অশোকের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদিগের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ স্বরূপ এই হত্যার ঘটনাটিও কেউ কেউ উল্লেখ করেন। তবে অ-বৌদ্ধ কোন কোন লেখকের লেখায় এবং অশোকের নিজের অনুশাসনেও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তাঁর উদারতার পরিচয় রয়েছে। এই সব কারণে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে ঐতিহাসিকগণ অধিক গুরুত্ব দিতে রাজি নন।

ভারতে ব্যাক্টিয়ান (বহ্লীক) গ্রীকদিগের অধিকার :

হিন্দুকুশের উত্তর পশ্চিমে ব্যাক্টিয়ানা ছিল একটি বিস্তৃত গ্রীক উপনিবেশ। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে ব্যাক্টিয়ানা ও সন্নিহিত পার্থিয়া প্রদেশ দুটি সেল্যুকাসের সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন হয়ে যায়।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ও শুঙ্গ বংশের অভ্যুত্থানের সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেশ কয়েকজন ব্যাক্টিয়ান (ইন্দোগ্রীক), শক ও পার্থিয়ান নৃপতি রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করেছিলেন।

মৌর্য শাসনাধীন উত্তর পশ্চিম ভারতের অঞ্চলগুলি ব্যাক্টিয়ান গ্রীক শাসকদিগের কর্তৃত্বাধীন হয়। মুদ্রায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, দিমিত্রিয়স্ (১ম) ব্যাক্টিয়ার ক্ষমতা হিন্দকুশের পশ্চিম, উত্তরে ও দক্ষিণে সম্প্রসারিত করেন এবং খ্রীঃপূঃ ১৮৫ পর্যন্ত তিনি ঐ অঞ্চল শাসন করেন। দিমিত্রিয়সের প্রায় সমসময়ের (১৯০-১৮০ খ্রীঃপূঃ) অ্যান্টিমেকস্ থিয়স নামে অপর একজন ইন্দোগ্রীক নৃপতি সিন্ধু উপত্যকায় একাধিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। জানা যায়, তিনিই ছিলেন "যবন" নৃপতি যিনি ভারতীয় আদশে চৌকো আকারের মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন। সম্ভবতঃ অ্যান্টিমেকসের পুত্র দিমিত্রিয়স্ (২য়) (১৮০-১৬৫ খ্রীঃপূঃ) গ্রীক শাসন কাবুল উপত্যকা এবং পশ্চিম গান্ধার পর্যন্ত প্রসারিত করেন। দিমিত্রিয়স্ (২য়) গ্রীক ও খরোষ্ঠী লিপিতে দ্বিভাষিক মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন। অনুমান করা হয় এই মুদ্রাগুলি তাঁর অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়েছিল। দিমিত্রিয়স্ (২য়) অপর এক ব্যাক্টিয়ান গ্রীক নৃপতি ইউক্রাটিডিসের হস্তে নিহত হন (১৭১ খ্রীঃপূঃ)। ইউক্রাটিডিসের পর মিনান্ডার ব্যাক্টিয়ায় ক্ষমতা অধিকার করেন। 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' নামক পালিগ্রন্থে (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত) সাকলের পরাক্রান্ত 'যবন' রাজা 'মিলিন্দ' ও বৌদ্ধ দার্শনিক ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে এক বিতর্কের বিবরণ পাওয়া যায়।*

মিনান্ডারের মুদ্রায় বৌদ্ধ রাজশক্তির প্রতীক চক্র অঙ্কিত আছে। এ থেকে মনে হয় তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, নয়তো বৌদ্ধদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মিনান্ডারের রাজধানী ছিল সাগল বা সাকল (সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের শিয়ালকোট)। পশ্চিমে কাবুল থেকে পূর্বে মথুরা এবং বুন্দেলখণ্ড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় মিনান্ডারের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা হয় গান্ধার আরাকোসিয়া, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও রাজপুতনার কিছু অংশও তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। বিখ্যাত বৈয়াকরণ পতঞ্জলি (যিনি পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক ছিলেন) তাঁর সময়ে

* মিলিন্দ-পঞ্‌হো গ্রন্থের লেখক লিখেছেন, "তার্কিক হিসাবে তাঁর (মিনান্ডারের) সমকক্ষ পাওয়া কঠিন, তাঁকে পরাজিত করা আরও কঠিন, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের স্রষ্টাদিগের সঙ্গে তুলনায় তিনি ছিলেন অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ।...তিনি ছিলেন সম্পদশালী, তাঁর সৈন্যসংখ্যার সীমা ছিল না।"

একটি গ্রীক অভিযানের উল্লেখ করেছেন। এই যবন অভিযানকারীরা সাকেত (অযোধ্যা) এবং মাধ্যমিকা (চিতোরের নিকট নাগরী) অবরোধ করেছিল। কিন্তু মগধরাজের (সম্ভবতঃ পুষ্যমিত্রের) সেনাবাহিনী কর্তৃক তারা বিতাড়িত হয়। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করেন পুষ্যমিত্রের সময়ের গ্রীক অভিযানকারী ছিলেন মিনান্ডার অথবা দিমিত্রিয়স্। সে যাই হোক, মিনান্ডার যে একজন শক্তিশালী ইন্দোগ্রীক নৃপতি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।* বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে মিনান্ডার শেষবয়সে পুত্রের হস্তে রাজ্যের ভার প্রদান করে সংসার ত্যাগ করেন। জানা যায়, মিনান্ডারের মৃত্যুর পর (আঃ ১৩০ খ্রীঃ পূঃ) একাধিক শহরের অধিবাসী তাঁর দেহাবশেষ পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এ থেকে তাঁর জনপ্রিয়তা সূচিত হয়।

মিনান্ডার

ভারতে শক অধিকার ঃ

মিনান্ডারের মৃত্যুর পর ইন্দোগ্রীকদিগের মধ্যে ক্ষমতা অধিকারের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ভারতে যবনাধিকার লুপ্ত হয় এবং বিশৃঙ্খলার যুগ আরম্ভ হয়। এই সময়ে শক নামে ইরানীয় উপজাতি গোষ্ঠীগুলি মধ্য এশিয়া থেকে অগ্রসর হয়ে অক্ষু (Oxus) নদীর তীরে সগ্‌ডিয়ানায় বসতি স্থাপন করে। ইন্দো শক রাজ্যগুলির সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা 'মউয়েস' (মোজ বা মোগ) সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে অথবা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর কোন সময়ে গান্ধার পাঞ্জাবে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজ্য সোয়াত নদীর উপত্যকায় এবং পুষ্কলাবতী থেকে তক্ষশীলা পর্যন্ত সিন্ধু নদের উভয়তীরে বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ কাশ্মীরের অংশবিশেষ জুড়েও তাঁর রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল। মোজের মুদ্রায় গ্রীক দেবদেবী ও শিব এবং বুদ্ধের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এ থেকে বহিরাগত শকদিগের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়।

মোজের পর অ্যাজেস্ (১ম) পাঞ্জাবে, গান্ধারে ও কাপিশ অঞ্চলে ক্ষমতার অধিকারী হন এবং ঐ অঞ্চল ইন্দোগ্রীক শাসনমুক্ত করেন। অ্যাজেস্ (১ম)-এর অধীন শকরা সিন্ধু নদ অতিক্রম করে এবং উজ্জয়িনী ও কাথিয়াবাড় অধিকার করে নেয়। পরে উজ্জয়িনীরাজের পুত্র বিক্রমাদিত্য শকদিগকে পরাজিত করেন। কথিত আছে, শকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসাবে তিনি বিক্রম সংবৎ চালু করেন।

শকদিগের সঙ্গে ইরানের পহ্লবদিগের (পার্থিয়ানদিগের) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শক নৃপতি মোজের সমসাময়িক ভনোনিজের নামের সাদৃশ্য থেকে ঐতিহাসিকগণ তাঁকে পার্থিয়ান বলে গণ্য করেন। ভনোনিজের বংশধারার সঙ্গে পার্থিয়ান

---

* স্ট্র্যাবো লিখেছেন, মিনান্ডার আলেকজান্ডার অপেক্ষাও অধিক জাতিকে জয় করেছিলেন।

সংস্কৃতির সম্পর্ক লক্ষ্য ক'রে ভনোনিজের বংশকে শক-পার্থিয়ান বা শুধু পার্থিয়ান নামে অভিহিত করা হয়।

মুদ্রা থেকে জানা যায় অ্যাজেস্ (২য়)-এর পর পল্লব নৃপতি গন্ডোফার্নেস্ (পারসিক 'বিন্দাফার্না'—'গৌরবজয়ী') রাজত্ব করেছিলেন (১৯-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ)। খরোষ্ঠী লিপিতে রচিত একটি অনুশাসন থেকেও গন্ডোফার্নেসের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলের কাহিনী থেকে জানা যায় তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁর রাজ্যে সাধু টমাস খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন ও শহীদ হন। তবে গণ্ডোফার্নেস্ এবং সাধু টমাস্ সংক্রান্ত কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ সন্দেহ পোষণ করেন।

শক-পহ্লব রাজারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের সাম্রাজ্য একাধিক প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলির শাসন-কর্তাদিগকে "ক্ষত্রপ" (satraps) বা "মহাক্ষত্রপ" (great satraps) বলা হত। ইতিহাসে কয়েকটি "ক্ষত্রপ" বংশের বিবরণ পাওয়া যায়। এই ক্ষত্রপ বংশগুলি আফগানিস্তানের কাপিশ অঞ্চলে, পশ্চিম পাঞ্জাবের তক্ষশীলায়, উত্তর প্রদেশের মথুরায়, দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে এবং মালবের উজ্জয়িনীতে শাসন করত। দাক্ষিণাত্যের ও পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপরা সম্ভবতঃ শকদিগের "ক্ষহরাত" শাখাভুক্ত ছিল। ক্ষহরাতরা নহপানের নেতৃত্বে পশ্চিম ভারতে শক্তিশালী হয়ে উঠে। কিন্তু পরে সাতবাহন নৃপতি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির হস্তে পরাজিত হয়। উজ্জয়িনীর শক-ক্ষত্রপরা তাঁদের নেতা ('স্বামিন্') চস্তনের (টলেমি বর্ণিত **'Tiastanes'**-এর) অধীনে শক্তিশালী হয়। চস্তন সম্ভবতঃ কুষাণদিগের অধীনে শাসন করতেন। চস্তনের পৌত্র রুদ্রদামন (আঃ ১৩০-১৫০ খ্রীঃ) প্রাচীন ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শকরাজা ছিলেন। জুনাগড় অনুশাসনে তাঁর রাজত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তিনি 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং সাতবাহন পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাতবাহন নৃপতিকে তিনি যুদ্ধে দুবার পরাভূত করেছিলেন, তবে নিকট-আত্মীয়তার জন্য তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন নাই। রুদ্রদামনের সভাকবির বর্ণনা থেকে জানা যায় দক্ষিণে কোঙ্কন থেকে উত্তরে মালব, গুজরাট, কাথিয়াবাড়, কচ্ছ, মাড়বার ও সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্ত রুদ্রদামনের অধিকার সম্প্রসারিত হয়েছিল। জানা যায় রুদ্রদামন শতদ্রুতীরের যৌধেয়দিগকেও পরাজিত করেছিলেন।

রুদ্রদামন শুধু যুদ্ধ-বিজেতা ছিলেন না, সুশাসকও ছিলেন। জুনাগড় প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায় তাঁর একজন সরকারী কর্মচারী সরকারী ব্যয়ে বিখ্যাত সুদর্শন হ্রদের সংস্কার করেছিলেন। রুদ্রদামন বিদ্বান্ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ব্যাকরণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তর্কবিদ্যা ও সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রুদ্রদামনের পর তাঁর বংশধরগণ অন্তর্কলহে দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রথমে সাতবাহনদিগের আক্রমণে পরে পারস্যের স্যাসানীয় শাসনকালের আক্রমণে শকদিগের শাসনাধীন প্রদেশগুলি একে একে হস্তচ্যুত হয়। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে

চষ্টনের প্রতিষ্ঠিত শক বংশের কর্তৃত্ব লুপ্ত হয়। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে মালব ও কাথিয়াবাড়ের পশ্চিমী শকক্ষত্রপদিগের আধিপত্য চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত হয়।

মৌর্যোত্তর যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা—কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প—জনসমাজে বিদেশী সংমিশ্রণ—বহির্জগতের সহিত সংস্পর্শ—মৌর্যশিল্পকলা

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিপর্যস্ত হয়। সেই সুযোগে বিদেশী হানাদার জাতিগুলি (বহ্লীক গ্রীক, শক, পার্থিয়ান প্রভৃতি) ভারতে প্রবেশ করে এবং নানাস্থানে রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন করে দীর্ঘদিন দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দেশে রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃস্থাপিত হয়। প্রায় পাঁচ শত বৎসরের এই মৌর্যোত্তর যুগে (১৮৫ খ্রীঃ পূঃ-৩২০ খ্রীঃ) দেশবাসীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল।

মৌর্যোত্তর যুগে সমাজব্যবস্থা ঃ

এযুগে সামাজিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্রাহ্মণ আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজে ব্রাহ্মণ আধিপত্যের অবসান ও ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের সূচনা হয়েছিল। মৌর্যোত্তর যুগে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী শুঙ্গ, কান্ব, সাতবাহন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিল। সাতবাহন নৃপতি গোতমীপুত্র সাতকর্ণি গর্ব ক'রে বলেছিলেন যে তিনি ক্ষত্রিয়দর্প ও মানমর্যাদা হরণ করেছেন। এ যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বিদেশাগত হানাদার জাতিগুলির ভারতীয় সমাজজীবনের অঙ্গীভুত হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়া। ব্যাকট্রীয় গ্রীক রাজা মিনান্ডার ('মিলিন্দ') বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, একটি বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে (মিলিন্দ পঞ্‌হো) তাঁকে দর্শনবেত্তা ও তার্কিকের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের বিদিশা (বেশনগর) শিলালিপি থেকে জানা যায় শুঙ্গরাজা ভাগভদ্রের সভায় প্রেরিত গ্রীকদূত হেলিওডোরাস্ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে বিদিশায় একটি গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। এই দৃষ্টান্তগুলি নিঃসন্দেহে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের উদারতার পরিচয় প্রদান করে। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণবংশীয় সাতবাহন পরিবারের সঙ্গে গুজরাট-মালবের শকক্ষত্রপদিগের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও অনুরূপ সামাজিক উদারতার পরিচায়ক। ভারতীয় ইতিহাসের এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন,—

"রণ ধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত
যারা এসেছিল যবে,

তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তারি বিচিত্র সুর।"

এই ভাবেই যুগে যুগে বহু মানুষের ধারা মিলিত হ'য়ে ভারত এক মহাজাতির সৃষ্টি করেছে।

বিদেশাগত বিভিন্ন মানুষের সংমিশ্রণের ফলে চিরাচরিত চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজ-কাঠামো অনিবার্যভাবেই ভেঙে পড়ল। শক, পহ্লব, ব্যাকট্রীয় গ্রীক প্রভৃতি বিভিন্ন হানাদাররা ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে কালক্রমে ভারতীয় সমাজদেহে গেল মিশে। সৃষ্টি হল বর্ণসঙ্করের, বৃত্তিমূলক জাতিবৈষম্যও প্রসারলাভ করল। সমাজে গৃহীত হলেও এইসব নবাগত বিদেশীরা পতিত বা নীচজাতীয় ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত হল। মনুসংহিতায় এদের বলা হয়েছে "ব্রাত্য" (পতিত) ক্ষত্রিয়, পুরাণে এদের বলা হয়েছে জাতিচ্যুত "বর্বর ম্লেচ্ছ"। সমাজে পতিতরূপে গণ্য হলেও এই সব বিদেশী জাতির মানুষরা কিন্তু ভারতীয় সমাজেরই একটা বলিষ্ঠ অংশ রূপে পরিগণিত হল।

মৌর্যোত্তর যুগের সমাজব্যবস্থায় আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল নারীজাতির অবস্থার অবনতি। মনুসংহিতায় এই অবনতির পরিচয় পাওয়া যায়। নারীর জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় নাই। বাল্যে পিতামাতার অভিভাবকতা, যৌবনে ভর্তার অধীনতা, প্রৌঢ়ত্বে সন্তানের অধীনতা—এই ভাবে জীবনের সকল অবস্থাতেই নারীকে পরনির্ভরশীল করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মৌর্যোত্তর যুগে পরিবর্তন ঘটল। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং বণিক সম্প্রদায়ের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি। মধ্য ও এশিয়ার বাণিজ্যপথ নতুন ক'রে উন্মুক্ত হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটল। রোমান সাম্রাজ্য ও চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর জনৈক গ্রীক নাবিকের বিবরণ থেকে জানা যায়, সে যুগে সিন্ধু নদের মোহনা থেকে গঙ্গানদীর মোহনা পর্যন্ত সমগ্র উপকূলভাগে বহু সমৃদ্ধ বন্দর ছিল, যেমন সিন্ধুনদের মোহনায় 'বর্বরিকে' (Barbarice), 'বারিগাজা', 'ব্রোচ', 'সুপ্পারক' (সোপারা), 'মাসালিয়া' (মসুলিপত্তম্), গঙ্গার মোহনায় 'গঙ্গে' (Gange) বন্দর প্রভৃতি। এই সকল বন্দরের মাধ্যমে বিবিধ পণ্যের আদান-প্রদান চলত। সে সময় রোমের অভিজাত সমাজে ভারতে প্রস্তুত বিলাসদ্রব্যের বিশেষ সমাদর ছিল। এই বিলাসদ্রব্যের মধ্যে ছিল নিম্ন গঙ্গা-উপত্যকা অঞ্চলের মসলিন, মসলাদ্রব্য, রেশম, মণিমুক্তা প্রভৃতি। রোমান লেখক প্লিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, শুধু বিলাসসামগ্রী আমদানি করতেই প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রা রোম

থেকে ভারতে চালান যায়। রোমক সম্রাটদিগের প্রভাবেই ব্যাকট্রীয় গ্রীক ও কুষাণ যুগে ভারতেও সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়।

গ্রীক লেখকদিগের কেউ কেউ সে যুগে দাসত্ব প্রথার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কেউ কেউ আবার ভিন্ন তথ্য প্রদান করেছেন, যা থেকে দাসত্ব প্রথার অনস্তিত্বই প্রমাণিত হয়।

মৌর্যোত্তর যুগে সাধারণ মানুষ মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—কৃষক, মেষপালক ও শিকারী। অধিকাংশ মানুষ কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। এই শ্রেণীর মানুষ সাধারণতঃ শহরের বাইরে গ্রামে বাস করত। উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ এদের রাজকররূপে প্রদান করতে হত। এই কর 'বলি' নামে উল্লিখিত হয়েছে। জনৈক শক নৃপতি (রুদ্রদামন) উল্লেখ করেছেন, জরুরী সময়েও তিনি বেগার বা অতিরিক্ত সেস্ বা অন্য কোন দানদক্ষিণা গ্রহণ করেন নাই। একটি পহ্লব দলিল থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত উদ্যানভূমি অতিরিক্ত কর প্রদান থেকে মুক্ত থাকত। লবণ, চিনি, কাষ্ঠ, তৃণ, সব্জি, পুষ্প প্রভৃতিও কর প্রদানের দায় থেকে রেহাই পেত।

কীট-পতঙ্গাদি দ্বারা শস্য যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য জরুরী সময়ে শস্য গোলা তৈরি করা হত। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে মেষপালক ও শিকারীরা তাঁবুতে থেকে পাহারা দিত।

রাজকোষের আয়ের একটা অংশ আসত কৃষকদিগের প্রদত্ত রাজস্ব থেকে। কিন্তু বৃহদংশ আসত বাণিজ্য শুল্ক থেকে। অনুশাসন ও নানা লিখিত সূত্র (নাগার্জুনীকোণ্ডা অনুশাসন ও মিলিন্দ পঞ্হো) থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে চীন, হেলেনীয় দুনিয়া (গ্রীস ও পার্শ্ববর্তী এলাকা), সিংহল ও বহির্ভারতের নানা দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম উপকূলের ব্রোচ বন্দরটি ছিল তখন আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের প্রধান কেন্দ্র। ভারতে আমদানি-করা পণ্যের মধ্যে ছিল রৌপ্যপাত্র, সুপেয় মদ্য, সূক্ষ্ম পরিধেয় বস্ত্র এবং দেহের অনুলেপন দ্রব্যাদি। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম মস্‌লিন ও রেশম প্রভৃতি।

এ যুগে সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ই সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত। কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ করভারে জর্জরিত ছিল। তখন বাধ্যতামূলক বেগার খাটানোর প্রথাও প্রচলিত ছিল।

শিল্প-বাণিজ্য ঃ

মৌর্যোত্তর যুগে উল্লেখযোগ্য শিল্পোন্নতি ঘটেছিল। গ্রীক লেখকদিগের বিবরণ থেকে জানা যায়, সে সময় ভারতে উন্নত ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মিত হত, অস্ত্রশিল্প ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পও উন্নত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক স্ট্র্যাবো লিখেছেন, তখন অভিজাত সমাজে স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তর খচিত পোশাক প্রচলিত ছিল। রোমান সাম্রাজ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কার্পাস বস্ত্র ও রেশম-নির্মিত আচ্ছাদনী যথেষ্ট সমাদৃত হত।

তখন আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান যথেষ্ট ছিল। এথেন্স ও আলেকজান্ড্রিয়ার বিপণিতে ভারতীয় দার্শনিক, বণিক্ ও নানা প্রকার আগন্তুকের দেখা পাওয়া যেত। ভারতীয় মুদ্রায় গ্রীক প্রভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

গান্ধার শিল্প ঃ

কুষাণ্ আমলে গান্ধার শিল্পের বিকাশ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। গ্রীক, রোমান ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পরীতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল এই নতুন শিল্পরীতি। গ্রীক দেবতাদের প্রতিকৃতির অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে এই শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। কুষাণ্ আমলে নির্মিত বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের প্রস্তরনির্মিত মূর্তিগুলিতে গ্রীক-রোমান শিল্পরীতির প্রভাব বিশেষভাবেই লক্ষিত হয়। গান্ধার অঞ্চলে আবিষ্কৃত হওয়ার জন্যই গান্ধার শিল্পের ওইরূপ নামকরণ হয়েছে। মথুরা ও অমরাবতীর শিল্পকেন্দ্রে গান্ধার শিল্পের প্রভাব স্পষ্টতঃই রয়ে গেছে।

মৌর্য যুগের শিল্পকলা ঃ

মৌর্যযুগের শিল্পকলা বর্ণনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "আরাম ও বিলাসের জীবনই শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে অনুকূল এবং আলোচ্যমান যুগে (অর্থাৎ মৌর্যযুগে) এ দুয়েরই আশ্চর্যরকম উন্নতি ঘটেছিল।" বস্তুতঃ মৌর্যযুগে যে রাজনৈতিক ঐক্য, শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা এক সৃজনমূলক প্রেরণার উৎসরূপে কাজ করেছিল। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী শিল্পের প্রধান উপজীব্য হল ধর্মীয় প্রেরণা। শিল্পের ঐতিহ্য অনুযায়ী শিল্পের বিকাশে এই ধর্মীয় প্রেরণা অশোকের আমলে বিশেষভাবেই প্রকট হয়। তাঁর সময়ে শিল্পকলার চারটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য। এই চারটি হল স্তূপ, স্তম্ভ, গুহা ও প্রাসাদ নির্মাণে নৈপুণ্য। স্তূপগুলি ছিল প্রস্তরে অথবা ইষ্টকে নির্মিত, সুদৃঢ় গম্বুজাকৃতি ও বৃহদায়তন। জনশ্রুতিতে অশোকের আমলে ৮৪০০০ স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। এই সংখ্যা অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই, কিন্তু চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ও তাঁর সময়ে (সপ্তম শতকের প্রারম্ভে) এদেশে নানা স্থানে বহু স্তূপ দেখতে পেয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন বিখ্যাত সাঁচী স্তূপ অশোকের দ্বারাই নির্মিত হয়েছিল।

প্রস্তর-নির্মিত 'ধর্মস্তম্ভ'গুলিই অশোকের শিল্পকীর্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ঐতিহাসিক ডঃ স্মিথ অশোকস্তম্ভগুলির গাত্রের মসৃণতার প্রশংসা ক'রে লিখেছেন, "প্রাচীনকালে অন্যকোন দেশে প্রাণীদেহের ভাস্কর্যের উৎকৃষ্টতর, এমন কি সমকক্ষ নিদর্শন পাওয়াও কঠিন।" তিনি মনে করেন এরূপ শিল্পোৎকর্ষ বর্তমানের শিল্পীদেরও ক্ষমতার বাইরে। তোপরা স্তম্ভের পালিশ এত চমৎকার যে কেউ কেউ এই প্রস্তরস্তম্ভকে ধাতুনির্মিত মনে করে ভুল করেন। অশোকস্তম্ভের মধ্যে লৌড়িয়

নন্দনগড়ের স্তম্ভটিকে অনেকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করেন। বারাণসীর নিকটে সারনাথ স্তম্ভটিও দর্শকদের মুগ্ধ করে। এই স্তম্ভের শীর্ষদেশে রয়েছে পরস্পর-বিপরীতমুখী চারটি সিংহমূর্তি যার নিম্নে আছে ধর্মচক্র ও ঘণ্টাকৃতি পদ্ম (উল্টিয়ে দেওয়া)। সারনাথ স্তম্ভের শীর্ষভাগের সিংহমূর্তিসহ ধর্মচক্রটিই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতীক রূপে গৃহীত হয়েছে। অখণ্ড প্রস্তরে নির্মিত অশোকস্তম্ভগুলির আলঙ্কারিক বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বৃষচিহ্নিত রামপুরবা স্তম্ভ ও হস্তী-চিহ্নিত সংকীশ স্তম্ভদুটি স্থাপত্যে তামার ব্যবহারের সুন্দর নিদর্শন।

অশোক স্তম্ভ

অশোক ও তাঁর উত্তরাধিকারী দশরথের সময়ে গুহানির্মাণ শিল্পের বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। বরাবর গুহা, নাগার্জুন গুহা, কর্ণচোপর গুহা প্রভৃতি এ যুগের গুহাশিল্পের নিদর্শন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই গুহাগুলি নির্মিত হত মঠবাসী বৌদ্ধভিক্ষুদিগের বাসস্থানের জন্য।

প্রাসাদ ও গৃহনির্মাণ শিল্পেও মৌর্যযুগের শিল্পীরা যথেষ্ট উৎকর্ষ অর্জন করেছিলেন। গ্রীক লেখকদিগের বর্ণনা থেকে জানা যায়, মৌর্য আমলের প্রাসাদ শিল্প পারসিক প্রাসাদশিল্পকেও হার মানিয়েছিল। মেগাস্থিনিস্ লিখেছেন, মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্র নগরী সোনা ও রূপার সূক্ষ্ম কাজের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। পাটলিপুত্র ছাড়াও উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী প্রভৃতি অনান্য বৃহৎ নগরগুলিও অনুরূপভাবে তোরণ, গম্বুজ ও প্রাসাদ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। মার্শাল প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মৌর্য স্থাপত্যকলায় গ্রীক-পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন কিন্তু হ্যাভেল প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁদের মতে এযুগেও ভারতীয় শিল্প ছিল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ।

মৌর্যযুগের শেষদিকে প্রস্তরের ব্যবহার চালু হলেও এ যুগের অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠনির্মিত ছিল এবং এই জন্যই এ সবের সামান্য অংশই টিকে আছে। সাম্প্রতিক খননকার্যের ফলে প্রাচীন পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের ও শত স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহের অংশবিশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

[৬] ভারতে কুষাণ্ অধিকার

গণ্ডোফার্নেসের মৃত্যুর পর (আঃ ৪৫ খ্রীঃ) পহ্লবরা ক্রমেই হীনবল হয়ে পড়ে, অবশেষে নবাগত কুষাণ্ আক্রমণকারীদের দ্বারা পরাজিত হয়। জনেক গ্রীক নাবিকের লিখিত পুস্তক ('Periplus of the Erythrean Sea', c. 81-96 A.D.) থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধে পার্থিয়ান শাসকগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে

সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইতিমধ্যে মধ্যএশিয়ায় চীনের ভূখণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। খ্রীঃ পূঃ ১৬৫ অব্দে ইউয়ে-চি নামক এক জাতি হিউং-নু (পরবর্তী কালে হূণ নামে পরিচিত) অপর এক যাযাবর জাতি কর্তৃক চীন সীমান্তের মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়। অক্ষু (Oxus) নদীর তীরে শক ও বহ্লীক গ্রীকদের উচ্ছেদ করে তারা সেখানে নিজেদের বসতি স্থাপন করল (আঃ ৫০ খ্রীঃ)। এই 'ইউয়ে-চি'দের কুষাণ ('Kuei-Shaung') নামে একটি শাখা 'Kian-tsien-K'io' বা 'Kujula Kadphises' বা প্রথম কদ্‌ফিসের নেতৃত্বে আঃ ৪০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে কাবুল উপত্যকা ও আরাকোসিয়ায় অধিকার স্থাপন করে। প্রথম কদ্‌ফিসের একটি মুদ্রায় তাঁকে রাজমর্যাদাজ্ঞাপক মুকুট পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁর নামের পাশে 'মহারাজ', 'মহন্ত', 'মহারাজাধিরাজ', 'সত্যধর্মস্থিত' প্রভৃতি আখ্যাও ব্যবহৃত হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন সম্ভবতঃ ভারতে তাঁর নববিজিত রাজ্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই এই মুদ্রাগুলি প্রস্তুত হয়েছিল। এই মুদ্রাগুলি থেকে কুষাণদিগের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

প্রথম কদ্‌ফিসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উইয়েমো (ওয়েমো, বাংলা বিম) বা দ্বিতীয় কদ্‌ফিস (চীনা ঐতিহাসিকদের ভাষায় 'ইয়েন কাউ-চিং') আঃ ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মৃত্যুকাল (আঃ ৭৮ খ্রীঃ) পর্যন্ত তিনি ভারতের অভ্যন্তরে কুষাণ আধিপত্য সম্প্রসারণে ব্যস্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ পূর্বদিকে যমুনাতীরে মথুরা পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। বিম কদফিস্ ও তাঁর বংশধরদের রাজত্বকালের প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় কুষাণ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমৃধির একটা কারণ ছিল কুষাণ সাম্রাজ্যের বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থিতি। এক দিকে (পূর্বে) চীন সাম্রাজ্য, অপর দিকে (পশ্চিমে) রোমান সাম্রাজ্য—এই দুই বৃহৎ সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক পথের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় কুষাণ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়ে কুষাণ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য সম্বন্ধে জানা যায়, ভারতীয় ও বিদেশী বণিকরা ভারত থেকে সূক্ষ্ম মস্‌লিন বস্ত্র, রেশম, মসলাদ্রব্য, মণিমুক্তা, পশুপাখি ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি করত এবং সেই উপলক্ষে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা ভারতে আমদানি হত। এই জন্যই রোমান লেখকেরা যথেষ্ঠ আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, বিলাসদ্রব্যের আমদানির জন্য প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা রোম থেকে ভারতে চলে যায়। রোমান সম্রাটদিগের স্বর্ণমুদ্রার অনুকরণে কুষাণ সম্রাটগণও প্রচুর স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন।

দ্বিতীয় কদ্‌ফিসের মুদ্রায় 'মহেশ্বর', 'বৃষভ' ও শিবের স্মারক ত্রিশূল বা রণকুঠার দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় তিনি শিবোপাসক ছিলেন।*

* তাঁর সময়ের খরোষ্ঠী অনুশাসনে নিম্নোক্ত কথা কয়টি তাৎপর্যপূর্ণ—Mahārājasa rājatirāyasa sarvaloga-isvarasa mahisvarasa Vima Kathphisasa trādāra (last word meaning defender or saviour).

কণিষ্ক ঃ

বিম (দ্বিতীয়) কদ্‌ফিসের পর কুষাণদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি কণিষ্ক (১ম) সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্ববর্তী কদ্‌ফিস্ রাজাদিগের সঙ্গে কণিষ্কের সম্পর্ক জানা যায় না। কণিষ্কের সিংহাসনারোহণের তারিখ নিয়েও মতভেদ বিদ্যমান। ডঃ ভিনসেন্ট স্মিথ্ ও তাঁর মতাবলম্বী ঐতিহাসিকগণ মনে করেন কণিষ্ক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের দ্বিতীয় পাদে ১২৫-১২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন এবং তিনি ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে যে শকাব্দ প্রচলিত হয় তা প্রবর্তিত হয়েছিল দ্বিতীয় কদ্‌ফিসের সময়ে, কণিষ্কের সময়ে নয়। কিন্তু পরবর্তী ঐতিহাসিকদিগের মতে কণিষ্কের সিংহাসনারোহণের প্রথম বর্ষে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শকাব্দ প্রচলিত হয়েছিল। এই অব্দটিকে শকাব্দ রূপে অভিহিত করার কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন সম্ভবতঃ ভুলক্রমেকণিষ্ককে 'শক' মনে করা হয়েছিল, যদিও তিনি ছিলেন 'কুষাণ্'। (এর কারণ, ওই সময়ে আগত প্রায় সকল বিদেশীকেই ভারতীয়রা 'শক' আখ্যা দিতেন)। দ্বিতীয়তঃ, মালব ও গুজরাটের পশ্চিমী শক ক্ষত্রপেরা এই অব্দটি দীর্ঘদিন ব্যবহার করায় এটি 'শক নৃপ-কাল' রূপে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া অল্‌বিরুণী (একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মাহ্‌মুদের সঙ্গে আগত মুস্‌লিম পণ্ডিত) যে অব্দগুলির তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে দ্বিতীয় শতকে প্রবর্তিত কোন অব্দের উল্লেখ নেই)। এই সব নানা কারণে ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে কণিষ্কের সিংহাসনারোহণের বৎসরে (৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) শকাব্দ প্রবর্তিত হয়েছিল। অন্যান্য (চীনা) সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকেও সমর্থিত হয় যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই কণিষ্ক রাজত্ব করেছিলেন।

মথুরায় প্রাপ্ত কণিষ্কের মস্তকবিহীন মূর্তি

কণিষ্কের সাম্রাজ্যের আয়তন ঃ

কণিষ্কের রাজধানী ছিল গান্ধারের পুরুষপুর বা পেশোয়ার। কণিষ্কের বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপিতে রচিত অনুশাসন থেকে জানা যায় সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিস্তৃত। কাশ্মীর, সমগ্র পাঞ্জাব এবং পাটনা পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপত্যকা তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কণিষ্কের জীবিত কালে এই সাম্রাজ্যের আয়তন হ্রাস পেয়েছিল

এমন কোন প্রমাণ নেই। জানা যায়, কণিষ্ক তাঁর রাজ্যের পশ্চিমদিকে পার্থিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছিলেন। পূর্ব তুর্কীস্থানের অন্তর্গত কাশগড়, খোটান ও ইয়ারখন্দের উপজাতি-প্রধানদের নিকট কর ও প্রতিভূ আদায় করবার উদ্দেশ্যে তিনি সসৈন্যে পামির মালভূমি অতিক্রম করেছিলেন। চীনা ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা

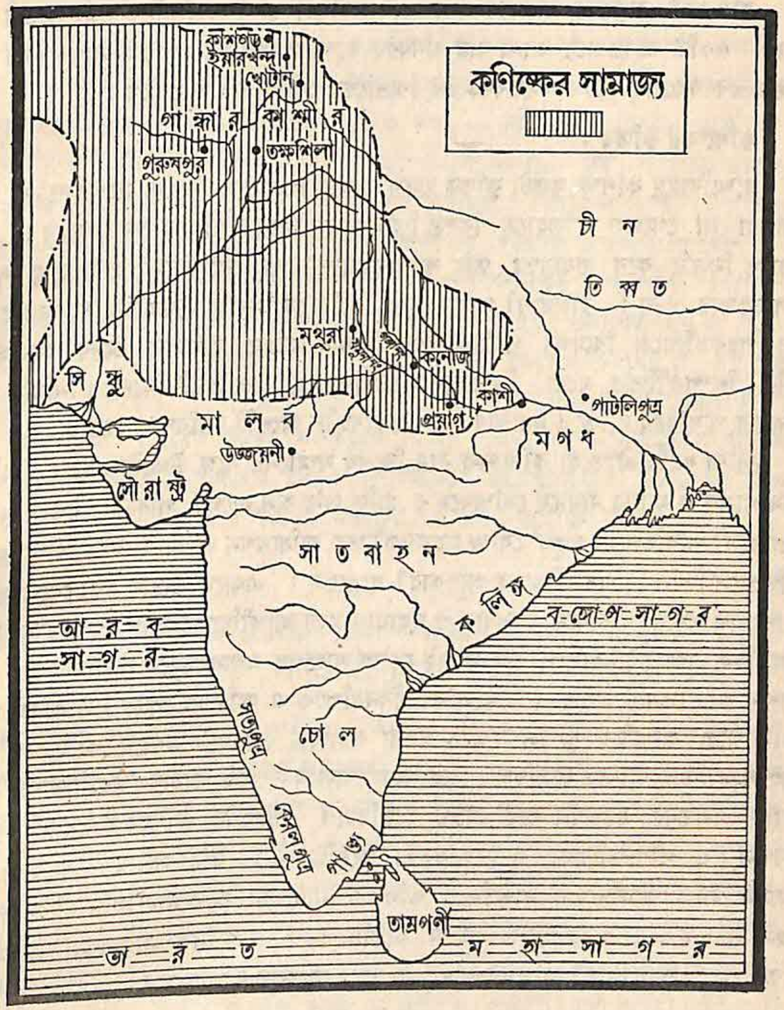

যায় চীন সম্রাট হো-টির (৮৯-১০৫ খ্রীঃ) বিখ্যাত সেনাপতি প্যান চাওয়ের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল এবং প্রথম দিকে তিনি সাফল্যলাভ করেছিলেন কিন্তু পরে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত তুর্কীস্থানের অধিকৃত অঞ্চলগুলির উপর তিনি আধিপত্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। চীনা লেখকদের প্রদত্ত তথ্য

থেকে প্রমাণিত হয়, কণিষ্ক প্রথম শতাব্দীতে প্যান চাওয়ের সমসাময়িক ছিলেন এবং ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শকাব্দের প্রবর্তক হিসাবে অনেক ঐতিহাসিক তাঁর সম্বন্ধে যে মত পোষণ করেন চীনা লেখকদিগের বিবরণে তার আরও একটি প্রমাণ মিললো।

কণিষ্কের রাজত্বের অবসান কিরূপে ঘটেছিল সে বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। একটি জনপ্রবাদে জানা যায় অনবরত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তাঁর সৈন্যগণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং বিদ্রোহ করে। সম্ভবতঃ এই বিদ্রোহের ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কণিষ্কের কৃতিত্ব ঃ

যুদ্ধবিগ্রহে কণিষ্ক কতটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহাতীত তথ্য পাওয়া না গেলেও ইতিহাসে কিন্তু তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন অন্য কারণে। তাঁর খ্যাতি নির্ভর করে প্রধানতঃ তাঁর স্থাপত্যকীর্তি এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। রাজধানী পুরুষপুরে তিনি যে বিশাল চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন তা পরবর্তীকালে বিদেশী পর্যটকদিগের বিস্ময়-মিশ্রিত প্রশংসার উদ্রেক করেছিল। তাঁর শিল্পকীর্তির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল তাঁরই নির্দেশে নির্মিত তাঁর নিজের পূর্ণাবয়ব মূর্তি (মথুরায় যার মস্তকবিহীন অংশটি আবিষ্কৃত হয়েছে)।

বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্যে কণিষ্কের নাম বিশেষ সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। বিভিন্ন অনুশাসন ও মুদ্রার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজধানী পুরুষপুরে চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসংগীতির অধিবেশন আহ্বান করে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কণিষ্কের সময়ে বৌদ্ধধর্মে হীনযান ও মহাযান মতাবলম্বীদিগের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল এবং এই মহাসংগীতির ফলেই বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ যথাযথভাবে পরীক্ষিত হয় এবং নতুন করে তিনটি অংশে (সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক) সংকলিত হয়। জানা যায়, কাশ্মীরে কুণ্ডলবন মঠে অথবা জলন্ধরে কুবনমঠে অশ্বঘোষের সভাপতিত্বে এই সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই মহাসম্মেলনে সংস্কৃত ভাষায় "মহাবিভাষা" নামে বৌদ্ধ দর্শনের একখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী কণিষ্ক বিদ্বান্ ও পণ্ডিতদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁর সভায় বিশেষ সম্মানের আসন লাভ করেছিলেন দার্শনিক, কবি ও নাট্যকার অশ্বঘোষ যিনি বুদ্ধচরিত ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দার্শনিক নাগার্জুন, চিকিৎসক চরক প্রমুখ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ কণিষ্কের সভা অলংকৃত করেছিলেন।

কণিষ্কের বংশধরগণ ঃ

কণিষ্ক সম্ভবতঃ ২৩/২৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাশিষ্ক (বাঝেষ্ক নামেও পরিচিত), হুবিষ্ক, জুষ্ক ও কণিষ্ক (দ্বিতীয়) পর পর সিংহাসন লাভ করেছিলেন। এই সময় কুষাণদিগের ক্ষমতার প্রধান কেন্দ্র ছিল মথুরা এবং এই সময়ে তাঁরা "রাজাধিরাজ", "দেবপুত্র", "কৈশর" (Caesar) ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ

করেছিলেন। শেষ বিখ্যাত কুষাণ নৃপতি ছিলেন বাসুদেব (১ম) যিনি কণিষ্ক অব্দের ৭৪-৯৮ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। তাঁর মুদ্রায় শিবের মূর্তি মুদ্রিত থাকত। তা থেকেই বোঝা যায় তিনি ছিলেন শৈব।

কুষাণ্ যুগে ভারতীয় সভ্যতা ঃ

কুষাণদিগের শাসনকাল নিঃসন্দেহে ভারতীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এই প্রথম উত্তর ভারতে আবার একটি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল যার সীমা ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ধর্ম, সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কুষাণ যুগে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম, গান্ধার শিল্প ও বুদ্ধ-মূর্তির আবির্ভাব এ যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কুষাণ্ নৃপতি বাসুদেব কবিদিগের পৃষ্ঠপোষক ও বিদ্বজ্জনের "সভাপতি" ছিলেন। অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের আবির্ভাব থেকে প্রমাণিত হয় এ যুগে সাহিত্যের প্রভুত উন্নতি হয়েছিল। ধর্মপ্রচারের দিক থেকেও কুষাণযুগে লক্ষণীয় উন্নতি ঘটে। শৈবধর্ম ও কার্তিকেয় মতবাদের বিকাশ, মহাযান বৌদ্ধমতের বিকাশ এবং মিহির ও বাসুদেব কৃষ্ণের মতবাদের বিকাশ ও কাশ্যপ মাতঙ্গের মাধ্যমে (খ্রীঃ ৬১-৬৭) চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কণিষ্কের বংশ মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের পথ প্রশস্ত করেছিল সন্দেহ নাই।

[চ] সাতবাহন সাম্রাজ্য—সাম্রাজ্যের বিস্তার—সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির কৃতিত্ব

মহারাষ্ট্রের সাতবাহনদিগের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে পরস্পর-বিরোধী বিবরণ পাওয়া যায়। একটি বিবরণ অনুযায়ী এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিমুক (মতান্তরে শিশুক) যিনি "শুঙ্গ আধিপত্যের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করে ক্ষমতা অধিকার করেন।" সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ইনি রাজত্ব করেছিলেন। পুরাণে সাতবাহনদের 'অন্ধ্র'রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে কৃষ্ণা-গোদাবরী উপত্যকায় তেলেগু অঞ্চলে ক্ষমতা করায়ত্ত করবার পর সাতবাহনরা 'অন্ধ্র'রূপে পরিচিত হয়েছিল।

সাতবাহন বংশের তৃতীয় নৃপতি প্রথম সাতকর্ণির আমলে এরা প্রথম শক্তিশালী হয়ে উঠেন। প্রথম সাতকর্ণি পূর্ব মালবসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। গোদাবরী তীরে পৈঠান বা প্রতিষ্ঠান ছিল তাঁর রাজধানী। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রথম দিকে পশ্চিম ভারতের ক্ষহরাত শাখার শক ক্ষত্রপরা সাতবাহনদের কাছ থেকে মহারাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল অধিকার করে নেয়।

গোতমীপুত্র সাতকর্ণি ঃ

উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি গোতমীপুত্র সাতকর্ণি সাতবাহন বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি শক্তিশালী পশ্চিমী ক্ষত্রপশাসক নহপানকে পরাজিত করেন এবং শক, যবন (গ্রীক) ও পহ্লবদিগের বাধা চূর্ণ করেন (তাঁকে বলা হয়েছে 'শক-যবন-পহ্লব-নিষূদন' এবং 'সাতবাহন-কুল যশ-প্রতিষ্ঠাপন-কর')। নাসিক প্রশস্তিতে উল্লিখিত আছে গোতমীপুত্র সাতকর্ণি নহপানের জামাতা ও দক্ষিণ প্রদেশের শক শাসনকর্তা ঋষভদত্তের অধীনতা থেকে মুক্ত করে কিছু ভূখণ্ড দান করেছিলেন। শিলালিপিতে আছে গোতমীপুত্র তাঁর বিজয়-বাহিনীর তাঁবু থেকে এই দানের আদেশ প্রদান করেন। এ থেকে অনুমান করা যায় তিনি যুদ্ধজয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যের উধ্বাংশ, মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারতে আধিপত্য লাভ করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে নাসিক প্রশস্তিতে বলা হয়েছে, 'ত্রিসমুদ্র তোয়পীত-বাহন' অর্থাৎ তাঁর অধীন বাহন, যেমন যুদ্ধাশ্ব ইত্যাদি তিন সমুদ্রের (বঙ্গোপ-সাগর, ভারতমহাসাগর ও আরবসাগর) বারি পান করেছিল। এই প্রশস্তি থেকে আরও জানা যায় নহপানকে পরাজিত করে গোতমীপুত্র 'অপরান্ত, অনূপ, সুরাষ্ট্র, কুকুর, আকর, অবন্তী' প্রভৃতি জয় করেছিলেন। ফলে তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এসেছিল দক্ষিণে কৃষ্ণা থেকে উত্তরে মালব-সৌরাষ্ট্র এবং পূর্বে বিদর্ভ থেকে পশ্চিমে কোঙ্কন পর্যন্ত অঞ্চল। গোদাবরী তীরে অস্মক, মূলক প্রভৃতি অঞ্চল তিনি অধিকার করেছিলেন। রাজধানী পৈঠানের সন্নিহিত জেলাগুলি ছাড়াও উত্তর কোঙ্কন, কাথিয়াবাড়, মালব, বিদর্ভ প্রভৃতি সহ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাতবাহন সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। তবে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন অন্ধ্রদেশ ও দক্ষিণ কোশল হয়ত তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই। সে যাই হোক, গোতমীপুত্র যে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিছু আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে গোতমীপুত্র সম্ভবতঃ ১০৬ খ্রীষ্টাব্দের পর ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন এবং অন্ততঃ ২৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।* সমসাময়িক শিলালিপিতে উল্লিখিত হয়েছে; গোতমীপুত্র ক্ষত্রিয়দিগের দর্প চূর্ণ ক'রে 'দ্বিজ'দিগের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন, নিম্নবর্ণের মানুষের স্বার্থও তিনি রক্ষা করেছিলেন। গোতমীপুত্রের চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায়, তিনি ছিলেন সুপুরুষ এবং নির্ভীক। শত্রুকেও তিনি সহজে আঘাত করতেন না। সৎ এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের তিনি ছিলেন আশ্রয়স্থল। তিনি সকল নৃপতির নিয়ন্তা, রাজাধিরাজ, সমাজসংস্কারক ও প্রজাবৎসল ছিলেন। গোতমীপুত্র সাতকর্ণিকে কেউ কেউ 'বিক্রমাদিত্য' আখ্যায় ভূষিত করতে আগ্রহী কিন্তু ঐতিহাসিকগণ এই মত সমর্থন করেন না।

গোতমীপুত্রের পর তাঁর পুত্র বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ী (১৩০-১৫৯ খ্রীঃ) গোদাবরী তীরে পৈঠানে রাজত্ব করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর ভ্রাতা বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণি

* অন্য মতে গোতমীপুত্র আঃ ৮০-১০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু বৈবাহিক বন্ধনের ফলেও সাতবাহনদিগের সঙ্গে শকক্ষত্রপদিগের শত্রুতার অবসান হয় নাই এবং রুদ্রদামনের হস্তে সাতকর্ণি দুবার যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। জানা যায় মনুসংহিতা এই যুগেই রচিত হয় এবং এই সময় নানা বিদেশী জাতির সঙ্গে বিধিবহির্ভূত মেলামেশার ফলে সমাজে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হয়।

সাতবাহন বংশের শেষ বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি (আঃ ১৬৫-১৯৪ খ্রীঃ)। নিঃসন্দেহে বলা যায় মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশ তাঁর কর্তৃত্বাধীন ছিল। শিলালিপি থেকে জানা যায় তিনি নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং রুদ্রদামনের বংশধরদিগের নিকট থেকে উত্তর কোঙ্কন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। পরবর্তী সাতবাহনরা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, পরে তারা নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

[ছ] গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস (৩২০-৫০০ খ্রীঃ)

গুপ্ত বংশের উত্থান—প্রথম তিনজন গুপ্তশাসক—সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত **ও প্রথম কুমারগুপ্ত**—স্কন্দগুপ্ত এবং হূণ আক্রমণ

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘ একটা কালপর্ব জুড়ে রাজনৈতিক ভাঙচুরের যুগ চলে। এই অবস্থাটা টিকে ছিল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত। এরপর নতুন এক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য, গুপ্তসাম্রাজ্যের পত্তন হয়।

গুপ্তবংশের উত্থান : প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

যেমন একবার ঘটেছিল মৌর্য যুগে তেমনি আরও একবার খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের সূচনায় মগধ পরাক্রান্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের নতুন এক রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠল। গুপ্ত রাজবংশের প্রথম দিককার রাজাদের সম্বন্ধে জানা যায় অল্পই। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'মহারাজা' উপাধিধারী শ্রীগুপ্ত। মনে হয় গুপ্ত রাজবংশের আসল ইতিহাস শুরু হয়েছিল শ্রীগুপ্তের পুত্র 'মহারাজা' শ্রীঘটোৎকচ গুপ্তের আমল থেকে। দুঃখের বিষয় গুপ্তদের আদি রাজ্য ও তার সীমানার কথা জানা যায় না। কিছু কিছু ইতিহাসবেত্তা মনে করেন যে মগধরাজ্যের সীমানাই ছিল ওই রাজ্যের সীমানা, আবার অন্যেরা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অংশবিশেষকেও ওই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন। বস্তুতঃ উৎকীর্ণ লিপির যথাযথ তথ্যের অভাবের ফলেই এই অনিশ্চয়তা এখনও রয়েছে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি সংহত করার কাজ শুরু হয় বংশের তৃতীয় শাসক প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে। ইনিই মর্যাদাজ্ঞাপক 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি প্রথম ব্যবহার করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সূচনা (খ্রীঃ ৩২০) থেকে গুপ্তাব্দ বা গুপ্ত সংবৎ প্রবর্তিত হয়। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি (এলাহাবাদ প্রশস্তি) থেকে জানা যায় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মহিষী কুমারদেবী ছিলেন লিচ্ছবিবংশীয়া ক্ষত্রিয় রাজকন্যা এবং সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন তাঁরই সন্তান। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন মগধে গুপ্তবংশের উত্থানের মূলে ছিল শক্তিশালী লিচ্ছবিদের সঙ্গে গুপ্তদের বিবাহসূত্রে

মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন। শক্তিশালী প্রজাতান্ত্রিক লিচ্ছবিবংশের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন গুপ্ত বংশীয়দিগের রাজশক্তি সংহত করে তুলতে নিশ্চয়ই বেশ কিছুটা কাজে লেগেছিল। সম্ভবতঃ গুপ্ত ও লিচ্ছবি এই দুই বংশের মিলিত শক্তি গুপ্ত রাজাদের অধীনে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যগঠনে সহায়ক হয়েছিল।

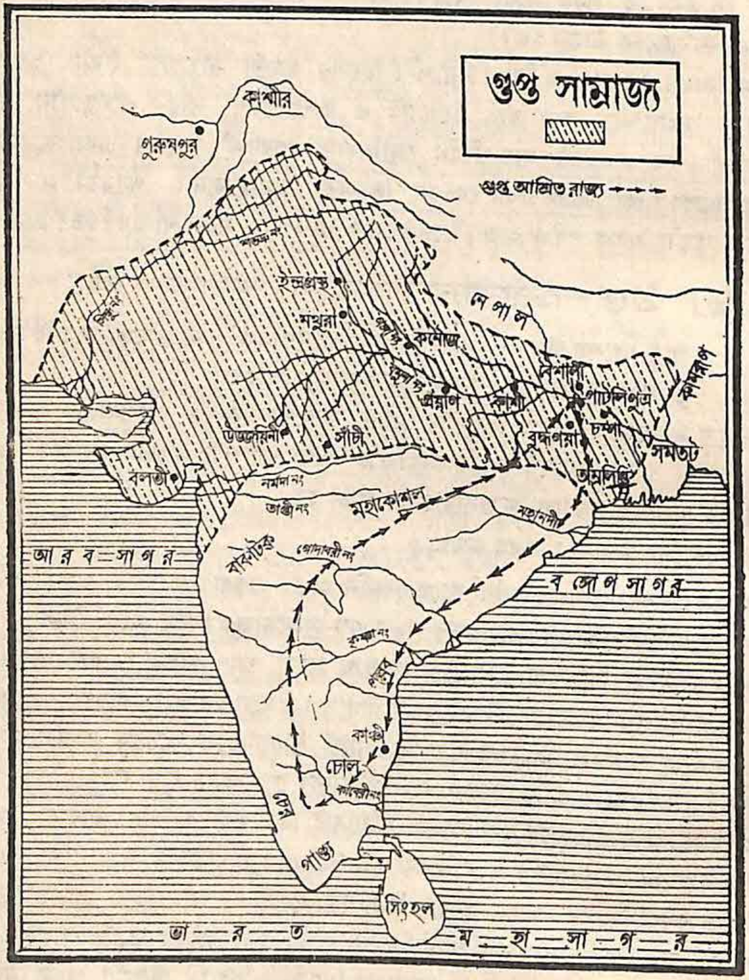

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় : উত্তরভারত জয়

সমুদ্রগুপ্ত ৩৩০ থেকে ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজ্যজয়ের কৃতিত্ব এবং অন্যান্য কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাপদ্ম নন্দ এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ন্যায় তিনিও মগধকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ঐক্যসাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর

চমকপ্রদ দিগ্বিজয়ের বিবরণ তাঁর সভাকবি হরিষেণ বিরচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'তে পাওয়া যায়। এলাহাবাদে উৎকীর্ণ স্তম্ভ-লিপিতে কবি হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত রাজন্যবর্গ ও রাজ্যসমূহের নামের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই তালিকা থেকে জানা যায় সমুদ্রগুপ্ত 'আর্যাবর্তে'র (গাঙ্গেয় উপত্যকার) নয় জন এবং 'দাক্ষিণাপথের' বারোজন রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বশীভূত করেছিলেন। আর্যাবর্তের পরাভূত রাজ্যসমূহের শাসনাধীন ভূখণ্ডগুলি গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক বিজিত এই রাজ্যগুলির সবকটির অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণীত না হলেও এদের অনেকগুলিরই অবস্থান মোটামুটিভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের যে রাজাদের উচ্ছেদ করেছিলেন তাঁরা হলেন—'রুদ্রদেব' (সম্ভবতঃ বাকাটক বংশীয় ১ম রুদ্রসেন), 'মতিল' (উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহর অঞ্চলের শাসক), 'নাগদত্ত' (সম্ভবতঃ একজন নাগবংশীয় রাজা), 'চন্দ্রবর্মণ' (সম্ভবতঃ বাঁকুড়া জেলার পুষ্করণ বা পোখরণের শাসক), 'গণপতি নাগ' (মথুরার নাগবংশীয় শাসক), 'নাগসেন' (পদ্মাবতী রাজ্যের নাগশাসক), 'অচ্যুত' (যুক্তপ্রদেশের বেরিলী জেলার অহিচ্ছত্রার শাসক), 'নন্দ' (সম্ভবতঃ একজন নাগ রাজা), 'বলবর্মণ' (সম্ভবতঃ আসামের একজন রাজা) এবং আর্যাবর্তের অন্যান্য রাজন্যবর্গ। সমুদ্রগুপ্ত 'কোটা'র (সম্ভবতঃ পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলের) একটি প্রভাবশালী পরিবারের প্রধানকেও বন্দী করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক বিজিত রাজ্যগুলি সমগ্র উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের একাংশ এবং দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধিকৃত রাজ্যগুলি সম্রাটের নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদিগের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন করা হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়, উত্তর ভারতে সমুদ্রগুপ্তের অভিযানগুলি সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর সাম্রাজ্যেরই সন্নিহিত গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে। এলাহাবাদ লিপিতে উল্লিখিত গুপ্তরাজ কর্তৃক অধিকৃত আরণ্যরাজ্যগুলি সম্ভবতঃ নর্মদা ও মহানদীর উপত্যকায় উপজাতি-অধ্যুষিত ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের দাক্ষিণভারত জয় ঃ

উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতেও সমুদ্রগুপ্তের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। প্রথমে তিনি দক্ষিণ কোশলের রাজা মহেন্দ্রকে পরাজিত করেন। তারপর গোদাবরী নদীর নিকটবর্তী উড়িষ্যার দক্ষিণাঞ্চলের রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করান, এরপর তিনি পরাস্ত করেন কাঞ্চীর পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপকে। এলাহাবাদ লিপিতে উল্লিখিত দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজাদের এখনও সনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই। সমুদ্রগুপ্তের দাক্ষিণী অভিযানগুলি সম্ভবতঃ মধ্যপ্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ, উড়িষ্যা এবং দাক্ষিণাত্যের উপকূল ভাগে কাঞ্চী পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের পরাজিত অন্যান্য নৃপতিদিগের মধ্যে ছিলেন 'মহাকান্তারে'র অধিপতি ব্যাঘ্ররাজ (সম্ভবতঃ মধ্যভারতের বনভূমিতে অবস্থিত), 'কৌরলের' মন্তরাজ (সম্ভবতঃ শোণপুর অঞ্চলে), 'কোত্তুরে'র (উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার) স্বামিদত্ত, পিষ্টপুরের

(গোদাবরী জেলার) মহেন্দ্রগিরি, 'এরণ্ড পল্ল'র (বিশাখপত্তমের) দমন, 'অবমুক্ত'র (অবস্থান অনির্দিষ্ট) নীলরাজ, 'বেঙ্গী'র (এল্লোড়ের নিকট সালঙ্কায়ন বংশোদ্ভূত) হস্তিবর্মণ, 'পলকে'র (সম্ভবতঃ নেলোর জেলার) উগ্রসেন, 'দেবরাষ্ট্রে'র (সম্ভবতঃ বিশাখপত্তম্ জেলার) কুবের, কুস্থলপুরের (সম্ভবতঃ উত্তর আর্কট জেলার) ধনঞ্জয় প্রভৃতি।

উত্তর ভারতে অভিযানগুলির ক্ষেত্রে সমুদ্রগুপ্ত যে নীতি (বিজিত দেশগুলিকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া) অনুসরণ করেছিলেন, দক্ষিণ ভারতের বিজিত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্ন নীতি (বশ্যতা স্বীকারের পর কর প্রদানে রাজী করিয়ে পরাজিত নৃপতিকে নিজ রাজ্যে পুনঃস্থাপিত করা) অনুসরণ করেন। এইসব রাজ্যের ক্ষেত্রে শুধু অধীনতা স্বীকার ও কর প্রদানে রাজী করিয়ে করদ নৃপতির মর্যাদা ফিরিয়ে দেন তিনি। সমুদ্রগুপ্ত কেন দক্ষিণ ভারতের শাসকদিগের ক্ষেত্রে ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার কারণ হিসাবে বলা হয়, রাজধানীর সঙ্গে দক্ষিণের দূরবর্তী রাজ্যগুলির যোগাযোগরাখার অসুবিধা ও অন্যান্য প্রশাসনিক অসুবিধাই তাঁকে এরূপ নীতি গ্রহণে বাধ্য করেছিল। এই মতের সমর্থনে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা যায়। পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোটও ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের করদ ভূখণ্ড—যেমন যৌধেয়, মালব, মদ্র, অর্জুনায়নদের রাজ্যগুলি। এ ছাড়া এলাহাবাদ লিপিতে পাঞ্জাব ও আফগানিস্তানের শক-ক্ষত্রপ এবং কুষাণদিগের শাসিত অঞ্চলে গুপ্তরাজবংশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। মনে হয়, গুপ্তরাজাদের সার্বভৌমত্ব সত্ত্বেও ক্ষত্রপরা ও কুষাণ্ রাজারা তাঁদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দেন নাই। লক্ষণীয় যে, খ্রীষ্টাব্দ ৩৩২ থেকে ৩৪৮ এবং খ্রীষ্টাব্দ ৩৫১ থেকে ৩৬০-এর মধ্যে ক্ষত্রপদের নামাঙ্কিত মুদ্রা একবারেই পাওয়া যায় নাই। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন অন্ততঃ ওই সময়টাতে ক্ষত্রপরা সাময়িকভাবে গুপ্তদিগের অধীনতা স্বীকার করেছিল। এ বিষয়টিও উল্লেখ্য যে ওই বৎসরগুলিতে ক্ষত্রপদের ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল গুপ্ত রাজাদের মুদ্রা। পরে অবশ্য ক্ষত্রপরা তাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছিল।

মুদ্রা : বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্ত

শ্রীলঙ্কার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। লোকশ্রুতি অনুযায়ী সিংহলরাজ মেঘবর্ণ (৩৫২-৩৭৯ খ্রীঃ) সমুদ্রগুপ্তের কাছে দূত পাঠিয়ে সিংহলী ভিক্ষুদের জন্য একটি মঠ নির্মাণের অনুমতি নিয়েছিলেন। ফলে গয়ায় বোধিবৃক্ষের কাছে একটি বৌদ্ধমঠ নির্মিত হয়।

সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব :

রাজ্যজয়ে কৃতিত্ব ছাড়াও সমুদ্রগুপ্তের চরিত্রের অন্যান্য গুণাবলীও উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রতিভা বহুমুখী ছিল। কাব্য চর্চার জন্য তিনি 'কবিরাজ' আখ্যায় ভূষিত

হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গীতপ্রিয়তা মুদ্রায় তাঁর বীণাবাদনরত মূর্তি থেকে জানা যায়। হরিষেণ, বসুবন্ধু প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁর নিকট সমাদর লাভ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ ধর্মের অনুরাগী হলেও সমুদ্রগুপ্ত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কথিত আছে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। বিদ্যানুরাগ ও সামরিক কুশলতার জন্য সমুদ্রগুপ্ত ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। সামরিক কৃতিত্ব ও শাসন দক্ষতার জন্য ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ্ সমুদ্রগুপ্তকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' আখ্যা প্রদান করেছেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ঃ

সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সিংহাসনের অধিকারী হন ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ৪১৩ বা ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বিশাখদত্ত রচিত নাটক 'দেবি চন্দ্রগুপ্তম্' অনুযায়ী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর ভ্রাতা রামগুপ্তের সঙ্গে সংঘর্ষের পর সিংহাসন অধিকার করেন। নাটকটিতে পশ্চিম দেশীয় ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের জয়লাভের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সমসাময়িক শিলালিপি, মুদ্রা, পদক ইত্যাদি থেকেও ক্ষত্রপদিগের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের জয়লাভ সমর্থিত হয়েছে। উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ও সেনাপতিরা কার্যোপলক্ষে মালবদেশ সফর করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর সূচনায় পশ্চিমী ক্ষত্রপদের ভূখণ্ডে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে গুপ্ত নৃপতি কর্তৃক পশ্চিমী ক্ষত্রপদের ভূখণ্ডগুলি অধিকার ও তা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার ইঙ্গিত প্রদান করে। এছাড়া পশ্চিমাঞ্চলে অভিযানকালে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্র-উপকূলবর্তী পশ্চিম ভারতের আরও কিছু এলাকা জয় করে নেন। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বাণিজ্য কেন্দ্রও গুপ্ত রাজাদের অধিগত হয় এবং পাশ্চাত্যের বহুদেশ সহ সমুদ্রপারের দেশগুলির সঙ্গে তাদের সংযোগ প্রসারিত হয়।

রাজা 'চন্দ্রে'র নির্দেশে দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপির ভিত্তিতে কিছু ইতিহাসবিদ্ অনুমান করেন যে এই 'চন্দ্র' এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একই ব্যক্তি ছিলেন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সীমা সুদূর বালুখ্ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। তবে এ অনুমানের সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পশ্চিম দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতের পরাক্রান্ত বাকাটক রাজার সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল এবং এই জন্যেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চন্দ্রগুপ্ত তাঁর কন্যাকে বিবাহ দিয়ে বাকাটক নৃপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করেন। নিজেও নাগবংশীয়া এক কন্যাকে বিবাহ করেন। অনুমান করা হয় শক্তিশালী বাকাটকদিগের সঙ্গে এই মৈত্রী পশ্চিম ভারতের শকদিগের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের অভিযানে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, কারণ "বাকাটক মহারাজার রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান এমন ছিল যে তিনি উত্তর থেকে পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপদিগের রাজ্যের আক্রমণকারীকে সহায়তা

করতে পারতেন, আবার তাঁর বিরুদ্ধাচরণও করতে পারতেন।" মুদ্রায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, চতুর্থ শতকের শেষদিকে অথবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমদিকে গুজরাট ও সুরাষ্ট্রের শক-অধিকৃত অঞ্চলগুলি চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা বিজিত হয় এবং তিনি 'শকারি' ও 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। এই বিজয়ের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমানা আরব সাগরের তীর পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং পশ্চিম উপকূলের সমৃদ্ধ বন্দরগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন একজন খাঁটি বৈষ্ণব—মুদ্রায় তাঁকে "পরম ভাগবত" বলা হয়েছে। নিজে বৈষ্ণব হলেও অপর ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও তিনি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করতেন। তাঁর একজন মন্ত্রী ছিলেন শৈব এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি সম্ভবতঃ একজন বৌদ্ধ ছিলেন।

কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য ঃ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে কিংবদন্তীর "বিক্রমাদিত্যে"র সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়, যিনি শকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন এবং যাঁর রাজসভা "নবরত্নে"র বা নয়জন বিখ্যাত পণ্ডিতের দ্বারা অলংকৃত হয়েছিল। সম্ভবতঃ নবরত্নের অন্যতম রত্ন কবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী সংস্কৃত সাহিত্যের বিক্রমাদিত্য ৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিক্রম সংবৎ প্রবর্তন করেছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কোনমতেই ঐ অব্দের প্রবর্তক হতে পারেন না। কাজেই কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য এবং ইতিহাসের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য একই ব্যক্তি ছিলেন কিনা তা প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন বৌদ্ধতীর্থস্থান দর্শন করতে ও বৌদ্ধপুঁথিপুস্তক সংগ্রহ করতে ভারতে এসেছিলেন। মধ্য-এশিয়ার গোবি মরুভূমি, খোটান পার্বত্য অঞ্চল এবং পামির মালভূমি অতিক্রম করে তিনি গান্ধারের পথে ভারতে প্রবেশ করেন। প্রায় ১৪ বৎসর কাল (৩৯৯-৪১৪ খ্রীঃ) তিনি পেশোয়ার, মথুরা, কনৌজ, শ্রাবস্তী, বারাণসী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর, বৈশালী ও পাটলিপুত্র প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থস্থানগুলি পরিভ্রমণ করে বঙ্গোপসাগর তীরের তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) বন্দর থেকে জলপথে সিংহল ও যবদ্বীপ হয়ে দেশে ফিরে যান।

বিশেষভাবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নামোল্লেখ না করলেও ফা-হিয়েন বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন তা থেকে গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে দেশের অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন রাজধানী পাটলিপুত্রে তিন বৎসর সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন। সেখানে তিনি দুটি বিরাট বৌদ্ধমঠ দেখতে পান যেখানে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্রগণ হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য সমবেত হত। পাটলিপুত্রে অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে ফা-হিয়েন এতই বিস্মিত হন যে তিনি ভেবেছিলেন প্রাসাদটি মানুষের তৈরি নয় ; অশোকের নিযুক্ত কোন দৈত্যদানবরাই এটি নির্মাণ করে থাকবে।

ফা-হিয়েনের বিবরণ ঃ

ফা-হিয়েন বলেছেন চন্দ্রগুপ্তের সময়ে রাজ্যের প্রজারা ছিলেন বিত্তশালী ও সমৃদ্ধ, ধর্মপরায়ণ ও দানশীল। বৈশ্য পরিবারের প্রধানগণ দানধ্যান ও ঔষধপত্র বিতরণের জন্য গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। পাটলিপুত্রে একটি চমৎকার হাসপাতাল ছিল। এখানে রোগীদের বিনামূল্যে খাদ্য ও ঔষধপত্র বিতরণ করা হত। বড় বড় শহরে ও পথিপার্শ্বে পান্থশালা ছিল। মধ্যদেশে (গাঙ্গেয় উপত্যকায়) একমাত্র চণ্ডালজাতি ছাড়া অন্যসকলেই ছিল নিরামিষাশী ও অহিংসা নীতির প্রতি অনুরাগী। এই প্রসঙ্গে ফা-হিয়েন বলেছেন "জনসংখ্যা বিপুল এবং প্রজাগণ সুখী। তাঁদের গৃহ সরকারী দলিলে লিপিবদ্ধ করতে হয় না, কোন স্থানীয় আধিকারিকের নিকটও তাদের সাক্ষাৎ করতে হয় না, মাত্র খাস জমির চাষীদের উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ রাজস্ব হিসাবে দিতে হয়। অপরাধীদের শিরশ্ছেদ করা হয় না, অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অর্থদণ্ড আদায় করা হয় মাত্র।" ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় "তাঁর সময়ে পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ এবং মথুরা প্রভৃতি নানা স্থানে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা বেশ উন্নতিশীল ছিল। তবে 'মধ্যদেশ' অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম মোটেই জনপ্রিয় ছিল না। বরং ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল। ধর্ম বিষয়ে কোন উৎপীড়ন ছিল না, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল।" তবে ফা-হিয়েন কর্তৃক প্রদত্ত এই চিত্র আদর্শায়িত, না বাস্তব, তা বলা যায় না।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত (১ম) মহেন্দ্রাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৪১৫ থেকে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ ব্যাপী তাঁর চল্লিশ বৎসরের রাজত্বকালে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা যায় না। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যের শক্তি ও অখণ্ডতা অক্ষুণ্ন ছিল। কুমারগুপ্ত ছিলেন শৈব-ধর্মাবলম্বী। তিনি সমুদ্র-গুপ্তের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর স্বর্ণমুদ্রায় 'ময়ূরবাহন কার্তিকেয়'র প্রতিকৃতি মুদ্রিত আছে। কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষদিকে পুষ্যমিত্র নামক উপজাতির আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিপন্ন হয়েছিল কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের সাহসিকতায় গুপ্তদিগের সৌভাগ্য আবার ফিরে আসে।

স্কন্দগুপ্ত ঃ হূণ আক্রমণ ঃ

কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্তবংশের শেষ বিখ্যাত নৃপতি স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন (আঃ ৪৫৫-৪৬৭ খ্রীঃ)। 'পুষ্যমিত্র'দিগের বিরুদ্ধে যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের বীরত্বের জন্যই গুপ্তসাম্রাজ্য রক্ষা পেয়েছিল কিন্তু কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পরেই গুপ্ত সাম্রাজ্য এক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়। এবার এই বিপদ এল মধ্য এশিয়ার হূন ও এফ্‌থ্যালাইট উপজাতিদিগের আক্রমণের ফলে।

স্কন্দগুপ্তের সিংহাসনারোহণের পরেই হূন উপজাতিগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্যাসানীয় ও কুষাণ রাজাদের ছোট ছোট রাজ্যগুলি অধিকার করে নেয়। পরে তারা গান্ধার জয় করে এবং আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই সময়েই

(আঃ ৪৫৫-৪৬০ খ্রীঃ) গুপ্তরাজ স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে হূনদের সংঘর্ষ শুরু হয়। প্তয়ুগের একটি উৎকীর্ণ লিপিতে হূনদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের জয়লাভের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই সাফল্য ছিল স্বল্পস্থায়ী। এখানে উল্লেখ্য যে হূনদের পশ্চিম বাহিনীগুলো রোমানদের বিরুদ্ধে একটার পর একটা যুদ্ধে জয়ী হয় এবং তাদের আক্রমণের চাপে পরিশেষে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়।

বুধগুপ্ত ঃ

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর (আঃ ৪৬৭ খ্রীঃ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়। স্কন্দগুপ্তের পর শেষ শক্তিশালী গুপ্ত শাসক ছিলেন বুধগুপ্ত যিনি বঙ্গদেশ থেকে মালব ও কাথিয়াবাড় পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে বুধগুপ্তের মৃত্যু হয়। বুধগুপ্তের পর গুপ্ত সাম্রাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। সাম্রাজ্যভুক্ত প্রদেশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সাম্রাজ্যের ঐক্য বিপন্ন হয়।

তোরমান ও মিহিরকুল ঃ

এমন সময়ে হূনদের নতুন দল আবার আঘাত হানল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। হূন-দলপতি তোরমানের নেতৃত্বে হূনরা ভারতের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে সিন্ধুদেশ এবং রাজস্থান ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করে নিল। তোরমানের উত্তরাধি-কারী মিহিরকুল প্রথমে গুপ্তরাজাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন কিন্তু পরে গুপ্ত রাজা নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য এবং মালবের রাজা যশোধর্মণ যুগ্মভাবে মিহিরকুলের হূনবাহিনীকে এক যুদ্ধে (৫৩৩ খ্রীঃ) চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঐক্য আর বজায় রইল না। পরবর্তীকালে কিছু নামমাত্র 'গুপ্তরাজা' মগধ ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে আরও কিছুদিন টিকে ছিলেন মাত্র।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন ঃ

অন্যান্য বৃহৎ সাম্রাজ্যের মতই একাধিক অনিবার্য কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়। কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্ত শাসকদিগের দুর্বলতা ও সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষায় অক্ষমতা, প্রথমে 'পুষ্যমিত্র'দিগের, পরে হূনদিগের ক্রমাগত আক্রমণে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রভৃতি কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়। বলভীর (গুজরাটের) মৈত্রকগণ, মান্দাশোরের যশোধর্মণ, কনৌজের মৌখরীগণ, বঙ্গের গৌড়গণ একে একে স্বাধীন হয়ে যায়। 'পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের' (**Later Guptas**) পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং তাদের কয়েকজনের বৌদ্ধপ্রীতিও গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসাবে কেউ কেউ উল্লেখ করেন।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্তযুগকে'সুবর্ণ যুগ' অর্থাৎ 'উৎকর্ষের যুগ' বলা হয়েছে। রাজনৈতিক ঐক্য ও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা, ধর্ম, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চারুকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে উন্নতি বিচার করলে গুপ্তযুগকে 'সুবর্ণযুগ' রূপে অভিহিত করা অসঙ্গত মনে হবে না।

গুপ্তযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ

রাজনৈতিক ঐক্যের নিরিখে গুপ্ত শাসকদিগকে প্রাচীন যুগের শেষ বিখ্যাত সাম্রাজ্য সংগঠকরূপে অনায়াসেই বর্ণনা করা যায়। গুপ্ত সম্রাটদিগের রাজত্বের পরবর্তীকালে হর্ষ, গুর্জর-প্রতিহার, পাল, রাষ্ট্রকূট, চোল প্রভৃতি যে সমস্ত হিন্দু সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল, তার কোনটি স্থায়িত্ব, উৎকর্ষ বা আয়তন ইত্যাদি কোন দিকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমকক্ষ ছিল না। গুপ্ত সম্রাটদিগের রাজত্বকালে প্রায় দুই শত বৎসর (৩২০-৫০০ খ্রীঃ) ভারতের একটা বৃহদঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছিল, গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবনতি ও ভাঙনের কালে আরও প্রায় দুইশত বৎসর উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রদেশে গুপ্তবংশীয় রাজারা নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলেন। গুপ্ত সম্রাটদিগের সুশাসনের ফলে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে উল্লেখযোগ্য বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটেছিল এবং তারই প্রতিফলন স্বরূপে গুপ্তযুগে ধর্ম, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উৎকৃষ্ট বিকাশ লক্ষিত হয়।

গুপ্তযুগে ধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। এজন্য কেউ কেউ এই যুগকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগ বলে থাকেন। কিন্তু ঐতিহাসিকদিগের মতে গুপ্তযুগে ধর্মের উন্নতিকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা অসমীচীন, কারণ মৌর্যোত্তর যুগেও বিদেশী আক্রমণকারী জাতিগুলির (যেমন শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি) একাধিক শাসক হিন্দু ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়েছিলেন এরূপ প্রমাণ আছে। তাই এরূপ উক্তি করাই অধিকতর সঙ্গত হবে যে গুপ্তরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল। গুপ্ত নৃপতিরা অনেকেই ছিলেন পরম বৈষ্ণব (যেমন সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি)। অনুশাসন থেকে জানা যায় গুপ্তরাজারা নিজেদের 'পরম ভাগবত', 'পরম ভট্টারক' প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করতেন। তাই সঙ্গত ভাবে বলা যায় যে, গুপ্তযুগে বৈষ্ণবধর্মের সবিশেষ উন্নতি হয়েছিল। আধুনিক হিন্দু ধর্মের দেব-দেবী, যেমন—বিষ্ণু, শিব, কার্তিকেয়, সূর্য, লক্ষ্মী, পার্বতী প্রভৃতির পূজা এ যুগেই প্রচলিত হয়। এ যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই সময় বৌদ্ধধর্মে মহাযান মতবাদের প্রচলন হওয়ায় বুদ্ধ মূর্তির পূজা আরম্ভ হয়। যার ফলে লৌকিক বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ঘটে এবং বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের পার্থক্য ক্রমশঃ হ্রাস পায় ও উভয় ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হয়। পরমতসহিষ্ণুতা গুপ্তরাজাদের একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। 'পরম বৈষ্ণব' হলেও তাঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে ছিলেন উদার। সিংহলরাজ মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের অনুমতি নিয়ে সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য বুদ্ধগয়ায় একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গুপ্তযুগের শাসনকালের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। নিজে বৈষ্ণব হলেও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন একজন শৈব। তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় গুপ্ত নৃপতিগণ প্রশাসনে কঠোর নিয়ন্ত্রণ

অপেক্ষা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হত অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী। শিরশ্ছেদের ন্যায় কঠিন শাস্তি রহিত করা হয়।

গুপ্তযুগে সাহিত্য, শিল্পকলা, বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল এবং এইজন্যই জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন, "গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লীয় যুগের যে স্থান ছিল, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগের স্থানও তদ্রূপই ছিল।"

গুপ্তযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। গুপ্ত নৃপতিদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের মুদ্রা ও অনুশাসনগুলি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার কালিদাস এযুগেই আবির্ভূত হন এবং তিনি কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্যের "নবরত্ন সভা"র একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তবে কিংবদন্তীর বিদ্যোৎসাহী নৃপতি উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য ও গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। এর প্রধান কারণ কালিদাসের আবির্ভাবকাল এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য ৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে "বিক্রম সংবৎ" প্রবর্তন করেছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করেছিলেন খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমদিকে (৩৮০-৪১৫ খ্রীঃ)। আরও অন্যান্য কারণে এই প্রশ্নটি এখনও অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। সে যাই হোক, এই বিতর্কিত বিষয়ে প্রবেশ না ক'রে কালিদাস ও অন্যান্য গুণীজনের কৃতিত্বের কিছুটা পরিচয় প্রদান করাই বোধ হয় অধিকতর সমীচীন।

মহাকবি কালিদাসের রচিত বিখ্যাত কাব্যগুলির মধ্যে মেঘদূতম্, রঘুবংশম্ ও কুমারসম্ভবম্, বিশেষতঃ প্রথম দুইটি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন বলে বিবেচিত হয়। কালিদাসের সৃষ্ট অপূর্ব নাট্য গ্রন্থগুলি হল অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ও বিক্রমোর্বশীয়ম্। বিখ্যাত জার্মান কবি ও নাট্যকার গ্যেটে অভিজ্ঞান শকুন্তলমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন, "যদি স্বর্গ ও নরক একই সঙ্গে সহাবস্থিত দেখতে চাই তাহলে 'শকুন্তলা' এই নামটি উচ্চারণ করলে সবই বলা হয়ে যায়।" গুপ্তযুগে অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসম্, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, নারদ-সংহিতা প্রভৃতি সুপরিচিত গ্রন্থও এই যুগেরই সৃষ্টি। এ যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের কীর্তিগুলির মধ্যে 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থটি এখনও বিশেষ জনপ্রিয়। এই যুগেই তামিল ভাষায় 'কুরাল' নামক নীতিগ্রন্থটি লোকশ্রুতিখ্যাত গ্রন্থকার তিরুভাল্লুভার কর্তৃক রচিত হয়েছিল।

বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ছাড়াও কৃতী শিল্পী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ এবং অন্যান্য জ্ঞানীগুণীর আবির্ভাব গুপ্তযুগকে বিশেষভাবে মহিমান্বিত করেছিল। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট (জন্ম ৪৭৬ খ্রীঃ), জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির (৫০৫-৫৮৭ খ্রীঃ), গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫৯৮ খ্রীঃ), বৌদ্ধলেখক ও দার্শনিক বসুবন্ধু এবং দিঙনাগ প্রমুখের নামগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

লোকশ্রুতি অনুযায়ী কয়েকখানি বিখ্যাত রাসায়নিক গ্রন্থের রচয়িতা নাগার্জুন এই যুগেরই দার্শনিক ছিলেন। গুপ্তযুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চরক (খ্রীষ্টীয় ২য় শতক) এবং সুশ্রুতের (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতক) রচিত চিকিৎসা সংক্রান্ত পুঁথিগুলি এখনও টিকে আছে। এই সব পুঁথিতে অস্ত্রোপচার, হস্তপদের ব্যবচ্ছেদ এবং চোখের ছানিকাটার মত জটিল ধরনের শল্য চিকিৎসারও উল্লেখ আছে।

গুপ্তযুগের বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অজন্তার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শনগুলি যা এখনও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় অঞ্চলের মানুষের বিস্ময়-বিমিশ্র প্রশংসার উদ্রেক করে। অজন্তার গুহা-মন্দিরগুলির রিলিফ (ভিত্তিগাত্রে-খোদিত চিত্রাবলী) সমগ্র জগতের শিল্প-সমালোচকগণের বিস্ময়ের বস্তু। পাঁচটি চৈত্য (বৌদ্ধমন্দির) ও পঁচিশটি বিহার (বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের বাসের জন্য মঠ) সমেত অজন্তার ৩০টি গুহা মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় অবস্থিত। গুহাগাত্রে খোদিত প্রস্তরমূর্তি, ও রঙীন দেওয়াল চিত্রগুলি প্রত্যহ দেশবিদেশের শত শত দর্শককে আকৃষ্ট করছে।

অজন্তার ভিত্তিগাত্রে খোদিত চিত্র ঃ শিশু সহ মা

অজন্তা গুহাগাত্রের উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য ছাড়াও দেওগড়ের (ঝাঁসীর নিকট) প্রস্তরে নির্মিত মন্দির এবং ভিতরগাঁও-এর (কানপুরের নিকট) ইস্টক-নির্মিত মন্দিরে অবস্থিত প্রস্তরের মূর্তিগুলি গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করছে। এখানে উল্লেখ্য যে গুপ্তভাস্কর্যের উল্লিখিত নিদর্শনগুলিতে পাশাপাশি বৌদ্ধ ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মাশ্রয়ী—উভয় বৈশিষ্ট্যই দৃষ্ট হয়।*

গুপ্তযুগের শিল্পকীর্তির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ঢালাই লোহার কাজে শিল্পীদিগের দক্ষতা। এ যুগের যেসব লৌহনির্মিত স্তম্ভের নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন —দিল্লীতে চন্দ্ররাজের নির্মিত স্তম্ভ যা এখনও কুতবমিনারের নিকট দণ্ডায়মান, তার ঢালাই কাজের মসৃণতা আজও বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করছে। প্রকৃতির সকল ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে দীর্ঘ পনেরশত বৎসর পরেও এই শিল্পকীর্তির ঢালাই কাজের মসৃণতা আজও অটুট আছে।

* অজন্তার ভাস্কর্য সম্বন্ধে ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ আর. জি. ভাণ্ডারকরের ন্যায় বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, "গুপ্তভাস্কর্যের মূর্তিগুলির দৈহিক গঠন-সুষমা যেমন আকর্ষণীয় তেমনি এই মূর্তিগুলির মনোভঙ্গী যুগপৎ মাধুর্যমণ্ডিত ও গাম্ভীর্যদ্যোতক, সংযত অথচ সুমার্জিত, ভারতের অন্য কোথাও এরূপ উৎকর্ষ-মানের ভাস্কর্যের নমুনা দেখা যায় না।"

গুপ্তযুগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ (৪র্থ-৬ষ্ঠ শতক)। এই যোগাযোগের একাধিক উদাহরণ সহজেই দেওয়া যায়। এযুগে ভারত এবং চীনের মধ্যে সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ ছিল তা উভয় দেশের মধ্যে দৌত্যের বিবরণ থেকেই বোঝা যায়। এই সকল দৌত্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় (৩৯৯-৪১৩ খ্রীঃ) চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভারত আগমন। প্রায় ১৩।১৪ বৎসরকাল তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে দেশে ফিরে যান। তাঁর লিখিত বিবরণ সমকালের ভারত-ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান।

গুপ্তযুগে ভারতের দিক থেকেও একাধিক পরিব্রাজক চীনে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত কুমারজীবের চীনে গমন। চতুর্থ শতকের শেষার্ধে কুমারজীব "মাধ্যমিক" বৌদ্ধধর্ম মত প্রচার করতে চীনে গিয়েছিলেন। কাশ্মীরের যুবরাজ গুণবর্মণ (মৃত্যু ৪৩১ খ্রীঃ) যবদ্বীপে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। অনুশাসন থেকে জানা যায় এযুগে মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং ঐসব দেশে ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টির যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। অজন্তার গুহাচিত্র থেকে জানা যায় সে সময়ে পারসিক সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদান হয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গেও গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয় জানা যায়। এ যুগের গুপ্ত সম্রাটদিগের স্বর্ণমুদ্রায় রোমীয় প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই লক্ষিত হয়। সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মূর্তি থেকে এযুগে সম্রাটদিগের পৃষ্ঠ-পোষকতায় সঙ্গীতবিদ্যার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ ৬ ॥

গুপ্তোত্তর যুগে প্রাধান্যলাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা

[ক] উত্তর ভারত

হূনদের আগমন ঃ যশোধর্মন

মধ্য এশিয়ায় চীন সীমান্তে এক দুর্ধর্ষ যাযাবর উপজাতি ছিল হূনরা (পূর্ব নাম হিউং-নু)। ইউয়ে-চি নামক অপর এক যাযাবর উপজাতির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি হূনরা কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বদিকে অক্ষুনদীর তীরে নতুন করে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তী কুষাণ শাসকদিগের দুর্বলতার সুযোগে হূনরা শক্তিশালী হয়ে উঠে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে—একটি শাখা ইউরোপে প্রবেশ করে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করে। অপর একটি শাখা এফ্থালাইট্ বা শ্বেত হূন নামে পরিচিত হয়। সভ্যতাবর্জিত, বর্বর জাতীয় এই শ্বেত হূনরা ধ্বংস ও হত্যালীলা ব্যতীত আর কিছুই জানত না। ইতিহাসে হূনদের নৃশংসতার তুলনা মেলা ভার।*

সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ দিকে (আঃ ৪৫০ খ্রীঃ) হূনরা হিন্দুকুশ অতিক্রম করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশগুলিতে ক্রমাগত হানা দিতে থাকে। গান্ধার ও পশ্চিম পাঞ্জাব অধিকার করে তারা আরও অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে যুবরাজ স্কন্দ-গুপ্তের সঙ্গে একাধিক সংঘর্ষ হয়। ভিতরি শিলালিপি থেকে জানা যায়, স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণের পর হূনদের সঙ্গে এক যুদ্ধে জয়লাভ করেন (আঃ ৪৫৮ খ্রীঃ)। স্কন্দগুপ্তের জীবিতকালে হূনরা আর সুবিধা করতে পারে নাই কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর (খ্রীঃ ৪৬৭) আরও শক্তি সঞ্চয় করে তারা অধিক সংখ্যায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন হূনদলপতি ছিলেন তোরমান। তিনি ছিলেন অতি নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর কোন অনুরাগই ছিল না এবং তিনি ছিলেন 'দস্যু দানবের পূজারী।' একটি জৈনগ্রন্থে (৮ম শতক) তোরমানকে 'উত্তরাপথের শাসক' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। হিউয়েন-সাঙ্ তোরমানের পুত্র মিহিরকুলের অত্যাচারী শাসনের উল্লেখ করেছেন।

যশোধর্মন

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে হূননেতা তোরমান তাঁর বিজয় বাহিনী নিয়ে মালব পর্যন্ত অগ্রসর হন কিন্তু তিনি গুপ্তরাজ ভানুগুপ্তের নিকট পরাজিত হন।

* ঐতিহাসিক গিবন হূনদিগের বীভৎস চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "সিথিয়ার (শকস্থানের) সমাজ-তাড়িত ডাইনীদের সাথে মরুভূমির নারকীয় ভূতপ্রেতের মিলন-প্রসূত সন্তান ছিল এই হূনেরা।"

মিহিরকুলের গোয়ালিয়র অনুশাসন (৫৩০ খ্রীঃ) থেকে জানা যায় তিনি যুদ্ধবিগ্রহে প্রথমে কিছু সাফল্য লাভ করেছিলেন। ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক দূত সুং-ইয়ুন গান্ধারে তাঁর সভায় উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। মিহিরকুল ছিলেন শিবোপাসক, বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিরোধী। ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের এই সময়ে গুপ্ত সম্রাটদিগের দুর্বলতার সুযোগে দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। গঙ্গা ও গোমতী নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে কান্যকুব্জের (কনৌজের) মৌখরীবংশীয় নৃপতিগণ এবং 'মগধের পরবর্তী গুপ্তরাজারা' (Later Guptas) নানা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এই বিশৃঙ্খলার সময়ে পূর্ব মালবে যশোধর্মন ক্ষমতাশালী হন। রাজধানী মান্দাশোরে যশোধর্মন প্রস্তরখণ্ডে সংস্কৃতে যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন তা থেকে জানা যায়, তিনি 'এমন সব রাজ্য জয় করেছিলেন যা গুপ্তরাজারা বা হূনরাও কখন জয় করতে পারে নাই' এবং ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে সমুদ্র ও হিমালয় থেকে দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বত পর্যন্ত সমগ্র ভারতের নৃপতিবৃন্দ তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। তাছাড়া তৎকালীন রাজন্যবর্গের যৌথশক্তিকে সংহত করে হূনরাজ মিহিরকুলের ক্ষমতাকে চূর্ণ করেন। মান্দাশোরের অপর একটি শিলালিপি (খ্রীঃ ৫৩৩-৩৪) থেকেও জানা যায় এই সময়ে বা এর পূর্বে যশোধর্মন মিহিরকুলকে পরাজিত করার গৌরব অর্জন করেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, গুপ্ত সম্রাট বালাদিত্যই মিহিরকুলকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। জানা যায় বালাদিত্য ও যশোধর্মনের হস্তে পরাজয়ের পর মিহিরকুল কাশ্মীরে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় (৫৪২ খ্রীঃ)।

কনৌজের মৌখরী-বংশের ঈশানবর্মন প্রথমে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন (খ্রীঃ ৫৫৪)। সম্ভবতঃ মিহিরকুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অনুমান করা হয়, বলভীর মৈত্রকগণও হূনদের ন্যায় বহিরাগত ছিল এবং তারাও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে প্রাদেশিক সামন্ত-শাসক ছিল। গুপ্ত শাসকগণ দুর্বল হয়ে পড়লে সুরাষ্ট্র উপদ্বীপের পূর্বদিকে বলভীতে স্বাধীন মৈত্রক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

গৌড়ে শশাঙ্ক

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে কয়েকটি আঞ্চলিক রাজ্য উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল শশাঙ্কের অধীনে গৌড়-বঙ্গের রাজ্যটি। ('গৌড় বলতে তখন বুঝাত বঙ্গদেশের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম ভাগ আর নিম্নবঙ্গের পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগকে বলা হত 'বঙ্গ')। প্রাচীন সাহিত্যে 'গৌড়জন' ও 'গৌড় দেশে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। জানা যায়, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েকজন রাজা বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়বাসীরা সামরিক শক্তির অধিকারী হন এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে শশাঙ্কের নেতৃত্বে কনৌজের মৌখরী ও থানেশ্বরের পুষ্যভূতিদিগের (বা পুষ্পভূতি) প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে

অবতীর্ণ হন। শশাঙ্কের পূর্বপরিচয় বা তাঁর বংশধরদিগের কোন পরিচয় জানা যায় না। সমসাময়িক একটি প্রস্তরলিপিতে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক' নামটির উল্লেখ থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন শশাঙ্ক প্রথমে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে একজন শক্তিশালী সামন্ত ছিলেন। হর্ষচরিত রচয়িতা বাণভট্ট ও চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ উভয়েই শশাঙ্ককে গৌড়ের অধিপতিরূপে উল্লেখ করেছেন।

গৌড়রাজ শশাঙ্ক ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও চতুর। মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে তিনি মৌখরীরাজ গ্রহবর্মনকে যুদ্ধে নিহত করলেন এবং তাঁর পত্নী রাজ্যশ্রীকে (থানেশ্বররাজ প্রভাকর বর্ধনের কন্যা) কারাগারে বন্দিনী করলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হলেন প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠপুত্র, রাজ্যবর্ধন যিনি ইতিমধ্যেই প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুতে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি দেবগুপ্ত কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হন এবং (সম্ভবতঃ) শশাঙ্কের বিশ্বাস-ঘাতকতায় নিহত হন। শশাঙ্ক কনৌজ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁর এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। কারণ রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ইতিমধ্যে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন।

জানা যায়,শশাঙ্ক তাঁর রাজ্য অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশ ও আসাম পর্যন্ত তাঁর রাজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং কিছুদিন শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটির নিকট) অধিকার করে নেন। তবে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, সম্ভবতঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর আনুমানিক ৬৩৭-৩৮ খ্রীঃ এর পর (পূর্বে নয়) ভাস্করবর্মা কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেছিলেন।

যদিও শশাঙ্কের চরিত্র ও কৃতিত্বের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না তথাপি ঐতিহাসিকগণ একমত যে তিনিই ছিলেন বঙ্গদেশের প্রথম বিখ্যাত নৃপতি। পরবর্তী-কালে পালবংশীয় শাসকগণ ভারতে প্রভুত্বলাভের জন্য যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন সে বিষয়ে শশাঙ্ককে তাঁদের পূর্বসূরী রূপে গণ্য করলে অসঙ্গত হবে না।

হর্ষবর্ধন—সিংহাসনারোহণ : রাজ্যজয় : তাঁর রাজ্যের আয়তন : হিউয়েন-সাঙের বিবরণ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যুগে পাঞ্জাবের একেবারে পূর্বসীমান্তে পুষ্যভূতিবংশের অধীনে থানেশ্বরের (স্থানীশ্বর) শক্তিশালী রাজ্যটিরও উত্থান ঘটে। এই বংশের প্রথম বিখ্যাত নৃপতি 'পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' প্রভাকরবর্ধন ('প্রতাপশীল' বলা হত), যিনি হূন গুর্জরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রভাকর-বর্ধনের মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর* তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ

* দেবগুপ্ত ও শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মনের মৃত্যু এবং রাজ্যবর্ধনের আকস্মিক জীবনহানির প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

করেন (৬০৬ খ্রীঃ)। পরে ভগ্নী রাজ্যশ্রী সম্মতিক্রমে ও তাঁর পার্ষদবর্গের অনুরোধে কনৌজের শূন্য সিংহাসনটিও গ্রহণ করেন তিনি। হর্ষবর্ধন তাঁর রাজধানী থানেশ্বর থেকে কনৌজে স্থানান্তরিত করলেন। হর্ষবর্ধনের সিংহাসনারোহণের সময় থেকে 'হর্ষাব্দ' নামে একটি নূতন অব্দ প্রচলিত হল। থানেশ্বর ও কনৌজের মিলনের ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় আবার একটি বৃহৎ এবং শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব ঘটল। এরপর থেকে কনৌজকে কেন্দ্র করেই হর্ষবর্ধনের সমস্ত রাজকার্য পরিচালিত হয়।

হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন এক শক্তিশালী বাহিনীসহ ভ্রাতৃবৈরী শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাজনৈতিক কূটকৌশলের সাহায্যে তিনি কামরূপের ভাস্করবর্মার সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন। উভয় দিকে শত্রু বেষ্টিত হলেও শশাঙ্ক আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জীবিতকালে হর্ষবর্ধন তাঁর বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পেরেছিলেন এরূপ প্রমাণ নাই।

হর্ষের রাজ্যজয়

হিউয়েন-সাঙ্ হর্ষের সামরিক অভিযানের নানা উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাঁর রাজ্যজয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। শশাঙ্ক যে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে) হর্ষবর্ধন মগধে প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন। হর্ষবর্ধন উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন (একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে)। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উড়িষ্যার কঙ্গোদ অঞ্চল (গঞ্জাম জেলা) জয় করেন। পশ্চিমে তিনি বলভীর সুরাষ্ট্র) শাসককে পরাজিত করেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় হর্ষ বলভীরাজ (২য়) ধ্রুবসেনের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। সিন্ধু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধেও হর্ষের অভিযানের উল্লেখ আছে, তবে বিস্তারিত তথ্য নাই। দক্ষিণে তিনি নর্মদা নদী অতিক্রম করতে পারেন নাই। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে তিনি বিজয়বাহিনীসহ নর্মদাতীরে উপনীত হলে বাতাপির (বাদামি) চালুক্যরাজ (২য়) পুলকেশীর হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন।

বাণভট্টের হর্ষচরিতে (অতিরঞ্জিত) বর্ণনায় হর্ষবর্ধনকে 'সকল উত্তরাপথনাথ' রূপে অভিহিত করা হয়েছে। অনুশাসনে প্রাপ্ত তথ্য থেকে মনে হয় হর্ষবর্ধনের রাজ্যের আয়তন খুব একটা বিস্তৃত ছিল না। সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের পূর্বদিকের কয়েকটি জেলাসহ, উত্তরপ্রদেশের বৃহদঞ্চল, বিহার, বঙ্গদেশ এবং উড়িষ্যা (কঙ্গোদ অঞ্চল) তাঁর

রাজ্যভুক্ত ছিল। তবে সুরাষ্ট্র এবং কামরূপ তাঁর কর্তৃত্বাধীন ছিল কিনা সন্দেহজনক। মনে হয়, উত্তর ভারতের প্রায় সকল নৃপতিগণই হর্ষবর্ধনের আধিপত্য মেনে নিয়েছিলেন।

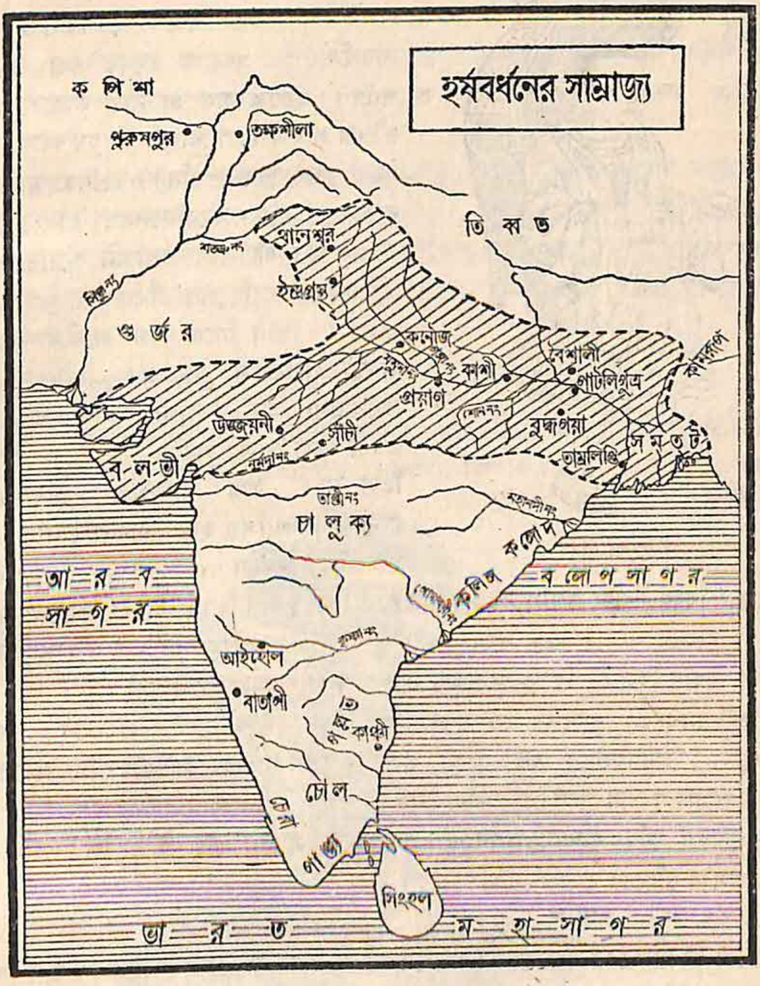

হিউয়েন-সাঙের বিবরণ

চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ হর্ষের রাজত্বকালে ভারতভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি মধ্য এশিয়ার পথে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধারে উপনীত হন। প্রায় ১৪ বৎসর (তার মধ্যে কনৌজে তিন বৎসর সহ হর্ষের রাজ্যে আট বৎসর) কাটিয়ে তিনি স্থলপথেই দেশে ফিরে যান। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর হিউয়েন-সাঙ তাঁর ভারত ভ্রমণের প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন ঐতিহাসিকদিগের নিকট তা ভারত-ইতিহাসের এক অমূল্য উৎসরূপে বিবেচিত হয়।

হিউয়েন-সাঙ

হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে আমরা হর্ষের রাজত্বকালে দেশের, দেশবাসীর এবং তাঁর নিজের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারি। হর্ষের রাজত্বের সময় ভারতের সঙ্গে চীনের সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ। হর্ষবর্ধন চীন সম্রাট তাই-সুঙের নিকট জনৈক ব্রাহ্মণকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। চীন থেকেও একজন দূত তাঁর সভায় আগমন করেছিলেন।

হর্ষবর্ধন ছিলেন একজন প্রজাদরদী শাসক। তিনি নিজে সমগ্র রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা পরিদর্শন করতেন। হিউয়েন-সাঙ্ লিখেছেন, "হর্ষ ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী, একটা সমগ্র দিনের সময়ও তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।" তার রাজ্যভুক্ত প্রদেশগুলি ('ভুক্তি') শাসিত হত রাজপ্রতিনিধি এবং সামন্তদিগের দ্বারা। প্রদেশগুলি বিভক্ত ছিল জেলায় (বিষয়) এবং প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল গ্রামগুলি। রাজ্যে করভার ছিল লঘু (উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ), দণ্ডবিধি ছিল কঠোর, গুরুতর অপরাধে অঙ্গ-চ্ছেদের বিধান ছিল। কিন্তু কঠোরতা সত্ত্বেও অপরাধ প্রায়শঃই ঘটত।

হিউয়েন-সাঙ্ ভারতের জনগণের উন্নত চরিত্র দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "অন্যায়ভাবে তাঁরা কিছু গ্রহণ করতেন না, এবং সততার রীতি অনুযায়ী যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি তাঁরা দিয়ে থাকেন। ভারতবাসীরা প্রতারণা করেন না, প্রদত্ত শপথও তাঁরা লঙ্ঘন করেন না।" হিউয়েন-সাঙের এই উক্তিগুলি তৎকালীন ভারতবাসীর চরিত্রের উৎকর্ষ সূচিত করে।

হর্ষের অধীনে কনৌজ

চীনা পরিব্রাজকের মতে হর্ষের অধীনে কনৌজ পাটলিপুত্রের গৌরবকেও ম্লান করে দিয়েছিল। হিউয়েন-সাঙ্ দেখতে পান একশত বৌদ্ধমঠ ও প্রায় দুইশত দেবমন্দির। হর্ষের রাজধানীতে হিউয়েন-সাঙ্ এক জাঁকজমকপূর্ণ ধর্মীয় শোভাযাত্রা ও সম্মেলনের উল্লেখ করেছেন।

কনৌজের ধর্মীয় শোভাযাত্রা ও সম্মেলন ছাড়াও প্রয়াগের একটি পঞ্চবার্ষিক দানমেলারও উল্লেখ করেছেন হিউয়েন-সাঙ্। এখানে "সন্তোষক্ষেত্রে" প্রতি পাঁচ-বৎসর এক দানমেলার আয়োজন করতেন হর্ষবর্ধন। হিউয়েন-সাঙের অবস্থানকালে ষষ্ঠ

পঞ্চবার্ষিকী উৎসবটি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নানা প্রদেশ থেকে আগত বহু রাজন্যবর্গ ও রাজকুমারগণ এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। এখানে বিভিন্ন দিনে বুদ্ধের মূর্তি ছাড়া শিব এবং সূর্যের মূর্তিও পূজিত হত। হর্ষবর্ধনের দানশীলতার সীমা ছিল না। বহু বৌদ্ধভিক্ষু, ব্রাহ্মণ ও জৈন শ্রমণ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা ধর্মমত নির্বিশেষে হর্ষের এই দানসত্রে নানা মূল্যবান সামগ্রী উপঢৌকন রূপে পেয়েছিলেন। ভারতের ইতিহাসে দানশীলতার এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

ধর্ম বিষয়ে হর্ষের উদারতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তিনি নিজে ছিলেন শিবভক্ত, কিন্তু সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর ছিল সমদৃষ্টি। হর্ষবর্ধন বহু স্তূপ ও মঠ প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন, তবে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন নাই। তাঁর রাজত্বকালে হিন্দুধর্মই প্রধান ধর্ম ছিল, হিন্দুদেবতা আদিত্য (সূর্য), শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা তখন প্রচলিত ছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

হর্ষবর্ধন ছিলেন জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষক। তার সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তৎকালের বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন দশ সহস্র

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও সাহিত্য, ন্যায়, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত প্রভৃতি অধ্যয়ন করত। প্রতিদিন এক শত বক্তৃতা মঞ্চ থেকে অধ্যাপকগণ বিভিন্ন হলঘরে পাঠদান করতেন। বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

একজন বিখ্যাত অধ্যাপক। বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের যাবতীয় ব্যয়ভার রাজকোষ থেকে বহন করা হত। হিউয়েন-সাঙ লিখেছেন, ১০০টি গ্রামের রাজস্ব এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিল। প্রতিদিন ২০০ জন গৃহস্থ পর্যায় ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিকদিগের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রহিসাবে প্রবেশলাভ সহজসাধ্য ছিল না। কঠিন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবে প্রবেশ মিলত। এখানে কয়েকতলা-বিশিষ্ট তিনটি বিরাট পাঠাগার ছিল। অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের বিদ্যাবত্তা ছিল প্রসিদ্ধ। হিউয়েন-সাঙ লিখেছেন, "অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই সারাদিন পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকতেন। অতি দুরূহ প্রশ্ন করা ও তার উত্তরদানের জন্য সারা দিনের সময়েও কুলোত না। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাঁরা আলোচনায় রত থাকতেন।"

হর্ষবর্ধন সাহিত্যিক ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কাদম্বরী কাব্য ও হর্ষচরিত রচয়িতা বাণভট্ট ছিলেন তাঁর সভাকবি। হর্ষ নিজেই সংস্কৃত ভাষায় প্রিয়দর্শিকা, রত্নাবলী ও নাগানন্দ নামে তিনখানি নাটক ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বাণভট্ট ছাড়াও জয়সেন, ময়ূর, দিবাকর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হর্ষের রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন।

হর্ষবর্ধনের পর উত্তর ভারত

প্রতিহার ও পাল সাম্রাজ্যের উদ্ভব—ত্রি-শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তার পরিণাম

হর্ষবর্ধনের সামন্তশাসিত প্রাদেশিক সংগঠনের ভিত্তি দৃঢ় ছিল না। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর (আঃ ৬৪৭ খ্রীঃ) উপযুক্ত বংশধরের অভাবে তাঁর সাম্রাজ্য খন্ড বিখণ্ড হয়ে যায় এবং ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য আবার বিনষ্ট হয়। যশোবর্মন নামে একজন রাজা সামরিক শক্তির অধিকারী হয়ে কনৌজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (আঃ ৭২৫-৭৫২ খ্রীঃ)। যশোবর্মনের সভাকবি বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহো' নাটক থেকে জানা যায় তিনি গৌড়রাজকে পরাজিত করেছিলেন এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে রাজ্যজয় করেছিলেন। কবিবর্ণিত রাজ্যজয়ের কাহিনী কতদূর সত্য বলা যায় না। যশোবর্মন কাশ্মীরের কর্কোট বংশীয় নৃপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (৭৩৪-৭৬০ খ্রীঃ) কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। জানা যায়, বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক 'উত্তররামচরিতমে'র রচয়িতা ভবভূতি যশোবর্মনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

ত্রি-শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা

হর্ষের পরবর্তী যুগে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল প্রভুত্বলাভের জন্য ত্রি-শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় দুইশত বৎসর তিনটি প্রধান শক্তির এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল উত্তর ভারতে। এই জন্য ভারতের ইতিহাসে এই যুগকে

ত্রি-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত সমসাময়িক চরিত্রগুলি হল বাংলার ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রীঃ), গুর্জর-প্রতিহার বংশের বৎসরাজ (আঃ ৭৩৮-৭৮৪ খ্রীঃ), নাগভট (২য়) (আঃ ৮০৫-৮৩৩ খ্রীঃ) এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট বংশের ধ্রুব (আঃ ৭৭৯-৭৯৩ খ্রীঃ) ও তৃতীয় গোবিন্দ (আঃ ৭৯৩-৮১৪ খ্রীঃ)। তখন উত্তর ভারতে এই তিনটি প্রধান রাজবংশের শাসকগণ সকলেই কনৌজের উপর আধিপত্যলাভকে সাম্রাজ্যিক মর্যাদার প্রতীকরূপে গণ্য করতেন। তার অবশ্য কারণ ছিল। হর্ষবর্ধনের সময়ে প্রায় চার দশক কাল কনৌজ ছিল ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের চূড়ায়। শুধু ঐশ্বর্যেই নয়—শিক্ষা, সাহিত্য ও নানা বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে ভারতে, এমন কি, সমগ্র এশিয়াতে, তখন কনৌজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কনৌজকে তখন বলা হত "মহোদয়" এবং কনৌজের ঐশ্বর্য তখন "মহোদয়-শ্রী" নামে পরিচিত হয়।

গুর্জর-প্রতিহার—পাল রাষ্ট্রকূট সংঘর্ষ

গুর্জর-প্রতিহার বংশের বৎসরাজ সামরিক শক্তির অধিকারী হয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত করেন। তিনি প্রতিহার বংশের শক্তিকেন্দ্র রাজপুতনা থেকে বহির্গত হয়ে পূর্বদিকে সাম্রাজ্যবিস্তারে সচেষ্ট হন এবং কনৌজ জয় করেন। কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধ তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। কিন্তু বৎসরাজ বাধা পেলেন বাংলার পালবংশীয় নৃপতি ধর্মপালের নিকট। বৎসরাজ অবশ্য সহজেই গৌড়ের রাজলক্ষ্মীকে তাঁর অধীনে আনয়ন করেন তবে তিনি পালরাজ্যের কোন অংশ জয় করেছিলেন কিনা বুঝা যায় না। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৎসরাজই জয়ী হয়েছিলেন। বৎসরাজের নিকট বাধা পেলেও ধর্মপালের পশ্চিমদিকে রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা দমিত হয় নাই। তাঁর কনৌজজয়ের উচ্চাভিলাষ পূরণের সুযোগও অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হল। বৎসরাজের ক্ষমতাবৃদ্ধি রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব মোটেই সুনজরে দেখলেন না। তিনি বৎসরাজকে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন এবং তাঁকে রাজপুতনার মরু অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলেন। ধ্রুব এর পর গাঙ্গেয় দোয়াব জয়ে অগ্রসর হলেন এবং ধর্মপালকে পরাজিত করলেন। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করলেও রাষ্ট্রকূটরাজের পক্ষে স্থায়ীভাবে দাক্ষিণাত্য থেকে গাঙ্গেয় দোয়াবের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। ঝড়ের গতিতে যুদ্ধজয়ের পর ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলেন (৭৯০ খ্রীঃ)। তিনি ধর্মপালের গুরুতর ক্ষতিসাধন করতে পারলেন না। বরং ধ্রুবের হস্তে প্রতিহাররাজের পরাজয়ের ফলে ধর্মপালের পক্ষে উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তারের পথ নিষ্কণ্টক হল। খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ধর্মপাল 'ইন্দ্ররাজ'কে (ইন্দ্রায়ুধকে) পরাজিত করে 'মহোদয়শ্রী' (কনৌজজয়ের গৌরব) অর্জন করলেন। এই উপলক্ষে ধর্মপাল কনৌজে যে বিজয়দরবার অনুষ্ঠিত করলেন তাতে উপস্থিত ছিলেন ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি

রাজ্যের অধিপতিগণ। এ থেকে মনে হয় ধর্মপাল এই সময় সমগ্র উত্তর ভারতের সার্বভৌম নৃপতিরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাঁর স্থাপিত কনৌজের রাজা চক্রায়ুধ তাঁর অধীন সামন্তরাজের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এই সময় ধর্মপালের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল বঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাব, পূর্ব-রাজপুতনা, মালব, বেরার এবং সম্ভবতঃ নেপালও পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রতিহারদিগের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বৎসরাজের পুত্র নাগভট (২য়) সিন্ধু, বিদর্ভ, অন্ধ্র ও কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধ হ'য়ে কনৌজ আক্রমণ করেন। চক্রায়ুধ পরাজিত হ'য়ে তাঁর অধিরক্ষক ধর্মপালের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই জয়লাভের ফলে নাগভট 'সাম্রাজ্যিক নগরী কনৌজে'র অধীশ্বর হন এবং তাঁর রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করেন কিন্তু এই বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে কোন কোন ঐতিহাসিক সন্দেহ পোষণ করেন। নাগভট বিজয়গর্বে পূর্বদিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর হস্তে মুঙ্গেরের নিকট যুদ্ধে ধর্মপাল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন কিন্তু এই ভাগ্যবিপর্যয়ের সময় রাষ্ট্রকূটদিগের হস্তক্ষেপে ধর্মপাল আবার রক্ষা পেলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরদিকে অভিযানে অগ্রসর হয়ে নাগভটকে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন। তিনি গঙ্গাযমুনা দোয়াব অধিকার করলেন। ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ উভয়েই তৃতীয় গোবিন্দের আধিপত্য স্বীকার করলেন। কিন্তু নাগভটের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকূটরাজের সহায়তা লাভ করেন। সংগ্রামে ধর্মপাল সম্ভবতঃ অক্ষতভাবে রক্ষা পান। এর পরে প্রতিহারদিগের অধিকার সঙ্কুচিত হয়ে রাজপুতনা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ধর্মপালের মৃত্যুর পর নাগভট সম্ভবতঃ কনৌজ অধিকার করেন।

নাগভটের পৌত্র মিহিরভোজ (১ম) 'আদিবরাহ' (আঃ ৮৩৬-৮৮৫ খ্রীঃ) একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন কনৌজে রাজত্ব করেছিলেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল ভোজকে পরাজিত করেছিলেন। এর পর ভোজ দক্ষিণ রাজপুতনা ও মালব জয় করেন। কিন্তু তারপরই প্রতিহারদিগের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদিগের আবার সংঘর্ষ হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব (২য়) ও কৃষ্ণ (২য়) (আঃ ৮৭৭-৯১৩ খ্রীঃ) পর পর যুদ্ধে ভোজকে পরাজিত করেন। পর পর পরাজয়ে ভোজের ক্ষমতা খর্ব হয় এবং সম্ভবতঃ গুজরাট তাঁর হস্তচ্যুত হয়। একজন আরব পরিব্রাজক সুলেমান ভোজের শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনীর উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

প্রথম ভোজের পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপালের সময় (৮৮৫-৯১০ খ্রীঃ) প্রতিহারদিগের ক্ষমতা শীর্ষে পৌঁছেছিল। তিনি মগধ জয় করেন এবং বাংলার নারায়ণপালকে পরাজিত ক'রে সাময়িকভাবে উত্তরবঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেন। মহেন্দ্রপালের পর দ্বিতীয় ভোজ তাঁর ভ্রাতা মহীপাল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। রাষ্ট্রকূটরাজারা শক্তিশালী হয়ে প্রতিহাররাজ মহীপালকে পরাজিত করে কনৌজ লুণ্ঠন করেন। রাষ্ট্রকূটদিগের হস্তে শোচনীয় পরাজয়ের পর একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে উত্তর ভারতে প্রতিহারদিগের

সার্বভৌম ক্ষমতা ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মহীপালের দুর্বল বংশধরদিগের আমলে কয়েকটি রাজপুত বংশ (চন্দেল্ল, কলচুরি, চৌলুক্য, চৌহান প্রভৃতি) উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য স্থাপন করে রাজত্ব করতে থাকে।

বাংলায় পাল ও সেন রাজত্ব

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (আঃ ৬৩৭ খ্রীঃ) গৌড় বাংলা আত্মকলহে দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রায় একশত বৎসর (আঃ ৬৫০-৭৫০ খ্রীঃ) চলে এক বিশৃংখলা ও অরাজকতার যুগ। এ সময় প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করত, ধনী নিষ্ঠুরভাবে দরিদ্রকে শোষণ করত। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের মতে তখন বাংলা ছিল 'মাৎস্যন্যায়' বা অরাজকতায় বিপর্যস্ত।

এই দুঃসময়ে বাংলার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ মিলিতভাবে গোপাল নামে একজন সাধারণ ব্যক্তিকে তাঁদের নায়ক বা রাজা নির্বাচিত করলেন (আঃ ৭৫০-৭৬০ খ্রীঃ) গোপাল ও তাঁর বংশধরদিগের সকলেরই নামের শেষে 'পাল' (পালক বা রক্ষক) শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় ঐতিহাসিকগণ গোপালের প্রতিষ্ঠিত বংশকে পালবংশ নামে অভিহিত করেছেন। গোপাল অচিরেই দেশে শান্তিশৃংখলা পুনঃস্থাপনে সক্ষম হলেন। গোপাল মগধ পর্যন্ত তাঁর প্রভুত্ব বিস্তার করলেন। তিনি প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। বিহারের উদ্দণ্ডপুরে (উদন্তপুরীতে) গোপাল একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন।

ধর্মপাল : উত্তরভারতে পালবংশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা

গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল রাজা হন (আঃ ৭৭০-৮৩০ খ্রীঃ)। ধর্মপাল ছিলেন পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর দীর্ঘ রাজত্ব কালে (অন্ততঃ ৩২ বৎসর) তিনি উত্তর ভারতে বঙ্গদেশকে সাম্রাজ্যিক মর্যাদায় উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কনৌজের 'ইন্দ্ররাজ'কে (ইন্দ্রায়ুধকে) পরাজিত করে তিনি তাঁর আশ্রিত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে ধর্মপাল যে বিজয়-উৎসবের আয়োজন করেন তাতে আর্যাবর্তের অনেক রাজা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের সম্মতিক্রমেই ধর্মপাল চক্রায়ুধকে কনৌজের সামন্তরাজপদে অধিষ্ঠিত করেন। এ থেকে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন ধর্মপাল এই সময়ে উত্তর ভারতের সার্বভৌম নৃপতিরূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কয়েকটি সমসাময়িক ইতিবৃত্তে ধর্মপালকে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে গোকর্ণ পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগের অধিপতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে গাঙ্গেয় দোয়াবে ধর্মপালের আধিপত্য অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণ দাবি করেছেন তাঁরা গৌড়রাজকে গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। এই সময়ের ত্রি-শক্তি সংঘর্ষে লিপ্ত অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট ধর্মপালের কর্তৃত্বাধীন কনৌজের সামন্তরাজ চক্রায়ুধকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। ধর্মপাল কিন্তু কূটকৌশলের সাহায্যে রাষ্ট্রকূট সম্রাটের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে প্রতিহার সম্রাটকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন।

মৌর্য ও গুপ্তযুগের গৌরবশ্রী-মণ্ডিত পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করে ধর্মপাল নিঃসন্দেহে পালসাম্রাজ্যের গৌরববৃদ্ধি করেছিলেন।

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল (আঃ ৮৩০-৮৭০ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেবপাল পিতার মতই শক্তিশালী ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি পশ্চিমের প্রতিহার ও দক্ষিণের দ্রাবিড় (রাষ্ট্রকূট)-দিগের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। প্রতিহাররাজকে তিনি পরাজিত করেন, তাঁর কনৌজ উদ্ধারের চেষ্টাও ব্যর্থ করেন। দেবপাল উড়িষ্যা ও আসাম জয় করেন, হূনদিগের বিরুদ্ধেও তিনি জয়ী হন। দেবপাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সুবর্ণদ্বীপের (সুমাত্রা) শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের সভায় দূত পাঠিয়ে নালন্দায় একটি সংঘারাম নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করলে দেবপাল সানন্দে তাঁর প্রার্থনা অনুমোদন করেন ও সংঘারামের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন।

দেবপালের সময় থেকেই দক্ষিণপূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাঙ্গালীদিগের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। সুমাত্রা যবদ্বীপ ও মালয় উপদ্বীপ নিয়ে গঠিত বিখ্যাত শৈলেন্দ্র বা শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূচনা দেবপালের সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।

পালশক্তির অবনতি ঃ

দেবপালের পর তাঁর বংশধরেরা দুর্বল হয়ে পড়ে ; ফলে পাল প্রভুত্বের অবসান ঘটে। পালরাজ্যের অভ্যন্তরে 'কম্বোজ' নামে এক রাজবংশ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে শক্তিশালী হয়ে উঠে। দক্ষিণ ভারতের চোলবংশীয় নৃপতিগণও বঙ্গদেশ আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ হন। এইভাবে নানা শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পালশক্তির পতন ঘটতে থাকে।

প্রথম মহীপাল ও দ্বিতীয় মহীপাল ঃ কৈবর্ত বিদ্রোহ

প্রথম মহীপাল (আঃ ৯৮০-১০৩০ খ্রীঃ) পাল বংশের মর্যাদা কিছু পরিমাণে পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন। তিনি কম্বোজ নামে পার্বত্য উপজাতিকে বিতাড়িত করেন। তিনি চোল আক্রমণও প্রতিহত করেন। মহীপাল বৌদ্ধপণ্ডিত ধর্মপালের অধীনে একটি বৌদ্ধ মিশন তিব্বতে প্রেরণ করেন। তাঁর পরবর্তী পাল শাসক নয়পালের সময় বিখ্যাত বাঙালী বৌদ্ধপণ্ডিত অতীশের অধীনে আর একটি বৌদ্ধ মিশন তিব্বতে প্রেরিত হয়েছিল। পাল শাসকদিগের মধ্যে মহীপাল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর সম্মানে বাংলা দেশে এখনও নানা সঙ্গীত প্রচলিত আছে। প্রথম মহীপালকে পাল বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতারূপেও অভিহিত করা হয়।

দ্বিতীয় মহীপাল আনুমানিক ১০৮০ খ্রীষ্টাব্দে পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ে বরেন্দ্রের কৈবর্তেরা বিদ্রোহী হন। বিদ্রোহীদের নায়ক ছিলেন দিব্ব বা

দিব্বোক নামে জনৈক চাষী কৈবর্ত। তিনি যুদ্ধে মহীপালকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং নিজেকে উত্তরবাঙ্‌লার বরেন্দ্রে স্বাধীন নৃপতিরূপে ঘোষণা করেন। উত্তর বাঙ্‌লার কৈবর্তস্তম্ভ এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করেছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর সংস্কৃতে রচিত 'রামচরিতম্' কাব্যে কৈবর্ত বিদ্রোহ ও রামপালের সময়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

দ্বিতীয় মহীপালের পরে খ্যাতিমান্ পালরাজা ছিলেন রামপাল। তিনি দিব্বের উত্তরাধিকারী ভীমকে পরাজিত করেন এবং পাল প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন করেন। রামপাল সামরিক বলে কামরূপ, উড়িষ্যা, অঙ্গ, মগধ প্রভৃতি স্থান জয় করেন। রামপালের সময় কলিঙ্গের শক্তিশালী রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে কলিঙ্গরাজের বিরুদ্ধে রামপালই জয়ী হন এবং উড়িষ্যায় পালপ্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হন। কিন্তু রামপালের পর পাল সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন ঘটে। যতদূর জানা যায়, দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট অঞ্চলের 'সেন' পদবীধারী 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়' গোষ্ঠী দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে পালদিগের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশে ক্ষমতা অধিকার করেন।

সামন্তসেন ও তাঁর পুত্র হেমন্তসেন প্রথমে পালনৃপতিদিগের অধীনে সামন্তরাজা ছিলেন। পরে তাঁরা রাঢ় অঞ্চলে (পশ্চিম বাংলায়) প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

বিজয় সেন (আঃ ১০৯৫-১১৫৮ খ্রীঃ) ঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন পালরাজা মদনপালকে পরাজিত করে বঙ্গদেশের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করেন। তিনিই ছিলেন সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। বিজয়সেনের দেওপাড়া-শিলালিপি পাঠে জানা যায়, তিনি গৌড়, মিথিলা, কলিঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। তাঁর "নৌবহর গঙ্গার জলপথে পশ্চিমদিকে রাজ্যজয়ে অগ্রসর হয়েছিল।" বিজয়সেন পশ্চিমবাংলায় বিজয়পুর নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। "বিক্রমপুর" নামে দ্বিতীয় একটি রাজধানীও তিনি পূর্ববাংলায় স্থাপন করেন।

বল্লাল সেন ঃ বিজয়সেনের পুত্র বল্লাল সেন সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ ও উত্তর বিহারের একটি বৃহৎ অংশে সেনরাজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে 'কৌলিন্য' প্রথার প্রবর্তক ছিলেন তিনি। তাঁর আমলে বাংলায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ—এই তিন শ্রেণীর 'কুলীন' নামে একটি বিশেষ সম্মানিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। বল্লাল সেন ছিলেন একজন বিদ্বান্ ব্যক্তি ও গ্রন্থ-প্রণেতা। তাঁর প্রণীত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' জনসমাজে এখনও প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্মণ সেন (আঃ ১১৭৯-১২০৫ খ্রীঃ) ঃ অনেক বয়সে (প্রায় ষাট বৎসর) লক্ষ্মণ সেন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় ও রাজ্যশাসনে সমান যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেন গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ ও কাশীর রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন এবং কাশী, প্রয়াগ ও পুরীতে 'জয়স্তম্ভ' স্থাপন করেছিলেন। তিনি গাহড়বাল বংশীয় জয়চন্দ্রকে মগধে তাঁর অধিকৃত অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। নিজের নাম চিরস্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যে তিনি রাজধানী

গৌড়ের নাম দিয়েছিলেন 'লক্ষ্মণাবতী'। গঙ্গাতীরে নদীয়াতে তিনি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

নদীয়ার পতন (১২০২ খ্রীঃ) : শীঘ্রই সেন রাজবংশ এক মহাবিপদের সম্মুখীন হল। মহম্মদ ঘুরীর এক তুর্কী সেনাপতি এই সময়ে বাংলা আক্রমণ করল। লোকশ্রুতিতে শোনা যায়, ইখ্‌তিয়ার-উদ্-দীন্-মহম্মদ-বিন-বখ্‌তিয়ার খল্‌জী নামে এই সেনাপতি মাত্র সতের জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া জয় করেন। মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-উদ্দীন-সিরাজের মতে রাজা লক্ষ্মণ সেন ('রায় লখ্‌মনিয়া') বখতিয়ারের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ না করেই নদীয়া পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করেছেন বখতিয়ার খল্‌জি ছদ্মবেশে অল্প কয়েকজন সৈন্যসহ নদীয়াতে প্রবেশ করলেও তাঁর পশ্চাতে এক বিশাল সেনাবাহিনী ছিল।

[খ] দাক্ষিণাত্য

বাদামির রাষ্ট্রকূটগণ—চালুক্যগণ—দ্বিতীয় পুলকেশীর কৃতিত্ব—তৃতীয় গোবিন্দ ও তৃতীয় কৃষ্ণ—কল্যাণের 'পরবর্তী চালকুগণ'—ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের (আঃ ১০৭৬-১১২৮ খ্রীঃ) কৃতিত্ব।

'দাক্ষিণাত্য' বলতে ভৌগোলিক অর্থে সাধারণতঃ বিন্ধ্যপর্বত ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী ভূভাগকেই বুঝায়। 'দাক্ষিণাত্যে'র আরও দক্ষিণে অবশিষ্ট ভারত 'সুদূর দক্ষিণ ভারত' নামে পরিচিত।

চালুক্য বংশ :

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে চালুক্যগণ কয়েক শতাব্দী ধ'রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু চালুক্যদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ তাঁরা উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত ছিলেন এবং অযোধ্যা অঞ্চল থেকে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে চলে যান। বাদামির (বাতাপির) চালুক্যগণ অবশ্য নিজেদেরকে 'মালব্য গোত্র'-ভুক্ত ও হারীতি-পুত্র বলে দাবি করতেন।

ষষ্ঠশতকের মধ্যভাগে (প্রথম) পুলকেশী দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের কানাড়ী ভাষা-ভাষী অঞ্চলে বাতাপিকে (বিজাপুর জেলার বাদামি) কেন্দ্র ক'রে একটি ছোট রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি আপন প্রভুত্বের পরিচায়ক হিসাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর পুত্র প্রথম কীর্তিবর্মন (আঃ ৫৬৬ খ্রীঃ) উত্তর কোঙ্কন এবং উত্তর কানাড়া পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কীর্তিবর্মনের পুত্র (দ্বিতীয়) পুলকেশী (৬০৯-৬৪২ খ্রীঃ) ছিলেন এই বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নৃপতি। তাঁর সামরিক কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তিনি উত্তর কানাড়া জেলায় কদম্বদিগের রাজধানী জয় করেন। মহীশূরের গঙ্গ, উত্তর কোঙ্কনের মৌর্য, দক্ষিণ গুজরাটের লাট এবং মালবের গুর্জরদিগকে তিনি পরাজিত করেন, মহাকোশল এবং কলিঙ্গের রাজারাও তাঁর নিকট পরাজিত হন। কিন্তু

পুলকেশীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সামরিক গৌরব হল 'উত্তরাপথনাথ' হর্ষের বিরুদ্ধে তাঁর জয়লাভ। পুলকেশীর বাধাদানের ফলে হর্ষবর্ধন নর্মদা অতিক্রমে ব্যর্থ হন এবং নিজরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। পল্লবরাজ (প্রথম) মহেন্দ্রবর্মনকে পরাজিত ক'রে তিনি কাঞ্চী পর্যন্ত অগ্রসর হন। চোল, কেরল ও পাণ্ড্যগণ তাঁর নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হল। এইভাবে পুলকেশী নর্মদা থেকে কাবেরী নদীর অপর তীর পর্যন্ত দক্ষিণভারতের এক বিরাট অঞ্চল তাঁর ক্ষমতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে তাঁর রাজধানী বাতাপি অধিকার করেন।

চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ পুলকেশীর রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর কল্যাণমূলক নানা কার্যাবলী তাঁর রাজ্য সীমার বাইরেও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। পুলকেশীর প্রশংসা ক'রে হিউয়েন-সাঙ্ বলেছেন, "তাঁর প্রজাবর্গ নির্বিবাদে তাঁর শাসন মেনে চল্‌ত।"

(দ্বিতীয়) পুলকেশীর মৃত্যুর পর বাতাপির চালুক্য শক্তির সাময়িক অবনতি ঘটে কিন্তু পল্লবদিগের সঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত গতিতেই চলে। এই সময়ে চালুক্যরা একাধিকবার পল্লব রাজধানী কাঞ্চী লুণ্ঠন করে এবং তাদের নিকট চোল, কেরল ও পাণ্ড্যগণ পরাজিত হয়। চালুক্যরাজ (দ্বিতীয়) বিক্রমাদিত্য (৭৩৩-৭৪৬ খ্রীঃ) আরবদিগের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং দক্ষিণ ভারতকে আরব-আক্রমণের আতঙ্ক থেকে রক্ষা করেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রকূট নায়ক দন্তিদুর্গ শক্তিশালী হয়ে মহারাষ্ট্র অঞ্চল অধিকার করে নেন (আঃ ৭৫৩ খ্রীঃ)।

চালুক্য রাজাদিগের ধর্মীয় সহনশীলতা এখানে উল্লেখ্য। হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা থেকে জানা যায় বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি হলেও তখন চালুক্য রাজ্যে অন্ততঃ একশটি বৌদ্ধ মঠ ছিল। অজন্তায় গুহা মন্দির নির্মাণরীতি চালুক্য যুগে বিশেষভাবে প্রচলিত হয় এবং হিন্দু দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের পূজা এই সময়ে জনপ্রিয় হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রকূটবংশ ঃ বাতাপির চালুক্যদিগের অবনতির সময়ে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটগণ প্রবল হয়। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রায় দুইশত বৎসর তাঁরা দক্ষিণ ভারতে প্রভুত্ব করেছিলেন। অনুশাসনে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় তাঁরা প্রথমে ছিলেন চালুক্যদিগের অধীনে বংশানুক্রমিক 'সামন্তরাজ'। তাঁদের আদি বাসভূমি ছিল সম্ভবতঃ কর্ণাটকে এবং মাতৃভাষা ছিল কানাড়ী। মান্যখেতে (নিজাম রাজ্যভুক্ত মালখেদে) তাঁরা রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে প্রথম অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে (৮১৪-৮৭৭ খ্রীঃ)।

রাষ্ট্রকূট শক্তির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম দন্তিদুর্গ। তিনি চালুক্যরাজ (দ্বিতীয়) কীর্তিবর্মনকে পরাজিত করে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাষ্ট্র অঞ্চল অধিকার করে নেন। তাঁর বংশধর প্রথম কৃষ্ণ (৭৬৮-৭৭২ খ্রীঃ) কোঙ্কন জয় করেন এবং মহীশূরের গঙ্গদের ও বেঙ্গীর চালুক্য শাসককে পরাজিত করেন। ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথের

মন্দির ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ঐতিহাসিক স্মিথ এই মন্দিরকে বলেছেন "স্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন।"

প্রথম কৃষ্ণের পর তাঁর পুত্র ধ্রুব নিরুপম রাজা হন (৭৭৯-৭৯৩ খ্রীঃ)। তাঁর সময় থেকেই রাষ্ট্রকূটদিগের "গৌরবময় যুগ" শুরু হয়। কাঞ্চীর পল্লব রাজা তাঁর নিকট পরাজিত হন। উত্তর ভারতের ত্রিশক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধ্রুবের কৃতিত্বের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ধ্রুবের পর তৃতীয় গোবিন্দ 'জগশুঙ্গ' (৭৯৩-৮১৪ খ্রীঃ) কাঞ্চীর পল্লবরাজাকে পরাজিত করেন। তিনি ত্রিশক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গুর্জর ও পাল রাজাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সামরিক কৃতিত্ব হল চোল, পাণ্ড্য, কাঞ্চী ও মহীশূরের গঙ্গবংশীয় রাজাদের মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়লাভ। এই জয়লাভের ফলে (তৃতীয়) গোবিন্দ কার্যতঃ দক্ষিণ ভারতে তাঁর অধিরাজত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। (তৃতীয়) গোবিন্দের পুত্র (প্রথম) অমোঘবর্ষ (আঃ ৮১৪-৮৭৭ খ্রীঃ) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বেঙ্গীর চালুক্যরাজকে পরাজিত করেন, বিহার ও বঙ্গদেশ সমেত তিনি সমগ্র পূর্ব ভারতে রাষ্ট্রকূট প্রাধান্য বিস্তার করেন। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ অপেক্ষা ধর্ম ও সাহিত্যচর্চায় তিনি অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং গ্রন্থ রচনাতেও তাঁর অধিকার ছিল।

অমোঘবর্ষ প্রতিহারদিগের দক্ষিণ দিকে সামরিক অগ্রগতি প্রতিহত করলেও উত্তর ভারতে পিতার ন্যায় সামরিক কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নাই। অমোঘবর্ষের প্রপৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র কনৌজের প্রতিহাররাজ মহীপালকে পরাজিত করে সাময়িকভাবে কনৌজ অধিকার করে রাষ্ট্রকূটদিগের সামরিক গৌরব বৃদ্ধি করেন। আরব বণিক সুলেমান নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি অমোঘবর্ষকে তৎকালের চারজন শ্রেষ্ঠ নরপতির একজন রূপে অভিহিত করেছেন (অপর তিনজন হলেন, বগদাদের খলিফা, চীনের সম্রাট এবং কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট)। সিন্ধুর আরবদিগের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদিগের মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল।

(প্রথম) অমোঘবর্ষের প্রপৌত্র তৃতীয় কৃষ্ণ (আঃ ৯৩৯-৯৪৮ খ্রীঃ) রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ বিখ্যাত শাসক ছিলেন। তিনি গুর্জর প্রতিহারদিগকে পরাজিত করে কালঞ্জর ও চিত্রকূট ছিনিয়ে নেন এবং দক্ষিণে কাঞ্চী ও তাঞ্জোর অধিকার করেন। তাক্কোলমের বিখ্যাত যুদ্ধে (৯৪৯ খ্রীঃ) চোলদিগের বিরুদ্ধে তিনি কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভ করেন এবং পাণ্ড্য ও কেরলদিগের গর্ব খর্ব করেন। এই সময়ে সিংহলের রাজাও তাঁকে কর দিতে বাধ্য হন।

তৃতীয় কৃষ্ণের পর তাঁর বংশধরদিগের দুর্বলতার জন্য ৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পর রাষ্ট্রকূট বংশের পতন হয়। মালবের পরমারগণ রাজধানী মান্যখেত লুণ্ঠন করেন। অবশেষে রাষ্ট্রশাসক চতুর্থ অমোঘবর্ষকে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয় তৈলপ (তৈল) রাষ্ট্রকূটদিগের অধীনতা অস্বীকার করে হায়দরাবাদের কল্যাণে (কল্যাণী) স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তৈলপের স্থাপিত বংশ ইতিহাসে 'কল্যাণের পরবর্তী চালুক্য বংশ' (Later Chalukyas of Kalyan) নামে পরিচিত হয়।

কল্যাণের চালুক্যগণ নিজেদের বাতাপির চালুক্যদের বংশধর বলে দাবি করতেন। তাঞ্জোরের চোলগণ এই সময়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেন। রাজরাজ চোল ও তাঁর পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র চোল 'কুলোতুঙ্গ' দ্রুত শক্তি অর্জন ক'রে চালুক্যদিগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈলপের ষষ্ঠ অধস্তন শাসক সোমেশ্বর "আহবমল্ল" চালুক্য বংশের গৌরব কিছু পরিমাণে উদ্ধার করলেও পরে রাজেন্দ্র চোলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হন।

সোমেশ্বর 'আহবমল্লে'র পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য 'ত্রিভুবনমল্ল' (১০৭৬-১১২৭ খ্রীঃ) দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ব লাভের জন্য তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল (১ম) কুলোতুঙ্গের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ছিলেন পরাক্রমশালী রাজা। তিনি একাধিকবার চোলরাজ্য আক্রমণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত চোলরাজকে পরাজিত ক'রে বেঙ্গি রাজ্য জয় করেন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য 'ত্রিভুবমল্ল' উপাধি নিয়ে পুরাতন 'শক নৃপতির গণনা' পরিত্যাগ ক'রে এক নূতন অব্দের প্রচলন করেন। সামরিক কৃতিত্ব ছাড়াও ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল হিন্দু আইনের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর আমলেই হিন্দু আইন-বিশারদ বিজ্ঞানেশ্বর হিন্দু আইন যথাযথভাবে বিধিবদ্ধ করে খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময় কাব্যচর্চার জন্য চালুক্য রাজসভার খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পুত্র ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তৃতীয় সোমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় বিহ্লন তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত' রচনা ক'রে খ্যাতিলাভ করেন। তৃতীয় সোমেশ্বরের মৃত্যুর পর চালুক্যদিগের ক্ষমতা হ্রাস পায়। ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর কল্যাণের সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে—দেবগিরিতে যাদবগণ, বরঙ্গলে কাকতীয় এবং দোরসমুদ্রে হোয়সলগণ রাজত্ব করতে থাকেন। অবশেষে তিনটি রাজ্যই মুসলমান শাসনাধিকৃত হয়।

[গ] দক্ষিণ ভারত

কাঞ্চীর পল্লবগণ—কয়েকজন বিখ্যাত শাসক—পল্লব-চালুক্য দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তাঞ্জোরের চোলগণ—প্রথম রাজরাজ চোল ও প্রথম রাজেন্দ্র চোলের কৃতিত্ব—বহির্ভারতে সামুদ্রিক অভিযান

দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত রাজবংশের ন্যায় পল্লবদিগেরও উৎপত্তির আদি ইতিহাস অনেকটা অস্পষ্ট। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতৈক্য দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে পল্লবদিগের সিংহল দেশীয় বলা হয়েছে। তবে এসব বিবরণ কোনটাই প্রমাণিত হয় নাই।

গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতে বিজয় অভিযান কালে কাঞ্চীর পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপকে পরাজিত করেছিলেন। পল্লবদিগের ইতিহাস স্পষ্টভাবে জানা যায় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। ঐ শতাব্দীর শেষদিকে 'মহান্-পল্লব' বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিংহবিষ্ণু রাজা হন। তিনি দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। কথিত আছে,

তিনি পাণ্ড্য, চোল ও চের রাজ্যের রাজাদের ও সিংহলরাজকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (সপ্তম শতকের প্রথমদিকে) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজিত হন। মহেন্দ্র বর্মনের পুত্র প্রথম নরসিংহ বর্মন (৬৪২-৬৬৮ খ্রীঃ) পল্লব বংশের সর্বাপেক্ষা সফল ও কীর্তিমান শাসক ছিলেন। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাতাপি অধিকার করেন এবং সম্ভবত দ্বিতীয় পুলকেশীকে নিহত করেন। এই জয়লাভের ফলে পল্লবগণ দক্ষিণ ভারতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজবংশ রূপে পরিগণিত হয়। নরসিংহ বর্মন সিংহলের বিরুদ্ধে একাধিক নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন এবং সিংহলের সিংহাসনে তাঁর মনোনীত এক ব্যক্তিকে বসিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ্ কাঞ্চী পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, 'এখানকার ভূমি উর্বরা, নিয়মিত চাষ হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। অনেক ফুল এবং ফলও জন্মে। এই রাজ্যে মূল্যবান্ মণিমুক্তা ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। আবহাওয়া উষ্ণ, মানুষেরা সাহসী। সত্যবাদিতা ও সত্যনিষ্ঠার প্রতি তাঁরা গভীর ভাবে অনুরক্ত এবং বিদ্যাচর্চা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন।"

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে পল্লব-চালুক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের অনুশাসনে প্রদত্ত পরস্পর-বিরোধী বংশপ্রশস্তি পাঠ করলে কে কখন কার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন। একটি উক্তি থেকে জানা যায় চালুক্য নৃপতি প্রথম বিক্রমাদিত্য প্রথম পরমেশ্বর বর্মনকে পরাজিত করে কাঞ্চী অধিকার করেন এবং কাবেরী পর্যন্ত অগ্রসর হন। ৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অল্প পরেই চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পুনরায় কাঞ্চী অধিকার করেন ; পল্লবগণ অবশ্য পরে তাঁদের রাজধানী শত্রুকবল থেকে মুক্ত করেন এবং চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতির বিরুদ্ধেও জয়লাভ করেন। কিন্তু এই সময় রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গ শক্তিশালী হয়ে এঁদের সকলকেই যুদ্ধে পরাজিত করেন। নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে রাষ্ট্রকূটগণ তৃতীয় গোবিন্দের নেতৃত্বে পল্লবরাজ দন্তিবর্মনকে পরাজিত করেন (আঃ ৭৭৬-৮২৮ খ্রীঃ)। সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্যদিগের রাজা সংঘর্ষে লিপ্ত হলে পল্লবদিগের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন (আঃ ৮৮০ খ্রীঃ)। শেষ পর্যন্ত চোলরাজ প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিতবর্মনকে পরাজিত ক'রে পল্লব রাজ্য (তোণ্ডমণ্ডলম্) অধিকার করে নেন।

পল্লব নৃপতিগণ ধর্ম বিষয়ে ছিলেন উদার এবং পরমতসহিষ্ণু। তাঁরা শৈবমতাবলম্বী হিন্দু হলেও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও নির্গ্রন্থ (জৈন)-দের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় পল্লব রাজধানী কাঞ্চীতে তখন শত শত বৌদ্ধমঠের অস্তিত্ব ছিল। পল্লবদিগের আমলে বৈষ্ণবধর্মও প্রচারিত হয়েছিল। শিল্প এবং সাহিত্যেও পল্লবগণ বিস্ময়কর উন্নতি করেছিলেন।

তাঞ্জোরের চোলগণ

চোলদিগের উদ্ভবঃ জানা যায় চোলগণ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলে তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লীতে প্রথম অধিকার বিস্তার করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পল্লব শক্তির অবনতি ঘটলে চোলদিগের অভ্যুত্থানের সুযোগ হয়। পল্লব সামন্তরাজ বিজয়ালয় নবম শতাব্দীর শেষদিগের পাণ্ড্যদিগের কর্তৃত্ব থেকে তাঞ্জোর অধিকার করেন এবং তখন থেকে তাঞ্জোরই হয় চোল রাজ্যের রাজধানী। বিজয়ালয়ের পুত্র প্রথম আদিত্য (আঃ ৮৭১-৯০৭ খ্রীঃ)। শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি পল্লবরাজকে পরাজিত করে তাদের রাজ্য 'তোণ্ডমণ্ডলম্' অধিকার করেন। তাঁর মৃত্যুকালে চোলরাজ্য উত্তরে মাদ্রাজ থেকে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম পরান্তক চোল পল্লব শক্তি নির্মূল করে পাণ্ড্যদিগের রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণ তাক্কোলমের যুদ্ধে (৯৪৯ খ্রীঃ) চোলদের পরাজিত করে তাঞ্জোর ও কাঞ্চি অধিকার করেন। সাময়িকভাবে চোলদিগের প্রাধান্য খর্ব হয়।

চোল প্রভুত্বের যুগঃ প্রথম রাজরাজ চোল (আঃ ৯৮৫-১০১৬ খ্রীঃ)ঃ প্রথম পরান্তকের প্রপৌত্র **প্রথম রাজরাজ** চোল দক্ষিণ ভারতে চোল প্রভুত্ব পুনঃস্থাপিত করেন। তিনি চেরদিগের নৌশক্তি ধ্বংস করেন এবং তাদের রাজ্য অধিকার করে নেন। মাদুরা অধিকৃত হয় এবং পাণ্ড্যরাজ বন্দী হন। রাজরাজ তাঁর প্রবল নৌশক্তির সাহায্যে সিংহল আক্রমণ করেন এবং দ্বীপের উত্তরাঞ্চল অধিকার করে চোল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করেন। মহীশূরের একটা বৃহদংশও চোলরা এই সময় অধিকার করলেন। পশ্চিমের চালুক্যদিগের সঙ্গে রাজরাজের সংঘর্ষ ঘটে এবং চোল নৃপতি পশ্চিমের চালুক্য প্রদেশগুলিও নিজ কতৃত্বাধীনে আনতে সমর্থ হন। পূর্ব চালুক্যদিগের অধীন বেঙ্গি প্রদেশটি তিনি আক্রমণ করেন। বেঙ্গিরাজ বিমলাদিত্য তাঁকে অধিরাজ রূপে স্বীকার করেন এবং রাজরাজের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন।

রাজরাজের সময়ে চোলদিগের নৌশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তিনি 'সমুদ্রের ১২০০০ পুরাতন দ্বীপে' চোলদিগের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। 'পুরাতন দ্বীপগুলি' বলতে সম্ভবতঃ মালদ্বীপ ও লক্ষাদ্বীপকেই বুঝান হয়েছে। প্রথম রাজরাজের সময়ে চোল সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিস্তৃত। রাজরাজের অধিকারে ছিল বর্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সমগ্র অংশ, মহীশূর ও কুর্গের বৃহদংশ, সিংহলের উত্তরাংশ এবং 'সমুদ্রের দ্বীপসমূহ'। রাজরাজ তাঁর শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্যে চোলদিগের অধীনে এক বিস্তীর্ণ নৌ-সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিলেন।

প্রথম রাজরাজের পুত্র ও যোগ্য উত্তরাধিকারী প্রথম রাজেন্দ্র চোল (আঃ ১০১৬-১০৪৪ খ্রীঃ) চোল শক্তিকে উন্নতির শীর্ষে তুলে ধরেন। চোল প্রভুত্ববিস্তারে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। রাজেন্দ্র চোল পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিজয় অভিযান শুরু করেন। সমগ্র সিংহল দ্বীপে তাঁর অধিকার প্রসারিত হয়। পাণ্ড্য ও

কেরল অঞ্চলে চোলশাসন তিনি আরও কার্যকরী করলেন। এরপর তিনি সংগ্রামে রত হলেন পশ্চিমের চালুক্যদিগের বিরুদ্ধে। কিন্তু রাজেন্দ্র চোল ছিলেন উচ্চাভিলাষী, চোল সাম্রাজ্যিক গৌরব আরও বৃদ্ধি করতে তিনি সচেষ্ট হলেন। দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ অঞ্চলে প্রভুত্ব করে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। রাষ্ট্রকূটদিগের ন্যায় তিনিও উত্তর ভারতে সামরিক অভিযানে সাফল্য অর্জন করতে প্রয়াসী হলেন। রাজেন্দ্র চোলের বিজয় বাহিনী অনায়াসেই গঙ্গাতীর পর্যন্ত অগ্রসর হল এবং ১০২১ থেকে ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বঙ্গ-বিহারের পাল নৃপতি প্রথম মহীপালকে পরাজিত করে পাল রাজ্যটি চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন। সমসাময়িক চোল অনুশাসন থেকে জানা যায় রাজেন্দ্র চোল উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ কোশল (মধ্য ভারত), বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলা অধিকার করলেন। তাঁর বিজয় বাহিনী দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ় বঙ্গ এবং পূর্ব বঙ্গ বিধ্বস্ত করলেন। তবে এই সব দূরবর্তী অঞ্চল তিনি চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন উত্তর ভারতে রাজেন্দ্র চোলের অভিযানের প্রত্যক্ষ ফল হল শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত কর্ণাটকের কিছু সামন্তকে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা। সমরাভিযান সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করে গর্বিত চোল নৃপতি উত্তর ভারত থেকে বিজয়গর্বে দক্ষিণ ভারতে ফিরে এলেন। গাঙ্গেয় বদ্বীপ ভূভাগে কৃতিত্বপূর্ণ জয়ের স্মারক হিসাবে তিনি 'গঙ্গাইকোণ্ড' উপাধি গ্রহণ করলেন। 'গঙ্গাইকোণ্ড-চোলপুরম্' (আধুনিক গঙ্গ-কোণ্ডপুরম্) নামে নতুন এক রাজধানী স্থাপন করলেন এবং রাজধানীর সন্নিকটে একটি বৃহৎ দীঘি খনন করলেন। নিকটবর্তী নদী থেকে খাল খনন করে, জল এনে পূর্ণ করলেন দীঘিটি। এইসব প্রশংসনীয় কীর্তির জন্য রাজেন্দ্র চোল ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

রাজেন্দ্র চোলের অপর একটি সামরিক কৃতিত্ব হল তিনি মাসাঙ্গির যুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের চালুক্য নৃপতিকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছিলেন। চালুক্যরাজ সোমেশ্বর আহবমল্ল অবশ্য কোপ্পমের যুদ্ধে জয়লাভ করে বংশের হৃতগৌরব কিছু পরিমাণে উদ্ধার করতে সমর্থ হন কিন্তু পরে কুদাল সঙ্গমমের যুদ্ধে তিনি রাজেন্দ্র চোলের হস্তে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন।

প্রথম রাজরাজের ন্যায় প্রথম রাজেন্দ্র চোল সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তুলেছিলেন। এই নৌবহরের সাহায্যে তাঁর সময়ে চোলরা বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে ব্রহ্মদেশের পেগু প্রদেশটি জয় করেন এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেন। চোল নৃপতিদিগের এই সব সামুদ্রিক অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ভারত এবং ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তোলা এবং এইভাবে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে চোল সাম্রাজ্যের সম্পদ ও শ্রী বৃদ্ধি করা।

রাজেন্দ্র চোল দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলেও চোল সাম্রাজ্যের আয়তন অটুট

রেখেছিলেন। তাঁর পিতার সময়ে অধিকৃত সমুদ্রমধ্যস্থ পুরাতন দ্বীপগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ তিনি যথাযথভাবেই বজায় রেখেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে প্রথম রাজেন্দ্র চোল নিঃসন্দেহে একটি উচ্চ আসনের অধিকারী।

রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম **রাজাধিরাজ** ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে চোলবংশের সিংহাসন অধিকার করেন। ইনিও পিতার ন্যায়ই যোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে চোল-চালুক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই সময়ে চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পাণ্ড্য ও কেরলগণ বিদ্রোহ করেছিলেন, সিংহল দ্বীপেও বিদ্রোহ ঘটে কিন্তু রাজাধিরাজ নিজ যোগ্যতাবলে এই সকল বিদ্রোহ দমন করেন এবং তাঁর কৃতিত্বের স্মারক হিসাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। কিন্তু এর পরেই পশ্চিমী চালুক্য নৃপতি প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্লের সঙ্গে সংগ্রামে **কোপনের যুদ্ধে** রাজাধিরাজ পরাজিত ও নিহত হন (১০৫২ খ্রীঃ)। রাজাধিরাজের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় রাজেন্দ্র (১০৫২-১০৬৪) চালুক্যরাজ সোমেশ্বরের সঙ্গে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। সমসাময়িক অনুশাসন এবং বিহ্লনরচিত কাব্য 'বিক্রমাঙ্কচরিত' থেকে জানা যায় **দ্বিতীয় রাজেন্দ্র** কাঞ্চি জয় করেছিলেন। পরবর্তী চোল নৃপতি **বীর রাজেন্দ্র** (১০৬৪-১০৭০ খ্রীঃ) কুদাল সঙ্গমের যুদ্ধে সোমেশ্বরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। পূর্ব চালুক্য রাজ্য বেঙ্গিও এই সময় চোল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বীর রাজেন্দ্রের সময় চোল নৌবাহিনী পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সাফল্যের সঙ্গে অভিযান করেছিল।

প্রথম কুলোতুঙ্গ (১০৭০-১১২২ খ্রীঃ) **:** বীর রাজেন্দ্র মৃত্যুর পর চোল রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বীর রাজেন্দ্রের পুত্র অধিরাজেন্দ্র নিহত হন এবং প্রথম রাজেন্দ্র চোলের দৌহিত্র প্রথম কুলোতুঙ্গ (তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল) চোল সাম্রাজ্যের ক্ষমতা হস্তগত করেন। কিন্তু চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ও প্রথম কুলোতুঙ্গ চোল আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় উভয়েই দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্বের সম-অংশীদার হলেন। এইরূপে চোল-চালুক্য দুই বংশের মিলন ঘটল। বেঙ্গির পূর্ব চালুক্য রাজ্যটি চোলরাজ্যের প্রদেশে পরিণত হল। রাজেন্দ্র চোল কুলোতুঙ্গের পর চোলদিগের ক্ষমতা হ্রাস পায়। চোল সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশ পাণ্ড্যদিগের হস্তগত হয়। গোদাবরী ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল—একসময়ে যেখানে প্রথম রাজেন্দ্র চোলের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছিল—সেখানে উদ্ভব ঘটল পূর্ব-গঙ্গদিগের কর্তৃত্বাধীনে কলিঙ্গ ও উড়িষ্যায় একটি নতুন সাম্রাজ্য। দক্ষিণ মহীশূর অঞ্চল হোয়সলগণ অধিকার করল। সমুদ্রের পরপারের অঞ্চলগুলি কুলোতুঙ্গের সময়ই চোলদিগের হস্তচ্যুত হয়। কুলোতুঙ্গ দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। জমি জরীপের সাহায্যে কর নির্ধারণের ব্যবস্থা করে তিনি ঐতিহাসিকদিগের প্রশংসা অর্জন করেছেন।

কুলোতুঙ্গের পর দুর্বল চোল শাসকগণ সাম্রাজ্যের ঐক্যরক্ষায় অসমর্থ হলেন। সিংহল, কেরল ও পাণ্ড্যরাজ্য চোলবংশের হস্তচ্যুত হল। চোল শক্তির দ্রুত পতন ঘটল।

রাজেন্দ্র চোলের একদা শক্তিশালী চোল সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট স্বয়ংশাসিত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল।

চোলদিগের সুসংগঠিত প্রশাসন ব্যবস্থা ইতিহাসে প্রশংসিত হয়েছে। চোল অনুশাসনে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় চোল সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশ ও করদ সামন্ত-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি প্রদেশ আবার বিভক্ত ছিল ক্ষুদ্রতর অংশে। চোল প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত মহাসভা ও সমিতিগুলি। চোল সাম্রাজ্যে আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় উদারতা। হিন্দু, শৈব, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাস করত। চোল আমলের মন্দিরগুলি ভারতের স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

[ক] সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

ভারতের ইতিহাসে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ের মোটামুটি ভাবে গুপ্তোত্তর যুগরূপে অভিহিত করা হয়। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পাঁচশ বৎসরের অধিক কালকে কোন একটি নির্দিষ্ট নিরিখের উল্লেখে অভিহিত করা অসুবিধাজনক, যেহেতু এই কয়েকশত বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রাজবংশ প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই সমস্ত রাজবংশগুলির মধ্যে বাংলার পাল ও সেন বংশ, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট বংশ, মধ্যভারতের চন্দেল্ল ও মহান্‌ গঙ্গবংশ এবং দক্ষিণ ভারতের পল্লব ও চোলবংশ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নিজ নিজ প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

পাল ও সেনগণ একত্রে প্রায় পাঁচশত বৎসর বাংলাদেশে রাজত্ব করেছিলেন। পাল ও সেন যুগকে সমাজ ও সংস্কৃতির বিচারে সকল ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করে বর্ণনা করা না গেলেও মোটামুটি ভাবে পাল ও সেনদিগের আমলে বাঙালী জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা যায়।

পাল ও সেন যুগে সমাজ ও সংস্কৃতি

বাংলার সমাজজীবনে এই যুগের প্রভাব অপরিসীম। সে সময় সমাজজীবনে বৈদিক সমাজের ন্যায় বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে বৃত্তি অবলম্বনে বর্ণভেদ প্রথা সকল ক্ষেত্রে কঠোরভাবে অনুসৃত হত না। সমাজে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে সহাবস্থান করতেন। শাসকগণ বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি অনুরাগী হলেও অপরাপর ধর্মাবলম্বিগণ তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হতেন না।

তখন জীবিকা অর্জনের সাধারণ উপায় ছিল কৃষিকার্য, তবে কৃষিকার্য ছাড়াও মানুষ অন্য বৃত্তি গ্রহণ করতে পারত। সাধারণ মানুষের অবস্থা সে যুগে সচ্ছল ছিল, নানা উৎসবের মধ্য দিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠান পালিত হত। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ও ব্রতকথার প্রচলন ছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ ক'রে মেলা ও যাত্রাগানের আকর্ষণ বেশি ছিল। লাঠি খেলা, নৌকাচালনা, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি লোকে যথেষ্ট উপভোগ করত। সাধারণ মানুষ ছিল ধর্মভীরু এবং সেই জন্য সমাজে অপরাধপ্রবণতা কম ছিল।

শিক্ষালাভে সাধারণ গৃহস্থগণ ছিলেন আগ্রহী। নারীশিক্ষার প্রচলনও এই সময়ের বৈশিষ্ট্য। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থ পঠন-পাঠনের প্রতি লোকের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হত। বর্তমানের মতই অলঙ্কারের ব্যবহার তখনও

ছিল। পাল নৃপতিগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মানুরাগী, সেনযুগে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার হয় ; শাসক-শাসিতের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধে পার্থক্য থাকলেও পাল ও সেন নৃপতিগণ ধর্মবিষয়ে ছিলেন উদার এবং পরমতসহিষ্ণু।

পালযুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বাংলার সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই পাল নৃপতিগণ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পালযুগে ওদন্তপুরী, নালন্দা, বিক্রমশীলা, সোমপুর প্রভৃতি বৌদ্ধবিহার ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার এক একটি প্রধান কেন্দ্র। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বৈদিক শাস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হত। বৌদ্ধদিগের মধ্যে মহাযান-মত খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সে সময়ের বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের মধ্যে নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্র এবং পণ্ডিত ধর্মপালের নাম উল্লেখযোগ্য। বিক্রমশীলার প্রখ্যাত অধ্যাপক অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (আঃ ১০৩৮ খ্রীঃ) তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছিলেন। এই যুগে বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজা তন্ত্রমতে শুরু হয়। বস্তুতঃ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি পালযুগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বৌদ্ধ সূত্রে জানা যায় চুরাশিজন সিদ্ধাচার্যের চেষ্টায় তান্ত্রিক ধর্মের প্রচার হয়।

পালযুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। কবি ক্ষেমীশ্বর, নীতিবর্মা, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের দানে তখন সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। পালরাজ রামপালের জীবনী অবলম্বনে রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম্ পালযুগের একটি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ।

পালযুগের ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন

পালযুগেই বাংলা ভাষার চর্চা শুরু হয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন এই যুগে রচিত 'বৌদ্ধ চর্যাপদ' থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি হয়। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলী ও বাউল সঙ্গীতগুলি এই চর্যাপদের গীতিধারা অনুসরণ করেই রচিত হয়।

পালযুগের পণ্ডিত চক্রপানি দত্ত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

পালযুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ

পাল স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হলেও কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নালন্দা মহাবিহারের কোন্ অংশটি পালযুগে নির্মিত হয়েছিল বলা কঠিন। পাহাড়পুরের সোমবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিহারসংলগ্ন কিছু কিছু স্তূপ ও মন্দিরের গড়ন ও অলঙ্করণের কাজ বড়ই সুন্দর।

পালযুগের ভাস্কর্য শিল্পের বহু নিদর্শন বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এ যুগের বিশিষ্ট শিল্পী ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এক নতুন শিল্পরীতি সৃষ্টি করে অমর হয়ে আছেন।

পালযুগে নির্মিত মূর্তিগুলি পরীক্ষা করলে সে যুগের বাঙালীদিগের পোশাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সে যুগের পুরুষেরা ধুতি চাদর ও মেয়েরা শাড়ি এবং ওড়না পরতেন। পুরুষ-নারী সকলেই আংটি, কানবালা, হার প্রভৃতি অলঙ্কার ভালবাসতেন।

সেনযুগে বাঙালী সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পকলা

সেন রাজাদের আমলে বাঙালী হিন্দু সমাজে বহু শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বর্ণ-হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। হিন্দু সমাজকে নতুনভাবে সংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন কিন্তু এর ফলে সমাজে বৈষম্য ও জটিলতা বৃদ্ধি পায়, সামাজিক সংহতি বিঘ্নিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি, যেমন অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এই সময়ে শাস্ত্রীয় নিয়ম কঠোরভাবে পালন করা হত।

সেন নৃপতিগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বল্লাল সেন 'দানসাগর' 'অদ্ভুত সাগর' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন। কবি জয়দেব ছাড়াও এযুগে গুণবিষ্ণু, ধোয়ী, হলায়ুধ, উমাপতিধর প্রমুখ পণ্ডিতেরা নানা গ্রন্থ রচনা করে সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যখানির জনপ্রিয়তা এতদিন পরেও হ্রাস পায় নাই।

সেন যুগে মূর্তিগুলির অধিকাংশই ছিল বিষ্ণু, তারা, শিব প্রভৃতি দেব-দেবী অবলম্বনে নির্মিত। সে যুগের গঙ্গা মূর্তিটি বাংলার শিল্পকলার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। পাল যুগের শেষদিকে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুপ্রবেশ করায় হোম, জপ এবং নানা প্রকার ক্রিয়াকাণ্ড বৌদ্ধপদ্ধতিতে স্থানলাভ করে। ফলে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের নৈকট্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হলায়ুধের রচিত 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থখানি বাঙলার ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

বিভিন্ন রাজবংশের আমলে দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি

দাক্ষিণাত্য এবং সুদূর দক্ষিণভারতের সব কটি রাজবংশই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন। দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন যুগে সামাজিক জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম প্রবেশ করেছিল। এ অঞ্চলে বৃত্তির ভিত্তিতে সমাজ চারভাগে বিভক্ত ছিল। সামন্ত বা শাসকগণ ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত এবং বিশেষ সুবিধাভোগী। রাজকর্মচারীরা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। লেখক, শিক্ষক, চিকিৎসক, কৃষক প্রভৃতি

ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। কর্মকার, ধীবর, রজক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন অন্তর্গত। সমাজে ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য ছিল অপ্রতিহত। নিম্নবর্ণের ব্যক্তিরা চতুর্থ শ্রেণীর হীনবলে গণ্য হত। বহুবিবাহ এবং সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে সমাজে নারীদের বিশেষ সম্মান ছিল। দক্ষিণের রাজ্যগুলি রাজতন্ত্র-শাসিত ছিল। সমাজে পুরোহিতদিগের ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। তাঁরা রাজার ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রণ করতেন। গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। কৃষি ও বাণিজ্য ছিল উন্নত।

প্রথমে নানা অসুর ও দানবের পূজা হত। পরে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করে হিন্দুধর্ম। সাতবাহন নৃপতিগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তবে তাঁরা ধর্মবিষয়ে পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। শৈব সাধুদিগের দক্ষিণী নাম ছিল "নায়নার", বৈষ্ণবদিগকে বলা হত "আলভার"। বৈষ্ণব গুরুদিগের মধ্যে কুলশেখর সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে হিন্দুধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্ট এবং বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তিবাদের প্রবর্তক রামানুজ। দাক্ষিণাত্যে এবং দক্ষিণ ভারতে এই যুগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে ব্যাপক অগ্রগতি ও সামগ্রিক উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় তার কারণ অবশ্য ছিল চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পল্লব, চোল প্রভৃতি রাজবংশগুলি কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং রাজ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার। সুশাসনের ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এযুগে দক্ষিণ ভারতে লক্ষণীয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল।

চালুক্যদিগের আমলে সমাজ-সংস্কৃতি : প্রথমে দাক্ষিণাত্যের বাতাপিকে (বাদামিকে) কেন্দ্র করে চালুক্যদিগের অভ্যুত্থান ঘটে। পরে মহারাষ্ট্রের কল্যাণ (অথবা কল্যাণী) এবং পূর্ব উপকূলের বেঙ্গিতে চালুক্যদিগের আরও দুটি শাখা প্রাধান্য অর্জন করেছিল কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চালুক্যদিগের অবদান সাধারণ ভাবে আলোচনা করাই সুবিধাজনক।

চালুক্য নৃপতিগণ বৈদিক হিন্দুধর্মের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিব, বিষ্ণু ও অন্যান্য বহু দেবতার মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তবে এখানে উল্লেখ্য হিন্দু ধর্মের একনিষ্ঠ উপাসক হলেও চালুক্য রাজগণ অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও সংঘারাম তাঁদের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিল। জৈনধর্মাবলম্বীদিগের তাঁরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন।

চালুক্যরাজাদের শিল্পানুরাগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের উৎসাহে পর্বতের গুহা কেটে হিন্দু দেবদেবীর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই সকল গুহামন্দির-গুলির মধ্যে বাতাপিতে বিষ্ণুর জন্য তৈরি মন্দির, সঙ্গমেশ্বর মন্দির, বিরূপাক্ষের (শিবের) মন্দির, মেগুতির শিবমন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অজন্তা এবং এলিফ্যান্টার গুহাচিত্রগুলির অন্ততঃ কয়েকটি এই সময়েই অঙ্কিত হয়েছিল।

রাষ্ট্রকূট : সমাজ-সংস্কৃতি : রাষ্ট্রকূটগণ প্রায় আড়াই শ' বছর (আঃ ৭৫০-১০০০ খ্রীঃ) দক্ষিণ ভারতের এক বিশাল এলাকায় গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। এই বংশের কয়েকজন বিখ্যাত নৃপতি (ধ্রুব, তৃতীয় গোবিন্দ, অমোঘবর্ষ, তৃতীয় কৃষ্ণ প্রমুখ) পাল ও প্রতিহারদিগের সঙ্গে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রশংসনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটদিগের কৃতিত্ব সমরাঙ্গনে সীমাবদ্ধ ছিল না। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। আরবদিগের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ফলে তাঁদের রাজত্বকালে দেশের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি রাষ্ট্রকূটদিগের অনুরাগ প্রশংসনীয় ছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ সর্ব (প্রথম) অমোঘবর্ষের সাহিত্যানুরাগ সুবিদিত। তিনি নিজে সুসাহিত্যিক ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি 'কবিরাজ মার্গ' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কানাড়ী ভাষায় এই গ্রন্থখানি প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থরূপে স্বীকৃত। সর্ব অমোঘবর্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। জৈন ও হিন্দু পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। এঁদের মধ্যে জিনসেন, মহাবীরাচার্য, সাকতায়ন প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রকূট নৃপতিদিগের শিল্প-স্থাপত্যে পৃষ্ঠপোষকতায় নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁরা রাজ্যের নানা স্থানে অনেক মন্দির তৈরি করে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির (ঔরঙ্গবাদ থেকে ১৬ মাইল দূরে) রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণের (৭৬৮-৭৭২) অবিস্মরণীয় কীর্তি। একটি আস্ত পাহাড় কেটে এই প্রস্তরময় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। এই মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্যের মাধ্যমে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী (দেবী দুর্গার শৌর্য) অপূর্ব কৃতিত্বের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে। ইলোরার মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ ভাস্কর্যের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। ইলোরাতে পাশাপাশি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও জৈনধর্মের কাহিনী অবলম্বনে মোট ৩৪টি গুহা মন্দির রয়েছে।

চন্দেল্ল নৃপতিদের কীর্তি : নবম শতাব্দীতে প্রতিহার বংশ দুর্বল হয়ে পড়লে মধ্য পশ্চিম ভারতে জেজাক ভুক্তির (বুন্দেলখণ্ডের) চন্দেল্লবংশ প্রবল হয়। এ প্রসঙ্গে রাজা ধঙ্গের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধঙ্গ (৯৫৪-১০০২ খ্রীঃ) প্রতিহার দিগের অধিরাজত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করেন। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করে চন্দেল্লদের ক্ষমতার বিস্তার সাধন করেন। উল্লেখ্য, ধঙ্গ ও পরবর্তী চন্দেল্ল নৃপতি বিদ্যাধর হিন্দুদিগের মর্যাদা ও সামরিক গৌরব অক্ষুণ্ন রাখবার উদ্দেশ্যে গজনীর সবক্তগিন ও ঘোরের মহম্মদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের উদভাণ্ডপুরের শাহী রাজাদের পক্ষে এক যৌথপ্রয়াসে সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু চন্দেল্লরাজার সহায়তায় হিন্দু রাজাদের এই সম্মিলিত প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। চন্দেল্ল পরিবারের ক্ষমতা এর পর হ্রাস পায়। একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কীর্তি

বর্মনের অধীনে চন্দেল্ল বংশের মর্যাদার পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং চেদিরাজ কর্ণকে তিনি পরাজিত করেন। তাঁর পরবর্তী একজন নৃপতি পরমার্দিদেব দিল্লী আজমীরের চৌহান রাজা তৃতীয় পৃথিবরাজের হস্তে পরাজিত হন। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে দাস বংশীয় প্রথম সুলতান চন্দেল্ল শক্তিকে পযুর্দস্ত করেন।

চন্দেল্ল বংশের খ্যাতি অবশ্য সামরিক কৃতিত্বের জন্য অর্জিত হয় নাই। চন্দেল্ল-দিগের স্থাপত্যকীর্তিই তাঁদের অমর করে রেখেছে। জানা যায়, ধঙ্গ কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করে প্রথমে স্থাপত্যকীর্তির সূচনা করেন। তাঁর পরবর্তী শাসকগণ খাজুরাহোতে (বর্তমান খাজুরাহো নামক গ্রাম, বিখ্যাত কালিঞ্জর দুর্গ থেকে ৪০ মাইল দূরে) অপূর্ব সুন্দর বেশ কতকগুলি মন্দিরনির্মাণ করে ভারতীয় স্থাপত্যের এক অক্ষয়কীর্তি রেখে গেছেন। খাজুরাহোর 'দেলা-দেও' মন্দিরের বিখ্যাত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ও সূর্যের বিগ্রহ পৃথিবীর শিল্প-রসিক সকলকেই মুগ্ধ করে। খাজুরাহোর মন্দির শীর্ষদেশ থেকে নিম্নতম তলদেশ পর্যন্ত সূক্ষ্ম ভাস্কর্যের দ্বারা অলংকৃত। শিল্প রসিকগণ মনে করেন খাজুরাহোর অলংকরণ সমৃদ্ধ মন্দির ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট স্থাপত্য নিদর্শনসমূহ।

চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মণ জ্ঞানীগুণীর সমাদর করতেন। তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত 'কিরাতসাগর' হ্রদ তিনিই নির্মাণ করেন। কবি কৃষ্ণ মিশ্র তাঁর সভা অলংকৃত করেছিলেন।

উড়িষ্যার 'মহাগঙ্গ' রাজবংশের কৃতিত্ব ঃ 'গঙ্গ' উপাধিধারী একাধিক বংশ বিভিন্ন সময়ে ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে গঙ্গদিগের এক শাখা মহীশূর অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে। এই বংশের নৃপতি চামুণ্ডা রায় দশম শতাব্দীর শেষভাগে মহীশূরের শ্রবণ বেলগোলায় 'গোমাতা' নামে একটি সুউচ্চ (৫৬ ফুট) প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। 'গোমাতা'র এই জৈন মূর্তিটি বিশ্বে ভাস্কর্যের এক বিস্ময়কর নিদর্শনরূপে বিরাজ করছে।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ব উপকূলে ভাগীরথী নদীর মোহনা থেকে অন্ধ্র-তামিল উপকূলের গোদাবরী কৃষ্ণা নদীর মোহনা পর্যন্ত অঞ্চলে 'পরবর্তী গঙ্গগণ' এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এই জন্য 'পরবর্তী পূর্বগঙ্গ বংশ' 'মহাগঙ্গ বংশ' বা 'সাম্রাজ্যবাদী গঙ্গ বংশ' নামে পরিচিত হয়।

অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গ ছিলেন মহাগঙ্গবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি একাধারে সামরিক পরাক্রম, ধর্মনিষ্ঠা, শিল্প ও সাহিত্যানুরাগের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। সংস্কৃত এবং তেলেগু উভয় প্রকার সাহিত্যের প্রতিই তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। যুদ্ধ এবং শান্তি—উভয়দিকেই তাঁর কীর্তি ছিল প্রশংসনীয়। অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ দীর্ঘ ৭০ বৎসরকাল (আঃ ১০৭৬-১১৪৮ খ্রীঃ) রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে উড়িষ্যা বিভিন্নদিকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছিল। পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ দেবের মন্দির উড়িষ্যার এই সময়কার বলিষ্ঠ স্থাপত্যশৈলী ও সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির পরিচয় বহন

করছে। অনন্তবর্মন ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণের দীর্ঘশাসনকালে (১০৭৬-১৫৬৮) উড়িষ্যা রাজ্যটি স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার অন্যান্য শাখায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছিল। চোড়গঙ্গের বংশধরগণ, সাফল্যের সঙ্গে বাঙলার মুসলিম সুলতানদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। পরবর্তী গঙ্গ রাজাদিগের মধ্যে প্রথম নরসিংহের (১২৩৮-১২৬৪ খ্রীঃ) নাম উল্লেখযোগ্য। পুরীর জগন্নাথ দেবের সুবিস্তৃত মন্দিরটির নির্মাণ কার্য তাঁর সময়ে সমাপ্ত হয়েছিল। কোনারকের সুবিখ্যাত সূর্য মন্দিরটিও তাঁর সময়েই নির্মিত হয়। পরবর্তী গঙ্গ রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে সূর্যবংশীয় কপিলেন্দ্রদেব উড়িষ্যারাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন। তিনি গঙ্গ-রাজ্যের সীমা দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। গোপীনাথপুর তাম্রলিপি থেকে জানা যায় তিনি সম্ভবতঃ বিজয়নগর রাজের কাছ থেকে উদয় ও কাঞ্জিভেরাম অধিকার করেছিলেন। উড়িষ্যার পরবর্তী কালের রাজাদিগের মধ্যে প্রতাপরুদ্রদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক, শিষ্য ও ভক্ত।

সুদূর দক্ষিণ ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি

পল্লবদিগের কৃতিত্ব ঃ ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে দক্ষিণভারতের পল্লবগণ নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভের অধিকারী। পল্লব নৃপতিগণ সকলেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয় এবং কাঞ্চী সংস্কৃত সাহিত্যের পীঠস্থানে পরিণত হয়। কিরাতার্জুনীয়ম্ কাব্যের রচয়িতা কবি ভারবি ও বিশিষ্ট পণ্ডিত দণ্ডী পল্লব রাজাদের নিকট যথেষ্ট সমাদর পেতেন। পল্লব নৃপতিগণ তামিল ভাষার উন্নতির জন্যও প্রচুর উৎসাহ দিতেন। মহেন্দ্রবর্মন ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। তামিল ভাষায় তিনি মাটাভিলাসা প্রহসন (সংস্কৃত 'মত্তবিলাস প্রহসন') নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'তামিল কুরাল' নামে একখানি সুসমৃদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থ এযুগেই রচিত হয়েছিল। রাজা মহেন্দ্রবর্মনের সঙ্গীত প্রিয়তা ছিল সুবিদিত।

পল্লব নৃপতিদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্র শিল্পেরও প্রভুত উন্নতি হয়েছিল। পুদুকোট্টাই অঞ্চলে আবিষ্কৃত পল্লব চিত্রগুলি মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্ব কালেই প্রস্তুত হয়েছিল।

পল্লব শাসকগণ ছিলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী। কাঞ্চীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেরই চর্চা হত। কাঞ্চী এখনও হিন্দুগণের নিকট পবিত্র পীঠস্থান রূপে গণ্য হয়। পল্লব রাজারা ধর্মবিষয়ে ছিলেন উদার, যদিও তাঁরা বিষ্ণু ও শিবের উপাসক ছিলেন, তথাপি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি তাঁরা উদার মনোভাব পোষণ করতেন। এ যুগে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় ধর্মীয় সাহিত্যের বিকাশ হয়। পল্লব নৃপতিগণ শিব মন্দিরের সঙ্গে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ কাঞ্চীতে 'শত শত' বৌদ্ধমঠ ও মহাযান মতাবলম্বী দশ সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিতের

দেখা পেয়েছিলেন। হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় তখন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ একত্রে শান্তিতে বাস করতেন। "আলভার"দিগের রচিত তামিল সঙ্গীতের মাধ্যমে এযুগে বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট বিস্তার ঘটে।

পল্লব স্থাপত্যর শিল্পকলা : ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখেছেন, "দক্ষিণ ভারতে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে পল্লবদিগের শাসনকালেই শুরু হয়।" পল্লব নৃপতিদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে এ যুগে শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটে। পৃষ্ঠপোষকতায়, নির্মিত বিখ্যাত মন্দিরগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে দক্ষিণ আর্কট জেলার 'দলভরম', চিঙ্গলপুট্ জেলার পল্লভরম্ ও বল্লম্ নামক স্থানে এবং পুদু কোট্টাই, ত্রিচিনপল্লী ও কাঞ্চীতে। পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মন মহামল্ল তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাবলিপুরম্ নামক সমুদ্র বন্দরের তীরে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে "দ্রৌপদী রথ", "ভীমরথ", "অর্জুন রথ" প্রভৃতি সাতটি পৃথক পৃথক মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। প্রস্তরনির্মিত এই মন্দিরগুলি পল্লবশিল্পের অপূর্ব নিদর্শনরূপে আজও দণ্ডায়মান থেকে ভারতীয় শিল্প-নৈপুণ্যের বিস্ময়কর উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করছে।

চোলরাজাদের আমলে সমাজ-সংস্কৃতি

দক্ষিণ ভারতের চোলদিগের অবদান নিঃসন্দেহে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। চোল শাসকদিগের উদ্ভাবিত সুগঠিত শাসনব্যবস্থার আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। চোল শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসন। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে জন-প্রতি নিধিগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত 'জনগণতান্ত্রিক' শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল, বলা যায়।

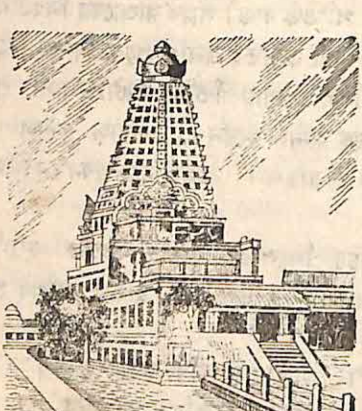
'গোপুরম'—চোল স্থাপত্য

চোলদিগের কর্তৃত্বাধীন সমগ্র রাজ্যকে বলা হত 'চোলমণ্ডলম্'। চোল নৃপতি-দিগের প্রয়াসের ফলে রাজ্যে উন্নত সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় এবং কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়। শক্তিশালী নৌবহরের সহায়তায় চোলদিগের আমলে নৌ-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। বিস্তীর্ণ চোল সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করত, ফলে জনজীবন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে।

পল্লবদিগের ন্যায় চোল নৃপতিগণও শিল্পানুরাগী ছিলেন। চোলগণও নিজস্ব শিল্পরীতি গড়ে তুলেছিলেন। তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর শিব মন্দিরটি চোলরাজ

রাজরাজ তৈরি করিয়ে তাঁর শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই মন্দিরের তোরণে প্রতিষ্ঠিত 'গোপুরম্' চতুর্দশ- তলবিশিষ্ট, এর শিখরে (চূড়ায়) আছে প্রস্তরের বিরাট গম্বুজ। প্রতিটি তলে প্রাচীর গাত্রের নানা কারুকার্য বিশ্লেষণ করলে শিল্পীর দক্ষতাদর্শনে অভিভূত হতে হয়। রাজেন্দ্রচোলদেব (প্রথম) গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরমে যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা সত্যই অতুলনীয়। মাদুরা ও রামেশ্বরমে অনেকগুলি কারুকার্যখচিত গগনচুম্বী মন্দির আজও চোল নৃপতিদিগের শিল্পানুরাগের পরিচয় বহন করছে। চোল নৃপতিদিগের সহায়তায় গর্ভগৃহস্থ অনেকগুলি মূর্তি পিতল ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি। তাঞ্জোরের শিবমন্দিরে ব্রোঞ্জনির্মিত নটরাজের মূর্তি চোল শিল্পীদের অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেয়। এই সঙ্গে মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরটিরও কারুকার্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

চোল আমলে নানা সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটেছিল। চোলনৃপতিগণ ছিলেন শৈব মতাবলম্বী। শৈব দর্শনের বিকাশের সঙ্গে এ যুগে ভক্তিমূলক বৈষ্ণব সাহিত্যেরও উন্নতি হয়েছিল। তামিল ভাষায় অনেকগুলি শৈব ও বৈষ্ণব স্তোত্র এই যুগে রচিত হয়েছিল। এই সব স্তোত্রসমষ্টি একত্রে 'তিরু-ইসাইপ্পা' নামে পরিচিত। স্তোত্র রচয়িতাদিগের মধ্যে তামিল কবি তিরুমালিকাই তেভর, সেন্থানার, কারুর তেঙর প্রমুখ বিখ্যাত। কবি কুটান ছিলেন বিক্রমচোলের সভাকবি।

[খ] বহির্ভারতের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। গ্রীকনৃপতি আলেকজান্ডারের ভারত-অভিযানের সময় থেকে গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার পরিচয় হয়। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক বিদেশী রাজার নিকট দূত প্রেরণ করেছিলেন। কুষাণ রাজাদের সময়ে রোমের সম্রাটদিগের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুষাণ যুগেই এশিয়া মহাদেশের একটি সুবিশাল অংশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। চীন, তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রচার আরও বেশি হয়েছিল।

ধর্মপ্রচার, বাণিজ্য, রাজকার্য, অধ্যাপনা প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যে ভারতবাসী প্রাচীন কালে পৃথিবীর নানা স্থানে গমনাগমন করতেন। অনেকে বিদেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাসস্থান স্থাপন করতেন। এই সব নানাকারণে বহির্ভারতের বিভিন্নস্থানে ভারতীয়দিগের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। এই উপনিবেশগুলি ছিল বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ। প্রাচীনকালে ভাগ্যান্বেষী কোন রাজা বা রাজকুমার জন্মভূমি পরিত্যাগ করে অন্য রাজ্য জয় ক'রে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করতেন। বাংলার রাজপুত্র বিজয়সিংহ কর্তৃক সিংহলজয়ের এরূপ একটি কাহিনী জনপ্রবাদ থেকে জানা যায়। বিদেশে ভারতীয় উপনিবেশের অধিবাসীরা ভারতীয় সভ্যতাকেই সাদরে গ্রহণ করতেন। ফলে স্থানীয় সভ্যতাও সমৃদ্ধ হত।

মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ঃ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জনপদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটেছিল বহ্লীক (ব্যাকট্রিয়ান) গ্রীক, শক ও কুষাণদিগের সময় থেকে। স্যার অরেল স্টেইনের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে খোটান অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহাবিহারে অধ্যয়নের জন্য তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী প্রাচীন যুগে ভারতে আগমন করত। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ ও তাঁর পরবর্তী কালের পরিব্রাজক ইৎ সিঙ্ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। যে মঙ্গোলগণ পরবর্তী কালে (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) উত্তর পশ্চিম ভারতের পথে এদেশে প্রবেশ করেছিল, তাদের মধ্যে নিকৃষ্টমানের এক বিকৃত ধরনের বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। নানারূপ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ফলে মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারের চিহ্নসমূহ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ভারত ও দূরপ্রাচ্য ঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। শাস্ত্রগ্রন্থ ও বুদ্ধদেবের মূর্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চীন থেকে পণ্ডিত ও ধর্মীয় পরিব্রাজকগণ জল ও স্থল উভয়পথেই ভারতে এসেছিলেন। ভারতীয় ধর্মগুরু ও অধ্যাপকদিগের নিকট তাঁরা ধর্মবিষয়ে পাঠগ্রহণ করতেন। ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করতে ও মর্মার্থ উদ্ধারে সাহায্য করতে ভারতীয় পণ্ডিতগণও সে যুগে চীনে যেতেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন চীনা ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধগ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত কম হবে না। তবে চীনা ভাষায় অনূদিত অনেক গ্রন্থেরই সন্ধান ভারতে পাওয়া যায় নাই। কোরিয়া এবং জাপানেও প্রাচীন কালেই বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করেছিল। চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে জলপথে ভারতের নিয়মিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারত ও তিব্বত ঃ সপ্তম শতাব্দীতে শক্তিশালী তিব্বতীয় শাসক স্ট্রং-সান্-গাম্পো তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। জানা যায়, খোটানে ব্যবহৃত ভারতীয় লিপিমালা তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন। ভারতীয় বর্ণমালা প্রবর্তনের ফলে তিব্বতের ইতিহাসে এক নূতন সাংস্কৃতিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলার পাল বংশীয় নৃপতিগণ তিব্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিব্বতে গমন করেছিলেন। অনেক তিব্বতীয় বৌদ্ধভিক্ষু নালন্দা ও বিক্রমশীলা বৌদ্ধবিহারে অধ্যয়ন করতেন। বৌদ্ধধর্মের অনেক পবিত্র গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

ভারত ও ব্রহ্মদেশ ঃ এরূপ প্রমাণ আছে যে, "ব্রহ্মদেশের সমগ্র সভ্যতার উৎপত্তি ছিল ভারতীয়।……রক্তে ও ভাষায় চীনাদের সঙ্গে বর্মীদের অধিকতর নৈকট্য থাকলেও চীনারা এইসব বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রেখেছিলেন মনে হয় না।"

নিম্নব্রহ্মের (সুবর্ণভূমির প্রধান বাসিন্দা ছিল "মন" বা "তালেইঙ্গগণ"। মনে করা

হয় তাঁরা ভারতের তেলেঙ্গানা থেকে উদ্ভূত ছিল বলে তাঁদের এরূপ নাম হয়েছিল, কিন্তু এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। হিন্দুসভ্যতা গ্রহণকারী তালেইঙ্গদিগের অধ্যুষিত অঞ্চলকে বলা হত "রামন্নদেশ"। হিন্দুসভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত আর একটি বর্মী গোষ্ঠীর নাম ছিল "পিইউ"। এঁদের স্থাপিত একটি নগরের নাম ছিল "শ্রীক্ষেত্র"। শ্রীক্ষেত্রকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন রাজ্যও তখন স্থাপিত হয়েছিল। ব্রহ্মসংলগ্ন আরাকান অঞ্চলেও প্রাচীন যুগে ভারতীয় রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতকে ব্রহ্মদেশ ও আরাকানে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন হয় এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণও সেখানে অনুপ্রবেশ করেছিলেন।

মৌর্য সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোচীন অঞ্চলে দূত প্রেরণ করেছিলেন। তখন সুবর্ণভূমিতে (নিম্নব্রহ্মে) বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। ধীরে ধীরে উত্তর ব্রহ্মেও বৌদ্ধধর্মের প্রচার হতে থাকে। সুবর্ণভূমি থেকে লোক দলে দলে পার্শ্ববর্তী শ্যাম দেশে (পরে নাম থাইল্যান্ড) বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিল।

নবম শতাব্দীতে মধ্য ব্রহ্মদেশে "পাগান" নামে একটি রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীতে পাগান রাজ্যের বর্মীরা হিন্দুপ্রভাবিত মনদের নিকট ভারতীয় লিপিমালা শিক্ষা করেন। ঐ সময়ে ভারতের সঙ্গে পাগান রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। পাগান রাজবংশ বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব অনুপ্রবেশকারীদিগের সঙ্গে প্রথমে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু পাগানের শক্তিশালী শাসকদিগের সময় ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম ব্রহ্মদেশ থেকে ক্রমে বিলুপ্ত হয় এবং তার স্থানে বৌদ্ধ "থেরবাদ" প্রধান ধর্মরূপে গণ্য হতে থাকে।

ভারত ও থাইল্যান্ডঃ ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ-পূর্বে শ্যামদেশটি থাইদিগের দ্বারা অধিকৃত হয় খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। কিন্তু তার পূর্বে প্রায় এক হাজার বছর দেশটি ছিল হিন্দু-ঔপনিবেশিকদিগের অধিকারে। থাইল্যান্ডের প্রাচীন সভ্যতায় ভারতীয় ধর্মীয় ও পবিত্র গ্রন্থগুলি যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট সমাদর ছিল।

থাইদিগের আদি বাসভূমি ছিল চীনের ইউনান প্রদেশে। সেকালে ওই অঞ্চল "গান্ধার" নামে পরিচিত ছিল। অপর একটা অংশের নাম ছিল মিথিলা। থাইল্যান্ডের "গান্ধার" অঞ্চলে ব্যবহৃত বর্ণমালা থাইগণ গ্রহণ করেছিলেন। এই বর্ণমালা তাঁরা ভারত থেকেই এনেছিলেন। তাঁরা ভারতীয় ধর্ম প্রচারকদিগের দ্বারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। শ্যামদেশ জয় করবার পর থাইগণ ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিলেন। "সুখোদয়", "অযোধ্যা" প্রভৃতি নামে হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। এই রাজ্যগুলির শাসক ও শাসিত উভয়েই ছিলেন বৌদ্ধ এবং পালি ছিল পবিত্র ভাষা। প্রাচীন শ্যাম রাজ্যটির শিল্পকলা ভারতীয় ধ্যান-ধারণা ও রীতি-পদ্ধতির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল।

কম্বুজ রাজ্যঃ কম্বোডিয়ার দক্ষিণ অংশে প্রাচীন কম্বুজ রাজ্যটি অবস্থিত

ছিল। চীনা সূত্র থেকে জানা যায় এই রাজ্যে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাজা যশোবর্মনের রাজত্বকাল থেকে কম্বুজ রাজ্যে এক গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। যশোবর্মন কম্বুপুরীতে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। রাজার নামানুসারে রাজধানীর নাম হয় 'যশোধরপুর'।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা সপ্তম জয়বর্মন (১১৮১ খ্রীঃ সিংহাসনারোহণ করেন) প্রাচীন রাজধানী যশোধরপুরের সংস্কার সাধন করে আর একটি সুদৃশ্য নগর নির্মাণ করেন। নতুন নগরটির নাম হয় আঙ্কোরথম। এখানেই রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

রাজা সপ্তম জয়বর্মন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বহু ভারতীয় পণ্ডিত তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় এক হাজার ছাত্র ও শিক্ষকের ভরণপোষণের ব্যয়ভার রাজসরকার থেকে বহন করা হত। রাজধানীতে প্রায় শতাধিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছিল। একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, এখানে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম পাশাপাশি বিরাজ করত। রাজধানীতে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। রাজা সপ্তম জয়বর্মনের একটি অক্ষয়কীর্তি হল বিখ্যাত বেয়নের শিব মন্দিরটি। রাজধানী আঙ্কোরথমের কেন্দ্রস্থলে পিরামিডের আকারে এই বিশাল মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরে প্রায় চল্লিশটি গম্বুজ রয়েছে। প্রত্যেকটি গম্বুজের 'শিখর' (চুড়া) ধ্যানরত শিবমূর্তির আকারে নির্মিত।

পৃথিবীর বৃহত্তম মন্দির আঙ্কোরভাট নির্মাণ করেন এই বংশেরই রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মন (আঃ ১১১৩-১১৪৫ খ্রীঃ)। আঙ্কোরভাট প্রথমে নিবেদিত হয় বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে, পরে কোন বৌদ্ধ মহাযানী দেবতা অবলোকিতেশ্বরের নামে মন্দিরটি উৎসর্গ করা হলেও হিন্দু পুরাণের নানা দেবমূর্তি মন্দির গাত্রে খোদিত আছে। তিনটি ক্রমোচ্চ গ্যালারি বা ধাপে সাজান মন্দিরটি পিরামিডের আকারে নির্মিত হয়েছে। এর 'শিখর' (চুড়া) প্রায় দুশো ফিট উঁচু। জলপূর্ণ পরিখাবেষ্টিত এর বহিঃপ্রাকারের পরিধিও বিশাল। সংক্ষেপে, আঙ্কোরভাট (নগরভাট বা নগর-মন্দির) ভারতীয় স্থাপত্যরীতি ও ভাস্কর্যের একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। জানা যায়, রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁর দেহভস্ম এই মন্দিরেই রক্ষিত হয়েছে।

চম্পা রাজ্য ঃ কম্বুজ রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে ছিল প্রাচীন চম্পা রাজ্যটি (বর্তমান আনাম)। চম্পা বা চম্পক নামটি বঙ্গদেশেও কিন্তু জনপ্রিয় ছিল। মনসা পুরাণের চাঁদ সওদাগরের রাজধানীর নাম ছিল চম্পা বা চম্পক নগর। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই উপনিবেশটি হয়ত বাঙ্গালীরাই গড়ে তুলেছিল।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতক থেকে চম্পাতে একটি হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করত। চম্পা রাজ্যটি ছিল কিন্তু চীন সাম্রাজ্যের সংলগ্ন। এখানকার হিন্দু রাজাদের সঙ্গে চীন সম্রাটদের প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ হত। পার্শ্ববর্তী কম্বুজ রাজ্যের সঙ্গেও চম্পার রাজাদের রাজনৈতিক সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত। কম্বুজরাজ সপ্তম জয়বর্মন চম্পা রাজ্যের

একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে চীনের মঙ্গোল নায়ক কুবলাই খান চম্পা রাজ্য বিধ্বস্ত করেন।

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির শত্রুতার জন্য চম্পা রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা কোন দিনই উন্নত হতে পারে নাই। তবে এই রাজ্যের সভ্যতার ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করবার মত। শিব, শক্তি, গণেশ, কার্তিকেয় প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা এখানে প্রচলিত ছিল। অনেক শিবলিঙ্গ ও কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সুমাত্রার "শ্রীবিজয়" রাজ্য ঃ সুমাত্রায় প্রাচীনতম হিন্দু রাজ্যটির নাম ছিল "শ্রীবিজয়" (পালেমবাং)। এই রাজ্যটি স্থাপিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীবিজয় রাজ্যটি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিঙ্ শ্রীবিজয়কে বর্ণনা করেছিলেন বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চার একটি বিখ্যাত কেন্দ্ররূপে। মলয়ু নামে সুমাত্রার আর একটি হিন্দু রাজ্য প্রথমে শ্রীবিজয় রাজ্যটির অংশ ছিল। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতনের পর মলয়ু রাজ্যটি শক্তিশালী হয়ে উঠে। মার্কো পোলোর বর্ণনা থেকে জানা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে মলয়ু ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব পর্যটক ইবন্-বতুতা সুমাত্রা পরিদর্শন করেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় তখন সুমাত্রায় ইস্‌লামের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য ঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয় এবং বলিদ্বীপ ও বোর্ণিও সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পুরাতন শ্রীবিজয় রাজ্যটি তারা অধিকার করে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইতিহাসে এই সাম্রাজ্য শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য নামে বিখ্যাত হয়েছে।

সম্ভবতঃ শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল কলিঙ্গ। নবম শতাব্দীতে সুলেমান নামে এক আরব বণিকের বর্ণনায় জানা যায়, কোন এক শৈলেন্দ্র রাজা যশোধরপুর অধিকার করেছিলেন। আরব বণিকরা শৈলেন্দ্র রাজাদের ঐশ্বর্য ও সম্পদের অনেক বর্ণনা করেছেন।

শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক। চীন ও ভারতের সঙ্গে তাঁদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ভাল ছিল। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব বাংলার পালরাজা দেবপালের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বালপুত্রদেব ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। গৌড়দেশীয় বৌদ্ধপণ্ডিত কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন। তাঁর নির্দেশে শৈলেন্দ্ররাজ দেবীতারার উদ্দেশ্যে সুদৃশ্য মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন যদিও শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা বৌদ্ধ মহাযান ধর্মমতের অনুরাগী ছিলেন।

শৈলেন্দ্র রাজাদের স্থাপত্যকীর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যযবদ্বীপে (জাভায়) অবস্থিত বরোবুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ 'স্তূপ'টি শৈলেন্দ্র রাজাদের অক্ষয়কীর্তি। একটি

পাহাড়ের চূড়ায় এই মন্দিরটি পরপর নয়টি থাকে ক্রমশঃ উপরে উঠে গেছে। সর্বোচ্চ থাকে বা চাতালে রয়েছে একটি ঘণ্টাকৃতি 'স্তূপ'। উপরের তিনটি থাকে রয়েছে একাধিক স্তূপের সারি। তার প্রত্যেকটিতে রয়েছে একটি করে বুদ্ধমূর্তি। প্রতিটি গ্যালারিতে খোদিত রয়েছে, যার মাধ্যমে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে নানা দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বহু ভাস্কর্য, নিঃসন্দেহে বরোবুদুরের এই স্তূপটি নির্মাণে ভারতীয় স্থপতি ও ভাস্করগণ অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজাদের বিশাল নৌবাহিনীর আক্রমণে শৈলেন্দ্র রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। এই সময় ভারত মহাসাগরের বহু দ্বীপ-উপদ্বীপ শৈলেন্দ্ররাজাদিগের

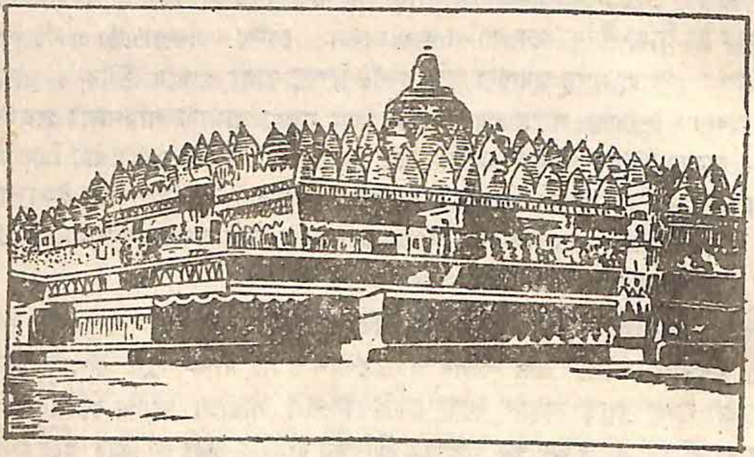

বরোবুদুরের বৌদ্ধ মন্দির

অধিকারে চলে যায়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের আক্রমণের ফলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

শৈলেন্দ্র বংশের পতনের পর মধ্য জাভায় আর একটি হিন্দু রাজবংশের সাময়িক উত্থান ঘটে। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। বরোবুদুরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত প্রম্বনমের মন্দিরে পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা হত।

ভারত ও সিংহল ঃ সিংহল দ্বীপটির সঙ্গে বরাবরই ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জানা যায়, "বন্দ" নামে এক জাতীয় মানুষ এখানকার প্রাচীনতম অধিবাসী ছিল। পরে দ্রাবিড় ও আর্যজাতীয় মানুষরা এখানে অনুপ্রবেশ করে। ঐতিহাসিক ডঃ মজুমদার লিখেছেন, "ইতিহাসের আদিম যুগ থেকেই দ্রাবিড় অধ্যুষিত বিশেষতঃ তামিল অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে অনুপ্রবেশের স্রোত অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলেছিল। সিংহলী ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাবের চিহ্ন যদিও যথেষ্ট বিদ্যমান, তবু প্রধানতঃ এই ভাষাটি আর্য গোষ্ঠীভুক্ত ছিল এবং বৈদিক সংস্কৃত থেকেই এর-উৎপত্তি হয়েছিল। অনুমান করা

হয় আর্যগণ প্রাচীনকালের কোন এক সময় দ্বীপটি অধিকার করে নিজেদের ভাষা ও কৃষ্টি অধিবাসীদিগের উপর চাপিয়ে দেয়।" গুজরাট বা মগধ বা কলিঙ্গের বিজয় সিংহ দ্বীপটি জয় ক'রে নাম দিয়েছিলেন "সিংহল" বা "সিংহ-গোষ্ঠী ভুক্ত।" খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে "দেবানাং পিয়" তিষ্যের রাজত্বকালে অশোকের দূতগণ সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের চোল ও তামিল রাজারা প্রায়শঃই সিংহলে নানা অভিযান করতেন। জানা যায়, গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বুদ্ধের পবিত্র দন্তটি কলিঙ্গের দন্তপুর থেকে সিংহলে আনীত হয়েছিল। বিখ্যাত পালি টীকাকার বুদ্ধঘোষ যিনি সিংহল ও অন্যান্য দেশে বৌদ্ধ মতগুলি প্রচার করেছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে সিংহল তামিল অভিযানকারীদিগের দ্বারা অধিকৃত হয়। পরে চোলদিগের আধিপত্যের যুগে সিংহলী অধিবাসীদিগের ভাগ্য তামিলদিগের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হয়। সিংহলের অধিবাসীদিগের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বরাবরই বজায় ছিল। এই দ্বীপের মণিমুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য ভারতের সঙ্গে বেশির ভাগ চলতো। দ্বীপবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনে রামায়ণ-মহাভারতের গভীর প্রভাব এখনও বিদ্যমান।

বৃহত্তর ভারত ঃ

এক সময়ে মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে স্থিত বলিদ্বীপ পর্যন্ত এবং সিংহল থেকে জাপান পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশের একটি বিশাল ভূভাগে ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প-রীতির অসামান্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখনও আচার-ব্যবহারে, সামাজিক রীতিনীতিতে ভারতীয়দিগের সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। বলি দ্বীপের অধিবাসীরা নাচেগানে, অভিনয়ে এখনও ভারতের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. C. Road

॥ ৮ ॥

মধ্যযুগে ভারত (১২00–১৭0৭)

মুসলিম-ভারত না বলে মধ্যযুগের ভারত বলব কেন ?ঃ ভারতে মুসলিমদিগের রাজত্ব চলেছিল প্রায় পাঁচশ বছর ধরে (১২০০-১৭৫৭)। তাই, আপাতঃ দৃষ্টিতে এই যুগকে মুসলিম আমলে ভারত বলাই সঙ্গত মনে হবে। কিন্তু ইতিহাসের চলতি ধারা ও গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী মধ্যযুগে ভারতের ধারণাকে পরিত্যাগ করে মুসলিম ভারতের ধারণাকে গ্রহণ করা সমীচীন হবে মনে হয় না। এই মতের সপক্ষে অবশ্য কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যায়। কালানুক্রমিক রীতি অনুসারে আমরা ভারতের প্রাচীন যুগের সমাপ্তি চিহ্নিত করি মোটামুটি ১২০০ খ্রীঃ নাগাদ যখন হিন্দু রজেত্বের অবসানে দিল্লীতে মুসলিম রাজত্বের সূত্রপাত হয়। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধের পর দিল্লীতে সুলতানী যুগ আরম্ভ হয় এবং তা চলে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুলতানী যুগের শেষে আর একটি নতুন মুসলিম বংশ (মুঘল) দিল্লীতে আরও দুশো বছরের কিছু বেশি (১৫২৬-১৭৫৭) রাজত্ব করেছিল। ফলে সুলতানী ও মুঘলযুগ মিলে মোটামুটি পাঁচশো বছর ভারতে মুসলিম আধিপত্যের যুগ চলে, এটা ইতিহাসের ঘটনা এবং স্বীকার্য। কিন্তু এই পাঁচ শো বছর দিল্লীতে মুসলিম আধিপত্য থাকলেও কয়েকটি কারণের জন্য এই যুগব্যাপ্তিকে ভারত ইতিহাসে মধ্য যুগ বলাই অধিকতর সঙ্গত মনে হবে। প্রথমতঃ উল্লিখিত পাঁচশো বছরের এই যুগে প্রথমে তুর্কী-আফগান, পরে মুঘল রাজবংশগুলি দিল্লীতে রাজশক্তি করায়ত্ত করে ক্ষমতাসীন থাকলেও তুর্কী-আফগান শাসন কালে অতি অল্প সময় (১৩১০-১৩৩৫) এবং মুঘল আমলে একশো বছরের মত সময় (১৫৭৬-১৬৭৪) ছাড়া মুসলিমগণ সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন এমন বলা যায় না। ভারতে মুসলিম প্রভুত্বের সূচনার প্রথম একশো বছর (১২০০-১৩০০) এবং মুঘল আধিপত্যের যুগে প্রথম ৫০।৫২ বছর মুসলিমদিগের রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রায় সম্পূর্ণরূপে উত্তরভারতেই সীমাবন্ধ ছিল। দ্বিতীয়তঃ উত্তর ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক প্রভুত্বকালেও নানাস্থানে বিভিন্ন রাজপুত বংশের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। সুলতানী আমলেও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলির স্বাধীনতা প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। চতুর্থতঃ মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালেই প্রথমে মা'বার (মাদুরা) অঞ্চল, পরে তেলিঙ্গানা এবং বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্যগুলি মুসলিম প্রভুত্ব অস্বীকার করে স্বাধীন হয়ে যায় (১৩৪৬ খ্রীঃ)। বস্তুতঃ বিজয়নগরের স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায় দুশো বছর (১৩৪৬-১৫৬৫) সগৌরবে রাজত্ব করেছিল। পঞ্চমতঃ মুসলিম ভারত বললে এই যুগের ইতিহাসকে সঠিক দৃষ্টিকোণ

থেকে তুলে ধরা হবে না, কারণ এই যুগেই হিন্দু ও মুসলিম সাধকদিগের প্রয়াসে সমন্বয়ধর্মী হিন্দু ভক্তিবাদ ও মুসলিম সুফিবাদের উদ্ভব ঘটেছিল। ষষ্ঠতঃ উল্লেখ্য, এই যুগেই শেরশাহ্ ও আকবরের ন্যায় মহানুভব শাসক জাতি-ধর্মমত নির্বিশেষে 'মহাভারতে'র ধারণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় ঐক্যপ্রয়াসের এক সমুন্নত আদর্শ রেখে গেছেন। সুতরাং এ যুগকে মুসলিম ভারতরূপে অভিহিত করলে সেই উদার ঐতিহ্যকেও অস্বীকার করা হবে। পরিশেষে, মধ্যযুগের কালানুক্রমিক ধারণার স্থলে মুসলিম ভারতের ধারণার ভিত্তিতে এ যুগের ইতিহাস পুনর্লিখিত হলে নিঃসন্দেহে তা হবে ভারতের বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের পরিপন্থী, একথাটিও নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সুলতানী যুগের ইতিহাসের উৎস

তুর্কী-আফগাণ সমসাময়িক ঐতিহাসিক সাহিত্য ঃ বিভিন্ন মুস্লিম রাজবংশ সম্পর্কিত তথ্যসম্বলিত প্রায় সমসাময়িক বেশ কয়েকটি ইতিবৃত্তের সন্ধান আমরা পেয়েছি। সুলতানী যুগের ইতিবৃত্তগুলির মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় মিন্হাজ-উদ্দীন সিরাজের 'তবাকৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থটির। মুস্লিম দুনিয়ার একটি সাধারণ ইতিহাস হলেও এই গ্রন্থে ১২৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর দাস বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই শ্রেণীর দ্বিতীয় গ্রন্থ হল ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দীন বরণীর 'তারিখ-ই-ফিরুজ-শাহী'। এতে 'তবাকৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থের সমাপ্তিকাল থেকে ফিরুজশাহ্ তুঘলকের রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসরের বিবরণ (১২৬৭-১৩৫৭ খ্রীঃ) প্রদত্ত হয়েছে। ফিরুজশাহের নিজের রচিত 'ফুতুহাৎ-ই-ফিরুজশাহী'-নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর শাসন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থে সুলতান নিজের ধর্মীয় মনোবৃত্তি ও অন্যান্য গোঁড়া সুলতানদের ধর্মীয় মনোভাবের কিছু পরিচয় দিয়েছেন। সামস্-ই-সিরাজ আফিফ্-রচিত 'তারিখ-ই-ফিরুজ-শাহী' আর একখানি এই জাতীয় গ্রন্থ। এতে ফিরুজশাহের রাজত্বের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। 'ইসামি'র রচিত ফুতুহ্-উস্-সালাতিন' এই যুগের আর একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এতে গজনীর ইয়ামিনি বংশের উদ্ভব থেকে মুহম্মদ-বিন্ তুঘলক পর্যন্ত সুলতানদিগের বিবরণ আছে।

সেখ রিজকুল্লাহ্ রচিত 'ওয়াকিয়াৎ-ই-মুস্তাকি' ও 'তারিখ-ই-মুস্তাকি' নামক গ্রন্থ দুটিতে শূর ও লোদীদিগের ইতিহাসসহ আফগানদিগের রাজত্বকালের বিবরণ আছে।

পরবর্তীকালে ফিরিস্তা, নিজাম-উদ্দীন ও বদায়ুনীর রচিত গ্রন্থগুলি থেকেও সুলতানী যুগের ইতিহাসের নানা তথ্য পাওয়া যায়।

কয়েকজন বিদেশী লেখকের বৃত্তান্তও সুলতানী যুগের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। এই সকল বিদেশী লেখকের গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বদর্-উদ্দীনের লেখা কয়েকখানি পুস্তক এবং শিহার-উদ্দীন-আল্ উমারির 'মাসালিক-উল্-আবসার' নামক

গ্রন্থগুলি। এগুলি থেকে সমসাময়িক ভারতে মুসলিম সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। মির্জা হাইদারের 'তারিখ-ই-রশিদী', কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী', গুলাম হুসেন সেলিমের 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন', সাইদ্-আলি তবাতবার 'বুরহান-ই মাসির', রফিউদ্দীন সিরাজীর 'তাজকিরাৎ-উল্-মুলুক্' প্রভৃতি ফার্সি গ্রন্থও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পারসিক দূত আবদুর রজ্জাকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে সুলতানী যুগে বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ অবস্থার বিবরণ জানা যায়। 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' গ্রন্থটিতে বখ্তিয়ার খলজীর বঙ্গদেশ অভিযানের কাহিনী থেকে ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত বাঙলার রাজনৈতিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

পর্যটকদের বিবরণী ঃ সুলতানী আমলে বেশ কয়েকজন বিদেশী ভ্রমণকারী ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের রচিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আমরা সেযুগের ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার একটি চিত্র পাই। এই সময়ের বিদেশী পর্যটকদিগের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত ইবন্ বতুতার নাম।

ইবন্ বতুতা তাঁর 'রেহ্লা' (Travels) নামক গ্রন্থে মুহম্মদ-বিন তুঘলকের রাজত্বকালের রাজনৈতিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বিচার-সংক্রান্ত, সামরিক এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। দেশের ডাক-ব্যবস্থা, পথ-ঘাট, যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিজ উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ের উপরে তিনি আলোকপাত করেছেন। ইবন্ বতুতার পরেই বিদেশীদিগের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় আল্-কালকাসুন্দির 'সুভ্-উল্-আশা' নামক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে তিনি চতুর্দশ শতকে ভারতের সাধারণ অবস্থার একটি বর্ণনা দিয়েছেন।

কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটক এ যুগে ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মার্কো পোলো, নিকোলো কন্টি, অ্যাথানাসিয়াস্ নিকিটিন, বারথেমা, বরবোসা ও পায়েস্। মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে ভারতে এসেছিলেন। নিকোলো কন্টি ছিলেন একজন ইটালীয়। তিনি ১৪২০ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্যটি পরিদর্শন করেন। তাঁর ভ্রমণের বিবরণ থেকে আমরা বিজয়নগরের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাই। আল্বুকার্কের লিখিত পর্তুগীজ ইতিবৃত্ত থেকে পর্তুগীজদের সঙ্গে গুজরাটের সুলতানের সম্পর্কের বিষয়ে জানা যায়। পারসিক দূত আবদুর রজ্জাক ও রুশ বণিক নিকিটিন দক্ষিণ ভারতের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে বিবরণ রেখে গেছেন। নিকিটিন বাহ্মনি সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করে (১৪৭০ খ্রীঃ) ঐ রাজ্যের একটি বিবরণ লিখে গেছেন।

মুদ্রা ও স্থাপত্য কীর্তি ঃ সুলতানী যুগের ইতিহাসের উৎসরূপে মুদ্রার গুরুত্বও উপেক্ষণীয় নয়। জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন, "যে সকল স্থানে মুদ্রণ ছিল একেবারেই অজ্ঞাত, সেখানে এই সকল প্রতীক চিত্রিত মুদ্রাগুলি প্রত্যেক বাজারে প্রবিষ্ট হয়ে ইস্তাহার ও ঘোষণাপত্ররূপে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করছে।" ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ভারতীয় মিউজিয়াম ও অন্যান্য মিউজিয়ামে এই মুদ্রাগুলি রক্ষিত আছে।

সুলতানী আমলের স্থাপত্য-কীর্তির নিদর্শনগুলিও এ যুগের ইতিহাসের উপাদান রূপে গণ্য হতে পারে। এই সকল স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে দিল্লীর কুতবমিনার, আলাই দরওয়াজা, জৌনপুরের আতাল-মস্‌জিদ্‌, আমেদাবাদের জাম-ই-মসজিদ, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়ের সোনা মসজিদ, কদম রসুল, বিজাপুরের গোল গম্বুজ, দৌলতাবাদের চাঁদ মিনার প্রভৃতি সেযুগের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পরিচয় প্রদান করে।

এ যুগের বিখ্যাত ফার্সী কবি আমীর খস্‌রুর লেখার মধ্যে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য পাই। তাঁর রচিত 'খাজাইন-উল্‌-ফুতুহ্‌' নামক গদ্যগ্রন্থ থেকে আলাউদ্দীন খল্‌জীর রাজত্বকাল সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায়।*

ভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশ—আরবদের সিন্ধু-বিজয়

সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিক হতে পশ্চিম ভারতের সমৃদ্ধ বন্দরগুলির উপর আরবদিগের লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। দ্বিতীয় পুলকেশীর সময়ে আরবরা প্রথমে একটি অভিযান পাঠিয়েছিল (আঃ ৬৩৭ খ্রীঃ)। এরপর তাঁরা গুজরাটের দেবল উপসাগর এলাকায় আরও অভিযান প্রেরণ করে।

সিন্ধু-বিজয়ঃ আরবরা বিজয় অভিযানে বালুচিস্তান জয় করে সিন্ধু অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়। জানা যায়, হিউয়েন সাঙের সময় হিন্দুশাহীয় বংশের সিংহাসন ছিল একটি শূদ্র বংশের অধিকারে, পরে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত 'চাচ্‌' সেখানে একটি নতুন বংশ স্থাপন করেন। চাচের পর তাঁর পুত্র দাহর বা দাহির সিংহাসনে বসেন। এদিকে ইরাকের শাসনকর্তা আল্‌-হজ্জাজ্‌ দেবল বন্দরের জলদস্যুদিগের ক্রমাগত উৎপাতে রুষ্ট হন। তিনি সিন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। প্রথম দিকের আরব অভিযানগুলি দাহির প্রতিহত করেন। অবশেষে ভারতীয় রাজাকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে হজ্জাজ্‌ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ-ইবন্‌ কাশিমের উপর ভার দেন। কাশিম দেবল বন্দর এবং আরও কয়েকটি শহর ও দুর্গ জয় করে সিন্ধুর পশ্চিমতীর পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই সময় দাহিরের পক্ষভুক্ত কয়েকজন রাজা ও কিছুসংখ্যক অসন্তুষ্ট বৌদ্ধভিক্ষু আরবদিগের সঙ্গে যোগ দিয়ে সহায়তা করে। ফলে কাশিম সহজেই সিন্ধু অতিক্রম করে দাহিরের সেনাদলকে আক্রমণ করেন। দাহির বীরত্ব

*স্যার হেনরি এলিয়ট্‌ ও অধ্যাপক জন ডাউসনের লিখিত "History of India as told by her own Historian" (৮ খণ্ড)—এ যুগের ইতিহাস রচনায় বিশেষ সহায়ক। গ্রন্থকারদ্বয় এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে ফার্সী লেখা ও সার সঙ্কলনের অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত ক'রে আমাদের অনেক তথ্য জানতে সাহায্য করেছেন। Hodivala লিখিত। "Studies In Indo-Muslims History" গ্রন্থখানিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। Lane-Poole-এর 'Babar' গ্রন্থখানি থেকে লোদী বংশের পতন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

সহকারে বাধা দেন কিন্তু পরাজিত ও নিহত হন (৭১২ খ্রীঃ)। দাহিরের বিধবা পত্নী দুর্গ রক্ষায় প্রবল সংগ্রাম করেন কিন্তু পরাজিত হন এবং আত্মাহুতি দেন। এরপর আরবরা মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সিন্ধুর সমগ্র নিম্ন উপত্যকা অধিকার করে। কাশেমের পরবর্তী শাসকের অধীনে আরবরা মাড়বার, ব্রোচ, উজ্জয়িনী সহ সুরাষ্ট্র ও গুজরাট অধিকার করে। তবে আরবদিগের অগ্রগতি দক্ষিণে প্রতিহত করে চালুক্যগণ এবং পরে প্রতিহার বংশীয় রাজপুতরা। উত্তরে তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করেন কাশ্মীরের কর্কোট বংশীয় রাজারা। ফলে আরবদিগের অধিকার সিন্ধু অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ফলাফল ঃ আরবদিগের সিন্ধুজয় ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ—একথা বলা যায় না। ঐতিহাসিক লেনপুল আরবদিগের সিন্ধুজয়কে বলেছেন, "ভারতের ইতিহাসের একটি কাহিনী এবং ইসলামের ইতিহাসে একটি নিষ্ফল বিজয়।" ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "আরবদিগের সিন্ধুজয় সাংস্কৃতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সংস্পর্শ আরব ও ভারত এই দুই অঞ্চলের মানুষের ধ্যানধারণার আদান-প্রদানে সাহায্য করেছিল এবং এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির বীজ বহির্ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আরবগণ হিন্দুদের নিকট থেকে ভারতীয় দর্শন, ভেষজবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ এবং লোকগাথার সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান অর্জন করে এবং সেই জ্ঞান ইউরোপে নিয়ে যায়। সমসাময়িক আরব লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, আরব ঔপনিবেশিকগণ এবং তাদের হিন্দু প্রতিবেশীরা শান্তি ও সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করেছিলেন। আমির খসরু উল্লেখ করেছেন যে একজন আরব জ্যোতির্বিদ বারাণসীতে দশবৎসর যাবৎ জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন।

ভারতে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত

সুলতান মহমুদ—তাঁর আক্রমণের ফলাফল—ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে আল্-বেরুনী

মুসলিম আক্রমণের প্রাক্-কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অবস্থা ঃ ইস্লাম-ধর্মাবলম্বী আরবদিগের সিন্ধুজয় ভারতে মুসলিম বিজয়ের সূচনারূপে গণ্য হয় নাই। কারণ আরবদিগের সিন্ধুজয়ের প্রভাব সুদূরপ্রসারী ছিল না। দ্বাদশ শতকের শেষদিকে আফগানিস্তানের অন্তর্গত ঘোর (ঘুরও বলা হয়) রাজ্যের তুর্কী অধিপতি মুইজ-উদ্দীন মুহম্মদ-বিন-সাম (মুহম্মদ ঘোরী) কর্তৃক দিল্লীর চৌহান নৃপতি (তৃতীয়) পৃথিবরাজের পরাজয় ভারতে মুসলিম শাসনের সূত্রপাতরূপে গণ্য হয়। সেই হিসেবে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্-কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় দিতে আমাদের তুলে ধরতে হবে একাদশ-দ্বাদশ শতকে ভারতের বহুধা-বিভক্ত রাজনৈতিক চিত্রটিকেই।

অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভের জন্য শুরু হয়েছিল পাল-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদিগের মধ্যে "ত্রিশক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতা", কিন্তু প্রায় দুশো বছর চললেও (৭৭০-১০০০ খ্রীঃ) এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উত্তর ভারতে কোন ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে উঠে নাই। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে এবং দক্ষিণ ভারতে চালুক্য ও চোলদিগের অধীনে আঞ্চলিক সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। চোলগণ প্রায় দুশো বছর (১০০০—১২০০ খ্রীঃ) দক্ষিণ ভারতে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিল কিন্তু চোল প্রভুত্ব উত্তর ভারতে কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। ফলে মুসলিম আক্রমণের প্রাক্-কালে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে আমরা উত্তর ভারতে কোন ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের সন্ধান পাই না। এইসময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার যে চিত্র আমরা পাই তা হল অনৈক্যে দুর্বল "খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত" এবং পরস্পর বিবদমান কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব। এই অবস্থা বিদেশী আক্রমণকারীর পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় পাঞ্জাবের উদভাণ্ডপুরের (ওহিন্দের, বা ভাতিন্দার) হিন্দুশাহী বা শাহীয় রাজ্যটি। একাদশ শতাব্দীর সূচনায় এখানে অধিষ্ঠিত ছিলেন রাজা জয়পাল (৯৬৫ —১০০২ খ্রীঃ)। উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রবেশপথে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি ছিল ভারতের দ্বাররক্ষীর ন্যায়। দ্বাররক্ষার দায়িত্ব পালনে শাহী রাজ্যের রাজারা যে ভূমিকা পালন করে গেছেন তা চিরদিনই তাঁদের গৌরবের স্বাক্ষর বহন করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সময় গাঙ্গেয় উপত্যকার দুটি শক্তিশালী রাজপুত রাজ্যের উল্লেখ করতে হয়। এই দুটি হল দিল্লী-আজমীঢ়ের চৌহান বা চাহমান রাজ্য এবং কাশী-কনৌজের গাহড়বাল রাজ্য। মুসলিম আক্রমণের প্রাক্-কালে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন গর্বিত চৌহান নৃপতি তৃতীয় পৃথিবরাজ (১১৭৭-৯২ খ্রীঃ) এবং তাঁর প্রতিবেশী গাহড়বাল রাজ্যে ছিলেন রাজা জয়চন্দ্র (১১৭০-১১৯৩ খ্রীঃ)। কিন্তু দিল্লীর পৃথিবরাজ ও কনৌজের জয়চন্দ্র—এই দুজন শক্তিশালী হিন্দু নৃপতির মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না। বরং পারিবারিক কলহের দরুন তাঁরা ছিলেন পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। তাঁদের পারস্পরিক বৈরিতা বিদেশী আক্রমণকারীর পক্ষে ক্ষমতা অধিকার করতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

সুলতান মাহ্মুদের ভারত অভিযান ঃ গাঙ্গেয় উপত্যকার চৌহান ও গাহড়বাল রাজ্য দুটি ছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও কয়েকটি শক্তিশালী রাজপুত রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মধ্যভারতে কলচুরীদিগের চেদীরাজ্য, জেজাকভুক্তির বুন্দেলখন্ডের চন্দেল্ল রাজ্য, পরমারদিগের অধীনে উজ্জয়িনীর মালব রাজ্য, গুজরাটের চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি রাজ্য এবং মেবারের গুহিলোট বংশীয় রাজ্যটি। এছাড়াও ছিল পরবর্তী পালরাজাদিগের অধীনে বিহারের মগধরাজ্য এবং

বাঙলার সেনবংশীয় রাজ্য। ভারত যখন রাজনৈতিকভাবে এইরূপে বহুধা-বিচ্ছিন্ন তখনই ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ হলেন আফগানিস্তানের অন্তর্গত ক্ষুদ্র গজনী রাজ্যের তুর্কী অধিপতি সুবুক্তিগিন।

সুবুক্তিগিন প্রথমে পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী রাজ্যটি আক্রমণ করলেন। শাহীরাজ জয়পাল পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। পরে প্রতিবেশী হিন্দুরাজাদিগের সাহায্য নিয়েও জয়পাল পুনরায় পরাজিত হন। সবুক্তিগিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মাহমুদ গজনীর সুলতান হন (৯৯৮ খ্রীঃ)। কথিত আছে তিনি সতের বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন (১০০০-১০২৬ খ্রীঃ) এবং প্রতিবারই বিধর্মীদের সম্পত্তি লুণ্ঠন, হত্যা ও ধ্বংসলীলায় মত্ত হন।

১০০১ খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ এক শক্তিশালী বাহিনীসহ জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করে জয়পালকে পরাজিত করেন। পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে জয়পাল আত্মহত্যা করলেন (১০০২ খ্রীঃ)। জয়পালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আনন্দপাল উত্তর ভারতের হিন্দুরাজাদের সাহায্য নিয়ে এক বিশাল বাহিনী গঠন করেন কিন্তু ওয়াইহিন্দের যুদ্ধে তিনি মাহমুদের নিকট পরাজিত হন (১০০৯ খ্রীঃ)। এরপর নগরকোটের (কাংড়ার) দুর্ভেদ্য দুর্গটির পতন হয় এবং সঞ্চিত বিপুল সম্পদ মুসলিমদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে প্রথমে আনন্দপাল, পরে তাঁর পুত্র ত্রিলোচনপাল মাহমুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। চন্দেল্ল নৃপতি বিদ্যাধর ত্রিলোচনপালের পক্ষে যোগ দিলেন কিন্তু মাহমুদ যুদ্ধে জয়ী হন (১০১৯ খ্রীঃ)। ত্রিলোচনপালের পুত্র ভীমপাল মাহমুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অটল ছিলেন। অবশেষে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে শাহী রাজ্যটি মাহমুদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

এরপর মাহমুদ একাদিক্রমে উত্তর ভারতের নানাস্থানে তাঁর লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা অব্যাহত রাখেন। তিনি মুলতান, ভাতিন্দা, থানেশ্বর, মথুরা, কনৌজ, কালঞ্জর প্রভৃতি জয় করিলেন বিজিত রাজ্যের রাজারা মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করে আত্মরক্ষা করলেন।

ভারতে সুলতান মাহমুদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিযান হল সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন (১০২৫-২৬ খ্রীঃ)। মন্দিরের সঞ্চিত বিপুল ধনরাশির কাহিনী শুনেই মন্দির আক্রমণে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন মাহমুদ। অবশ্য বিধর্মীদেরকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যও ছিল তাঁর। সোমনাথের সুদৃশ্য মন্দিরটি ছিল গুজরাটের উপকূলে আরবসাগরের তীরে। মন্দিরের অভ্যন্তরে 'লিঙ্গম' ছিল হিন্দুদের একটি পবিত্র বিগ্রহ। কয়েক হাজার ব্রাহ্মণের অনুরোধ-উপরোধ এবং আনহিলবাড়ার রাজা ভীমদেব ও অন্যান্য হিন্দু রাজার বাধাদান অগ্রাহ্য করে মাহমুদ সসৈন্যে মন্দির লুণ্ঠন করলেন, বিগ্রহটিও ধ্বংস করলেন। মন্দিরের যাবতীয় ধনরত্ন রাজধানী গজনীতে প্রেরিত হল। এই ঘটনার পর মাহমুদ মাত্র অল্প কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে

তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বোখারা ও সমরখন্দ থেকে গুজরাট এবং গঙ্গা-যমুনার দোয়াব পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য রেখে যান তিনি।

মাহ্‌মুদের নির্বিচার লুনঠনকার্য, নির্মমভাবে বিধর্মী হত্যা, মন্দির ধ্বংস ইত্যাদি ঘটনা থেকে তাঁকে একজন নিষ্ঠুর লুণ্ঠনকারী দস্যুরূপে মনে হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর চরিত্রের নানা সদগুণের পরিচয়ও আমরা পাই। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পরসিক। তাঁর সভায় জ্ঞানীগুণীদিগের মধ্যে ছিলেন আলবেরুণী। ইনি ছিলেন গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। 'শাহ্‌নামা' কাব্যের রচয়িতা ফিরদৌসী ছিলেন মাহ্‌মুদের প্রিয়পাত্র।

ফলাফল: সুলতান মাহ্‌মুদ একটি মাত্র প্রদেশ পাঞ্জাব গজনীর সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন, তাও বাধ্য হয়েই। তবু এটা মনে করলে ভুল হবে যে ভারতে তাঁর অভিযানগুলির কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। তিনি এই দেশের সম্পদ শোষণ করেছিলেন এবং অতি ভয়াবহরূপে এদেশের সামরিক শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। মাহ্‌মুদের গজনভী বংশের দ্বারা পাঞ্জাব অধিকারের ফলে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ-পথের চাবিটিই বহিঃশক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। মাহ্‌মুদের অভিযানের দুশো বছর পরে যে চূড়ান্ত সংঘর্ষের ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় মুসলিমদিগের অধিকার প্রসারিত হয়েছিল সেই সংঘর্ষের পথ প্রশস্ত করে দিলেন মাহ্‌মুদ।

আল্-বেরুণী: আল্‌বেরুণী ভারতে এসেছিলেন মাহ্‌মুদের অনুচরদের সঙ্গে এবং কিছুদিন ভারতে অবস্থান করে দেশে ফিরে যান। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি একখানি গ্রন্থের আকারে তাঁর ভারত অভিজ্ঞতার বিবরণ রেখে গেছেন। তাঁর 'কিতাব্-উল্ হিন্দ্' গ্রন্থ প্রদত্ত বিবরণ থেকেজানা যায়, তখন ভারত ছিল কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন (অনেক সময় পরস্পর-বিবদমান) রাজ্যে বিভক্ত। গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল সিন্ধু, মালব, গুজরাট, বঙ্গদেশ ও কনৌজ। সমাজে জাতিভেদ প্রথা তখন কঠোরভাবে পালিত হত। বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিধবা বিবাহ অনুমোদিত ছিল না। সমগ্রদেশেই মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল। আল্-বেরুণী লিখেছেন; "সমাজের ইতরশ্রেণীর মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু কৃষ্টিবান্ শ্রেণীর মানুষ মনে করতেন ঈশ্বর এক, অনন্ত ও অসীম, তাঁর আরম্ভও নাই, শেষও নাই। তিনি সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ এবং সকলের জীবনদাতা।" তখনকার বিচার ব্যবস্থা ছিল উদার ও আদর্শনিষ্ঠ। দণ্ডবিধি ছিল নমনীয়। অপরাধীর শাস্তি হত অপহৃত দ্রব্যের মূল্য অনুযায়ী। গুরুতর অপরাধে অঙ্গচ্ছেদের বিধান ছিল। করভার ছিল লঘু। উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ মাত্র রাজস্ব দিতে হত। ব্রাহ্মণরা করপ্রদান থেকে রেহাই পেতেন।

মাহ্‌মুদের ভারত অভিযানের ফলে গুরুতর ক্ষতির উল্লেখ করে আল্-বেরুণী লিখেছেন, "মাহ্‌মুদ দেশের সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছেন। এই জন্যই হিন্দুদের মনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটা বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণেই

আমাদের বিজিত অঞ্চল থেকে হিন্দুদের জ্ঞান-বিজ্ঞান বহুদূরে সরে গেছে।" "আলবেরুণীর মতে "হিন্দুদের প্রধান দোষ ছিল তাঁদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা, বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতা. অন্যান্য মানুষদের তাঁরা বলেন 'ম্লেচ্ছ" এবং তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগও রাখেন না।

দিল্লীর সুলতানী আমল

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর (১০30 খ্রীঃ) পর তাঁর বংশধরদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ শুরু হয়। মধ্য এশিয়া থেকে সেলজুক তুর্কীদের ক্রমাগত আক্রমণের চাপ বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় গজনভী রাজ্যের রাজধানী পাঞ্জাবের লাহোরে স্থানান্তরিত করা হল। কিন্তু উত্তরের ক্ষুদ্র ঘোর (ঘুরও বলা হত) রাজ্যটি ইতিমধ্যে প্রবল হয়ে উঠল।

মহম্মদ ঘোরী ঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে গজনী রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ঘোরের শাসনকর্তা গিয়াস্-উদ্দীন মহম্মদ (যিনি প্রথমে গজনীর অধীনে একজন সামন্ত ছিলেন) গজনী অধিকার করলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুইজ-উদ্দীন মহম্মদকে (যিনি পরে মহম্মদ ঘোরী নামে পরিচিত হন) গজনীর শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করলেন (১১৭৩ খ্রীঃ)। ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী গজনভী বংশীয় শাসককে পরাজিত করে পেশোয়ার জয় করেন। পরে লাহোর অধিকার করে মাহমুদের বংশধরকে হত্যা করেন (১১৯২ খ্রীঃ)।

মহম্মদ ঘোরী ভারতের অভ্যন্তরে একাধিকবার অভিযান পরিচালনা করলেন। শক্তিশালী চাহমান (চৌহান) বংশীয় নৃপতি তৃতীয় পৃথিবরাজের সম্মুখীন হলেন ঘোরী। দিল্লী-আজমীরের অধিপতিরূপে গঙ্গা-যমুনা-দোয়াবের উপর মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধের করবার দায়িত্ব ছিল পৃথিবরাজেরই। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী পরাজিত হলেন। আহত হয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন। ভারতজয়ের লক্ষ্যে অবিচল থেকে তিনি নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করলেন। পরের বছরই তিনি আবার পৃথিবরাজের সম্মুখীন হলেন। অন্ততঃ ১৫০জন সামন্ত রাজপুত পৃথিবরাজের পক্ষে যোগ দিলেন। একমাত্র যিনি দূরে সরে রইলেন তিনি হলেন গাহড়বাল (রাঠোর) বংশীয় রাজা জয়চন্দ্র (যাঁর সঙ্গে পৃথিবরাজের শত্রুতা ছিল সুবিদিত)। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথিবরাজ পরাজিত এবং নিহত হলেন (১১৯২ খ্রীঃ)। মহম্মদ ঘোরী দিল্লীর পার্শ্ববর্তী আজমীর ও অন্যান্য শহরগুলি একে একে অধিকার করলেন।

তিনি ১১৯4 খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের নিকটে চান্দোয়ার নামক স্থানে চূড়ান্ত যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হলেন। এর পর ঘোরী বারাণসী অধিকার করলেন এবং মন্দিরগুলি ধ্বংস করে তার স্থানে মসজিদ নির্মাণ করলেন। এর পর তিনি ভারতে অধিকৃত অঞ্চলগুলির ভার তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর কুতুব-উদ্দীন আইবকের হস্তে ন্যস্ত

করে বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত সম্পদসহ গজনীতে ফিরে গেলেন। কুতব্-উদ্দীন কালঞ্জরের দুর্গটি অধিকার করলেন।

মহম্মদ ঘোরীর অপর অনুচর ইখ্তিয়ার-উদ্দীন-মহম্মদ-বিন্-বখ্তিয়ার খল্জী পূর্বভারতে মুসলিম অধিকার প্রসারিত করতে উদ্যোগী হলেন। ঐতিহাসিকদিগের অনুমান, সম্ভবতঃ এই সময় পরবর্তী পাল বংশের বিলোপ ঘটে এবং কনৌজের গাহড়বাল বংশও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে কোন যোগ্য শাসক তখন না থাকায় অতি সহজেই বিহার মুসলিমদিগের কবলিত হল। বিহার জয়ের পর সম্ভবতঃ ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখ্তিয়ার খলজী মাত্র ১৭ জন অগ্রবর্তী অশ্বারোহী সেনাসহ অতর্কিতে সেনরাজধানী নদীয়ায় উপস্থিত হন। নদীয়া সহজেই বখতিয়ার খল্জি অধিকার করে নেন। অপ্রস্তুত লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। সেখানে তাঁর বংশধরগণ পরে অনেক বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন।*

কুতব্-উদ্দীন ঃ

কুতব্-উদ্দীন আইবক বিভিন্ন তুর্কী-আমির ও মহম্মদ ঘোরীর অন্যান্য সেনাপতিদিগের সম্মতিক্রমে 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করে দিল্লীতে স্বাধীন সুলতানী বংশের সূচনা করলেন। 'ঘোর'—রাজ্যটি অবস্থিত ছিল গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী পর্বতসঙ্কুল আফ্গানিস্থানে, তাই মহম্মদ ঘোরীর বিশ্বাসভাজন সুলতান ও তাঁর বংশধরদের তুর্কী-আফগান বলা হয়। এইরূপে দিল্লীতে স্বাধীন সুলতানী বংশের রাজত্ব শুরু হোল (জুন, ১২০৬ খ্রীঃ)। যেহেতু কুতব্-উদ্দীন ও তাঁর পরবর্তী শাসক ইলতুৎমিশ্ এবং তাঁর কিছু কিছু উত্তরাধিকারীও ছিলেন প্রথমে ক্রীতদাস, তাই এঁদের বংশ ইতিহাসে 'দাস রাজবংশ' নামে পরিচিত হয়েছে।

কুতব্-উদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেও অন্ততঃ দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী বিনা বাধায় তাঁকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এঁরা হলেন মুলতানের শাসনকর্তা নাসির-উদ্দীন কুবাচা এবং কিরমানের শাসনকর্তা তাজ-উদ্দীন ইল্দুজ। নিঃসন্তান অবস্থায় ঘোরীর মৃত্যুর পর তাজ-উদ্দীন গজনী অধিকার করেন। পরে কুতব্-উদ্দীন তাঁকে পরাজিত করে গজনীতে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু নিজের সৈন্যদিগের বিদ্রোহের দরুন তাঁকে গজনী ত্যাগ করে লাহোরে আশ্রয় নিতে হয়। এর অল্প পরেই 'চৌগন' (পোলো) খেলতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন (নভেঃ ১২১০ খ্রীঃ)।

কুতব্-উদ্দীন তাঁর বদান্যতার জন্য 'লাখ্বখ্শ্' (লক্ষের দাতা) রূপে পরিচিত ছিলেন। দিল্লী ও আজমীরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর দুটি মসজিদ ইসলাম ধর্ম ও শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচয় বহন করছে।

কুতব্-উদ্দীনের মৃত্যুর পর ইলতুৎমিশ্ সুলতান হলেন (১২১১ খ্রীঃ)।

* মীনহাজ-উস্-সিরাজ তাঁর গ্রন্থে (১২০২ খ্রীঃ রচিত ৎ-ই-নাসিরি) ১৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে বখ্তিয়ার খল্জীর বঙ্গ বিজয়ের যে কাহিনী লিখেছেন ঐতিহাসিকগণ তা প্রকৃত ইতিহাসের সঠিক উপস্থাপন বলে মনে করেন না।

ইলতুৎমিশ্ ঃ সুলতানী লাভ করেই ইল্‌তুৎমিশ্ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হলেন। আলি মর্দান খল্‌জী ইতিমধ্যেই দিল্লীর কর্তৃত্ব নিজের করায়ত্ত করে নিয়েছিলেন। নাসির-উদ্দীন কুবাচা মুলতান ও লাহোর অধিকার করে সমগ্র পাঞ্জাবে কর্তৃত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। তাজ-উদ্দীন ইল্‌দুজ নিজেকে মহম্মদ ঘোরীর উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষণা করে সমগ্র ভারতের উপরে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব দাবি করলেন।

ইলতুৎমিশ্

চতুর্দিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত হয়ে ইলতুৎমিশ্ সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। তিনি প্রথমে বিদ্রোহী সামন্ত নায়কদের বশীভূত করে দিল্লী, অযোধ্যা ও বারাণসী প্রভৃতি জেলাগুলিতে তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন। এরপর অন্যান্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাজ-উদ্দীন ইলদুজ ইলতুৎমিশের হস্তে পরাজিত ও নিহত হলেন। পরের বৎসর ইলতুৎমিশ্ নাসির-উদ্দীন কুবাচাকে বিতাড়িত করে লাহোর অধিকার করলেন। এই ভাবে ইল্‌তুৎমিশের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ একে একে পর্যুদস্ত হল। সুলতানীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগের তাঁর আর কোন আভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধক রইল না।

কিন্তু এই সময় ইলতুৎমিশের সম্মুখে দেখা দিল এক নতুন বিপদ। পরাজিত খিভার শাহের পুত্র জালাল-উদ্দীনকে পশ্চাদ্ধাবন করে মোঙ্গলরা সসৈন্যে উপস্থিত হল ইলতুৎমিশের সাম্রাজ্যের একবারে দ্বার প্রান্তে (১২২১ খ্রীঃ)। মোঙ্গলদের নেতা ছিলেন চেঙ্গিস্ খাঁ, যার নাম শুনলেই দেহের রক্ত হিম হয়ে যেত। ইলতুৎমিশ্ জালাল উদ্দীনকে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে অস্বীকার করায় দেশ এক সমূহ বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল। মোঙ্গল-আক্রমণ দিল্লীর সুলতানী বংশের পক্ষে এক হিসাবে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল, কারণ সর্বদা মোঙ্গল আক্রমণের বিভীষিকার দরুন অভিজাত বংশীয় মুসলিমগণ দিল্লীর সিংহাসন রক্ষায় সুলতানের চার পাশে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কুবাচার পতনের পর ইলতুৎমিশ্ বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আলীমর্দান খলজী অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর শত্রুদিগের হস্তে নিহত হলেন। তাঁর বংশধরদিগের বিদ্রোহ ইলতুৎমিশ্ দমন করলেন। এরপর তিনি একে একে গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী প্রভৃতি দুর্গগুলি জয় করলেন। উজ্জয়িনীর বিখ্যাত মহাকালের মন্দিরটি ধ্বংস করা হয়। ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিশের মৃত্যু হয়।

যুদ্ধজয়ে এবং রাজ্যবিস্তারে ইলতুৎমিশের কৃতিত্ব অবশ্যই প্রশংসনীয়। মোঙ্গল বিভীষিকা থেকে কৌশলে ভারতকে রক্ষা করা নিঃসন্দেহে তাঁর একটি কৃতিত্ব। চারদিকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে তিনি অসম সাহস ও সামরিক শক্তিবলে সুলতানী সাম্রাজ্যকে শুধু রক্ষাই করেন নাই, এর আয়তনও উল্লেখযোগ্য রূপে বর্ধিত করেছিলেন। এই সব নানা কারণে ইলতুৎমিশকে অনেকে দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতানরূপে গণ্য করেন।

ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে দিল্লীতে সু-উচ্চ কুতব-মিনারটি নির্মিত হয়েছিল বিখ্যাত সাধক খাজা কুতব্-উদ্দীন বখতিয়ার কাকির স্মৃতিরক্ষার্থে। এই মিনার নির্মাণের কাজ অবশ্য শুরু হয়েছিল কুতব্-উদ্দীনের রাজত্বকালে। কিন্তু শেষ হয় ইলতুৎমিশের আমলে। বাগদাদের খলিফা ইল্‌তুৎমিশ্‌কে 'সুলতান-ই-আজম'-উপাধিতে ভূষিত করেন। ইলতুৎমিশের চল্লিশজন সুদক্ষ ক্রীতদাস 'চল্লিশের চক্র' নামে সংগঠিত ছিল।

ইলতুৎমিশ্ সুলতানশাহীকে বংশানুক্রমিক করতে চাইলেন। তিনি নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচন করলেন কন্যা রাজিয়াকে। সুলতানা রাজিয়া অবশ্য সাহসিকা ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন কিন্তু ধর্মীয় অন্ধসংস্কারবশতঃ যোদ্ধৃ নেতৃবৃন্দ স্ত্রীলোকের অধীন হয়ে থাকাটা অসম্মানজনক বলে মনে করলেন। রাজিয়া পুরুষের ন্যায় পোশাক পরিহিতা হয়ে নির্ভয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। এটা তাঁরা পছন্দ করলেন না। শক্তিশালী সামন্তরা বিদ্রোহ করলেন। বিদ্রোহে রাজিয়া নিহত হলেন। রাজিয়া চার বছরের বেশি রাজত্ব করতে পারলেন না। গোঁড়া মুসলিমদিগের বিরোধিতাই এর কারণ।

নাসির-উদ্দীন মাহ্‌মুদ (১২৪৬ ৬৬ খ্রীঃ)

রাজিয়ার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সময়ে মোঙ্গলরাও বারে বারে ভারত আক্রমণ করতে থাকে এবং লাহোর অধিকার করে বসে। অবশেষে ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিশের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ্দীন মাহ্‌মুদকে সিংহাসনে বসান হয়। তবে সত্যকার শাসনক্ষমতা ন্যস্ত রইল তাঁর যোগ্য অভিভাবক গিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বনের (প্রকৃত নাম উলুঘ খান) হস্তে। নাসির-উদ্দীন ছিলেন শান্তিপ্রিয় স্বভাবের। তিনি নিরুদ্বেগে দিন কাটাতেই ভালবাসতেন।

উলুঘ খান প্রথমে ছিলেন ইল্‌তুৎমিশের অধীনে একজন ক্রীতদাস। পরে যোগ্যতা-বলে উচ্চতর পদে উন্নীত হন। ক্ষমতা পেয়ে তিনি দিল্লী ও পাঞ্জাবের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি একে একে অধিকার করলেন। পরে সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করে সুলতানের প্রতিনিধি ('নায়েব-ই-মামালিকাট্') উপাধি লাভ করেন।

উলুঘ খান সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্রতী হলেন এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সুলতানের কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপন করলেন। তিনি কঠোর হস্তে রাজকর্মচারীদিগের বিদ্রোহ দমন করলেন। ইতিমধ্যে উলুঘ খানের সম্মুখে কঠিনতর বিপদ উপস্থিত হল। দুর্ধর্ষ

মোঙ্গলরা পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করল। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রতিরক্ষাব্যূহের বরাবর উলুঘ খান (বল্‌বন) একসারি দুর্গ নির্মাণ করলেন। এদিকে মুলতানের শাসনকর্তা দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে মোঙ্গলদিগের অধীনতা স্বীকার করলেন। এই অবস্থায় বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রে বিব্রত হওয়ায় দিল্লীর সুলতানী বিপন্ন হয়ে পড়ল। কিন্ত উলুঘ খান যথেষ্ট দৃঢ়তা সহকারে এই সঙ্কট থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করলেন।

এই সময় বঙ্গদেশের শাসনকর্তা তুঘ্রিল খাঁ দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন সুলতানরূপে ঘোষণা করলেন। কালঞ্জর, গোয়ালিয়র ও মালব প্রভৃতি রাজ্যের হিন্দুরাজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। দোয়াব অঞ্চলের হিন্দুরাজারাও বিদ্রোহে যোগ দিলেন কিন্তু বল্‌বন কঠোর হস্তে এই সকল বিদ্রোহ দমন করলেন। নাসির-উদ্দীন মাহ্‌মুদের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসরের বিবরণ জানা যায় না। সম্ভবতঃ ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

গিয়াস্‌-উদ্দীন বল্‌বন (১২৬৬-৮৭ খ্রীঃ)

নাসির-উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর শ্বশুর ও মন্ত্রী উলুঘ্‌ খান গিয়াস-উদ্দীন বল্‌বন নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১২৬৬)। তিনি ইলতুৎমিশের চাব্বিশ জন ক্রীতদাসের অন্যতম ছিলেন।

বল্‌বন হিন্দু রাজাদের ও মুসলিম সামন্তদের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনে করলেন তিনি। কিন্তু দিল্লী ও গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে মেওয়াটের রাজপুতদের অত্যাচার বহুদিন ধরে চলেছিল। সুলতান হয়ে বলবন্‌ মেওয়াটীদের দমন করলেন। তিনি নানাস্থানে দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করলেন।

বঙ্গদেশের শাসনকর্তা তুঘ্রিল খাঁ সুলতানের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বল্‌বন তাঁর বিরুদ্ধে পর পর দুবার অভিযান প্রেরণ করেন। দুবারই তাঁর সেনাদল পরাজিত হওয়ায় বৃদ্ধ সুলতান স্বয়ং বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তুঘ্রিল পলায়ন করলেন, কিন্তু ধরা পড়ে নিহত হলেন। তুঘ্রিলের সমর্থক অন্যান্য বিদ্রোহীরা ধরা পড়ে কঠোর শাস্তি পেল। সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র বুখ্‌রা খাঁকে বঙ্গ দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল।

বল্‌বনের রাজত্বকালের আর একটি প্রধান ঘটনা ভারত সীমান্তে মোঙ্গলদের বার বার আক্রমণ। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে বল্‌বনের জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদ নিহত হন। মুহম্মদের মৃত্যুতে বল্‌বন গভীর শোকে নিমগ্ন হন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয় (১২৮৬ খ্রীঃ)।

সামরিক কৃতিত্ব অপেক্ষা ন্যায়পরায়ণতার জন্যই বল্‌বন অধিক প্রসিদ্ধ। ন্যায়-পরায়ণতা সম্বন্ধে সুলতান নিজেই মন্তব্য করেছেন, "আমি যা কিছু করি তা অত্যাচারীর অত্যাচার দমন ও ন্যায়ের চক্ষে সকলকে সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। যে শাসন দেশের জনগণকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে সেটাই দেশের ও রাষ্ট্রের মর্যাদা

বৃদ্ধি করে।" ঐতিহাসিক মীনহাজ-উস্-সিরাজ ও কবি আমীর খসরু বলবনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন এবং তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও বিদ্যোৎসাহিতার প্রশংসা করেছেন। নিঃসন্দেহে বলবন ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক। বিদ্রোহী আমীর ওমরাহদের বশীভূত করে তিনি সুলতানের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। প্রয়োজনীয় সামরিক ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করে তিনি সুলতানীর ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছিলেন। দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিশের পরেই তাঁর নাম করা যেতে পারে।

বলবনের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র কায়কোবাদ সুলতান হন (১২৮৭-৯০)। কিন্তু শাসন করার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। সুযোগ বুঝে মোঙ্গলরা আবার পাঞ্জাব আক্রমণ করে দিল্লীর পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত হল কিন্তু তারা পরাজিত হল। বহু মোঙ্গল বন্দী হয়ে নিহত হল। ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করে অনেক মোঙ্গল 'নব মুসলমান' রূপে পরিচিত হল। এই সময় কায়কোবাদ অসুস্থ হয়ে পড়লে রাজধানীর তুর্কী অভিজাতদিগের প্রধান 'আমীর' জালালউদ্দীন খলজী দিল্লী অধিকার করেন। 'জালাল-উদ্দীন ফিরুজশাহ' নাম ধারণ করে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করলেন (১২৯০ খ্রীঃ)। দিল্লীতে খলজী বংশের শাসনের সূত্রপাত হল।

খলজী বংশ (১২৯০-১৩১৬ খ্রীঃ)

আলাউদ্দীন খলজী ঃ জালাল-উদ্দীন ফিরুজ খলজী যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তরের কোঠায়। তিনি ছিলেন দুর্বল চিত্ত ও দয়ালু প্রকৃতির। আমীর ওমরাহদের এবং সুলতানের আত্মীয়-স্বজনদের রাজকার্যে বহাল রেখে তিনি শান্তিতে রাজত্ব করতে চেয়েছিলেন। এদিকে মোঙ্গলরা পুনরায় ভারত আক্রমণ করে সুলতানের শাসনকে বিব্রত করে তোলে। কিন্তু তারা পরাজিত হয় এবং বহু মোঙ্গল নিহত হয়। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকেই ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল। তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা ক্রমেই প্রকট হয়ে পড়ল। পরাজিত বিদ্রোহীদেরকেও তিনি শাস্তি দিতে অপারগ ছিলেন। তাঁর দুর্বলতার জন্য তাঁর জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। জালাল-উদ্দীন প্রথমে আলাউদ্দীনকে কারা ও অযোধ্যা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। কিন্তু এই অসাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে অভিযান করে দেবগিরির যাদবরাজ রামচন্দ্রকে পরাজিত করলেন এবং প্রভূত ধন-সম্পদসহ কারায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সুলতান বিজয়ী ভ্রাতুষ্পুত্রকে কারায় অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেলে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হলেন (জুলাই, ১২৯৬ খ্রীঃ)।

আলাউদ্দীনের আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ উপস্থিত হল। তিনি সসৈন্যে দিল্লী অধিকার করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আলাউদ্দীনের আদেশে জালাল-উদ্দীনের বিধবা

পত্নী কারারুদ্ধ হলেন, তাঁর পুত্রগণকে অন্ধ করা হল। দিল্লীতে আমীর ওমরাহদের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণ করে আলাউদ্দীন তাঁদের বশীভূত করলেন।

আলাউদ্দীনের রাজত্বের প্রথম ভাগে মোঙ্গলদের আক্রমণ চলতে থাকে। কিন্তু মোঙ্গলগণ পরাজিত হয়, মোঙ্গলনায়কদের অনেকেই ধৃত হয়। আলাউদ্দীন তাঁদের কঠোর শাস্তি দিলেন।

সিংহাসন অধিকার করবার পরই আলাউদ্দীন সমগ্র ভারত জয়ের পরিকল্পনা করলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিস্তারে মন দিলেন। প্রথমেই তিনি দুইজন বিশ্বস্ত সেনাপতি নসরৎ খাঁ ও উলুঘ্ খাঁকে গুজরাট আক্রমণ করতে প্রেরণ করলেন। বাঘেলা রাজ দ্বিতীয় কর্ণদেব পরাজিত হলেন এবং গুজরাট বিজিত হল (১২৯৭ খ্রীঃ)। রানী কমলাদেবী বন্দিনী হয়ে আলাউদ্দীনের হারামে (অন্তঃপুরে) স্থান পেলেন। এখানে উল্লেখ্য গুজরাট জয়ের পর আলাউদ্দীনের লুণ্ঠিত ধন-সম্পদের সঙ্গে ক্রীতদাস মালিক কাফুরও ধৃত হন (এই কাফুরই পরে আলাউদ্দীনের রাজ্যজয়ের কালে প্রধান সেনাপতির ভূমিকা নিয়েছিলেন)। এর কয়েক বৎসর পরে আলাউদ্দীন রাজপুতনার বিখ্যাত রণথম্ভোর দুর্গ অবরোধ করলেন। এক বৎসর অবরোধের পর সেনাপতিদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় দুর্গাধিপতি বীর হাম্বীরদেব নিহত হন এবং রণথম্ভোর সুলতানের দ্বারা অধিকৃত হয় (১৩০০ খ্রীঃ)।

আলাউদ্দীন খলজী

রণথম্ভোর অধিকারের পর আলাউদ্দীন পরবর্তী অভিযান পরিচালনা করলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী 'মেবারের রাজপুত' রাজ্যটির বিরুদ্ধে।

মেবারের গুহিলোট বংশীয় রাজপুতদিগের সঙ্গে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতানদিগের একাধিকবার সংঘর্ষ হয় কিন্তু আলাউদ্দীনের পূর্বসূরীদের কেউই মেবার জয়ের চেষ্টা করেন নাই। আলাউদ্দীন স্বয়ং মেবার আক্রমণ করে চিতোর অবরোধ করলেন। ইতিবৃত্তকার টডের মতে চিতোর অভিযানে আলাউদ্দীনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাণা ভীম সিংহের সুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে লাভ করা। আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযান প্রসঙ্গে টডের বর্ণিত পদ্মিনী উপাখ্যানের সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন, কারণ তাঁরা নিশ্চিত যে আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের সময় চিতোরের রাণা ছিলেন রতন সিংহ, ভীম সিংহ নন। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, চিতোর অভিযানে আলাউদ্দীনের উদ্দেশ্য ছিল দিল্লীর অতি নিকটবর্তী এই শক্তিশালী রাজপুত রাজ্যটিকে সুলতানের বশীভূত করা। কবি আমির খসরু চিতোর

অভিযানে সুলতানের সঙ্গী ছিলেন, তিনি এই অভিযানের একটি মূল্যবান বিবরণ দিয়ে গেছেন।

আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের বিরুদ্ধে রাজপুত বীরগণ প্রবল বিক্রমে বাধা দিয়েও চিতোর রক্ষা করতে পারেন নাই। চিতোর মুসলিমদিগের দ্বারা অধিকৃত হলে শত শত রাজপুত রমণী 'জহরব্রত' অনুষ্ঠান করে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দেন। রাজপুত বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। চিতোর জয়ের পর আলাউদ্দীন চিতোর শাসনের ভার অর্পণ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খানের হস্তে এবং চিতোরের নতুন নামকরণ করেন খিজিরাবাদ।

রণথম্ভোর ও চিতোর দুর্গ জয়ের পর আলাউদ্দীনের পরবর্তী লক্ষ্য হল পার্শ্ববর্তী মালব রাজ্যটি অধিকার করা। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর সেনাপতি আইন্-উল্-মুল্‌ক্ মুলতানীকে মালব জয়ের জন্য প্রেরণ করলেন। যুদ্ধে মুসলিমগণ জয়লাভ করলেন। মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, ধারা, চান্দেরী প্রভৃতি বিখ্যাত দুর্গগুলি আলাউদ্দীন জয় করলেন। আইন্-উল্-মুল্‌ক মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। এইভাবে ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে সুলতানী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

আলাউদ্দীনের দাক্ষিণাত্য-অভিযান ঃ আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে দেবগিরির বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান প্রেরিত হয়। যাদব সেনাদল বিধ্বস্ত হয় এবং দেবগিরি লুণ্ঠিত হয়। যাদবরাজ রামচন্দ্রদেব বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে প্রেরিত হন। দেবগিরি দিল্লীর সুলতানের করদ রাজ্যে পরিণত হল। দেবগিরি জয়ের পর মালিক কাফুর ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দে তেলিঙ্গানার রাজধানী বরঙ্গল আক্রমণ করেন। তেলিঙ্গানার কাকতীয় রাজা দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রদেব বরঙ্গলের দুর্গে আশ্রয় নিয়ে বহুদিন ধরে আক্রমণ প্রতিহত করেন; কিন্তু অবশেষে আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। তাঁর ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হল। বরঙ্গল করদরাজ্যে পরিণত হল। বরঙ্গল থেকে যে ধনরত্ন কাফুর দিল্লীতে নিয়ে যান সে সম্বন্ধে আমীর খসরু লিখেছেন, "এক হাজার উট ধনরত্নের বোঝার ভারে আর্তনাদ করতে লাগল" (১৩১০ খ্রীঃ)।

দাক্ষিণাত্যের সামরিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ও অপরিমেয় ধনরত্নে প্রলুব্ধ হয়ে কাফুরের নেতৃত্বে আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যে পুনরায় এক অভিযান প্রেরণ করেন। দেবগিরির পথে কাফুর অকস্মাৎ হোয়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লালের রাজধানী দোরসমুদ্রে উপস্থিত হন। হোয়সলরাজ উপায়ান্তর না দেখে সঞ্চিত ধনরাশি সমর্পণ করে সন্ধিভিক্ষা করলেন। হোয়সল রাজ্য দিল্লীর করদ রাজ্যে পরিণত হল।

এর পর সুদূর দক্ষিণে কাফুর পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী মাদুরায় উপস্থিত হলেন। সে সময় পাণ্ড্য-রাজপরিবারে গৃহবিবাদ চলছিল। সুতরাং বিনাযুদ্ধেই পাণ্ড্য-রাজ্য অধিকৃত হল। মাদুরা লুণ্ঠন করে কাফুর সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। আমীর খসরুর বিবরণে জানা যায়, এই অভিযানে কাফুর ৬১২টি হস্তী, ২০,০০০ অশ্ব, ৯৬,০০০ মন স্বর্ণ এবং বহু মণি মুক্তা নিয়ে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী করতে আলাউদ্দীনের গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা ঃ আলাউদ্দীন সর্বদা বিদ্রোহের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতেন। সম্ভ্রান্ত লোকদের মেলামেশা, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি তিনি নিষিদ্ধ করলেন। রাজ্যমধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ হল। সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর কঠোর নজরদারি রাখা হল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হল। আলাউদ্দীন মনে করতেন যে, প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় করে রাখা হলে তাদের সমস্ত শক্তি জীবিকা নির্বাহের জন্যই ব্যয়িত হবে। সুতরাং ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের চিন্তা তাদের মনে স্থান পাবে না।

সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আলাউদ্দীন খল্‌জী এক বিশাল সৈন্যবাহিনী রেখেছিলেন। এই বিশাল বাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ সামরিক ব্যয়ভার বহন করতে হত। প্রধানতঃ সৈন্যদের ব্যয়ভার লাঘব করে রাজকোষের উপর অতিরিক্ত চাপ কমাবার জন্যই কৃত্রিম উপায়ে জিনিসপত্রের দাম অনেক কমিয়ে দিলেন আলাউদ্দীন। নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য, যেমন—গম, যব, চাল, বস্ত্র, চিনি, ঘি, তেল, লবণ প্রভৃতি, এমন কি গৃহ-পালিত জন্তু, যেমন—ঘোড়া ও গোমহিষাদির দরও নির্দিষ্ট করে দিলেন। বাজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সুলতান একটি শক্তিশালী কর্মচারীদল নিযুক্ত করলেন।

তাঁর আদেশমত সকল ব্যবস্থা যথাযথভাবে অবলম্বিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে দেখা-শুনার জন্য 'শাহ্‌না-ই-মণ্ডি' এবং 'দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ' নামে দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হলেন। কোন বিপণিকার কোন পণ্যবিক্রয়ে ওজন কম দিলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হত (এমন কি তার দেহ থেকে সমপরিমাণ মাংস কেটে নেবারও বিধান ছিল)। বাজারের দালালদের এরূপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হল যে তারা আর কোন মতে নির্দিষ্ট মূল্যের হেরফের করতে সাহসী হত না। বে-আইনীভাবে শস্য মজুত করা বা নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক দরে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হল। স্থির হল দোয়াব অঞ্চলে 'খালসা' গ্রামগুলির রাজস্ব আদায় হবে উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে, নগদে নয়। দিল্লীর প্রধান গোলাঘরগুলিতে শস্য মজুত করা হবে যাতে দুর্ভিক্ষের সময় মানুষকে দ্রুত খাদ্য সরবরাহ করা যায়। 'শাহ্‌না-ই-মণ্ডি'র অফিসে সকল পণ্য-ব্যবসায়ীর পক্ষে নাম রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক করা হল। কোন রাজকর্মচারী যাতে অধিক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে না পারেন সেজন্য জায়গীর প্রদানের প্রথা রহিত করা হল। নগদ মুদ্রায় বেতন দেওয়া আরম্ভ হল।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কিরূপ কঠোরভাবে পালিত হত একটা উদাহরণ দিলে তা বোঝা যাবে। একবার 'শাহ্‌না-ই-মণ্ডি' সুপারিশ করেছিলেন যে খরার সময়ে শস্যের নির্দিষ্ট মূল্য কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। বরাণি জানিয়েছেন যে, এই অপরাধের জন্য সুলতান তাঁকে ২১ বার বেত্রাঘাত করবার আদেশ দিয়েছিলেন। বরাণি আরও বলেছেন, খরার সময়েও খাদ্যশস্যের কোন অভাব হত না।

যদিও আলাউদ্দীনের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সামরিক ব্যয় হ্রাস করা, তবু এই ব্যবস্থার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস পেয়েছিল

এবং সাধারণ প্রজারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল। সরকারের দিকেও অনেক সুবিধা হয়েছিল। কারণ এর ফলে বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণের ব্যয়ভার হ্রাস পেল এবং রাজকোষের উপর থেকে চাপও কমে গেল। জিয়াউদ্দীন বরাণির মতে "বাজারে শস্যের মূল্য অপরিবর্তিত থাকাটা সে সময়ে একটা অত্যাশ্চর্য বিষয় বলে গণ্য হয়েছিল।"

আলাউদ্দীন হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করতেন। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর, আবাসিক কর প্রভৃতি নানাবিধ নিপীড়নমূলক কর ধার্য করে ও অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা জারি করে হিন্দুদের যথেষ্ট দুর্দশার কারণ হয়েছিলেন।

আলাউদ্দীনের ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনি ছিলেন ক্রূর, নিষ্ঠুর এবং অকৃতজ্ঞ। তাঁর বৃদ্ধ স্নেহান্ধ পিতৃব্যকে গুপ্তঘাতকের দ্বারা নির্মমভাবে হত্যা করাতেও তিনি এতটুকু কুণ্ঠিত হন নাই। তবে রাজ্য-বিজেতারূপে এবং কঠোর শাসনশৃঙ্খলার প্রবর্তক রূপে তাঁর কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া আলাউদ্দীন ছিলেন শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। কবি আমীর খসরু এবং সন্ত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কুতব্-মসজিদের আলাই দরজা, শিরির দুর্গ ও হাজার শিতুন তাঁরই আদেশে নির্মিত হয়। ঐতিহাসিক লেনপুল আলাউদ্দীনকে 'সাহসী রাজনৈতিক, অর্থনীতিবিদ' আখ্যা দিয়েছেন। ইবন্ বতুতা তাঁকে দিল্লীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতানের মর্যাদা দিয়েছেন।

১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। তাঁর অকর্মণ্য বংশধরগণ আমীর চক্রের হস্তে সম্পূর্ণ ক্রীড়নক হয়ে পড়ে এবং সিংহাসন নিয়ে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি চলতে থাকে। সুলতানের প্রিয় সেনাপতি মালিক কাফুরই এই জঘন্য চক্রান্তের নায়ক হয়ে উঠলেন। সুলতানের বংশধরদিগের কেউই রাজ্যশাসনের যোগ্য ছিলেন না।

তুঘলক বংশ

গিয়াস-উদ্দীন-তুঘলক (১৩২০-২৫ খ্রীঃ) ঃ আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর চার বৎসর নানা গোলযোগে অতিক্রান্ত হয়। অবশেষে আমীর চক্রের পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দীপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিক সসৈন্যে দিল্লীতে উপস্থিত হলেন। গিয়াস-উদ্দীন-তুঘলক নাম ধারণ করে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এইরূপে খলজী বংশের অবসান ঘটিয়ে তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা হল (১৩২০ খ্রীঃ)। গিয়াস্-উদ্দীন মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন (১৩২০-২৫ খ্রীঃ)। এই সময়ে তিনি বরঙ্গল ও বঙ্গদেশে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। তিনি কৃষি, পুলিস ও বিচারবিভাগীয় সংস্কার প্রবর্তন করে দেশে সমৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র জোনা খাঁর (জুনা খাঁও বলা হয়) ষড়যন্ত্রে এক আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু হলে জোনা খাঁ মুহম্মদ-বিন্-তুঘলক নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন (১৩২৫ খ্রীঃ)।

মহম্মদ-বিন্-তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রীঃ) ঃ ভারতের মুসলমান সুলতানদিগের মধ্যে মুহম্মদ তুঘলকের মত অদ্ভুত চরিত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। স্বীয় কার্যাবলী দ্বারা তিনি কখনও নৃশংস হত্যাকারী, কখনও অত্যন্ত দয়াশীল, কখনও উন্মাদ, কখনও বা দূরদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তির মত নিজের পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্য, গণিত, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান পণ্ডিতদিগেরও বিস্ময় উৎপাদন করত। মহম্মদ তুঘলকই ভারতের ইতিহাসে একমাত্র শাসক যাঁকে একাধিক ব্যক্তি "পাগলা রাজা" বলে উপহাস করেছেন। কিন্তু পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বাস্তব বুদ্ধির সংযোগের অভাবের জন্যই তাঁর সকল শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তাঁর চারিত্রিক বৈপরীত্যের জন্য কেউ কেউ তাঁকে ইংলন্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা প্রথম জেমসের সঙ্গে তুলনা করেছেন।*

মহম্মদ-বিন্-তুঘলক

মহম্মদ তুঘলক যুবরাজ থাকাকালেই বরঙ্গল রাজ্যে সাফল্যের সঙ্গে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। হোয়সল রাজ্যেরও এক বড় অংশ সুলতানী সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। রাজত্বের প্রথম দিকে কয়েকটি বিদ্রোহ তিনি সহজেই দমন করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে মহম্মদ তুঘলক গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদিগের দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি করলেন। সুলতানী কর্মচারিগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে বর্ধিত হারে রাজস্ব আদায় করতে লাগলেন। কিন্তু এই সময়ে এ অঞ্চলের কৃষকগণ অনাবৃষ্টি ও খরার দরুন দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়ে নিদারুণ কষ্টে পড়েছিলেন। সুলতানের নিকট এই সংবাদ সময়মত না পেঁছানোর জন্য তাঁর আদেশে কৃষকদিগের উপর ব্যাপক অত্যাচার হতে লাগল। কর্মচারীদের নৃশংস আচরণের ফলে অনেকের প্রাণহানি ঘটল, বহু প্রজা প্রাণভয়ে ঘরবাড়ী ত্যাগ করে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। দোয়াব অঞ্চল কার্যতঃ জনশূন্য হয়ে পড়ল। সুলতান খবর পেয়ে তাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য নানাবিধ ত্রাণসামগ্রী পাঠালেন। কিন্তু এই বিলম্বিত সাহায্য ফলপ্রসূ হয় নাই।

মহম্মদ তুঘলকের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাজ হল রাজধানী পরিবর্তন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় দিল্লী বার বার মোঙ্গলদিগের আক্রমণে বিধ্বস্ত হচ্ছিল। তাই সুলতান সাম্রাজ্যের অপেক্ষাকৃত মধ্যস্থলে দক্ষিণ ভারতের দেবগিরিতে

* ইংলন্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় প্রথম জেমস্ও মহম্মদ তুঘলকের ন্যায় নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাস্তবজ্ঞানের অভাব ছিল। এই জন্য পোপ তাঁকে উপহাস করে বলেছিলেন, "Wisest fool in Christendom." অর্থাৎ "খ্রীষ্টান দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী মূর্খ।"

রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। দেবগিরির নূতন নাম দিলেন "দৌলতাবাদ"। অনিচ্ছুক নাগরিকদের অনেককে বলপূর্বক নতুন রাজধানীতে যেতে বাধ্য করা হল। ফলে অনেক লোকক্ষয় ঘটল। আট বৎসর পরে সকলকে পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রদত্ত হল। পুনরায় লোকক্ষয়ে সর্বত্র সুলতানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিল।

ইবন্ বতুতা বলেছেন যে সুলতানের বিরুদ্ধে দিল্লীর লোকদের কুৎসাপূর্ণ আচরণের জন্যই রাজধানী পরিবর্তন করে তিনি তাদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর রাজধানী পরিবর্তনের প্রকল্পটি হয়ত ব্যর্থ হত না যদি সুলতান সকল নাগরিককে নতুন রাজধানীতে যাবার আদেশ না দিয়ে মাত্র সরকারী দপ্তরখানাটি স্থানান্তরিত করতেন। কারণ নাগরিকরা সরকারী কাজের প্রয়োজনে নিজেরাই নতুন রাজধানীতে যেতে বাধ্য হতেন।

মহম্মদ তুঘলকের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল চীন ও পারশ্যের অনুকরণে উচ্চতর অর্থমূল্যযুক্ত তামার নোটের প্রচলন করা। এই প্রকল্পের দ্বারা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হল না, বরং এর ফলে নতুন করে অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হল। তামার নোটের ব্যবহারে ব্যাপক জাল এবং বিদেশীদের তামার নোট গ্রহণে অসম্মতি রাজ্যব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। তবে এবিষয়ে সম্রাট সততার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি খাঁটি ও জাল উভয় প্রকার নোটই ফিরিয়ে নিলেন এবং সকলকেই পূরো ক্ষতিপূরণ দিলেন। তামার নোট যাতে জাল না হয় সেবিষয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করার ফলেই এই প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়।

কারাজল বিজয়ের পরিকল্পনা ঃ মধ্য এশিয়ায় কারাজল এলাকাটি জয় করবার এক বিরাট পরিকল্পনা করলেন সুলতান। ঐ অঞ্চলের বাণিজ্য সুরক্ষিত করা এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা—এই দুটি প্রধান উদ্দেশ্যে সুলতান এরূপ পরিকল্পনা করেছিলেন, মনে হয়। এই প্রকল্পটি থেকে সুলতানের চিন্তাধারায় উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকল্পটি কার্যকরী করবার জন্য সুলতান প্রভূত ব্যয়ে প্রায় দু বৎসর ব্যাপী তিন লক্ষ সৈন্য প্রতিপালন করলেন। এবং তার পরে সৈন্য বাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে প্রকল্পটি পরিত্যাগ করলেন। বাস্তব সম্ভাবনা থাকলেও এই প্রকল্পটিও সফল হল না। সুলতানের নিজের স্থির সঙ্কল্পের অভাব, প্রয়োগে কল্পনার অভাব, আমলাতান্ত্রিক শৈথিল্য প্রভৃতি নানা কারণে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। রাজকোষের প্রভুত অর্থব্যয় হল কিন্তু কোন ফল হল না। নানা অব্যবস্থায় রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ল। ক্রমে ক্রমে মালব, বাংলা, গুজরাট, অযোধ্যা স্বাধীনতা ঘোষণা করল। বিদ্রোহ দমনের জন্য মহম্মদ রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করতে লাগলেন। অবশেষে ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

মহম্মদ তুঘলকের চরিত্রে পরস্পর-বিরোধী গুণের সমাবেশ পূর্বেই উল্লিখিত

হয়েছে। দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও সাহিত্যে তাঁর পারদর্শিতা প্রশংসনীয় ছিল কিন্তু তাঁর অদ্ভুত খামখেয়ালিপনার জন্য তিনি রাজ্যশাসনে সাফল্য লাভ করতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদের মতে মধ্যযুগের সম্রাটদিগের মধ্যে মহম্মদ তুলঘক ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। জনৈক ঐতিহাসিকের মতে মহম্মদ তুঘলক উলেমাদিগের অন্ধ গোঁড়ামি অস্বীকার করে ন্যায়নীতি ও বিবেকের ভিত্তিতে রাজ্যশাসন করতে চেয়েছিলেন। মুরদেশীয় (আফ্রিকান) পর্যটক ইবন্-বতুতা* সুলতানের পরস্পর-বিরোধী চরিত্রের উল্লেখ করে তাঁর "রেহ্‌লা" ('সফরনামা') গ্রন্থে লিখেছেন, "সুলতান উপহার বিতরণ করতে যেমন ভালবাসেন তেমনই ভালবাসেন রক্তপাত করতে।" ধৈর্য ও প্রয়োগ-কুশলতার অভাবের জন্যই তাঁর প্রকল্পগুলি বাস্তবে ফলপ্রসূ হয় নাই। তবে সেই ধর্মীয় গোঁড়ামির যুগে মহম্মদ তুঘলক কিন্তু ছিলেন ধর্মমতে উদার।

ফিরুজ শাহ্ তুঘলক : চতুর্দিকে বিশৃংখলা ও বিদ্রোহের মধ্যে মহম্মদ তুঘলকের মৃত্যু হলে তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা ফিরুজ শাহ তুঘলক আমীরদিগের অনুরোধে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু সাহস বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এ দুটির কোন বৈশিষ্ট্যই তাঁর চরিত্রে ছিল না। তিনি বঙ্গদেশের স্বাধীন নৃপতি ইলিয়াস্ শাহকে দমন করতে ব্যর্থ হন (১৩৪৫-১৩৫৪ খ্রীঃ)। ইলিয়াস্ শাহের পুত্র সেকেন্দার শাহের হস্তে পরাজিত হয়ে তিনি বঙ্গদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন (১৩৫৯-৬০ খ্রীঃ)। সিন্ধু প্রদেশটিও এই সময় স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। দক্ষিণাত্যে নর্মদা ও কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা এবং কাবেরী উপত্যকায় যথাক্রমে বাহ্‌মনি (১৩৪৭ খ্রীঃ) ও বিজয়নগর নামে (১৩৩৬ খ্রীঃ) দুটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভবের ফলে দাক্ষিণাত্যে সুলতানী আধিপত্য লুপ্ত হয়ে যায়।

বিদ্রোহ দমনে বা রাজ্যজয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শনে ব্যর্থ হলেও শাসন সংস্কারে কিন্তু ফিরুজ তুঘলক বাস্তব বুদ্ধি ও পরিকল্পনার নিদর্শন রেখে গেছেন। সাম্‌স্-ই-সিরাজ আফিক ('তারিখ-ই-ফিরুজশাহী' গ্রন্থে) বলেছেন যে ফিরুজ তুঘলক ইসলামী আইন-বিরোধী অতিরিক্ত কর তুলে দিয়ে ইসলাম নির্দেশিত মাত্র চার প্রকারের কর ধার্য করেন। ফিরুজ বেশ কয়েকটি খাল কাটিয়ে সেচব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছিলেন। এই খালগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৫০ মাইল দীর্ঘ যমুনা নদীর সঙ্গে যুক্ত খালটি।

ফিরুজ শাহ শরিয়তের বিধান অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করেন। দৈহিক নির্যাতন ও বিভিন্ন প্রকার অমানুষিক শাস্তিপ্রদান প্রথা রহিত করে তিনি সাধারণ মানুষের অশেষ উপকার করেন। অনাথ-আতুরের জন্য ফিরুজ দেওয়ান-ই-খয়রাত ও

* ইবন্ বতুতা ভারতে আসেন (১৩৩৩ খ্রীঃ) মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে। এই জন্য তিনি সুলতানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি মহম্মদ তুঘলকের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং ঐ সময়ের অন্যান্য অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি ভারতে ৮ বৎসর ছিলেন (১৩৩৪-৪২ খ্রীঃ)। সে সময়ের হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

রোগীদের জন্য দার-উল্-সাফা (হাসপাতাল) স্থাপন করেন। উদ্যান রচনা ছিল তাঁর একটি শখ। বিভিন্ন শহরে তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর উদ্যান নির্মাণ করেন। সাহিত্য ও স্থাপত্য-কলার প্রতি ফিরুজের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। জোনপুর, ফিরোজাবাদ, ফতেহাবাদ, হিসার প্রভৃতি কয়েকটি সুন্দর শহর তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। বহু বিদ্যালয়, মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র তাঁর সাহায্য লাভ করেছিল। এই রূপ নানা জনহিতকর কাজ করে ফিরুজ ইতিহাসে প্রজার কল্যাণকামী স্বৈরতন্ত্রী নৃপতির মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের কয়েকটি দুর্বলতার জন্য তিনি সাম্রাজ্যের বিপদ ডেকে এনেছিলেন। এই দুর্বলতাগুলি হল ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা, আমীর ও আমলাতন্ত্রের উপর অত্যধিক নির্ভরতা, জায়গীর প্রথা এবং ক্রীতদাস প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা। এই সকল দুর্বলতার জন্য ইতিহাসে ফিরুজ তুঘলকের প্রজাহিতৈষী ভূমিকা মসীলিপ্ত হয়েছে।

তৈমুরলঙ্

১৩৮৮ সালে ফিরুজ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্বল বংশধরদিগের আমলে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। মোঙ্গলদের চাঘতাই বংশের তৈমুরলঙ্ **১৩৯৮** খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন। শেষ তুঘলক শাসক নাসির-উদ্দীন মাহমুদ শাহের দুর্বল প্রতিরোধ চূর্ণ করে অনায়াসেই দিল্লী প্রবেশ করলেন তৈমুর। দিল্লী অধিকার করে তিনি পনের দিনমাত্র ছিলেন ; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তিনি লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ ও নরহত্যার পৈশাচিক তাণ্ডবলীলায় উন্মত্ত হয়েছিলেন। এরপর বিশাল তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্যের পতনের গতিরোধ করা আর সম্ভব হয় নাই।

তৈমুরলঙের প্রত্যাবর্তনের পর দুর্বল নাসির-উদ্দীন মাহমুদ শাহ্ গুজরাট থেকে দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নামেমাত্র শাসন বজায় রাখেন। নাসির-উদ্দীন মাহমুদ শাহের পর তৈমুরলঙের বংশোদ্ভূত খিজির খাঁ সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১৪১৪ খ্রীঃ)। খিজির খাঁর পরবর্তী তিনজন সৈয়দ বংশীয় সুলতান ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শেষ সৈয়দ সুলতান আলাউদ্দীন আলম শাহকে হত্যা করে বাহ্লুল লোদী লোদীবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১৪৫১ খ্রীঃ)। লোদীরা ছিলেন আফগান। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আফগান লোদী বংশ দিল্লীতে সুলতান শাহীর অধিকার বজায় রেখেছিল। শেষ লোদী সুলতান ইব্রাহিম লোদী ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে সুলতান হন। তাঁর সময় বিদ্রোহী আমীর দৌলৎ খাঁ কাবুলের শাসনকর্তা বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফারগানা নামক ক্ষুদ্ররাজ্যের অধিপতি ছিলেন বাবর। তিনি এই সুযোগ কাজে লাগালেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ভাগ্যান্বেষী বাবর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। সৈয়দ ও লোদী বংশ একত্রে ১১২ বৎসর দিল্লীতে রাজত্ব করেছিল কিন্তু সুলতানী ইতিহাসে তাঁরা কোন ছাপ রাখতে পারেন নাই।

সুলতান ও আমীরদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতাই এই যুগের মূল চিত্র। চতুর বাবর সেই সুযোগেরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

সুলতানী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ও পতন ঃ প্রায় তিনশো বছর দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য টিকে ছিল। তবে খলজী শাসনের শেষদিকেই সুলতানী সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। সুলতানী শাসনের মূল ভিত্তি ছিল সামরিক। বিলাস-ব্যসন ও অন্তঃকলহ এই সাম্রাজ্যের বনিয়াদ দুর্বল করে দিয়েছিল। সুলতানদের রাজকার্যে অবহেলা, আমোদপ্রমোদের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ, সঙ্কীর্ণ ধর্মনীতি, বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগের অভাব, প্রাদেশিক শক্তিগুলির বিদ্রোহ সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের কয়েকটি প্রধান কারণ। এই অবস্থায় মুহম্মদ তুঘলকের ন্যায় শাসকের অব্যবস্থিত চিত্ততা সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল। ফিরুজ তুঘলকের দুর্বল শাসননীতি, হিন্দুদিগের উপর নিপীড়ন, বৈষম্যমূলক জায়গীর প্রথা, ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—এই সব নানা কারণেই সুলতানী সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। সর্বশেষে তৈমুরলঙের আক্রমণ, ব্যাপক নরহত্যা ও লুণ্ঠনের ফলে সুলতানী সাম্রাজ্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও ভেঙে পড়ে। সর্বব্যাপী অসন্তোষ, বিদ্রোহ, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং পানিপথের যুদ্ধে বাবর কর্তৃক ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব

[ক] বঙ্গদেশে ইলিয়াস্ শাহী শাসকগণঃ হুসেন শাহ্ ও নসরৎ শাহ্ঃ সাংস্কৃতিক জীবন

সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের যুগে উত্তর ভারতে যে কয়টি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল তার মধ্যে বাংলাদেশের ইলিয়াস্ শাহী রাজ্যটি ছিল অন্যতম। মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের আমলে সামসুদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ্ বিদ্রোহী হয়ে নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতানরূপে ঘোষণা করেন (১৩৪৫ খ্রীঃ)। ইলিয়াস্ শাহ্ ছিলেন সুনিপুণ যোদ্ধা এবং বিচক্ষণ শাসক। তিনি বিহারের কয়েকটি জেলা এবং উড়িষ্যার কতক অংশ অধিকার করেন।

বাংলায় ইলিয়াস্ শাহী বংশ (১৩৪৫-১৫৩৮ খ্রীঃ) ঃ ইলিয়াস্ শাহের রাজধানী ছিল উত্তরবঙ্গের পাণ্ডুয়া। তাঁকে দমন করবার জন্য ফিরুজ তুঘলক এক বিশাল সৈন্য-বাহিনী সহ পূর্বাঞ্চলে উপস্থিত হলেন। ইলিয়াস্ শাহ্ একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। অনেক চেষ্টা করেও সুলতান একডালা দুর্গ জয় করতে না পেরে ইলিয়াস্ শাহের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। ইলিয়াস্ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরুজ তুঘলক আবার বাংলাদেশ

জয়ের চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হলে যুদ্ধের অবসান হয়। স্থাপত্যশিল্পের প্রতি সিকান্দার শাহের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনিই পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদের নির্মাতা। সিকান্দারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে তাঁর পুত্র গিয়াস্-উদ্দীন আজমশাহ সুলতান হন। গিয়াস-উদ্দীন আজম শাহ্ দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গিয়াস্-উদ্দীনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে নানা গোলযোগ দেখা দেয়। হাব্সী (আফ্রিকার আবিসিনিয়া থেকে আনীত) ক্রীতদাসদিগের নির্মম অত্যাচারে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে বাংলার অভিজাত মুসলিমদিগের আহ্বানে আলাউদ্দীন হুসেন 'হুসেন শাহ্' উপাধি নিয়ে সুলতান হলেন (১৪৯৩ খ্রীঃ)।

হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) ঃ ক্রীতদাসদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে হুসেন শাহ্ এক নবযুগের প্রবর্তন করেন। তিনি দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। রাজ্যবিস্তারেও তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি জৌনপুরের সুলতানকে পরাজিত করে বিহারের কিছু অংশ দখল করেন। দক্ষিণে উড়িষ্যা পর্যন্ত তাঁর অধিকার সম্প্রসারিত হয়। ত্রিপুরার একাংশ তিনি জয় করেছিলেন। সম্ভবতঃ ভৌগোলিক কারণে তাঁর আসাম জয়ের চেষ্টা সফল হয় নাই। হুসেন শাহের আমলে বাংলার সুলতানী রাজ্য বিহার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

হুসেন শাহ্ শুধু সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেন নাই। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ শাসক। তাঁর সময়ে বাংলার হিন্দু-মুসলিম সকল প্রজাই সুখে ও শান্তিতে বসবাস করত। প্রজার মঙ্গলসাধনে এবং দানধ্যানে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। হুসেন শাহ্ বহু হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর দুইজন প্রধান পরামর্শদাতা সাকর মল্লিক ও দবীর খাঁ (পরে রূপ ও সনাতন নামে খ্যাত) শ্রীচৈতন্য-দেবের শিষ্য ও পরম ভক্ত ছিলেন। উজীর গোপীনাথ বসু, সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রভৃতি অনেকেই হিন্দু ছিলেন। ধর্মীয় উদারতার জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। সুলতান হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেন।

শ্রীচৈতন্য

বাংলা সাহিত্যের প্রতি হুসেন শাহের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাংলা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। হুসেন শাহের সময়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীঃ) ইতিহাসের এক বিখ্যাত ঘটনা। চৈতন্য 'মহাপ্রভু' নামে বিখ্যাত, তিনি বাংলায় ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবনে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করেন।

'আচণ্ডালে কোল' দিয়ে তিনি সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের কৃত্রিম গণ্ডী দূর করেন। তাঁর শিষ্যদিগের মধ্যে যবন (মুসলিম) হরিদাস বিখ্যাত ছিলেন।

পূর্ববর্তী সুলতানদিগের ন্যায় হুসেন শাহও ছিলেন শিল্প-স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সময়ে অনেক সুন্দর সুন্দর মসজিদ এবং ফটক নির্মিত হয়। তাঁর সময়ে নির্মিত গৌড়ের 'ছোট সোনা মস্‌জিদ', 'গুমতি ফটক' প্রভৃতির গঠন ও সৌন্দর্য অসাধারণ।

নসরৎ শাহ্ (১৫১৮-৩৩ খ্রীঃ) ঃ হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫১৮ খ্রীঃ)। পিতার সুনাম তিনি সর্বতোভাবে রাখতে সক্ষম হন। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ, ত্রিহুত এবং বিহারের কিছু অংশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মুঘল সম্রাট বাবর নসরৎ শাহের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রথমদিকে সাফল্য অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত নসরৎ শাহ্ বাবরের নিকট পরাজিত হন। সুলতান অবিলম্বে বাবরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখলেন।

নসরৎ শাহ্ ছিলেন উদার, বিদ্যোৎসাহী এবং প্রজাবৎসল শাসক। মুসলিম-দিগের ন্যায় হিন্দুপ্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। হুসেন শাহের ন্যায় তিনিও শিল্প ও স্থাপত্যের অনুরাগী ছিলেন। গৌড়ের 'কদম রসুল' এবং 'বড় সোনা মসজিদ' তাঁর স্থাপত্যকীর্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

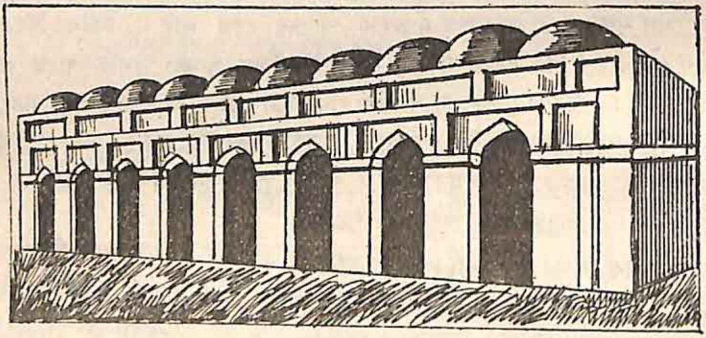

বড় সোনা মসজিদ

নসরৎ শাহের মৃত্যুর পরে যোগ্য শাসকের অভাবে হুসেন শাহী বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে বিহারের আফগান বীর শের খাঁ ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান মাহ্‌মুদ শাহ্‌কে পরাজিত করে বাংলা অধিকার করেন।

সুলতানী আমলে বাংলার সংস্কৃতি ঃ সাহিত্য, ধর্ম আচার ও সমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে সুলতানী আমলে বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। সুলতানদের আমলে দরবারে ফার্সী ভাষার প্রচলন থাকলেও এই সময় থেকে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তায় সুলতানেরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে থাকেন। সামসুদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ্, রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ্, হুসেন শাহ্ এবং

নসরৎ শাহ্ প্রমুখ সুলতানেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবল অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের উৎসাহে ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যগুলির অনুবাদের কাজ এই সময়ে আরম্ভ হয়। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসু সুলতান কর্তৃক 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত হন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর প্রেরণায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। জনপ্রিয় 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য এই সময়েই রচিত হয়। মহাকবি কৃত্তিবাস এই সময়ে বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন। 'বৈষ্ণব পদাবলী' সাহিত্য রচনা এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সর্বোপরি চৈতন্যদেব এই যুগে আবির্ভূত হয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন।

[খ] বাহ্মনি ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উদ্ভব

পাঁচটি পৃথক সুলতানী রাজ্যে বিভাগ

বাহ্মনি রাজ্যের উদ্ভব ঃ মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে দেবগিরিতে (দৌলতাবাদ) বিদ্রোহ করেন ইস্মাইল মুখ নামে এক জন বিদেশী অভিজাত। তাঁকে নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করে বিদ্রোহীদিগের নেতা হন হাসান নামে জনৈক দুর্ধর্ষ সৈনিক। হাসান আবুল মুজফফর আলাউদ্দীন রহমন শাহ্ উপাধি নিয়ে ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করেন। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার মতে হাসান বাল্যে গঙ্গু নামে জনৈক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর আশ্রয়ে পালিত হয়েছিলেন বলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম রেখেছিলেন বাহ্মনি রাজ্য। কিন্তু নির্ভরযোগ্য প্রমাণাভাবে ঐতিহাসিকগণ এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন। হাসান নিজেকে পারস্যের রাজবংশজাত বলে দাবি করতেন। তাঁর "বাহ্মান শাহ্" উপাধি শুধুমাত্র তাঁর রাজকীয় পদবীজ্ঞাপক ছিল। হাসান গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করলেন। ফিরুজ তুঘলকের দুর্বলতার সুযোগে হাসান তাঁর রাজ্যসীমা যথেষ্ট সম্প্রসারিত করলেন। তাঁর মৃত্যুকালে (১৩৫৮ খ্রীঃ) বাহ্মনি রাজ্য দৌলতাবাদ থেকে নিজামরাজ্যের ভোঙ্গীর এবং উত্তর-পূর্বে ওয়েনগঙ্গা নদী থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হাসান মালব এবং গুজরাট জয়ের চেষ্টা করে বিফল হন কিন্তু দক্ষিণ দিকে তাঁর অভিযানগুলি সফল হয়েছিল। শাসনের সুবিধার জন্য হাসান তাঁর রাজ্যকে গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বেরার ও বিদর প্রভৃতি কয়েকটি 'তরফে' ভাগ করেছিলেন।

বিজয়নগর ঃ এদিকে বাহ্মনি রাজ্যের দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে গড়ে উঠে বিজয়নগর রাজ্যটি। জনপ্রবাদে কথিত আছে সঙ্গমের দুইপুত্র হরিহর এবং বুক্কা-তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতীরে বিজয়নগর দুর্গটি স্থাপন করেছিলেন (১৩৩৬ খ্রীঃ)। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন আনেগুণ্ডি নামক যে ক্ষুদ্র নগরটিকে কেন্দ্র করে বিজয়নগর রাজ্য গড়ে উঠেছিল, সেটি স্থাপিত হয় তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তর তীরে হোয়সলরাজ তৃতীয়

বীর বল্লাল কর্তৃক ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। বিজয়নগরের উৎপত্তির কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা যাই হোক, যে বিষয়টি শীঘ্রই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল, তা হচ্ছে বাহ্মনি ও বিজয়নগর। এই দুই রাজ্যের—মধ্যবর্তী শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ উর্বর রায়চুর (বা রাইচুর) উপত্যকার দখল নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

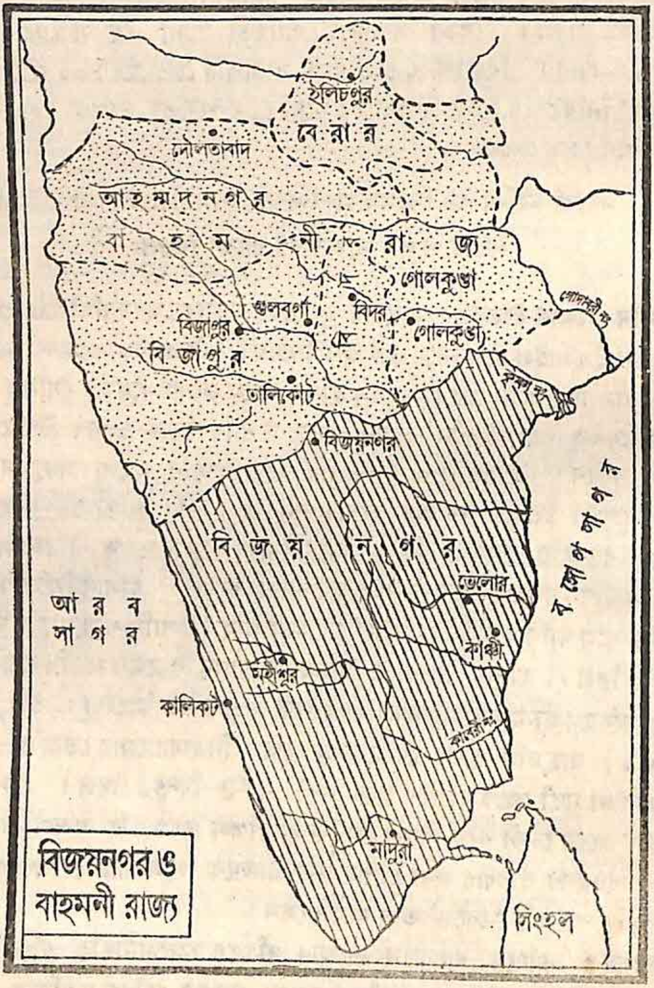

বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য

বাহ্মনি রাজ্যের রাজনৈতিক জীবন নির্ধারিত হয় বিজয়নগরের বিরুদ্ধে বহুবিধ যুদ্ধ এবং মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের দুটির মধ্যে ক্রমাগত বিবাদ-বিসংবাদের দ্বারা। ইতিমধ্যে বাহমনী রাজ্যের অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা দুই দলে বিভক্ত ছিল, একদিকে দাক্ষিণাপথের

মুসলমানগণ এবং তাদের সহযোগী আফ্রিকার মুসলমানগণ, অপরদিকে ছিল আবর, তুর্কী, ইরাণী, মুঘল প্রভৃতি বিদেশী অভিজাতগণ। এদের মধ্যে সর্বদাই ঝগড়াবিবাদ চলছিল। দক্ষিণাপথের মুসলমানগণ ছিলেন "সুন্নী", আর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ছিলেন "সিয়া"। 'সুন্নী'-'সিয়ার' সংঘর্ষ প্রসঙ্গত লক্ষ্য করার মত।

বিজয়নগররাজ দ্বিতীয় হরিহর রায়চুর দোয়াব আক্রমণ করেন কিন্তু বিফল হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। এর পর বাহ্‌মনী সুলতান ফিরুজশাহ বিজয়নগর আক্রমণ করলে পরাজিত হন। ১৪২০ সালে নতুন করে যুদ্ধ আরম্ভ হলে ফিরুজশাহের পর 'দক্ষিণী' গোষ্ঠীর দুর্দান্ত শাসক আহ্‌মদ শাহ্‌ বাহ্‌মনি (১৪২২-৩৫) বিজয়নগর রাজ্য লুণ্ঠন করে ছারখার করেন। মুসলিমদিগের হস্তে বার বার পরাজিত হওয়ায় বিজয়নগরের দ্বিতীয় দেবরায় মুসলিম অশ্বারোহী সেনার শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করে অনুরূপ প্রথায় সামরিক সংস্কার করেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন (১৪২৩ খ্রীঃ)।

বাহ্‌মনি রাজ্যের চরম উন্নতি ঘটে যখন রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত হয় উজির (প্রধান মন্ত্রী) মাহ্‌মুদ গাওয়ানের উপর (১৪৪৬-৮১ খ্রীঃ)। মাহ্‌মুদ গাওয়ান নিজ যোগ্যতাবলে পর পর দুজন সুলতানের অধীনে উজীরপদে আসীন থাকেন। গাওয়ান যথেষ্ট সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি মালব-রাজ্য এবং কোঙ্কন প্রদেশের বহু ছোটখাট হিন্দু রাজার রাজ্য জয় করেন। বিজয়নগরের বিরুদ্ধে অভিযান করে তিনি কাঞ্চী জয় করেন এবং বিপুল দেবত্র সম্পত্তির জন্য প্রসিদ্ধ কাঞ্চীর হিন্দু মন্দিরগুলি লুণ্ঠন করেন। তিনি গোয়া অঞ্চলও জয় করেন। তাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে অন্যান্য আমীরেরা তাঁর বিরুদ্ধে সুলতানকে প্ররোচিত করলে তৃতীয় মুবারক শাহ্‌ (১৪৬০-৮২ খ্রীঃ) তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এইভাবে এক সুযোগ্য মন্ত্রী চক্রান্তের শিকার হলেন। মাহ্‌মুদ গাওয়ানের কৃতিত্ব শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি অর্থনীতিক ও বিচার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করলেন। জনশিক্ষা বিভাগে প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করলেন। পল্লীর সকল জমির জরীপ করালেন এবং রাজস্বের হার ন্যায়সঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন, দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করলেন। দালালদের অন্যায় কাজকারবার নিষিদ্ধ করলেন। সকল বিভাগে কঠোর শৃঙ্খলা প্রবর্তন করলেন। তিনি সামরিক বিভাগের সংস্কার সাধন করলেন। ঐতিহাসিক মেডোজ টেলর বলেছেন, "তাঁর (গাওয়ানের) সঙ্গেই সুলতানি সাম্রাজ্যের যাবতীয় সংহতি ও শক্তি অন্তর্হিত হয়।"

পাঁচটি পৃথক সুলতানীর উৎপত্তি : মাহ্‌মুদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর বাহ্‌মনি সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন ঘটে। পরবর্তী সুলতান মাহ্‌মুদ শাহের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসকগণ একে একে স্বাধীন হয়ে গেলেন। বিজাপুরে ইউসুফ আদিল শাহ্‌ আদিল শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করলেন (১৪৯০ খ্রীঃ)। আহ্‌ম্মদনগরে আহ্‌মদ নিজামশাহ্‌ নিজাম শাহী বংশ স্থাপন করলেন। ফতুল্লাহ্‌ ইমাদ শাহ্‌ বেরারে স্থাপন করলেন

ইমাদশাহী বংশ (১৪৯০ খ্রীঃ)। কুলি কুতব শাহ্ গোলকুণ্ডায় কুতবশাহী বংশ স্থাপন করলেন (১৫১২ খ্রীঃ)। এর কয়েক বৎসর পর শেষ বাহ্মনি সুলতান বিজাপুরে পালিয়ে গেলে তাঁর শক্তিশালী মন্ত্রী আমীর বারিদ বিদরে বারিদশাহী বংশ স্থাপন করলেন। এইরূপেই সামন্তদিগের পারস্পরিক কলহে দীর্ণ এবং বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে শক্তিহ্রাসের ফলে বাহ্মনি সাম্রাজ্য সংহতি ও শক্তি হারিয়ে বিলুপ্ত হল।

[গ] বাহমনি-বিজয়নগর দ্বন্দ্ব

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে কয়টি আঞ্চলিক রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল তার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের বাহ্মনি এবং দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্য দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী নদীর উপত্যকায় উদ্ভব ঘটেছিল মুসলিম শাসিত বাহ্মনি রাজ্যটির। আর তারই দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর উপত্যকায় উত্থান হয়েছিল হিন্দুশাসিত বিজয়নগর রাজ্যটির। বাহ্মনি রাজ্যটি ছিল মুসলিম ধর্মশাসিত, কিন্তু বিজয়নগর ছিল হিন্দুধর্মাশ্রয়ী রাজবংশ দ্বারা শাসিত।

রায়চুড় দোয়াব নিয়ে সংঘর্ষ ঃ ধর্ম-বিভেদ ছাড়াও এই দুটি প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাতের অন্য রকম কারণও লক্ষিত হয়। রাজ্য দুটির সীমান্তবর্তী রায়চুড় দোয়াব (কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যস্থিত ভূভাগ) ছিল একটি শস্য সম্ভাবনাময় বিস্তীর্ণ উর্বর ভূমিখণ্ড এবং সেই জন্য এই দোয়াবের উপর কর্তৃত্ব করতে দু রাজ্যই সর্বদা চেষ্টিত থাকত। প্রতিবেশী হলেও দু রাজ্যেরই শাসনকর্তারা সর্বদা চাইতেন রায়চুড় দোয়াবে নিজ নিজ আধিপত্য বজায় রাখতে। কৃষিজ সমৃদ্ধির গুরুত্ব ছাড়াও দুটি রাজ্যের সীমান্তবর্তী দোয়াবের সামরিক গুরুত্বও ছিল যথেষ্ট। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে দু রাজ্যেরই রায়চুড় দোয়াবের উপর কর্তৃত্ব অত্যাবশ্যক ছিল। ধর্মীয়, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও বাহ্মনি-বিজয়নগরের দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত দিকও ছিল। দেড়শ বছরের অধিককাল স্থায়ী দু রাজ্যের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ব্যক্তিগত দিকটি কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। পরিস্থিতি কখনও কখনও এমন দাঁড়াত যেন রায়চুড় দোয়াবের দখল রাখতে পারা বা না পারা উভয় রাজ্যের মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে উঠত। দুটি রাজ্যের শাসকগণই নিজ নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সীমান্তবর্তী রায়চুড় দোয়াবের কর্তৃত্ব হারাতে রাজী ছিলেন না। এই অবস্থায় দু রাজ্যের মধ্যে রেষারেষি এবং সংঘাত-সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত। জয়-পরাজয় ও ক্ষয়-ক্ষতি দুপক্ষেরই হত ; সব সময়ই তা একতরফা ভাবে হত, তা বলা যায় না। তবে দু রাজ্যের মধ্যে এই দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বের জন্য উভয় বংশের বিভিন্ন শাসকের ব্যক্তিগত চরিত্র ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাও দায়ী ছিল, তা আমরা দ্বন্দ্বের বিবরণের ধারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারব।

বাহ্মনি-বিজয়নগরের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় বাহ্মনি রাজ্যের দ্বিতীয় শাসক ১ম

মুহম্মদ শাহের আমলেই (১৩৫৫-৭৭ খ্রীঃ)। এই সময় বিজয়নগরের রাজা ১ম বুক্কা বরঙ্গলের রাজা কানহাইয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে রায়চুড় দোয়াবে কর্তৃত্ব এবং মুদ্রানীতির সংস্কারে আপত্তি প্রভৃতি কতকগুলি অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য বাহমনি রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু কৌঠালের যুদ্ধে (১৩৬৭ খ্রীঃ) মিলিত বাহিনী বাহমনি সুলতানের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। পরবর্তী বাহমনি শাসক মুজাহিদের আমলে রায়চুড় দোয়াবের আধিপত্য নিয়েই আবার যুদ্ধ বাধে। এই সময় বুক্কার রাজধানী বিজয়নগর অবরুদ্ধ হয়। কিন্তু বিজয়নগরের বিরুদ্ধে মুসলিমদের এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়।

মুজাহিদের পরবর্তী শাসক ২য় মুহম্মদ শাহ্ (১৩৭৮-৯৭) ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং সাহিত্যানুরাগী। রাজ্য জয়ের জন্য রক্তাক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ অপেক্ষা শান্তিতে বাস করতেই তিনি অধিক পছন্দ করতেন। তাই তাঁর সময়ে অন্ততঃ কিছুদিন দু রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ ছিল।

২য় মুহম্মদ শাহের পরবর্তী বাহমনি সুলতান ফিরুজশাহ (১৩৯৭-১৪২২) পুনরায় আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করলেন। যুদ্ধ বাধতেও বিলম্ব হল না। ১৩৯৮ সালে বিজয়নগরের রাজা ২য় হরিহর ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী ও কয়েক লক্ষ পদাতিক সেনাসহ রায়চুড় দোয়াব আক্রমণ করেন। কিন্তু বাহমনি সুলতান চতুরতার আশ্রয় নিয়ে বিজয় নগরের যুবরাজকে বিভ্রান্ত করে হরিহরের সেনা-ছাউনীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে সফল হন। ফলে বিজয়নগররাজ ভীত হয়ে রাজধানী অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করেন। এই অবস্থায় বাহমনি সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন তিনি। বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়ে সুলতানের কবল থেকে ব্রাহ্মণ বন্দীদের মুক্ত করতে সক্ষম হলেন তিনি।

ফিরুজশাহের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী গুজরাট ও মালবের মুসলিম সুলতানদের সম্পর্ক মোটেই সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না। ফলে এই সুলতানদিগের প্ররোচনায় বিজয়নগররাজ বাহমনি রাজ্যের গর্বিত সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন (১৪০৬ খ্রীঃ)। এবারে, সুলতান ফিরুজশাহ্ হিন্দুবাহিনীর দ্বারা পরাজিত ও আহত হলেন কিন্তু তাঁর সেনাপতি তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করে নিলেন। ২য় বুক্কা অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। রাজ্যের একটা অংশ ও বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতেও তিনি স্বীকৃত হলেন। এরপর ১৪১৭ সালে ফিরুজশাহ্ তেলিঙ্গানা অধিকার করলেন।

তিন বৎসর বিরতির পর পুনরায় দুপক্ষে যুদ্ধ বাধল। বিজয়নগর বাহিনী ফিরুজ শাহকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করল। ফিরুজশাহের পরবর্তী বাহমনি শাসক আহমদ শাহ্ (১৪২২-৩৫ খ্রীঃ) সুলতান হয়ে আবার পুর্ণোদ্যমে বিজয় নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। বিজয়নগররাজের বিপুল বাহিনী তুঙ্গভদ্রাতীরে সমবেত হল। কিন্তু মুসলিমদিগের অতর্কিত আক্রমণে বিজয়নগরের রাজা রাজধানীতে

পলায়ন করতে বাধ্য হন। আহ্‌মদ শাহ্‌ নির্দয়ভাবে সমগ্র বিজয়নগর রাজ্য বিধ্বস্ত করলেন। হাজার হাজার নিরপরাধ অসামরিক অধিবাসীকে হত্যা করা হল। বিজয়নগর অবরুদ্ধ হল। অবশেষে বিজয়নগরের রাজা ২য় দেবরায় ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন (১৪২৩ খ্রীঃ)। আহ্‌মদ শাহ্‌ বরঙ্গল দুর্গটি অধিকার করে নিলেন। ফলে কাকতীয় রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল। এই সময় আহ্‌মদ শাহ্‌ গুলবর্গা থেকে রাজধানী বিদরে স্থানান্তরিত করেন।

বিজয় নগরের রাজা ২য় দেবরায় (১৪২২-৪৬ খ্রীঃ) বাহ্‌মনি সুলতানের নিকট বার বার পরাজয়ের ফলে সামরিক সংস্কারে মন দিলেন। বাহ্‌মনি সেনাবাহিনীতে মুসলিম অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ সৈন্যের সামরিক নৈপুণ্য লক্ষ্য করে তিনি বিজয় নগরের বাহিনীতে মুসলিম ঘোড়-সওয়ার ও তীরন্দাজ নিয়োগ করলেন। তিনি মুসলিম সৈনিকদের অর্থমূল্যে বেতন দানের পরিবর্তে জায়গীর দিলেন এবং তাদের প্রার্থনার সুবিধার জন্য রাজধানী বিজয়নগরে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিলেন। কিন্তু এই সামরিক সংস্কারের ফল আশানুরূপ হয় নাই।

পুনর্গঠিত সেনাবাহিনী নিয়ে ২য় দেবরায় রায়চুড় দোয়াব আক্রমণ করেন (১৪৪৩ খ্রীঃ) কিন্তু যুদ্ধে মাত্র সামান্য কিছু প্রারম্ভিক সাফল্য লাভ করলেন তিনি। বড় রকম লাভ কিছুই হল না। আহ্‌মদ শাহের পরবর্তী বাহ্‌মনি সুলতান আলাউদ্দীন আহ্‌মদ (১৪৩৫-৫৭ খ্রীঃ) দেবরায়কে সন্ধি করতে বাধ্য করলেন।

একজন অযোগ্য শাসক ঃ আলাউদ্দীন আহ্‌মদের পরবর্তী বাহ্‌মনি সুলতান হুমায়ুন ছিলেন একজন অযোগ্য শাসক। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য শাসক হলেন ৩য় মুহম্মদ শাহ্‌ (১৪৬৩-৮২ খ্রীঃ)। তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রী মাহ্‌মুদ গাওয়ানের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় মুহম্মদ শাহের পরবর্তী বাহ্‌মনি সুলতান মাহ্‌মুদশাহ্‌ (১৪৮২-১৫১৮ খ্রীঃ) ছিলেন অপদার্থ। তাঁর আমলে বাহমনি সাম্রাজ্য পাঁচটি পৃথক সুলতানী রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়—একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

মাহ্‌মুদ শাহের সময় বাহ্‌মনি সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে প্রতিবেশী বিজয়নগর সাম্রাজ্যটি বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণ দেবরায় রায়চুড় দোয়াব অধিকার করেন এবং গুলবর্গা ধ্বংস করেন।

পরে বিজাপুর গোলকুন্ডা প্রভৃতি স্বাধীন সুলতানী রাজ্যগুলির মিলিত আক্রমণে পরাজিত হয়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

[ঘ] বিজয়নগর সাম্রাজ্য—দেবরায় ও কৃষ্ণদেব-রায়—প্রশাসনিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধীনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থ নৈতিক অবস্থা

ফিরুজশাহ্‌ (১৩৯৭-১৪২২ খ্রীঃ) ঃ আহ্‌মদ শাহ্‌ (১৪২২-১৪৩৫)

যাদব বংশীয় সঙ্গমের দুইপুত্র হরিহর ও বুক্কা ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগরের স্বাধীন রাজ্যটি স্থাপন করেন। হরিহরই বংশের প্রথম রাজা

হয়েছিলেন। হরিহর তুঙ্গভদ্রা নদীর উপত্যকায়, কোঙ্কন এবং মালাবার উপকূলে তাঁর রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করেন। সম্ভবতঃ হরিহর মুসলিমদিগের বিরুদ্ধে বরঙ্গলের কাকতীয় রাজাকে সাহায্য করেছিলেন। হরিহরের জীবিতকালেই বিজয়নগর রাজ্য উত্তরে কৃষ্ণা থেকে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। হরিহরের ভ্রাতা বুক্কা বিজয়নগর রাজ্যের শক্তি আরও বর্ধিত করেন। বুক্কার পর দ্বিতীয় হরিহর সর্বপ্রথম রাজকীয় মর্যাদাজ্ঞাপক উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের উপর বিজয়নগরের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দেবরায় ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহমনি সুলতানদের নিকট বার বার পরাজিত হওয়ার ফলে দেবরায় বিজয়নগরের সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্যে মুসলিম-দিগের অনুকরণে অশ্বারোহী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করবার কাজে ব্রতী হন। কিন্তু তিনি এই উদ্দেশ্যে মুসলিম অশ্বারোহী সেনাদের নিয়ে বিজয়নগরের সামরিক বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির যে চেষ্টা করেন তার দূরপ্রসারী ফল শুভ হয় নাই। কারণ, কয়েকবৎসর পরে বাহমনি সুলতানের সঙ্গে যখন পুনরায় যুদ্ধ হয় তখন মুসলিমদিগের হস্তে বিজয়নগরের রাজা পরাজিত হয়ে কর দিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় দেবরায়ের সময় (১৪১৯-১৪৪৯ খ্রীঃ) ইটালীয় পর্যটক নিকোলো কন্টি (১৪২০-২১ খ্রীঃ) এবং পারসিক রাজদূত আবদুর রজ্জাক (১৪৪২ খ্রীঃ) বিজয়নগর পরিদর্শন করেন। তাঁরা উভয়েই রাজধানী বিজয়নগরসহ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের তৎকালীন অবস্থার মূল্যবান বিবরণ রেখে গেছেন।

নিকোলো কন্টির বিবরণ থেকে জানা যায় তখন বিজয়নগরের আয়তন ছিল বিস্তৃত। যুদ্ধে যোগদানে সক্ষম অন্ততঃ ৯০ হাজার ব্যক্তি এই শহরে ছিলেন। নিকোলো কন্টির মতে বিজয়নগরের তখনকার রাজা ভারতের অন্যান্য সব রাজাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিলেন। রাজ্যে রথযাত্রা, দীপাবলী, হোলি ও দোল উৎসবের তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, তখন সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

আবদুর রজ্জাকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বিজয়নগর বিশাল এবং জনাকীর্ণ শহর ছিল। বিজয়নগরের 'রায়' ছিলেন শক্তিশালী। দেশের ভূমি উর্বরা এবং চাষ-বাস ভাল হত। এই রাজ্যে প্রায় তিন শত বন্দর ছিল। সৈন্যবাহিনীতে ১১ লক্ষ সৈন্য ছিল। ব্রাহ্মণগণকে রাজা বিশেষ সম্মান করতেন। রজ্জাকের মতে, বিজয়নগর শহরের ন্যায় মনোহর সুদৃশ্য শহর কেউ চোখেও দেখেন নাই, এমনকি কানেও এরূপ শহরের কথা শোনেন নাই ; শহরটি এমন ভাবে নির্মিত যে পর পর সাতটি প্রাকার দ্বারা এই শহর বেষ্টিত। শহরের বহিঃ প্রাকার এরূপ সুদৃঢ় ছিল যে কেউই এর ৫০ গজের মধ্যে যেতে পারতো না।...দুর্গটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। দুর্গদ্বার সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত। ...রাজপ্রাসাদের নিকটেই চারটি বাজার ও অনেক দোকানপাট আছে।"

দ্বিতীয় দেব রায়ের মৃত্যুর পর সঙ্গমবংশের দুর্বল বংশধরদিগের সময় নানা ষড়যন্ত্র

শুরু হয় এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অবশেষে শালুভ বংশীয় নরসিংহ (আঃ ১৪৯০ খ্রীঃ) দেব রায়ের বংশধরকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসক। তাঁর অল্প কয়েক বৎসরের রাজত্বকালে তিনি রাজ্যে শৃঙ্খলা পুনঃ প্রবর্তন করেন। কিন্তু নরসিংহ শালুভের মৃত্যুর পর রাজ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নরসিংহ শালুভের অপদার্থ পুত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে অবশেষে বীর নরসিংহ সিংহাসন অধিকার করেন। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে বীর নরসিংহ শালুভ বংশের অবসান ঘটিয়ে বিজয়নগরে তুলুভ বংশের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। বীর নরসিংহের ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্য শক্তি ও সমৃদ্ধির শীর্ষে উঠেছিল। বিভিন্ন যুদ্ধজয়ে তিনি যথেষ্ট সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণদেব রায় অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত করেন। প্রথমে তিনি মহীশূরের বিদ্রোহী সামন্তদের বশীভূত করেন। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রায়চুর দোয়াব অধিকার করেন। উড়িষ্যার রাজার বিরুদ্ধে তিনি সাফল্যের সঙ্গে একাধিক অভিযান প্রেরণ করেন। গোলকুণ্ডা ও বিদরের সুলতানের সহায়তা লাভ করেও উড়িষ্যার রাজা দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্যন্তই তাঁর রাজ্যের সীমা স্বীকার করে নেন এবং কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর সুলতান রায়চুর দোয়াব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলেন। তিনি কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুর অধিকার করে গুলবর্গা ধ্বংস করেন। কৃষ্ণদেব রায় পশ্চিমে কোঙ্কন পর্যন্ত, পূর্বে বিশাখাপত্তম্ এবং দক্ষিণে ভারতীয় উপদ্বীপের প্রান্তবিন্দু পর্যন্ত তাঁর অধিকার সম্প্রসারিত করেন। সম্ভবতঃ ভারত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপও তাঁর কর্তৃত্বাধীন ছিল। বিজয়নগরের শক্তি ও সমৃদ্ধি দর্শনে বিদেশী পর্যটকরাও মুগ্ধ হন। পর্তুগীজ পর্যটক পায়েস্ লিখেছেন, "তিনিই (কৃষ্ণদেব রায়) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক ভীতি-উৎপাদনকারী এবং সর্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণাঙ্গ শাসক। তিনি একজন মহান্ শাসক এবং খুবই ন্যায়-বিচারনিষ্ঠ ব্যক্তি, তবে তিনি অনেক সময় হঠাৎ ক্রোধে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেন। তিনি যেরূপ বিপুল পরিমাণ সৈন্য* এবং রাজ্যের অধিকারী তাতে তিনি তুলনায় সকলের চেয়ে নিঃসন্দেহে অধিক প্রভুত্বশালী ব্যক্তি।" গোয়ার পর্তুগীজদের সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় শুধু সাহসী রাজ্যবিজেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন দক্ষ প্রশাসক, সুপণ্ডিত এবং বিদ্যোৎসাহী। তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন "অষ্টদিগ্‌গজ" বা আটজন পণ্ডিত। তিনি ধর্মানুরাগী বৈষ্ণব

* পর্তুগীজ পর্যটক পায়েস্ জানিয়েছেন, কৃষ্ণদেব রায়ের বাহিনীতে ছিল সাত লক্ষ পদাতিক, ৩২,৬০০ অশ্বারোহী সেনা এবং ৬৫১টি রণহস্তী। এই সময়েও কামানের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সামরিক বিভাগ ছিল প্রধান সেনাপতির (দণ্ডনায়কের) অধীন।

হলেও তাঁর শাসনীতিতে ধর্ম বিষয়ক অনুদারতা এতটুকু ছিল না। সংক্ষেপে, কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন একজন আদর্শ প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্রী শাসক।

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা অচ্যুত রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫৩০-৪২ খ্রীঃ)। অচ্যুত রায়ের দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। অচ্যুত রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব সিংহাসনে বসেন কিন্তু রাজ্যশাসনের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল তাঁর মন্ত্রী রাম রায়ের হাতে। রাম রায় রাজ্যশাসন পরিচালনায় ব্যর্থ হলেন। তিনি ভেঙে-যাওয়া বাহ্মনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সুলতানদের সঙ্গে অযথা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে প্রায় সকলকেই শত্রু করে তুললেন। অবশেষে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা আহম্মদনগর, বিদর প্রভৃতি মুসলিম রাজ্যগুলির শাসকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিজয়নগর আক্রমণ করেন। তালিকোটার যুদ্ধে* (১৫৬৫) বিজয়নগরের বাহিনীকে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং বিজয়নগর লুণ্ঠিত হয়ে ধূলিসাৎ হয়। ঐতিহাসিক ফিরিস্তা বলেছেন, "লুণ্ঠন এত ব্যাপক হয়েছিল যে সম্মিলিত বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক স্বর্ণ, মণিমুক্তা, অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব ও ক্রীতদাসাদিগের অধিকারী হয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।"** তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর দুর্বল হয়ে পড়লেও দক্ষিণভারতের হিন্দুদিগের রাজনৈতিক শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত সুলতানদিগের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও কলহের ফলে বিজয়নগর হৃত ক্ষমতার কিছুটা উদ্ধারে সমর্থ হয় এবং তালিকোটার যুদ্ধের পর আরও প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল তা টিকেছিল। তবে সামন্তদের পারস্পরিক কলহের ফলে বিজয়নগর আর পূর্বক্ষমতা ফিরে পায় নাই।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল সুশৃঙ্খল প্রজাকেন্দ্রিক এবং উন্নত। বেশ কয়েকটি সামন্তরাজ্যের অস্তিত্ব সত্ত্বেও বিজয়নগর সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতের পূর্ববর্তী রাজ্যগুলির তুলনায় অধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত শাসনের অধীন ছিল। সাম্রাজ্যের অধিপতি মহারাজা নামে পরিচিত হলেও প্রায়শঃই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকত রাজ্যের মন্ত্রী বা মহাপ্রধানের হস্তে। মহারাজার অধীনে প্রকাণ্ড একটি রাজ্যপরিষদ ছিল। তাতে থাকতেন প্রধান প্রধান সামন্ত ভূস্বামী ও বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সরাসরি দায়ী থাকতেন মহাপ্রধানের (প্রধান মন্ত্রীর) কাছে।

---

* যুদ্ধক্ষেত্রটি অবস্থিত ছিল দুটি গ্রাম—রাকসস্ এবং তাগ্ড়ি নামক অঞ্চলে।

** (ক) 'বুরহান-ই-মাসির'-এর লেখক এই যুদ্ধে বিজয়ী বাহিনীর তাণ্ডবতা ও লুণ্ঠনের বর্ণনা দিয়েছেন।

(খ) "Never perhaps in the history of the world as such havoc been wrought and wrought so suddenly, on so splendid a city ; teeming with a wealthy and industrious population..............seized, pillaged and reduced to ruins, amid scenes of savage massacre and horrors beggaring description".—Sewell, Advanced History of India, Page 366.

এই শাসনকর্তাদের সাধারণতঃ দুই বা তিন বৎসর অন্তর বদলি করা হত। রাজ্যের প্রদেশগুলিকে ভাগ করা হত এক-একজন রাজকর্মচারীর শাসনাধীনে কয়েকটি করে জেলায়। এই শাসনকর্তাদের কাজ ছিল রাষ্ট্রীয় তালুকগুলি থেকে খাজনা আদায় করে তা রাজকোষে জমা দেওয়া এবং ভূস্বামী ও সামন্তরাজন্যবর্গের কাছ থেকে রাজকর আদায় করা।

কিছু কিছু শর্তাধীনে সরকারের জমি দেওয়া হত যোদ্ধাদের তাদের রাজসেবার বিনিময়ে পুরস্কার স্বরূপ। সচরাচর সমর নায়করা তাঁদের জায়গীর থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ রাজকোষে জমা দিতেন। রাজস্বের বাকী আয় থেকে তাঁদের সৈন্যবাহিনী পোষণের যাবতীয় খরচ বহন করতে হত। নীতিগত ভাবে উর্ধ্বতন জায়গীরদাররা তাঁদের ভূ-সম্পত্তি বংশপরম্পরায় ভোগদখল করার অধিকারী ছিলেন। অনেক সময় মন্দিরগুলিও আশেপাশের বিশাল এক-একটা এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করত। পূজাপার্বণ উপলক্ষে অনেক সময় মন্দিরগুলিতে তীর্থযাত্রীদের ভীড় হত, মেলাও বসত। কারুশিল্পী ও বণিকরা মন্দিরের কাছাকাছি বাস করতেন। মন্দিরের সেবার কাজটিও হত বংশানুক্রমিক। উর্ধ্বতন সামন্ত ভূস্বামীদের দায়িত্ব থাকত বিদেশী আক্রমণের সময় মন্দিরগুলিকে রক্ষা করার।

গ্রামগুলির একটা প্রধান অংশই ছিল ব্রাহ্মণ 'সভা'গুলির কর্তৃত্বাধীন। এই ব্রাহ্মণরা কর্তৃত্ব করতেন খুব ছোট ছোট জমির উপর। তা সত্ত্বেও এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ ভূস্বামী। এঁদের হয়ে জমি চাষ করতেন ভাড়াটিয়া প্রজা। পতিত জমিগুলিই ছিল গ্রামীণ সমাজের যৌথ সম্পত্তি এবং নিষ্কর। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সিদ্ধান্ত করা হয় দেয় সকল আদায় দিতে হবে নগদ মুদ্রায়। এর ফলে কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল। বিজয়নগরের প্রভূত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও প্রচণ্ড করের বোঝার দরুন সাধারণ কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ ছিল। ভূস্বামীদের অত্যাচারের ফলে তাঁরা অনেক সময় বিদ্রোহী হতেন। অন্ততঃ তিনচারটি বড় বড় কৃষক বিদ্রোহের উল্লেখ আমরা পাই।

বিজয়নগর রাজ্যে সামন্ত ভূস্বামীদের প্রতাপপ্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্রমশঃ তাঁরা ধনী হয়ে উঠেন কিন্তু সাধারণ প্রজাদের নানা দুঃখদুর্দশা ছিল। বিজয়নগর রাজ্যের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি বহিরাগত পর্যটকদের তাক লাগিয়ে দিত। শহরের বিপুল আয়তন, শহরের চারপাশে সাতটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুর্গপ্রাকার, তার বিশাল জনসংখ্যা, বাজার ও মণিকারদিগের মহল্লাগুলির ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং আমোদপ্রমোদের ঢালাও ব্যবস্থা দেখে স্বভাবতঃই বিদেশী পর্যটকরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। পর্তুগীজ ইতিহাসবেত্তা নুনিসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, কৃষকরা উৎপন্ন ফসলের নয়দশমাংশ উর্ধ্বতন ভূস্বামীকে দিতে বাধ্য হতেন, উর্ধ্বতন ভূস্বামীরা আবার রাজাকে দিতেন তাঁদের আয়ের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধাংশ পর্যন্ত।

বিজয়নগর রাজ্যের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির মূলে ছিল উন্নত সেচ ও কৃষিব্যবস্থা। শিল্পের মধ্যে খনিশিল্প ও বস্ত্রশিল্প উল্লেখযোগ্য। শিল্পে নিযুক্ত অধিবাসীদের জীবন সুন্দর ভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন কারিগরদিগের এবং বণিকদিগের নিজ নিজ সংঘ ছিল। পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরটি ছিল সমৃদ্ধ। ইউরোপের এবং দূর-প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে এই বন্দরটির বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বিজয়নগরের নিজস্ব সামুদ্রিক পোত ও পোত নির্মাণ শিল্পও ছিল।

বিজয়নগরের নৃপতি যদিও স্বৈরতন্ত্রী শাসক ছিলেন তবু প্রজাদের কল্যাণসাধনের জন্য রাজা তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় বলেছিলেন, "মুকুট পরিহিত নৃপতিকে দেশশাসন করতে হবে ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে।"

দেশ শাসনে রাজাকে সাহায্য করতেন মন্ত্রিগণ। সমগ্র রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি প্রদেশ শাসিত হত একজন রাজ্যপ্রতিনিধি (নায়ক) দ্বারা। রাজপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করতেন কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিটি গ্রামে একটি করে গ্রামসভা ছিল। গ্রামসভার অধীনে প্রতিটি গ্রাম ছিল এক একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। ভূমি রাজস্ব ছিল রাজার আয়ের প্রধান উৎস।

বিজয়নগর সাম্রাজ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে দুইজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, দক্ষিণভারতে মুসলিম সুলতানদিগের আগ্রাসক নীতি প্রতিরোধ করে বিজয়নগর রাজ্যটি হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। বিজয়নগরের শাসকগণ শুধু মাত্র সংস্কৃতের ন্যায় প্রধান ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই, তাঁরা তেলেগু, তামিল ও কানাড়ীর ন্যায় আঞ্চলিক ভাষাগুলিরও শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিলেন। মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানাধিকারী পণ্ডিত মাধব ও সায়নাচার্য বিজয়নগরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এই মহান্ রাজ্যে কোন ধর্মীয় উৎপীড়ন ছিল না। দুয়ার্তে বর্বোসা বলেছেন, "বিজয়নগরের রাজা এতটা স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন যে প্রত্যেক মানুষই তাঁর স্বাধীন ইচ্ছানুসারে এই শহরে অবাধে যাতায়াত করতে পারেন ; এবং তাঁর নিজস্ব ধর্মানুমোদিত রীতিতে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারেন, তা তিনি খ্রীষ্টান, ইহুদী, মুর বা হিন্দু যে ধর্মেরই লোক হউন না কেন।" বিজয়নগরের চমৎকার মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ থেকেই বিজয়নগরের নৃপতিদিগের ধর্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব মন্দিরের স্থাপত্যরীতি পাশ্চাত্যের স্থাপত্য বিশারদদিগের যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে।

[৬] সুলতানী যুগে (ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী) ভারতের উপর ইসলামের প্রভাব

ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামের প্রভাব—গোঁড়া সম্প্রদায়ের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া—ক্রমে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রয়াস—ভক্তিবাদ—সুফী মতবাদ—ধর্মগুরুগণ—তাঁদের বাণী—শিল্প ও স্থাপত্য—কথ্যভাষায় সাহিত্যের

বিকাশ—আঞ্চলিক শিল্পকলা ও সংস্কৃতি—শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা—উর্দুর উৎপত্তি

দিল্লীতে সুলতানী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর ভারত তথাকথিত মুসলিম জগতের সাংস্কৃতিক বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ইসলাম ধর্মের ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ প্রথম শুরু হয় সিন্ধুদেশে সপ্তম শতাব্দীতে আর অন্যান্য অংশে তা শুরু হয় নবম-দশম শতাব্দীতে। তবে দিল্লীর সুলতানী রাজত্বের আমলে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করা হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদিগের উপর তা চাপিয়ে দেওয়া হয় জোর করে।

নবাগত ইসলাম ধর্মের সঙ্গে ভারতে প্রচলিত হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের ধ্যানধারণা ও ধর্মানুমোদিত সামাজিক আচরণের মধ্যে প্রায় সর্ববিষয়েই ছিল অমিল ও বৈপরীত্য। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদিগের সামরিক বিজয় ভারতের অপরাপর ধর্মাবলম্বী (প্রধানতঃ হিন্দুধর্মাবলম্বী)-দিগের মধ্যে যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে উদ্ভব ঘটল একটা পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের ভাব। এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে পূর্ব পূর্ব বারে শক, হূন, কুষাণ, গ্রীক প্রভৃতি আক্রমণকারী জাতিগুলি বারে বারে ভারতের ধর্ম ও সমাজকে আঘাত করলেও পরে তাদের অনেকেই হিন্দুধর্মের উদার ভাবনার ফলে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রথম হিন্দুধর্ম বহিরাগত ইসলামধর্মকে গ্রাস করতে পারে নাই। তার অবশ্য প্রধান কারণ ছিল ইসলামধর্মের ধর্মান্তরকরণে উৎসাহ এবং অপর ধর্মমত সম্পর্কে ইসলামের আপস-বিরোধী মনোভাব। ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণে এইরূপ বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্যই হিন্দুধর্ম ও ইস্‌লামধর্ম প্রথম দিকে পরস্পরকে দূরে রাখতেই প্রয়াসী হয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী বিজিত অমুসলিম ('জিম্মি')-দিগের সম্মুখে খোলা ছিল তিনটি বিকল্প পথ—(১) ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান সমাজভুক্ত হওয়া, (২) 'জিজিয়া' ('মাথাপিছু') কর প্রদান করা এবং (৩) মৃত্যুবরণ করা। ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করতে হলে অমুসলিমদিগকে গ্রহণ করতে হত এই তিনটি পথের একটি পথকে। ইসলামের এইরূপ আপসবিরোধী ধর্মভাবের জন্য হিন্দুধর্মের ঐক্য ও সমন্বয়মূলক চিন্তাধারা সত্ত্বেও দুটি ধর্ম পাশাপাশিই চলেছিল। ফলে প্রথমদিকে উভয় মতাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রেম ও প্রীতির প্রসার ঘটে নাই। অমুসলিমদিগের মধ্যে নিরাপত্তার অভাবের জন্য গোঁড়া সম্প্রদায়গুলি ধর্ম বিষয়ে সংরক্ষণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। তাঁরা সঙ্কীর্ণ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিষেধাত্মক নানা শাস্ত্রীয় বিধি রচনা করে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তৎপর হন। রক্ষণশীলতার প্রাচীর তুলে তাঁরা ইসলামের প্রসারে বাধা দিতে চাইলেন। জাতিভেদ প্রথার নিয়মবিধি আরও কঠোর করা হল। এইরূপ সঙ্কীর্ণতার সমর্থনে স্মৃতি গ্রন্থগুলিতে স্মৃতি পণ্ডিতগণ লৌকিক আচারের নিয়ামক কতকগুলি নতুন নিয়ম প্রবর্তন করলেন। এই সকল স্মৃতিকারদিগের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন বিজয়নগর রাজ্যের মাধব বিদ্যারণ্য যাঁর 'পরাশর স্মৃতি'র উপর রচিত 'কাল নির্ণয়' নামক টীকাগ্রন্থ লিখিত

হয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে। প্রায় সমসময়েই লিখিত হয় স্মৃতিকার বিশ্বেশ্বর কর্তৃক 'মদনপারিজিতা' নামক অনুরূপ আর একখানি স্মৃতিগ্রন্থ। বাঙ্গালী টীকাকার বারাণসীর কুল্লুক এই সময়েই মনুসংহিতার উপর তাঁর বিখ্যাত টীকা রচনা করেন। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ স্মার্তকার পণ্ডিত রঘুনন্দন এই সময়ে জীবিত ছিলেন। জানা যায়, তিনি শাস্ত্রীয় বিতর্কে নিমাই পণ্ডিতের (চৈতন্যদেবের ছোটবেলার নাম) নিকট পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়েছিলেন।

ইসলাম ধর্মের আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা নানাভাবেই গরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের ধ্যানধারণা ও ধর্মীয় আচরণের থেকে পৃথক ছিল। হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা ইসলামের দৃষ্টিতে ছিল পৌত্তলিকতা এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বিগণ পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এইরূপ পরস্পর বিপরীতধর্মী ধ্যানধারণা ও আচার-আচরণের ফলে ভারতের এই দুটি প্রধান ধর্মের গোঁড়া সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের ভাব সমাজের পক্ষে ছিল অমঙ্গলকর। ক্রমে হিন্দু অধিবাসী-দিগের বিভিন্ন অংশ ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হয়; তার মধ্যে একটি ছোট অংশ বলপ্রয়োগের ফলে বাধ্য হয়ে এই ধর্ম গ্রহণ করে। আর অন্যেরা নানা সুযোগ-সুবিধা পাবার আশায়, যেমন রাজসরকারে কোন পদ পাওয়া ইত্যাদি। এছাড়া কিছু মানুষ এই ধর্ম গ্রহণ করে অমুসলমানদের উপর ধার্য মাথাপিছু কর ('জিজিয়া' কর) এড়িয়ে যাওয়ার উপায় হিসাবে। চতুর্থতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরকরণ মেনে নেয় হিন্দুসমাজে তাদের নানা সামাজিক অসুবিধাগুলির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হিসাবে।

নতুন ভারত-বিজেতা মুসলিমদিগের সঙ্গে পরে আরও এলেন তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও নিজ উপজাতির লোকজন। মুসলিম ধর্মগুরু, পণ্ডিত ও কবিরাও এসে সুলতানদের দরবারে ভীড় করলেন। ফলে শীঘ্রই দেশে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের পরে বহুসংখ্যক প্রাক্তন বৌদ্ধ এক নতুন ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করল ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায়। তবে অন্যান্য মুসলিম দেশের সঙ্গে ভারতের অবস্থার একটা বড় পার্থক্য ছিল এই যে, এখানে ইসলাম ধর্ম আগাগোড়া দুটি প্রধান ধর্মের একটি হয়ে থেকেছে, দেশের একমাত্র ধর্ম হয়ে উঠে নাই কখনও। সুলতানী আমলের শেষদিকে মুসলিমগণ দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই শাসকসম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা থেকে গিয়েছিলেন প্রধানতঃ তাদের চিরাচরিত বৃত্তিগুলি নিয়েই, যেমন বণিক, কুসীদজীবী মহাজন ও সাধারণ কৃষক ইত্যাদি।

একাধিক সুলতানের হিন্দুধর্ম-বিরোধী নানা কার্যকলাপ (যেমন মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করা) এবং বার বার হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ বেধে উঠা সত্ত্বেও এই দেশের মাটিতে দীর্ঘ কয়েকশত বৎসরের সহাবস্থানের ফলে দুটি সম্প্রদায়ের উপর পারস্পরিক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী রূপেই পড়ল এবং তাদের উভয়ের ধর্মবিশ্বাস ও

আচার-আচরণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সংমিশ্রণও ঘটল। ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দুদের জাতি-ভেদ প্রথাকে গ্রহণ করে নিলেন, তাঁদের লৌকিক দেব-দেবীকেও মানতে শুরু করলেন। ফলতঃ শেষ পর্যন্ত ভারতের মুসলিমগণ এমন সব দেবদেবীর পূজাও শুরু করেন (যেমন সত্যপীর) যাঁদের তাঁরা আগে কখনও মান্য করতেন না। হিন্দুদের উৎসবগুলিতেও তাঁরা যোগ দিতে শুরু করেন। অপরপক্ষে হিন্দুরা প্রভাবিত হলেন মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার দ্বারা, যার ফলে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার সঙ্কীর্ণতাও অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে পড়ল। এইরূপে সমন্বয়-ধর্মী ধর্ম-ভাবনার মধ্যে আবির্ভাব ঘটল উল্লেখযোগ্য এক নতুন মতবাদের যা পরিচিত হল 'সুফী' মতবাদ নামে।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই দেখা যায় মুসলিম ধর্মনায়করা জনসাধারণের মধ্যে বিষ্ণুর অবতার রামের সঙ্গে রহিমকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এক বিশেষণ পরম করুণাময়কে) এক করে ফেলছেন। সুফী মতবাদের মধ্য দিয়ে রক্ষণশীল মুসলিম ধ্যানধারণার সঙ্গে হিন্দুধর্মের 'সর্বজীবে নারায়ণ' ইত্যাদি উদার ধর্মভাবনাকে ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করবার একটা প্রয়াস হয়েছিল। বস্তুতঃ ইসলাম ও হিন্দুমতের মধ্যে এই সমন্বয়-প্রয়াস সুফী মতবাদের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান বলে গণ্য করা যেতে পারে। তবে সুফী সাধকদিগের এইরূপ সমন্বয়ধর্মী ভাবনার বিরোধিতা করেছিলেন গোঁড়া উলেমা সম্প্রদায়গুলি। উলেমারা ছিলেন আপসবিরোধী মুসলিম ধর্মগুরু কিন্তু সুফীবাদীরা কোরানের পণ্ডিতী ব্যাখ্যার চেয়ে প্রাধান্য দিতেন আধ্যাত্মিক গুরুর দিব্য-উপলব্ধিকেই। সুফী মতবাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের উদার ধর্মচিন্তার এক উৎকৃষ্ট সমন্বয়-প্রয়াস লক্ষিত হয়। 'চিস্তি' এবং 'ফিরদৌসী' প্রভৃতি উপাধিধারী মুসলিম সাধকগণ হিন্দু-মুসলিমের আপাত বিভেদকে উপেক্ষা করে ধর্মের অভ্যন্তরীণ মূল ঐক্যের সুরকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এই যুগের প্রখ্যাত সুফী সেখদিগের মধ্যে নিজাম-উদ্দীন আউলিয়া (মৃত্যু ১৩২৫ খ্রীঃ) ও সেখ সেলিম চিস্তি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অতি উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন। এই সুফী সাধকগণ উচ্চ নৈতিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অ-মুসলিম হিন্দুদিগের প্রতি সহনশীলতার আদর্শ প্রচার করেছিলেন। পার্থিব ভোগ সুখ বর্জন করা, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসা শিক্ষা দিতেন এই সুফী গুরুরা। সেখ ফরিদ-উদ্দীন শাকার ছিলেন এ যুগের আর একজন বিখ্যাত সুফী সাধক। তাঁর অনুগামী শিষ্যরা ধর্মীয় গান ও নাচের মধ্য দিয়ে হিন্দু সাধকদের মতই ভাব-সমাধির অবস্থায় পৌঁছুতেন। সেখ মৈন-উদ্দীন চিস্তির (১১৪১-১২৩৬) নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুফীদিগের অনুসরণে সুফিয়ানি মতে সাধনা করে সে যুগে অনেক মুসলমান সাধক আউল, বাউল, ফকির প্রভৃতি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোহ্‌ 'সুফী' মতবাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

সুফী মতবাদের মাধ্যমে হিন্দু ও ইসলামী ভাবধারার পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ার এই

ব্যাপারটি বিশেষভাবে অনুভব করা যায় হিন্দু সাধকদিগের 'ভক্তি'বাদী আন্দোলনের মধ্যে। বৈষ্ণব গুরু রামানুজ (মৃত্যু ১১৩৭ খ্রীঃ) ছিলেন ভক্তি আন্দোলনের প্রথম উদ্গাতা। 'রামানুজ' সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট শিষ্য রামানন্দ (পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে) উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। রামানন্দই প্রথম ধর্মগুরু যিনি ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম-দিগের ধর্মভাবনার মধ্যে সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসতে উপদেশ দিলেন রামানন্দ।

আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যেকার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সূক্ষ্ম পাণ্ডিত্যপনার পরিবর্তে 'ভক্তিবাদী' আন্দোলনের প্রবক্তা সাধকগণ প্রচার করলেন এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণা। তাঁরা শিক্ষা দিলেন যে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা নিবেদন করা ধর্মীয় আচার-আচরণের চেয়ে বহুগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন জাতি, বর্ণ বা ধর্মমতের প্রতিটি মানুষের পক্ষেই ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব। ঈশ্বরের নিকট সকল মানুষই তুল্যমূল্য—ভক্তিবাদের প্রচারিত এই নীতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সামাজিক সাম্যের আদর্শ। এতে হিন্দুদের জাতি-ভেদ প্রথার বিরুদ্ধে যেমন প্রতিবাদ, তেমনই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদিগের সুবিধাভোগী শ্রেণীর আধিপত্যের বিরুদ্ধেও আপত্তির প্রতিফলন ঘটেছিল। ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রবক্তারা এসেছিলেন হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজ থেকেই। ভক্তিবাদী গুরুগণ কেবলমাত্র হিন্দুদের উদ্দেশ্যেই নয়, মুসলমানদের উদ্দেশ্যেও শিক্ষা প্রচার করেছিলেন। 'ভক্তি' আন্দোলনের আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। তা হল এই যে 'ভক্তি'বাদী গুরুরা তাঁদের রচনাগুলি প্রকাশ করেছিলেন আঞ্চলিক ভাষায় যাতে আপামর সকলেই তা সহজে বুঝতে পারেন। তাঁদের রচিত ভক্তিগীতিগুলি গাওয়া হত শ্রোতৃবৃন্দের পরিচিত নানা জনপ্রিয় সুরে। সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রচারিত হওয়ায় ভক্তিবাদের ধ্যান-ধারণাগুলি দ্রুত সকল স্তরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং গানগুলি লোকগীতিতে পরিণত হয়।

কবীর

ভক্তিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সব চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন কবীর (আঃ ১৩৮০-১৪১৪ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন মুসলমান তাঁতি বা জোলা। তাঁর গানগুলি তিনি লিখেছিলেন 'ব্রজবুলি'তে (একটি আঞ্চলিক কথ্য ভাষা যা পরে হিন্দী ভাষার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়)। কবীর প্রচার করতেন যে, ঈশ্বর রামও নন, আল্লাহ্‌ও নন, তিনি আছেন প্রতিটি মানুষের অন্তরে এবং তিনি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ চান না, চান মানুষে মানুষে মৈত্রী। পঞ্চদশ শতকে মহারাষ্ট্রের এক দর্জির

ছেলে নামদেবও জাতি-ভেদ প্রথার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ষোড়শ শতকের সূচনায় 'সৎপন্থ' (সঠিক পথ) নামে এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটল। এই সম্প্রদায়ের ভক্তরা ঐশ্বর্য বিলাসের নিন্দা করতেন এবং প্রচার করতেন পরিশ্রম ও সততার মূল্য। পদ-মর্যাদা নির্বিশেষে সকল মানুষকে এরা 'সৎপন্থ' সম্প্রদায়ভুক্ত হতে সাদর আহ্বান জানাতেন।

মধ্যযুগের উদার ধর্মান্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পাঞ্জাবে শিখ' বা শিষ্য সম্প্রদায়ের উদ্ভব। শিখ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রীঃ) নামে লাহোরের জনৈক হিন্দু শস্য বিক্রেতা বণিক।* জাতিভেদ প্রথার ফলে সৃষ্ট সমাজের অসাম্যের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানালেন গুরু নানক। তিনি নির্দেশ দিলেন যে জাতিগত পার্থক্য ভুলে তাঁর শিষ্যদের এক সঙ্গে বসে খাদ্যগ্রহণ করতে হবে ('গুরুকা লঙ্গর')। সন্ন্যাসীর জীবন যাপন ও কৃচ্ছ্রসাধনের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে নানক তাঁর শিষ্যদের দেশবাসীর কল্যাণ সাধনের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষাদাতার কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করতে বললেন শিখদের গুরু নানক। তাঁর শিক্ষার মূল বাণী ছিল তিনটি, "একমাত্র সত্য ঈশ্বর, গুরু এবং নাম"। হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, সকল মানুষের অন্তরে একই ঈশ্বর বিরাজ করছেন।

নানক

গুরু নানক যে সময়ে পাঞ্জাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রায় সেই সময়ে বাংলাদেশে জন্ম নিলেন শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৪ খ্রীঃ) নামে আর একজন ধর্মপ্রচারক যিনি ভক্তি-বাদের নীতিগুলি কৃষ্ণ উপাসক বৈষ্ণব ধর্মমতের অঙ্গীভূত করে এক নতুন ধর্মমত প্রচার করলেন। চৈতন্যদেবের এই ধর্মের মূলকথা হল সর্বজীবে ঈশ্বর দর্শন এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে আপামর সর্বসাধারণের মধ্যে প্রেম বিতরণ। সকল মানুষই ঈশ্বরের প্রেম লাভের অধিকারী। ঈশ্বরের নাম সংকীর্তনের মাধ্যমেই তাঁর কাছে যাওয়া যায়, তাঁকে

* নানকের জন্ম হয় লাহোরে ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম জীবনে তিনি লাহোরের শাসনকর্তার অধীনে চাকরি নিয়েছিলেন। কিন্তু অন্তরে দ্বন্দ্বের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি চাকরি ছেড়ে দিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, "হিন্দুও নাই, মুসলমানও নাই" এবং ধর্মশিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করবার সঙ্কল্প নিলেন। নানক ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করলেন। পরে মক্কা ও মদিনায় তীর্থদর্শন করে দেশে ফিরলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর নানক শিখসম্প্রদায়কে সংহত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

পাওয়া যায়। 'কীর্তন' গানের মধ্য দিয়েই আপামর সকলকে ভাব-সমাধির স্তরে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছিলেন শ্রীচৈতন্য।

একদিকে ইস্‌লামের সুফী-মতবাদ, অপর দিকে হিন্দু সাধকদিগের ভক্তি আন্দোলন —এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ঘটনা মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ ঘুচিয়ে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক নতুন বাতাবরণ নিয়ে এসে মানুষে মানুষে বিদ্বেষজনিত অসহিষ্ণুতা দূর করতে যথেষ্ট সাহায্য করল। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় এক নতুন মিলন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল।

শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশেও মধ্যযুগের অবদান যথেষ্ট মূল্যবান। দিল্লীর সুলতানশাহীর আমলে ফার্সি (পার্শি) ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাওয়ায় এই ভাষায় সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতা, রচিত হতে লাগল। উত্তর ভারতে একটি নতুন ভাষা উর্দুর (প্রথমে সেনাবাহিনীর শিবিরের ভাষা) প্রচলন ঘটল এই সময়ে। নতুন উদ্ভূত উর্দু ভাষার ব্যাকরণ ছিল ভারতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী কিন্তু এর শব্দসম্ভার ছিল প্রধানতঃ ফার্সি ও আরবী শব্দ থেকে সংগৃহীত। সুলতানী যুগের বিখ্যাত কবি ছিলেন আমীর-খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রীঃ)। খসরুর একখানি গ্রন্থে ভারতের সমসাময়িক সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। কেবল ফার্সি ভাষাতেই নয়, উর্দুতেও খসরু কবিতা লিখেছেন। কথিত আছে খসরু ৯৩ খানি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যদিও সবগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ভারতের নতুন আঞ্চলিক ভাষাগুলিতেও কবিতা রচিত হতে লাগল। আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গুজরাটি, মারাঠি, হিন্দী, পাঞ্জাবি, বাংলা প্রভৃতি। এই সকল আঞ্চলিক ভাষায় মহাকাব্যের ছন্দে লিখিত গাথা কবিতার মধ্যে হিন্দীতে কবীরের 'দোঁহা' ও 'সাথী', মারাঠিতে নামদেবের গীত, পাঞ্জাবীতে নানকের গীত, বাংলায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এবং অন্যান্য ভক্ত কবিদিগের ভক্তিবাদী, ভাবাশ্রয়ী কবিতা ও গান, রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, পদ্মা-মনসা-চণ্ডী-ধর্ম (লৌকিক দেবদেবী) ইত্যাদির মঙ্গলকাব্য, চৈতন্য জীবনী কাব্য ও নানা বৈষ্ণব কবিতা আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে এই যুগে। বিদ্যাপতির রচনায় মৈথিলি, চণ্ডীদাসের রচনায় বাংলা ও মীরাবাঈ-এর ভক্তি রসাত্মক 'ভজন' গানে 'ব্রজভাষা' (হিন্দীর আদিরূপ) প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষাগুলি রসসমৃদ্ধ হয়ে জনচিত্তে এক নতুন ভাবলহরীর সৃষ্টি করে। শুধু কাব্যসাহিত্য নয়, গদ্য সাহিত্যও এই যুগে বিকাশলাভ করে।

ফার্সি এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলি দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ফার্সি গদ্য সাহিত্য রূপ নেয় ইতিবৃত্ত রচনায়। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সংস্কৃত ভাষায় কবি কহ্লন রচিত 'রাজতরঙ্গিণী' (কাশ্মীরের রাজবংশের ইতিবৃত্ত) গ্রন্থখানির কথা বাদ দিলে বলতে হয় মুসলিম বিজয়ের আগে ভারতে কোন ইতিহাসই লেখা হয় নাই। সুলতান মাহমুদের সঙ্গে আগত আবুরায়হান বেরুণী বা আলবেরুণী (৯৭৩-১০৪৮ খ্রীঃ)

কর্তৃক লিখিত ফার্সি গদ্য গ্রন্থ 'কিতাব্-উল্-হিন্দ্' (হিন্দুস্থানের বিবরণ) সে যুগের ঐতিহাসিক তথ্যের অমূল্য ভাণ্ডাররূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। প্রথম সত্যিকারের (গদ্য) ইতিবৃত্ত অবশ্য রচনা করেন মিন্হাজ-উদ্দীন আবু-ই-উমর-উস্মান (জন্ম ১১৯৩ খ্রীঃ) নামে জনৈক পারস্যবাসী। মোঙ্গল আগ্রাসকদের অত্যাচার এড়াতে ইনি ভারতে পালিয়ে আসেন। এঁর রচিত ইতিবৃত্তখানির ইনি নাম দেন 'তবাকাৎ-ই-নাসিরি' (তাঁর পৃষ্ঠপোষক দাসবংশীয় সুলতান নাসির-উদ্দীন মাহ্মুদের নামানুসারে)। চতুর্দশ শতকে ফার্সি ভাষায় মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সংকলিত করেন জিয়া-উদ্দীন বরানি ও সাম্স্-ই-সিরাজ আফিফ। এঁদের রচনা ফার্সিতে আদর্শ গদ্য রচনার নমুনা বলে গণ্য হয়। সুলতান ফিরুজশাহ্ তুঘলকের সম্মানে উভয় গ্রন্থকারই তাঁদের গ্রন্থের নাম দেন 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী'।

সুলতানী যুগে সংস্কৃত ভাষার চর্চার ফলে এই ভাষারও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। চতুর্দশ শতকে পার্থসারথি মিশ্রের রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এইগুলি হল 'কর্ম মীমাংসা' সম্বন্ধীয় কয়েকখানি গ্রন্থ যার মধ্যে 'শাস্ত্র দীপিকা' সে যুগে যথেষ্ট পঠিত হত। 'যোগ', 'বৈশেষিক' এবং 'ন্যায়দর্শন' সম্বন্ধে এ সময়ে বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। জয়সিংশূরীর রচিত 'হাম্মীর-মদ-মর্দন' (ত্রয়োদশ শতাব্দী), কেরালার যুবরাজ রবিবর্মনকৃত 'প্রদ্যুম্ন-অভ্যুদয়', বিদ্যানাথের 'প্রতাপরুদ্র কল্যাণ' (চতুর্দশ শতাব্দী), বামন ভট্ট বাণের পার্বতী পরিণয় (পঞ্চদশ শতাব্দী), গঙ্গাধরের রচিত 'গঙ্গাদাস-প্রতাপ-বিলাস', হুসেন শাহের মন্ত্রী, রূপ গোস্বামীকৃত 'বিদগ্ধ মাধব' এবং 'ললিত মাধব' (ষোড়শ শতাব্দী) সংস্কৃত ভাষায় রচিত এ যুগের বিখ্যাত নাটক ও কাব্যগ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। এই যুগের অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ রচয়িতাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন পদ্মনাভ দত্ত, বিদ্যাপতি উপাধ্যায় (পূর্বে উল্লিখিত) মিথিলার বাচস্পতি এবং বাংলার রঘুনন্দন। এই সময়ে বিজয়নগর রাজ্যে সংস্কৃতের বিশেষ উন্নতি হয়। বিখ্যাত টীকাকার সায়নাচার্য এবং মাধব বিদ্যারত্ন বিজয়নগরের নৃপতিদিগের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

স্থাপত্যকলা : দিল্লীর সুলতানী যুগে মুসলিমদের উপাসনার উপযোগী প্রথম অট্টালিকাগুলি নির্মিত হয়। এই অট্টালিকাগুলির মধ্যে ছিল মসজিদ, মিনার, সমাধিসৌধ ও মাদ্রাসাসমূহ। এই ভবনগুলির আকার ছিল তৎকালীন ভারতের পক্ষে অপরিচিত। হিন্দুরীতির ন্যায় ওগুলির গায়ে কোন ভাস্কর্যশিল্পের অলংকরণ ছিল না, তবু অনুপাতবোধ, সূক্ষ্মতা ও রেখার সৌন্দর্যের বিচারে এগুলি ছিল লক্ষণীয়। যেমন কুতব্-মিনার একটি সু-উচ্চ সুদৃঢ় মিনার, যার দেওয়ালগুলি হল সভঙ্গ শিরালো (বিভিন্ন লম্ব রেখাকৃতি ঊর্ধ্বগামী স্তম্ভের সমষ্টির ন্যায়) এবং লাল রঙের বেলে-পাথরে মোড়া। এর অলংকরণগুলি জ্যামিতিক ধাঁচের এবং সেগুলি উৎকীর্ণ আরবী লিপির সঙ্গে সুষমভাবে সংমিশ্রিত। মিনারটি যেমন সুদৃশ্য তেমনই জাঁকালো। ইলতুৎমিশের সমাধিসৌধ চতুষ্কোণ গম্বুজশোভিত এবং চতুর্দিকে ধনুকের আকৃতির

ন্যায় খিলানসহ প্রবেশপথ যুক্ত। এই সমাধিসৌধটির দেওয়াল অলংকরণও ছবির মত হস্তলিপিতে সুসজ্জিত। তুঘলক যুগের সৌধগুলি রেখার সরলতার জন্য বিশিষ্ট, তবে আকারে বিপুলতা এবং জাঁকালো ভাবের জন্য সেগুলি মনে রেখাপাত না করে পারে না। আলাউদ্দীনের তৈরি শিরি শহরের ও মুহম্মদ তুঘলকের তৈরি তুঘলকাবাদের ধ্বংসাবশেষ, দিল্লীর সুলতানী আমলে নির্মিত দুর্গ-প্রাকার ও নগর স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আমাদের দেয়। লোদী যুগের ভবনগুলি আকারে ছোট হলেও দেখতে সুন্দর। মুসলিম স্থাপত্যশিল্প বিদর, মাণ্ডু, আহমদাবাদ, গুলবর্গা ইত্যাদি দাক্ষিণাত্যের প্রাদেশিক সুলতানশাহীর রাজধানীতেও বিকশিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য, ভারতে মুসলিম-বিজয় হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। মুসলিম-শাসনকালে বেশ কিছু হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করে ফেলা হয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ কোন নতুন হিন্দুদের নির্মিত অট্টালিকা তখন গড়ে উঠে নাই। তাছাড়া এই যুগে ভারতীয় চারু ও ভাস্কর্য শিল্পেরও উল্লেখযোগ্য বিকাশ দেখা যায় না।

সুলতানী যুগের স্থাপত্য ও শিল্পকলায় আমরা হিন্দু ও মুসলিম ধ্যানধারণার সংমিশ্রণ স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করতে পারি। বিখ্যাত স্থাপত্যবিদ্ স্যার জন মার্শালের মতে সুলতানী যুগের স্থাপত্য হল হিন্দু ও মুসলিমদিগের যৌথ প্রয়াসের ফল। মার্শালের মতে এযুগের মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের আঙ্গিকের যে বলিষ্ঠতা ও সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায় তা সম্ভবতঃ হিন্দুযুগের নির্মাণরীতির প্রভাবেরই ফল। কুতব্‌মিনার ছাড়া কুতব্‌-উদ্দীনের নির্মিত আজমীরের "আড়াই-দিন-কা ঝোঁপরা" স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে দিল্লীর রীতির নিদর্শনরূপে পরিগণিত হয়। খলজি আমলের স্থাপত্যের নিদর্শনগুলির বহিরলংকরণের ঐশ্বর্যও শিল্পরসিকদিগের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। এ যুগের প্রাদেশিক শিল্পরীতির নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়ের 'দখিল দওয়াজা', আহম্মদনগরের 'জাম্‌-ই-মস্‌জিদ্‌', এবং মাণ্ডুর দুর্গ শহর নির্মাণে জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য। মালবের 'জাম্‌-ই-মসজিদ্‌' এবং 'হিন্দোলা মহল' নামে দরবার হলটিও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এ সময়ের জৌনপুরী শিল্পরীতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপে অতালা মসজিদটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সুলতানী যুগে বিজয়নগর রাজ্যে নির্মিত বিভিন্ন মন্দির, প্রাসাদ, দুর্গ প্রভৃতি এযুগের স্থাপত্য সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছিল।

প্রথম যুগের সুলতানরা হিন্দুদের বলপূর্বক ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করতে উৎসাহী ছিলেন। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে অনেক নিম্ন বর্ণের হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে ধর্মান্তরিতদের নিয়েও এক নতুন সমাজের সৃষ্টি হয়।

সুলতানী যুগে সমাজের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সুলতান স্বয়ং এবং তারপর পদমর্যাদা অনুসারে স্থান পেতেন আমীর-ওমরাহ্ গোষ্ঠী। সাধারণ

রাজকর্মচারী, শিল্পী, কারিগর, বণিক-ব্যবসায়ীদের নিয়ে গঠিত হত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বিশেষ উল্লেখ্য এই যে, এই যুগে সমাজে নারীর অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। প্রাচীন যুগের তুলনায় হিন্দু সমাজে গোঁড়ামি বৃদ্ধি পেয়েছিল, যদিও 'ভক্তি' আন্দোলনের প্রভাবে এই গোঁড়ামির বাড়াবাড়ি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের প্রভাবে শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতেই সমাজে এক নতুন প্রাণ-বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল।

তখন গ্রামসমূহ ছিল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি। কৃষি ও শিল্পের নানা কাজ ছিল জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়। খাদ্যবস্ত্রের অভাব সে যুগে তেমন ছিল না। নানা ধরনের বস্ত্র, নীল, আফিম, মসলাদ্রব্য, মূল্যবান্ মণি-মুক্তা প্রভৃতি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হত। দেশীয় শিল্পের মধ্যে কাপড়, চিনি, কাগজ ও পাদুকা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে নির্মিত হত। অত্যধিক করভারে প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল। হিন্দুদের উপরে 'জিজিয়া' কর, তীর্থকর প্রভৃতি পীড়াদায়ক করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের জীবন দুর্বিষহ করা হয়েছিল। প্রাণ ভয়েই হিন্দুগণ জিজিয়া কর প্রদানে সম্মত হত। তবে কয়েকজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, "হিন্দুদিগের উপর ধারাবাহিক ভাবে অত্যাচার করা হত না। যদিও অনেক মুসলিম শাসকরা ধর্ম বিষয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে খুবই অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন তবু তাঁরা সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুদেরকে একবারে নিশ্চিহ্ন করবার কোন প্রয়াস করেন নাই।" জনৈক ঐতিহাসিকের মতে "সুলতানদিগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ এই হতে পারে যে তাঁরা প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশীদার হতে কোন সুযোগ হিন্দুদের দেন নাই।"

॥ ৯ ॥

মুঘল যুগ ঃ ১৫২৬-১৭০৭ খ্রীঃ

ইতিহাসের উপাদান ঃ পূর্ববর্তী যুগগুলির তুলনায় মুঘল যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানের কোন অপ্রতুলতা নাই। ১৫২৬ সাল থেকে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত সব কয়জন মুঘল শাসকের রাজত্বকালের ইতিহাস লিখতে অনেক উপাদানই পাওয়া যায়, কখনও কখনও একজন শাসকের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনায় একাধিক গ্রন্থও পাওয়া যায়।

মুঘল রাজদরবারের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ যে ধারাবাহিক ইতিবৃত্তগুলি রচনা করেছিলেন সেই ইতিবৃত্তগুলিই ইতিহাস রচনার প্রধান উৎস। তবে এইগুলি রচিত হয়েছিল প্রধানতঃ ফার্সি ভাষায়, দ্বিতীয়তঃ এগুলির রচয়িতারা প্রায় সকলেই ছিলেন সম্রাটদিগের অনুগ্রহপ্রাপ্ত সভাসদ্ এবং সেই হিসাবে এঁদের বিবরণগুলির নির্ভর-যোগ্যতাও কিছু পরিমাণে সীমাবন্ধ। কারণ, অনেক সময় এই ইতিবৃত্তকারদিগের শাসক-বাদ্শাহের প্রশস্তি অতিরঞ্জিত হতে পারে, কিছু পরিমাণে বিকৃতও হতে পারে। অবশ্য অনুগৃহীত সভাসদ্ ছাড়াও বিভিন্ন সম্রাটের রাজত্বকালে কিছু অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচেতা লেখকের রচিত ইতিবৃত্তও পাওয়া যায়। তবে সম্রাটের ঘনিষ্ঠ এবং আস্থাভাজন সভাসদ্দিগের ইতিবৃত্ত লেখায় একটা সুবিধা ছিল এই যে অন্যের তুলনায় তাঁরা বাদ্শাহের মহাফেজখানায় (দপ্তরখানায়) রক্ষিত সরকারি দলিল-দস্তাবেজ ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখবার অধিক সুযোগ পেতেন। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত ইতিবৃত্তগুলি ছাড়াও ভারতে মুসলিম শাসন সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থও পাওয়া যায়। এগুলিতে ইসলামের উত্থানের শুরু থেকে গ্রন্থের রচনাকাল পর্যন্ত শাসকের রাজত্বকালের বিবরণ লিপিবন্ধ হয়েছে।

মুঘল যুগের উপাদানগুলির মধ্যে দুখানি আত্মজীবনী, যেমন তুর্কী ভাষায় বাবরের (বাবুরের এরূপ উচ্চারিত হয়) লিখিত 'তুজুক-ই-বাবর-ই' এবং জাহাঙ্গীরের লিখিত 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর-ই' ওই দুইজন বাদশাহের রাজত্বকালের মূল্যবান্ উপাদান। শাহ্জাহান আত্মজীবনী না লিখলেও তাঁর আদেশে এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁর রাজত্বকালের ইতিহাস লিখিত হয়েছিল। মুঘল যুগের ইতিহাসের উপাদানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, অন্ততঃ একখানি ইতিহাস গ্রন্থ এই সময়ে একজন মহিলা কর্তৃক রচিত হয়েছিল। কয়েকজন বিদুষী শাহ্জাদীও (রাজকুমারী) কয়েকখানি কাব্য ও অন্য রকমের সাহিত্য গ্রন্থ এই সময়ে লিখেছিলেন। এই জাতীয় গ্রন্থগুলি সাধারণতঃ 'দিওয়ান' নামে পরিচিত ছিল। চতুর্থতঃ, আকবরের সময় থেকেই

অনেকগুলি 'ফারমান' (বাদশাহী হুকুমনামা) এবং বিভিন্ন ধরনের সরকারী ও আধা সরকারী আদেশপত্র বাদশাহের দরবার থেকে জারি করা হয়েছিল ; এগুলিও ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মূল্যবান্ তথ্য সরবরাহ করে। মুঘল ইতিহাস রচনায় পঞ্চম প্রকারের উপাদান হল বিভিন্ন জরীপ ও গণনাকার্যের বিবরণ, বিশেষতঃ রাজস্বসংক্রান্ত বিধি-নিয়মগুলি, চিঠিপত্র ইত্যাদি। এগুলি একত্রে "দস্তর-উল-আমল" নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকগণ এগুলি সম্পর্কে বলেছেন, "এগুলি বিশ্বের প্রথম সাম্রাজ্যিক গেজেটিয়ারের মর্যাদালাভের যোগ্য।" বাদ্শাহী দরবার থেকে প্রকাশিত বুলেটিন (ইস্তাহার) ও সংবাদপত্রগুলিও মুঘল যুগের ইতিহাস রচনার একটি মূল্যবান্ উপাদান। এই জাতীয় উপাদানগুলি সাধারণভাবে 'আকবারাৎ-ই-দরবার-ই-মুয়াল্লা' নামে পরিচিত। সপ্তমতঃ, অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও মুন্সী (সেক্রেটারী) বেশ কিছু ঐতিহাসিক চিঠিপত্রের সংগ্রহ রেখে গেছেন। এগুলি 'ইন্শা' ('মকতুবাৎ' অথবা 'রুকাৎ') নামে কয়েক খণ্ডে পাওয়া যায়। এই জাতীয় উপাদানেরও যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

মুঘল যুগের ঐতিহাসিক তথ্যের আরও একটি মূল্যবান্ উৎস হল ইউরোপীয় ও অন্যান্য মিশনারী, পর্যটক, বণিক প্রভৃতি বিদেশীদিগের লিখিত বিবরণসমূহ। অন্যান্য যুগের তুলনায় মুঘল যুগে অনেক বেশি সংখ্যায় ইউরোপীয় এবং মুসলিম আগন্তুকগণ ভারতে পর্যটনে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন, যেমন বার্নিয়ে (১৬৫৬-৮৮), ট্যাভার্নিয়ে (১৬৪০-৬৭), ম্যানচী (১৬৫৩-১৭০৮), টমাস্ রো (১৬১৫-১৯), উইলিয়ম হকিন্স (১৬০৮-১৩), এফ্. পেলসার্ট (জাহাঙ্গীরের আমল), দু'জারবিক (১৬১৪ খ্রীঃ), দ্য'লায়েট (১৬৩১), পিটার মান্ডি (১৬৩০-৩৪), রাল্ফ্ ফিথ্ (১৫৮৩-৯১), ই. টেরি (১৬১৬-১৯), উইলিয়ম ফিঞ্চ্ (১৬০৮-১১), অ্যান্টনী মন্সেরুরেট (১৫৮০-৮৩) প্রমুখ তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রদ ও উপভোগ্য বিবরণ রেখে গেছেন।

সম্রাট আকবরের প্রতিদিনের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেকটি আদেশ-নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গেই লিপিবন্ধ করা হত এবং এগুলি বাদশাহী মহাফেজখানায় রক্ষিত হত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই মূল্যবান্ উপাদান প্রাকৃতিক, মানবিক অবহেলা ও অন্যান্য কারণে বিনষ্ট হয়ে গেছে।

ফার্সিতে রচিত গ্রন্থগুলি ছাড়া মুঘল যুগে সংস্কৃত, হিন্দী এবং বাংলা ও গুজরাটি প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাতেও রচিত হয়েছিল বেশ কিছু ইতিহাস বা ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থ। সেগুলিও এযুগের ইতিহাসের উপাদান রূপে গণ্য।

মুঘলযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে অবশ্যই উল্লেখ্য তৎকালীন স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনগুলি। সমকালীন অনুশাসন ও প্রাপ্ত মুদ্রাগুলিও মুঘল ইতিহাসের উপাদান হিসাবে উপেক্ষণীয় নয়।

ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা

বাবর ভারতে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপে খ্যাত হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মুঘল (মোঙ্গল)* ছিলেন না। বাবর নিজেকে 'মুঘল' বলে পরিচয় দিতে ঘৃণাই বোধ করতেন। পিতার দিক থেকে তিনি ছিলেন চাঘ্‌তাই (চাঘাতাই) তুর্ক, কারণ তুর্ক সমরনায়ক তৈমুরলঙের পঞ্চম বংশধর ছিলেন তিনি ; মাতার সূত্রে অবশ্য বাবর ছিলেন মোঙ্গলনায়ক চিঙ্গিজ খানের বংশধর। ফলে বংশসূত্রে বাবরের ধমনীতে মিলিত হয়েছিল মধ্য এশিয়ার দুই দুর্ধর্ষ সেনানায়কের রক্তধারা—তৈমুর ও চিঙ্গিজ।

বাবরের পিতা উমর শেখ মির্জা ছিলেন চীনা তুর্কিস্থানের অন্তর্গত ফারগানা নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি। এই ফারগানাতেই জন্ম হয় বাবরের, ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। বাবরের প্রথম জীবন ছিল নাটকীয়। মাত্র এগার বৎসর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। একাদশবর্ষীয় বালক ফারগানার অধিপতি হলে বাবরের আত্মীয়পরিজনরা কিন্তু তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন না, বরং তাঁদের অনেকেই নানাভাবে বাবরের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হলেন। তাঁর পিতৃদত্ত ক্ষুদ্র জায়গীরটুকুও একাধিকবার তাঁকে হারাতে হয়।

চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত হয়ে বাবর কিন্তু সাহস হারালেন না। নিজ বুদ্ধি ও সাহস বলে তিনি তুর্কীস্থানের রাজধানী সমরখন্দ জয় করলেন মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে। উজবেগদের নিকট পরাজিত হওয়ায় সমরখন্দ তাঁর হস্তচ্যুত হল। সেই সঙ্গে পৈতৃক জায়গীর ফারগানাও শত্রুদের অধিকারে চলে গেল। একরকম কপর্দকহীন হয়ে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন বাবর। তাঁর এই সময়কার অসহায় অবস্থার কথা তিনি নিজেই লিখেছেন, "রাজ্য ও গৃহহারা হয়ে দাবার ঘুঁটির মত স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হল।" তবু চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও বাবর সঙ্কল্পচ্যুত হলেন না। বরং প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁর মনোবল আরও দৃঢ় হল। পারসিকদিগের সংস্পর্শে এসে তিনি তাঁদের থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিখলেন। উজবেগদিগের কাছে শিখে নিলেন তাঁদের বিশেষ সমরকৌশল। মধ্য এশিয়ার দুর্দান্ত উজবেগদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাবর প্রথম জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন তা তিনি পরে ভারতের পানিপথ ও খানুয়ার রণাঙ্গনে কাজে লাগান। তাঁর এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন, "সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনার সঙ্গে যুগপৎ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা বাবর লাভ করেছিলেন মধ্য এশিয়ায়।"

মধ্য এশিয়ায় সামরিক সাফল্য লাভে ব্যর্থ হলেও বাবর হতাশ হলেন না। তিনি

---

* 'মোঙ্গল', 'মোঘাল', 'মুঘল'—একই শব্দের বিভিন্ন রূপ। 'মোঙ্গল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 'মোঙ্গ' (সাহসী, দুঃসাহসিক, নির্ভীক) শব্দ থেকে। মোঙ্গলদের আদি বাস ছিল মধ্য এশিয়ার 'স্তেপ্‌স্' (তৃণহীন মরু প্রান্তর) অঞ্চলে। বাবরের পিতা উমর শেখ মির্জা ছিলেন তুর্কদের চাঘাতাই (চাঘ্‌তাই) শাখার অন্তর্ভুক্ত। চাঘাতাই ছিলেন চিঙ্গিজ খানের দ্বিতীয় পুত্র। বাবরের (বাবুর রূপেও উচ্চারিত) পুরো নাম ছিল জহীর-উদ্দীন-মুহম্মদ বাবর।

দৃষ্টি দিলেন আফগানিস্থানের উপর। প্রথমে কাবুল, পরে কান্দাহার জয় করলেন তিনি (১৫২২ খ্রীঃ)। এই সময়ে বাবর ভারতের ধন-ঐশ্বর্যে প্রলুব্ধ হয়ে ভারত জয়ের নেশায় মেতে উঠলেন। মনে করলেন ভারত জয় করতে পারলেই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী এক রাজ্যের অধিপতি হতে পারবেন তিনি। অতঃপর বাবর ১৫২৪ ও ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে দুবার পাঞ্জাব আক্রমণ করলেন। অবশেষে পাঞ্জাবের দুই বিক্ষুব্ধ সামন্ত দৌলত খান লোদী ও আলম খান লোদীর সহায়তা পেয়ে ভারত জয়ের দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত হলেন বাবর।

১৫২৫ সালের নভেম্বর মাসে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে বাবর পাঞ্জাবে প্রবেশ করলেন এবং পানিপথের প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদীর* সম্মুখীন হলেন। পানিপথে ইব্রাহিম লোদী ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন (এপ্রিল ২১,১৫২৬ খ্রীঃ)। বাবরের অধীনে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অভিজ্ঞ দুই গোলন্দাজ সেনানী উস্তাদ আলি ও মুস্তাফার পক্ষে সংখ্যায় অধিক ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যদের কামানের গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত করতে কোন অসুবিধা হল না।**

সেই সঙ্গে সমতল রণক্ষেত্রে দ্রুতগতি অশ্বারোহী সেনাকে নিপুণতার সঙ্গে নিয়োগ করে বিপুল আফগান সেনাদলকে পর্যুদস্ত করলেন বাবর। পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী শোচনীয় ভাবে পরাজিত ও নিহত হলেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে প্রথম পানিপথের যুদ্ধ নামে খ্যাত। বাবর সহজেই দিল্লী ও আগ্রা জয় করলেন। এইভাবেই দিল্লীতে মুঘল পাদশাহীর সূত্রপাত হল।

কিন্তু দিল্লীজয়ের পরেও হিন্দুস্থানে মুঘল শক্তিকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে তখনও দুই প্রবল প্রতিপক্ষের বিরোধিতা অতিক্রম করতে হল বাবরকে। পূর্বদিকে আফগানরা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের (সঙ্গ নামেও পরিচিত) অধীনে যুদ্ধপ্রিয়, নির্ভীক রাজপুতগণ।

পানিপথে জয়লাভের মাত্র আট মাসের মধ্যে বাবরের আধিপত্য উত্তর-পশ্চিমে অ্যাটক থেকে পূর্বে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হল। মুলতান এবং গোয়ালিয়র বিজিত হল। বাবরের সঙ্গে সমঝোতার প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় রাণা সঙ্গ মাহমুদ লোদীকে দিল্লীর সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারীরূপে স্বীকার করলেন। অবশেষে বাবরও সংগ্রামসিংহ ফতেপুর সিক্রীর অদূরে খানুয়ার প্রান্তরে যুদ্ধের জন্য মিলিত হলেন (মার্চ ২৭,১৫২৭ খ্রীঃ)। রাজপুত অশ্বারোহী সেনা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেও অধিকক্ষণ রণক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারল না। রাজপুত বাহিনীর সংখ্যার প্রবল চাপ সত্ত্বেও মুস্তফার

---

* ইব্রাহিম লোদীর সম্বন্ধে বাবর লিখেছেন "একজন অনভিজ্ঞ তরুণ যুবক তাঁর চলাফেরায়ও শিথিলতা লক্ষ্য করার মত। শৃঙ্খলা ব্যতিরেকেই তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হলেন কোনরকম পরিকল্পনাহীনভাবে।

**বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে যুদ্ধের পর আগ্রায় পৌঁছে তিনি স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট জানতে পারেন যে, ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ মানুষ এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল।

কামানের বিধ্বংসী অগ্নিবর্ষণের ফলে যুদ্ধের গতি বাবরের অনুকূল হল। রাজপুতগণ ও তাদের মিত্র আফগানরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করল।

খানুয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তুর্ক-আফগান সুলতানশাহীর পতনের পর উত্তর ভারতে রাজপুত প্রভুত্ব স্থাপনের আশা নির্মূল হয়ে গেল। হতাশায় রাণা সঙ্গ প্রাণত্যাগ করলেন (১৫২৮ খ্রীঃ)।

রাজপুতদিগের বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে বাবর পূর্বদিকে আফগানদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত আফগানদিগের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। 'লোহানী' ও 'লোদী' আফগানগণ ছিল পরস্পরের বিরোধী।

বিহার বাবরের অধিকৃত হল। জালাল-উদ্দীন বহর খান লোহানী বাবরের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। বাংলার সুলতান নসরৎ শাহ্ আফগানদিগের সাহায্যার্থ সসৈন্যে গোগ্রা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। বাংলার সুলতানের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল। নসরৎ শাহ্ মুঘলদিগের সঙ্গে সন্ধি করলেন। এইরূপে গোগ্রার যুদ্ধ (৬ই মে, ১৫২৯ খ্রীঃ) অন্ততঃ সাময়িকভাবে আফগানদিগের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দিল। ১৫৩০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর বাবর মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র হুমায়ুন পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করলেন। মৃত্যুকালে বাবর তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্য একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য রেখে গেলেন। মধ্য এশিয়ার অক্ষু নদীর তীর থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল তাঁর অধিকার। বাবরের রাজ্যজয়ে সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সাহস এবং গভীর আত্মবিশ্বাস।

লেনপুলের ভাষায় বাবর ছিলেন, "মধ্য এশিয়া ও ভারত, হানাদারী উপজাতি ও সাম্রাজ্যিক প্রশাসন এবং তৈমুরলঙ্ ও আকবরের মধ্যে যোগসূত্র।" বাবর ছিলেন একজন পর্যবেক্ষণশীল মানুষ, শিল্পরসিক ও প্রকৃতি-প্রেমী। তুর্কী ভাষায় রচিত তাঁর আত্মজীবনী ('তুজুক-ই-বাবরী') বিশ্বের এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ স্থান লাভের অধিকারী। এই গ্রন্থে বাবরের সাহিত্যিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বাবরের আত্ম-জীবনী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন লিখেছেন, "এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য হল লেখকের চরিত্র মাধুর্য...এতে আমরা এমন একজন নৃপতির সন্ধান পাই যিনি এক-নাগাড়ে দিনের পর দিন কাঁদাতে পারেন এবং আমাদের বলতে পারেন যে তিনি তাঁর বাল্যের খেলার সঙ্গীর জন্য কেঁদেছিলেন।"

মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা

১৫২৬ সালে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে মুঘল (মোঙ্গল) সমরনায়ক বাবরের জয়লাভ থেকে ১৫৫৬ সালে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগান সুলতান আদিল শাহের বিরুদ্ধে মুঘল সম্রাট আকবরের জয়লাভ পর্যন্ত ত্রিশ বৎসরের ভারতের ইতিহাসকে মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাসরূপে বর্ণনা করা হয়। এই ত্রিশ বৎসরের মুঘল-আফগান রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রধান ঘটনাই

হল মুঘলদের সঙ্গে আফগানদের ক্রমাগত বিরোধ এবং তাঁরই ফলে ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যের উত্থান-পতন।"

মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসকে আমরা একটি তিন দৃশ্যের নাটকরূপে বর্ণনা করতে পারি। প্রথম দৃশ্যে আমরা পাই দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র : মুঘল সমরনায়ক বাবর এবং দিল্লীর আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদী। পাণিপথের প্রান্তরে প্রথম যুদ্ধে ১৫২৬ সালে জয়ী হন মুঘলবীর বাবর এবং আফগানশাহীর স্থানে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় মুঘল 'পাদশাহী'। পরবর্তী দৃশ্যে আমরা পাই একদিকে বাবর পুত্র হুমায়ুনকে। অপরদিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আফগান বীর শের খাঁ শূরকে। পর পর দুটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে (১৫৩৯—চৌসা, ১৫৪০—বিল্বগ্রাম বা কনৌজ) এই দুই প্রতিপক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হন এবং জয়ী হন আফগান নায়ক শের খাঁ শূর। ফলে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত হয় মুঘলের বদলে আফগান শূর বংশ। অন্ততঃ ১৫ বৎসর দিল্লীর শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করলেন শের শাহ ও তাঁর বংশধরগণ। ভ্রাতৃবিরোধে ভাগ্যহত দুর্বল হুমায়ুন প্রথমে পলায়ন করেন সিন্ধুপ্রদেশে, পরে আশ্রয় নেন পারস্যে। সেখানেই পারশি সম্রাটের আশ্রিতরূপে নির্বাসিত জীবন কাটান তিনি। পরবর্তী ১৫ বৎসর (১৫৪০-৫৫ খ্রীঃ) শেরশাহের মৃত্যুর (১৫৪৫ খ্রীঃ) পর তাঁর বংশধরদের অন্তঃকলহের সুযোগে ভাগ্যবলে হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার করেন (জুলাই, ১৫৫৫ খ্রীঃ)। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। মাত্র সাতমাস পরেই তিনি দিল্লীর পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে অবতরণ কালে অকস্মাৎ পদস্খলিত হয়ে পড়ে যান এবং পরে মারা যান (জানুয়ারী ১৫৫৬ খ্রীঃ)। এরপরেই আমরা পাই আফগান-মুঘল নাটকের তৃতীয় দৃশ্য। সেই দৃশ্যে দেখতে পাই কিশোর বয়স্ক (চৌদ্দ বৎসর) মুঘল সম্রাট আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁর সঙ্গে আফগান সুলতান আদিল শাহের সেনাপতি হিমুর যুদ্ধ। এবারেও মুঘল-আফগান শক্তি পরীক্ষা হল ঐতিহাসিক সেই পাণিপথেরই প্রান্তরে। পাণিপথের এই দ্বিতীয় যুদ্ধে (নভেম্বর ১৫৫৬ খ্রীঃ) বহু যুদ্ধের নায়ক সেনাপতি হিমু বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেও পরাজিত ও নিহত হলেন। হিমুর প্রভু আদিল শাহ বিহারে যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হন। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্রাহিম খান শূর উড়িষ্যায় পলায়ন করে সেখানেই মারা যান। আরও এক আফগান প্রতিদ্বন্দ্বী সিকান্দার শাহ শূর পরে মারা যান বাংলাদেশে। অতঃপর মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ আর রইল না। ভারতে নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপিত হল মুঘলদিগের।

শেরশাহ : ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিলগ্রামের যুদ্ধে জয়লাভ করে শেরখান 'শেরশাহ' উপাধি নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। শেরখান (বাল্য নাম ফরিদ) প্রথমে ছিলেন বিহারের একজন সামান্য জায়গীরদার। পরে বিহারের নাবালক সুলতানের অভিভাবক হয়ে তিনি শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে

তিনি দুর্ভেদ্য চুনার দুর্গটি অধিকার করেন। তাঁর ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বাংলার সুলতান ও বিহারের সামন্তগণ তাঁর বিরুদ্ধে মিলিতভাবে অগ্রসর হন। কিন্তু সুরজগড়ের যুদ্ধে শের খাঁ মিলিত বাহিনীকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন (১৫৩৭ খ্রীঃ)। এরপর হুমায়ুন সসৈন্যে বাংলা আক্রমণ করে শেরখানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। চৌসা ও বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন পারস্যে পলায়ন করলে শেরশাহ দিল্লীর সম্রাট হন (১৫৪০ খ্রী)।

শেরশাহের শাসনব্যবস্থা ঃ রাজ্যজয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও শেরশাহ রাজ্যশাসনে অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ইতিহাসে সুশাসকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি সর্বনিম্ন স্তর থেকে শাসনের বনিয়াদ দৃঢ় করে স্তরে স্তরে সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা যত্ন সহকারে গড়ে তুলেছিলেন। শেরশাহ তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন এবং প্রতিটি প্রদেশ আবার কতকগুলি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন। যাই হোক, শেরশাহের সাম্রাজ্যের সংগঠন ছিল সুসংহত। তিনি প্রত্যেকটি সরকারকে কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত করেন। প্রতিটি পরগনা গঠিত হয়েছিল কতকগুলি গ্রাম নিয়ে। শেরশাহের সাধারণ শাসন ও ভূমি রাজস্ব সংগঠনে পরগনাগুলির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এটা লক্ষণীয় যে, বর্তমানে যে ভূমি ব্যবস্থা দেশে চালু রয়েছে তার মধ্যে পরগনার একটা স্থান আছে। 'পরগনা' আমাদের শেরশাহের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রতিটি পরগনায় শেরশাহ একজন কানুনগো এবং আমিন (জরীপকারী), একজন শিকদার (আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক), একজন খাজাঞ্চি ও দুইজন করে কারকুন (দলিল লেখক) নিযুক্ত করেন। প্রতি সরকারের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন দুজন কর্মচারী 'শিকদার-ই শিক দাবান' (সাধারণ প্রশাসন ও ফৌজদারী আইন) এবং 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান' (দেওয়ানী আইন ও দেওয়ানী বিচার)।

শেরশাহের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ ভূমি রাজস্বের বিষয়ে শেরশাহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমতঃ তিনি আদেশ দেন ভূমির আয়তন ও উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে রাজস্ব নির্ধারিত হবে। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র রাজ্যে জমি জরীপের নির্দেশ দিলেন তিনি। পূর্বে জমির পরিমাণ যথাযথ মাপ-জোখের দ্বারা নির্দিষ্ট না করে ফসলের অংশ দাবি করত খাজনা-আদায়কারীরা নিজেদের খেয়াল খুশিমত। এই ত্রুটিপূর্ণ অবস্থার অবসান করতেই শেরশাহ নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সাধারণভাবে শেরশাহ রাজস্বের হার নির্দিষ্ট করেন উৎপন্ন শস্যের তিন ভাগের এক ভাগ। তবে শেরশাহ যথেষ্ট কঠোরতার সঙ্গে রাজস্ব আদায় করেছিলেন।

শেরশাহ নিয়ম করে দেন যে তাঁর সৈন্যদের কেবলমাত্র অর্থেই বেতন দিতে হবে এবং যেখানেই সম্ভব হয়েছিল সেখানেই তিনি দ্রব্যসামগ্রীর পরিবর্তে অর্থে খাজনা দেবার ব্যবস্থা করেন।

শেরশাহ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সংগঠনে বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন, কারণ রাষ্ট্রের ভিত্তি

তথা শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করত এই ভূমি ব্যবস্থার সুষ্ঠু সংগঠনের উপরেই। তিনি যে পাট্টা ও কবুলিয়ত প্রথার প্রবর্তন করেন (যা পরিবর্তিত আকারে হলেও) এখনও প্রচলিত আছে। পাট্টা হল বাদশাহের পক্ষ থেকে রাইয়তকে (প্রজাকে) দেওয়া জমির উপরে আইনানুগ একটা অধিকারপত্র। পাট্টার বলেই 'পাট্টাদার' অর্থাৎ প্রজা জমির

উপর স্বত্ব পেত। দ্বিতীয় দলিলটি হল কবুলিয়ত বা রাইয়ত কর্তৃক শর্তপালনের স্বীকৃতিপত্র। পাট্টা-কবুলিয়ত আদান-প্রদানের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হত বাদশাহ ও রাইয়তের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।

শেরশাহের অন্যান্য সংস্কার ঃ শেরশাহ মুদ্রানীতির সংস্কার করেছিলেন। তিনি

বর্তমান কালের মত রৌপ্যমুদ্রা ('তঙ্কা') প্রবর্তন করেন। রাস্তাঘাটের সংস্কার করে সাম্রাজ্যের যাতায়াত ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন শেরশাহ্। তিনি পুরাতন রাস্তাগুলির যেমন সংস্কার করলেন তেমনই নতুন রাস্তাও নির্মাণ করলেন। বাংলাদেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রাজপথ তিনি নির্মাণ করেছিলেন। এই রাজপথটি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে বর্তমানে খ্যাত।

দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের জন্য শেরশাহ্ ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিলেন।

ভূস্বামীদিগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা শেরশাহ্ তাঁর প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য করেছিলেন। এই নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার উদ্দেশ্যে তিনি জায়গীরদারদের উপর কঠোর নির্দেশ জারি করলেন। তাঁদের নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী যোদ্ধা নিয়ে অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করতে হবে (অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা নির্ভর করবে জায়গীরের আয়তনের উপর)। এই অশ্বারোহীবাহিনীগুলিই ছিল সম্মিলিত ভাবে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। এ বিষয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার জন্য শেরশাহ্ নিয়ম করলেন যে, সেনাবাহিনীর জন্য যে সব অশ্ব রাখা হবে তাদের গায়ে বিশেষ বিশেষ জায়গীরদারের নিজস্ব সীলমোহরের ছাপ দিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা তাঁদের সেনাবাহিনী-গুলির নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। জায়গীরদারগণ যাতে অসাধু উপায়ে অশ্বারোহীবাহিনীর 'ভুয়া' সংখ্যা দেখিয়ে রাষ্ট্রকে প্রবঞ্চিত করতে না পারে এই জন্যই শেরশাহ্ অশ্বের গায়ে ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন।

শেরশাহের জনহিতকর কাজ ঃ প্রাচীন হিন্দু নৃপতিদিগের অনুসরণে শেরশাহ্ পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ, কূপখনন, সরাইখানা নির্মাণ প্রভৃতি নানা জনহিতকর কাজ করেছিলেন। শেরশাহ কঠোরভাবে ন্যায়বিচারের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। গ্রামে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন গ্রামের মোড়লের উপর। তিনি আদেশ দেন অপরাধীকে সনাক্ত করে তাকে শাস্তির জন্য হাজির করবার দায়িত্ব থাকবে গ্রামের মোড়লদের।

শেরশাহের অবদান ঃ শেরশাহ ছিলেন একজন বুদ্ধিমান রাজ্য বিজেতা এবং বিজ্ঞ প্রশাসক। মাত্র পাঁচ বৎসরের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে তিনি সমগ্র উত্তর-ভারত জয় করেছিলেন এবং একটি সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। অনৈক্যে দুর্বল আফগানদের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন তা অবশ্যই তাঁর সামরিক কৃতিত্বের পরিচায়ক। ফিরুজ তুঘলক, সিকান্দার লোদী প্রভৃতি গোঁড়া সুলতানদের হিন্দু নিপীড়নের নীতি ত্যাগ করে তিনি তাঁর শাসনকার্যে হিন্দুদিগকে যথাযোগ্যভাবে নিযুক্ত করে একটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই, মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি পথঘাট, রাজস্ব ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রশাসনের সকলদিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সম্রাট আকবর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির যে উদার আদর্শ অনুসরণ করে 'মহাভারত' গঠনের

কল্পনাকে বাস্তব রূপদানের যে চেষ্টা করেছিলেন 'শেরশাহ' তার পথপ্রদর্শক ছিলেন এ দাবি নির্দ্বিধায় করা যায়। জানা যায় ব্রহ্মজি গৌড় নামে জনৈক হিন্দু শেরশাহের একজন সেনাপতি ছিলেন।

আকবর

হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে মাত্র তের বৎসর বয়সে আকবর পিতার উত্তরাধিকারী মুঘল সম্রাট হিসাবে ঘোষিত হলেন। তরুণ আকবর তখন পাঞ্জাবে তাঁর অভিভাবক পিতৃবন্ধু বৈরাম খাঁর সহিত বাস করছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণকালে (জানু, ১৫৫৬ খ্রীঃ) আকবরের অধীনে রাজ্য ছিল গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু উচ্চাভিলাষী তরুণ সম্রাট এই সামান্য ভূখণ্ডের উপর কর্তৃত্ব করে সন্তুষ্ট ছিলেন না। আত্মপ্রত্যয়ী আকবর দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন যে সমগ্র উত্তর-ভারতকে সহজেই তিনি নিজ কর্তৃত্বাধীন করতে সক্ষম হবেন। আর তা করতে পারলেই তিনি এক সুষ্ঠু কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তাঁর উচ্চাভিলাষ পূরণ করতে সক্ষম হবেন। এই সংকল্প সাধনের পথে বৈরাম খানের অভিভাবকতাকে তিনি দেখলেন অন্তরায়-রূপে। বৈরাম খানের নিকট নানাভাবে ঋণী থাকলেও তিনি নিজ উদ্দেশ্যসাধনের সুবিধার্থে বৈরাম খানকে অব্যাহতি দিয়ে নিজেই পূর্ণ শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন (১৫৬০ খ্রীঃ)।

সম্রাট আকবর

বৈরাম খানের অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আকবর তাঁর রাজ্যবিস্তারের লক্ষ্যপূরণে অগ্রসর হলেন।

উত্তর-ভারতে রাজ্য জয়ঃ রাজ্য জয়ের জন্য আকবর কয়েকটি নীতি গ্রহণ করলেন। নীতিগুলির বৈশিষ্ট্য হল—

১। সকল রাজ্যের শাসককে রাজ্যচ্যুত না করে মুঘলদের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হবার সুযোগ দান;

২। অপেক্ষাকৃত ছোট রাজ্যগুলিকে প্রভাবিত করে সাম্রাজ্যের অধীনে আনয়ন করা। এই সকল রাজ্য যেমন খান্দেশ, বেরার, আহম্মদনগর প্রভৃতিকে সম্রাটের আধিপত্য মানতে বাধ্য করা;

৩। যে সকল রাজ্যে বিশৃংখলা ও অপশাসন চলছে, যেমন—মালব, গুজরাট,

বিহার, বঙ্গ, কাশ্মীর, বালুচিস্থান, সিন্ধু, উড়িষ্যা এবং সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি সেই রাজ্যগুলিকে প্রথমে সাম্রাজ্যভুক্ত করা ;

৪। সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলি, যেমন—চুনার, রোহ্‌তাস্‌, কোটা, চিতোর, রন্‌থম্বোর ও কালঞ্জর প্রভৃতিকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা ;

৫। মর্যাদা-সচেতন, স্বাধীনতাপ্রিয় রাজপুত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এক বিশেষ উদার নীতি অনুসরণ করা ; এবং

৬। প্রয়োজনে শত্রুকে যুদ্ধে পরাজিত করে তার রাজ্য জয় করে নেওয়া।

মালব জয় (১৫৬০-৬১) ঃ রাজ্য জয়ের সঙ্কল্প পূরণে আকবর পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হলেন। প্রথমে তিনি পার্শ্ববর্তী মালব রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করলেন। মালবের সুলতান বজবাহাদুর যুদ্ধে পরাজিত হলেন এবং মালব মুঘলের

অধিকৃত হল। পরাজিত হয়েও অন্ততঃ আরও দশ বৎসর বজবাহাদুর মুঘলের বিরোধিতা অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে ১৫৭১ সালে তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন।*

মালব জয়ের পরের বৎসর (১৫৬২) অম্বরের (জয়পুর) রাজা বিহারীমল বিনা যুদ্ধে মুঘলদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। বিহারীমলকে পাঁচহাজারী-মনসবদারের পদ দিয়ে সম্মানিত করা হল। বিহারীমলের পোষ্যপুত্র ভগবানদাস ও পৌত্র মানসিংহ উভয়েই মুঘল সৈনাবাহিনীতে যোগ দিলে উচ্চ রাজপদে সম্মানিত হন। বিহারীমল স্বীয় কন্যাকে আকবরের হস্তে সম্প্রদানের প্রস্তাব করলে আকবর সানন্দে সম্মত হয়ে বিহারীমলের কন্যাকে বিবাহ করলেন।**

গণ্ডোয়ানা জয় (১৫৬৪) ঃ আকবরের আদেশে সেনাপতি আসফ খান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গণ্ডোয়ানা (গড় কটঙ্গা) রাজ্যের বিধবা রাজমাতা ও নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা রানী দুর্গাবতীর রাজ্য আক্রমণ করলেন। সাহসী রানী মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে বাধা দিলেন কিন্তু বিরাট মুঘল বাহিনীর কাছে পরাজিত হন এবং অপমান এড়াবার জন্য আত্মহত্যা করেন। রাজপুত রমণীগণ জোহরব্রত অনুষ্ঠান করে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। গণ্ডোয়ানা মুঘলদিগের অধিকৃত হল।

চিতোর অবরোধ (১৫৬৭-৬৮) ঃ মেবারের রাজধানী চিতোরের সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে আকবর চিতোর দুর্গ অবরোধ করলেন। রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র উদয়সিংহ পিতার ন্যায় বীর ছিলেন না। তিনি পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাণার দুই বিশ্বস্ত সেনাপতি জয়মল ও পত্ত চিতোর রক্ষায় প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। দুর্গ জয়ের জন্য অবরোধকারী মুঘলসৈন্য নানা কৌশল অবলম্বন করল। অবশেষে চার মাস পর জয়মল নিহত হলে চিতোর অবরোধের অবসান হয়। চিতোর মুঘলের অধিকৃত হল। আকবরের চিতোর জয়কে ঐতিহাসিকগণ একটি অভুতপূর্ব সামরিক সাফল্যরূপে অভিহিত করেছেন। এরপর পতন হয় বিখ্যাত রণথম্ভোর দুর্গটির (১৫৬৯)। বিকানীর এবং জয়শলমীরও বশ্যতা স্বীকার করল।

আকবরের রাজপুত নীতি ঃ রাজ্য জয়ের ক্ষেত্রে আকবরের রাজপুত নীতি বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। রাজপুতদিগের বাধাদানের তীব্রতা উপলব্ধি করে তিনি তাঁদের

---

* জানা যায়, বজ বাহাদুর সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি পরে আকবরের সভায় সভাসদরূপে বিশেষ সম্মানের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

** বিহারীমলের কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহের ফলে রাজপুতদিগের সহিত মুঘলদিগের মৈত্রীর যে নীতির সূচনা হয়, তার তাৎপর্য এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন জনৈক ঐতিহাসিক, "রাজপুতদিগের সহিত মৈত্রীবন্ধন উগ্রহিন্দুত্বকে জয় করবার উদ্দেশ্যে একটি কূটনৈতিক চালমাত্র ছিল না, এটা ছিল রাষ্ট্রনীতির একটা নূতন দিক্‌নির্দেশ—আকবরের প্রচারিত 'সুল্‌হ্‌-ই-কুল্‌ল্‌' মতবাদের (সর্বজনীন সহিষ্ণুতার) প্রথম বাস্তব প্রকাশ।"

প্রতি উদার মৈত্রী-নীতি অনুসরণ করলেন। তিনি বুঁদীর শক্তিশালী রাজপুত রাজা রায় সুরজন হর-এর সঙ্গে উদার শর্তে সন্ধিসূত্রে আবন্ধ হলেন। টডের উল্লিখিত সন্ধির শর্তগুলি* থেকে দেখা যায় আকবর এই সন্ধির মাধ্যমে রাজপুতদিগের পক্ষে অপমানকর প্রথাগুলি রহিত করে তাঁদেরকে তাঁর রাজ্য জয়ের প্রয়াসে অংশীদার করে তুলতে চেয়েছিলেন। যদিও মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ (উদয়সিংহের পুত্র) কখনই মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই এবং বরাবরই মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন তবু এই সন্ধির পর আকবরের অধীনে মুঘলরা রাজপুতনায় সার্বভৌমিক শক্তিরূপে পরিগণিত হল এবং রাজপুত রাজন্যবর্গ মুঘল সাম্রাজ্যের 'মনসবদার'রূপে গণ্য হলেন। অতঃপর মুঘল অশ্বারোহী সেনার এক-তৃতীয়াংশ রাজপুত গোষ্ঠীগুলি থেকে ভর্তি করা হতে লাগল। টডের মতে "আকবরই ছিলেন রাজপুতদিগের প্রথম সফল বিজেতা এবং এই লক্ষ্যপূরণে তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলীই তাঁকে সাহায্য করেছিল।" ঐতিহাসিকগণ মনে করেন আলাউদ্দীন খলজী ও শেরশাহের অনুসৃত নীতির থেকে আকবরের রাজপুত নীতির এইটিই ছিল পার্থক্য।

গুজরাট জয় (১৫৭৩ খ্রীঃ) ঃ ১৫৬৯ সালে বিখ্যাত কালঞ্জর দুর্গটির পতন হয়। কালঞ্জর দুর্গের পতনের পর আকবরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল গুজরাটের প্রতি। সামন্তদিগের অন্তঃকলহের সুযোগে তিনি আহমেদাবাদ অধিকার করে গুজরাটের সুলতানকে বৃত্তি দানে সন্তুষ্ট করলেন। অতঃপর সুরাট বন্দরটি অধিকার করলেন (১৫৭৩ খ্রীঃ)। পর্তুগীজদিগের সঙ্গে সন্ধি করে তীর্থযাত্রী ও বণিকদিগের জন্য যাতায়াতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। গুজরাট অধিকৃত হওয়ায় মুঘলদিগের বাণিজ্যলব্ধ সম্পদ বৃদ্ধি পেল।

বাংলা-বিহার জয় ঃ গুজরাট জয়ের পর বাংলার পাঠান সুলতান সুলেমান কররাণি সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করলেন। সুলেমানের পরবর্তী শাসক দাউদ বিদ্রোহী হয়ে পাটনায় আশ্রয় নিলে আকবর তাঁকে পাটনা থেকে বিতাড়িত করেন। শেষ পর্যন্ত রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ পরাজিত ও নিহত হন। বাংলা-বিহার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হল (১৫৭৬ খ্রীঃ)। অবশ্য এর পরেও বাংলার ঈশা খাঁ, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভুঁইয়াগণ দীর্ঘদিন মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু মানসিংহের ন্যায় অভিজ্ঞ সেনাপতির নিকট তাঁরা পরাভূত হন। উড়িষ্যাও এই সময় মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় (১৫৯২ খ্রীঃ)।

* বুঁদীর রাজার সঙ্গে আকবর কর্তৃক স্বাক্ষরিত সন্ধির কয়েকটি শর্ত হল ঃ (১) বুঁদীর অধিপতিদের মুঘল হারেমে রাজপুত কন্যা প্রেরণের দায় থাকবে না, (২) 'জিজিয়া' বা মাথাপিছু কর দিতে হবে না, (৩) মুসলিম উৎসব নওরোজ উপলক্ষে রাজপুতদের স্ত্রী ও কন্যাদিগের দ্বারা বাজারে বিপণি সাজাতে বাধ্য করা হবে না, (৪) তাঁদের সশস্ত্রভাবে 'দেওয়ান-ই-আমে প্রবেশের অধিকার থাকবে (৫) হিন্দুদের মন্দিরগুলির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে, (৬) তাঁদের অশ্বগুলির গাত্রে কখনও রাজকীয় 'দাগ' অঙ্কিত হবে না, (৭) 'লাল দরজা' পর্যন্ত তাঁদের দামামা বাজানোর অধিকার থাকবে, ইত্যাদি।

রাজপুত রাজ্যগুলি (অম্বর, বিকানীর, বুঁদী প্রভৃতি) আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেও উদয়সিংহের পুত্র দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা রাণা প্রতাপসিংহ অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে একাকী প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ মুঘলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের সংহত শক্তির বিরুদ্ধে তিনি অসম সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ চালিয়ে যান। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাণা প্রতাপ মুঘল বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহ ও সহকারী সেনাপতি আসফ খাঁর বিরুদ্ধে হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করেও পরাজিত হলেন। টড্* তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ মৃত্যুর পূর্বে প্রতাপ চিতোর ব্যতীত সমগ্র মেবারকে মুঘলের কবলমুক্ত করেছিলেন। প্রতাপের বীরত্ব কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

রাণা প্রতাপ

মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে কাবুলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আকবর নিজেই ১৫৮১ সালে কাবুলের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। মানসিংহ শক্তিশালী বাহিনীসহ আকবরের সহযোগী হন। আকবর যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৫৮৫ সালে কাবুল অধিকৃত হয়।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্থান ও বালুচিস্থান মধ্য এশিয়ার বাণিজ্য পথে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকায় আকবর এই দুইটি প্রদেশের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। এই অঞ্চলের আফগান উপজাতিগুলি ছিল দুর্ধর্ষ। উপজাতীয় নেতাদের যথেষ্ট পরিমাণে বৃত্তি দিয়ে তাঁদের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করলেন আকবর।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম দ্বাররক্ষার পক্ষে আফগানিস্থানের কান্দাহার দুর্গটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৫৯৫ সালে কান্দাহারের পারসিক শাসনকর্তা বিনা যুদ্ধে দুর্গটি আকবরের হস্তে অর্পণ করেন। এরপর একাদিক্রমে কাশ্মীর, সিন্ধু ও বালুচিস্থান মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আকবর দাক্ষিণাত্যের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। খান্দেশের দুর্ভেদ্য আসীরগড় দুর্গটি অধিকার করাই ছিল আকবরের লক্ষ্য। খান্দেশ সহজেই বশ্যতা স্বীকার করল। মুঘল সেনাপতি আবদুর রহিম খান খানান ও যুবরাজ মুরাদ আহম্মদনগর অবরোধ করলেন (১৫৯৫ খ্রীঃ)। বিজাপুরের বিধবা সুলতানা চাঁদবিবি

* *Annals And Antiquities of Rajasthan*—Col. James Tod.

ছিলেন আহম্মদনগরের নাবালক সুলতানের পিতৃস্বসা (পিসি)। তিনি মুঘলের বিরুদ্ধে বাধাদানে প্রস্তুত হলেন। বিজাপুর ও আহম্মদনগরের মিলিত বাহিনী গোদাবরী তীরে সুপা নামক স্থানের যুদ্ধে (১৫৯৭ খ্রীঃ) মুঘলদিগের বিরুদ্ধে জয়লাভে ব্যর্থ হল। আকবর স্বয়ং এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে আসেন। মুঘলদিগের প্ররোচনায় এক ষড়যন্ত্রে মহীয়সী রানী চাঁদবিবি নিহত হন। আহম্মদনগর মুঘলরা অধিকার করে নিল (১৬০০ খ্রীঃ)। পরের বৎসর (জানুয়ারী ১৬০১ খ্রীঃ)। আসীরগড় দুর্গের পতন হল। জেসুইটদিগের বিবরণ থেকে জানা যায়, মুঘলগণ উৎকোচের সাহায্যে আসীরগড়ের দুর্গটি জয় করেছিলেন।

এইরূপে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের (১৫৬০-১৬০১ খ্রীঃ) সামরিক অভিযানের ফলে আকবরের রাজ্যজয়ের নীতি সাফল্যমণ্ডিত হল। তাঁর সাহস, সমরকুশলতা ও চতুর রাজপুত নীতির ফলে মুঘল সাম্রাজ্য সমগ্র উত্তর ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যে আসীরগড় পর্যন্ত বিস্তৃত হল। তাঁর রাজ্যজয়ের স্বপ্ন সফল হল।

আকবরের শাসনব্যবস্থা ঃ রাজ্যজয়ের মতো রাজ্য শাসনেও আকবর সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থা ছিল অনেকটা বর্তমানের আমলাতান্ত্রিক ধাঁচের মত। কেন্দ্রীয় শাসনের শীর্ষে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। তাঁকে সাহায্য করতেন বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ, যেমন—উজীর (পরে উকিল) বা প্রধানমন্ত্রী, দেওয়ান (রাজস্ব ও অর্থ বিভাগ), মীর বক্সী (সামরিক বিভাগ), মীর সামান (প্রধান কার্যনির্বাহক এবং শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ) এবং সদর্-উস্-সদর (ধর্মীয় ও বিচার বিভাগ)। এই চার মন্ত্রীকে সাম্রাজ্যের চার স্তম্ভ বলা হত। এছাড়া ছিলেন 'দারোগা-ই ঘুসলখানা' (সম্রাটের ব্যক্তিগত সচিব) এবং 'আর্জ-ই-মুকর্রর্' (সম্রাটের আদেশের পুনর্বিবেচনার জন্য ভারপ্রাপ্ত)। আরও দুজন 'দারোগা-ই-ডাক চৌকি' ও 'মীর আর্জ' যথাক্রমে সংবাদ আদান প্রদান ও আবেদন নিবেদনের দায়িত্বে ছিলেন। আকবরের সাম্রাজ্য ছিল ১৫টি 'সুবাহ্' বা প্রদেশে বিভক্ত। সুবাহ্র ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সুবাহ্দার বা সিপাহ্সালার (নাজিমও বলা হত); তাঁকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন দেওয়ান, বক্সী, কাজী এবং সদর্ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। কয়েকটি 'পরগনা' (গ্রামসমষ্টি) নিয়ে গঠিত হত একটি করে 'সরকার', সরকারগুলির সমন্বয়ে গঠিত হত 'সুবাহ্'। 'আমাল্গুজার' উপাধিধারী কর্মচারীর দায়িত্ব ছিল প্রদেশের হিসাব রাখা। 'সরকারে'র সাধারণ প্রশাসন, পুলিস ও অপরাধ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন ফৌজদার। 'কোতোয়াল' ছিলেন প্রধানতঃ শহরাঞ্চলের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে। সুবাহ্র সমস্ত সংবাদ ও চিঠিপত্র সম্রাটের কাছে পৌঁছাত 'দারোগা-ই-ডাক্চৌকি' নামক কর্মচারীর মারফত।

মনসবদারী প্রথা ঃ আকবর জায়গীরদারি প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে মনসবদারি প্রথার প্রবর্তন করলেন। প্রচলিত জায়গীরদারি প্রথায় সেনাপতি ও কর্মচারিগণ প্রত্যেকে শর্তাধীনে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জায়গীরের মালিকানা পেতেন। সরকারে দেয় নির্দিষ্ট

পরিমাণ রাজস্বের অংশ ব্যতীত জায়গীর থেকে প্রাপ্ত অবশিষ্ট রাজস্ব ও অন্যান্য আয় জায়গীরদারের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হত। বিনিময়ে বাদশাহ্‌কে প্রয়োজনের সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সৈন্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকতেন জায়গীরদারগণ। কিন্তু জায়গীরদাররা অনেক সময় নির্ধারিত পরিমাণ সৈন্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হতেন। বিরাট ভূখণ্ডের মালিক হয়ে অনেক জায়গীরদার অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে উঠতেন। উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশও নানা অজুহাতে জায়গীরদারগণ অনেক সময় দিতে ব্যর্থ হতেন। এই সকল অসুবিধা উপলব্ধি করে আকবর জায়গীর প্রথা রদ করে মনসব প্রথা প্রবর্তন করেন। মনসবদারি প্রথায় কর্মচারীদের ভূখণ্ডের মালিকানা (জায়গীরদারি) তুলে দিয়ে তার স্থলে নগদ অর্থমূল্যে বা দ্রব্যসামগ্রীর মাধ্যমে অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'জায়গীরে' তাঁদের বেতন দানের ব্যবস্থা করা হল।*

পদমর্যাদা অনুযায়ী আকবর তাঁর কর্মচারীদের ৩৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন। নীচে দশজনের অধিকর্তা থেকে শুরু করে উর্ধ্বে পাঁচ হাজার, সাত হাজার, বা তারও অধিক, দশ হাজারের অধিকর্তাকে যথাক্রমে পাঁচ হাজারি, সাত হাজারি বা দশ হাজারি (সর্বোচ্চ) মনসবদার বলা হত। নগদ অর্থমূল্যে বেতন লাভ করলেও প্রতি মনসবদার তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী বাদ্‌শাহ্‌কে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করতে দায়ী থাকতেন। যুবরাজ সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর) ছিলেন সর্বোচ্চ দশহাজারি মনসবদার পদাধিকারী। মানসিংহ ছিলেন একজন সাত হাজারী মনসবদার। উচ্চ পদাধিকারী মনসবদারগণ 'আমির-উল্‌-উমরা' উপাধি লাভ করতেন। তবে পাঁচ হাজারের নীচে কোন পদাধিকারী 'আমির' আখ্যা লাভের অধিকারী হতেন না। পদাধিকারের সঙ্গে যুক্ত সৈন্যসংখ্যা আর বাস্তব সৈন্যসরবরাহের মধ্যে সব সময় মিল থাকত না। সেই জন্য আকবর প্রত্যেক মন্‌সবদারকে ব্যক্তিগত 'জ্জাত্‌' (জাট) ও সরকারি 'সওয়ার' (নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি)—এই দুটি পদবী লাভের অধিকারী বলে নির্দিষ্ট করলেন। এই দ্বিবিধ পদবীর ভিত্তিতেই কর্মচারিদিগের বেতনের পরিমাণ নির্দিষ্ট হত**

আকবরের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ঃ আকবরের শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা। ১৫৮২ সালে টোডরমলের সংস্কারের পর মুঘলদিগের রাজস্ব-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) 'ঘল্লবক্‌স্‌' অথবা ফসল বিভাগ ঃ এই ব্যবস্থায় (সিন্ধু, কাবুল ও কাশ্মীরে প্রচলিত) প্রতি ফসলের একটি অংশ রাষ্ট্র গ্রহণ করত।

* ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ডের হিসাব অনুযায়ী এক জন পাঁচ হাজারি মনসবদার মাসে অন্ততঃ ১৮০০০ টাকা এবং একজন পাঁচশত অশ্বারোহী সৈনিকের অধিকারী মনসবদার মাসে অন্ততঃ ১০০০ টাকা বেতন লাভের অধিকারী ছিলেন।

** এখানে উল্লেখ্য আকবরের স্থায়ী-সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ২৫০০০। অন্য সূত্রে জানা যায় তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৪৫০০০। তবে আকবরের সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ গঠিত হত মনসবদারদিগের দ্বারা প্রেরিত সেনাদলগুলির দ্বারা।

(২) 'জাব্‌তি' বা টোডরমলের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা (প্রচলিত ছিল মুলতান থেকে বিহার পর্যন্ত, রাজপুতনা, মালব এবং গুজরাটে) ঃ এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতিটি চাষের এলাকায় শস্যের ফলন অনুযায়ী পরিবর্তনশীল অংশ প্রদানের পরিবর্তে রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট হারে নগদ অর্থমূল্য দিতে হত। এর জন্য প্রয়োজন হল প্রতি বৎসর চাষের অধীন এলাকাগুলি জরীপের সাহায্যে নির্ণীত করে লিপিবদ্ধ করা। এই প্রথায় দুটি বিষয় প্রাধান্য পেত। এক, 'দস্তুর' নামে অর্থমূল্য প্রদানের হার নির্ধারণ করা এবং ফসলের যথাযথ বিবরণ প্রস্তুত করা। এই উদ্দেশ্যে জমিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হত—(ক) যেমন 'পোলজ' (ক্রমাগত চাষের যোগ্য), (খ) 'পরাউতি' (দুবৎসর পতিত রাখা জমি) (গ) 'চাচার' (তিন-চার বৎসর-পতিত রাখা) এবং (ঘ) 'বান্‌জার' (পাঁচ বা তার বেশি বৎসর যাবৎ অকর্ষিত জমি)। প্রথম তিন শ্রেণীর জমি আবার গুণানুসারে তিন স্তরে ভাগ করা হত, যেমন—ভাল, মাঝারি ও খারাপ। এই তিন স্তরের জমির উৎপাদনের ভিত্তিতে গড় উৎপাদন নির্ণীত হত। একমাত্র চাষের অধীনে জমির ভিত্তিতেই রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হত। প্রতিটি ফসলের জমির পরিমাণের ভিত্তিতে তার রাজস্বের হার নির্ণীত হত এবং এই হার নির্ণয়ে বাজারে প্রচলিত মূল্যের গড় ধরা হত। এই প্রকার রাজস্ব ব্যবস্থা 'রাইয়ত্‌-ওয়ারি' বা সরকার এবং রাইয়ত্‌ (প্রজা) ভিত্তিক ব্যবস্থা নামে পরিচিত ছিল। আকবরের সময়ে রাষ্ট্রকে দেয় রাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ। ঐতিহাসিকদের মতে এই ব্যবস্থার উৎকর্ষ ছিল এই যে এতে কারও কোন নির্দিষ্ট ভূমিগত অধিকার বা 'জায়গীরের' স্থান ছিল না। রাজস্বের মালিক হিসাবে কোন জমিদার ছিল না, অনুমানভিত্তিতে রাজস্বের পরিমাণ স্থির করারও কোন স্থান ছিল না এতে। বস্তুতঃ আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থায় বাৎসরিক খাজনা (নির্দিষ্ট পরিমাণে দেয় অর্থ) বলে কিছু ছিল না, রাজস্ব দাবি করা হত জমির অধিকার বা দখলের ভিত্তিতে নয়, দাবি করা হত জমির বাস্তব চাষের উপর। তবে বিকল্প ব্যবস্থার হিসাবে পূর্বে স্বীকৃত চুক্তি অনুযায়ী অনুমান ভিত্তিতে বাৎসরিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের দ্বারাও রাজস্ব দিতে পারত চাষী।

(৩) 'নাসাক্‌' অথবা অনুমানভিত্তিক ব্যবস্থা ঃ টোডরমল কানুনগো বা স্থানীয় কর্মচারীদিগের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলা-সুবায় খাজনার নির্দিষ্ট হার স্থির করেন। 'নাসাকি' ব্যবস্থায় স্থানীয় জরীপ বা ঋতুর পরিবর্তন-সাপেক্ষ ফসলের উৎপাদনের উপর রাজস্ব নির্ভর করত না! এই ব্যবস্থা ছিল অনেকটা পরবর্তী কালের জমিদারি ব্যবস্থার মতই।

'দীন-ই-ইলাহী' ঃ আকবরের সময়ে সাংস্কৃতিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তাঁর প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহী ধর্মমত। আকবর বুঝেছিলেন যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দুরা একনিষ্ঠভাবে তাঁর সেবা করবেন যদি তিনি তাঁদের ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই কারণেই ১৫৬৩ সালে তিনি তীর্থযাত্রীদের

দেয় কর-ব্যবস্থা বাতিল করে দেন এবং পরের বৎসর বাতিল করেন অমুসলিমদিগের নিকট অপমানকর 'জিজিয়া-কর' (মাথাপিছু কর)।

১৫৭৫ সালে তিনি ফতেপুর সিক্রিতে বিশেষভাবে ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি উপাসনালয় (ইবাদৎখানা) নির্মাণ করেন। এখানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আলোচনা-সভায় তিনি দেখলেন, সুন্নী, শিয়া, মাহ্‌দি, সুফী প্রভৃতি মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধ নিয়ে প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক হয়। তাছাড়াও ছিল হিন্দু, জৈন, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য মতাবলম্বীদিগের মধ্যে ধর্ম নিয়ে প্রচণ্ড মতবিরোধ। এই অবস্থায় বিস্মিত, ক্ষুব্ধ আকবর রক্ষণশীল ইসলাম ধর্ম থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকেন।

তাঁর উপদেষ্টা ও অন্তরঙ্গ বন্ধু আবুল ফজল এবং তাঁর ভ্রাতা ফৈজী সুফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মোল্লাতন্ত্রের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান তাঁরা। আকবরের মত ছিল যে সকল ধর্মের পথই হল ঈশ্বর-সন্ধানের পথ এবং প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই আছে সত্যের কিছু না কিছু উপাদান। আবুল ফজল আকবরের মধ্যে জাগিয়ে তুললেন যেমন অ-মুসলিম ধর্মগুলি সম্বন্ধে তেমনই নানা ধর্মবিরোধী মতবাদ সম্বন্ধেও আগ্রহ। আন্তরিকভাবেই আকবর বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে যেমন আগ্রহী হয়ে উঠলেন তেমনি তিনি পরিচিত হয়ে উঠতে শুরু করেন হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে এবং পারসিক, জৈন ও খ্রীষ্টানদিগের ধর্মের সঙ্গেও। শেখ মুবারকের প্রভাবে ঘোষণা করা হয় যে সম্রাট নিজেই ইমাম-ই-আদিল অর্থাৎ ইসলামী আইনের চরম নির্ধারক। আকবরের এই সব কার্যকলাপের ফলে মৌলবাদী উলেমাগণ তাঁকে ইসলামবিরোধী বলে গণ্য করতে লাগলেন। তবে আকবরের চেষ্টায় তাঁদের অভ্যুত্থানের প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

এই সাফল্যের পরই আকবর এক নূতন ধর্মমতের প্রবর্তন করতে শুরু করেন (১৫৮২ খ্রীঃ)। এই ধর্মের নাম দিলেন তিনি 'দীন-ই-ইলাহী' বা দিব্য বিশ্বাস।* এই ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আকবর একীভূত করতে চেয়েছিলেন ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলির মধ্যে যে উপাদানগুলিকে তিনি যুক্তিসম্মত বলে মনে করেছিলেন সেই সমস্ত উপাদানকে। এই ধর্মবিশ্বাসের প্রধান কয়েকটি বিষয় ছিল এই রকম : আবুল ফজল এবং তাঁর পিতা শেখ মুবারকের 'মাহ্‌দি'-বাদীদের ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্রাট আকবরকে 'ন্যায়বিচারক সম্রাট' বলে তাঁর গুণকীর্তন করতে হবে, হিন্দুধর্মের কিছু কিছু এবং কিছু পরিমাণে মুসলিম ধর্মেরও আচার-বিচার, পূজা-পদ্ধতি এবং পুরাণ কথাকে খানিকটা অস্বীকার করতে হবে।

---

* আকবরের প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহীর দিব্য মতবাদ অনুসারে কয়েকটি পালনীয় আচরণবিধি ছিল এইরূপ. (১) দীন-ই-ইলাহীর অনুগামীগণ পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে পরস্পরকে 'আল্লাহ্‌-উ-আকবর' এবং 'জাল্লা জাল্লালুহু'—এই উক্তিগুলি উচ্চারণ করবেন ; (২) মৃত্যুর পরে দেয় ভোজ মৃত্যুর পূর্বে জীবিত কালেই দিতে হবে ; (৩) মাংস খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে ; (৪) কসাই, জেলে, পাখি-ধরা ইত্যাদি নীচু শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করা চলবে না ; (৫) সম্রাটকে চার উপায়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে, যেমন সম্রাটের জন্য ধন, প্রাণ, মান এবং ধর্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে ইত্যাদি।

কেউ কেউ আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী' মতবাদকে বর্ণনা করেছেন 'পারসি-হিন্দু একেশ্বরবাদ' রূপে।

কৃত্রিমভাবে জোড়া-তালি দিয়ে তৈরি আকবরের এই ধর্মমতের সপক্ষে সমর্থন জুটল প্রধানতঃ সমাজের দরিদ্রতর অংশগুলির মধ্য থেকেই, যদিও আকবরের আশা ছিল যে তাঁর দরবারের নানা মহলকে এই ধর্ম হয়ত আকর্ষণ করতে পারবে। জানা যায়, 'দীন-ই-ইলাহীর' প্রধান ১৮ জন সমর্থকের মধ্যে ছিলেন হিন্দু রাজা বীরবল।* প্রকাশ্যে কোন বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান না ঘটলেও আকবরের এই ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে মুসলিমদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সমানে চলল। এ থেকে বোঝা যায় যে আকবর তাঁর জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার শেখদের নির্বাসিতও করেছিলেন এবং কিছু কিছু মসজিদও তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আকবরের মৃত্যুর পর 'দীন-ই-ইলাহী' আরও অর্ধশতাব্দীর মত টিকে ছিল ছোট একটি সম্প্রদায়ের আচরিত ধর্ম হিসাবে। তবে দীন-ই-ইলাহীর মাধ্যমে আকবর ধর্মীয় সহিষ্ণুতার যে মর্মবাণীটি প্রচার করেছিলেন এবং হিন্দু ও ইসলাম এই দুই প্রধান ধর্মকে পরস্পরবিরোধী না করে বরং পরস্পরের ঘনিষ্ঠ করে তুলবার উপায় সন্ধানের ও দুই ধর্মের একটা সমন্বয় সাধনের জন্য যে প্রয়াস আকবর করেছিলেন ভারতীয় সমাজকে তা প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আকবরের বিশেষ কৃতিত্ব এই, মহাপ্রতাপশালী সম্রাট হলেও তিনি কারও বিবেকের অনুশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর নতুন ধর্মমত জোর করে চাপিয়ে দেন নাই।

আকবরের সভা ঃ আকবরের সময়ে তাঁর সাম্রাজ্যে বিশেষতঃ তাঁর সভায় (দরবারে) সাংস্কৃতিক জীবন ছিল যথেষ্ট উন্নত। বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী আকবর ছিলেন প্রতিভাধর এবং রুচিবান্ শাসক। প্রাচীন যুগের বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ন্যায় আকবর তাঁর সভায় সাম্রাজ্যের জ্ঞানী-গুণীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতে ভালবাসতেন। জানা যায়, প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আকবর এঁদের সঙ্গে নানা দার্শনিক ও তত্ত্বালোচনায় যোগ দিতেন। এইসব জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সুলেখক আবুল ফজল, গোঁড়া মতবাদী ঐতিহাসিক বদায়ুনী, কবি ফৈজী, সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন ও বজবাহাদুর, সুরসিক রাজা বীরবল, জরীপ বিশেষজ্ঞ টোডরমল, এবং সামরিক শৌর্যের অধিকারী রাজা মান সিংহ প্রভৃতি। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র ও স্থাপত্যকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আকবরের আগ্রহ ছিল অপরিসীম।

* বীরবল ছাড়া দীন-ই-ইলাহীর অন্যান্য সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন দুই ভ্রাতা আবুল ফজল ও ফৈজী তাঁদের পিতা শেখ মুবারক এবং মীর্জা জানি ও আজিজ কোকা প্রভৃতি আমীর ওমরাহ্‌গণ।

"ধার্মিক মুসলিমগণ আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী'কে গ্রহণ করেছিলেন একটি নূতন ধর্মমত হিসাবে নয়। তাঁরা এটিকে গ্রহণ করেছিলেন রাষ্ট্রকে সেবা করবার সাধারণ উদ্দেশ্যে। ইসলামের ৭২টি ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং অন্য ধর্মমতাবলম্বী হিন্দুদের একসূত্রে বাঁধার একটি উপায় হিসাবে। আকবরের ধর্মমতের সমর্থকদের মধ্যে বীরবলের মত একজন প্রধান হিন্দু রাজার অন্তর্ভুক্তি থেকেই প্রমাণিত হয় যে তাঁর এই মতবাদ প্রচারের পশ্চাতে কোন গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না।

নিরক্ষর হলেও তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, কথা-সরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদের জন্য তিনি বিভিন্ন পণ্ডিতকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর সভায় নিয়ে আসেন। তাঁর জ্ঞান-পিপাসা এতই প্রবল ছিল যে প্রাচীন ইরাণী ভাষায় একখানি অভিধান রচনায় সাহায্য করবার জন্য তিনি ইরাণ থেকে ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন পণ্ডিতকে তাঁর সভায় আনিয়েছিলেন। আকবর পণ্ডিতগণকে তাঁর গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে শোনাতে বলতেন। তাঁর আদেশে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন দৃশ্যের চিত্রে রূপায়ণ করা হয়েছিল। এরূপ চিত্র অনেক সংখ্যায় প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের জলবায়ুর জন্য এগুলির অধিকাংশই বিনষ্ট হয়েছে।

প্রায় সকল মুঘল সম্রাটই স্থাপত্যকলার উন্নতি সাধনে বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। আকবরও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদ শহর, 'ইবাদৎখানা' নামে ধর্মীয় উপাসনাগৃহ এবং অতি বিশাল 'বুলন্দ্ দরওয়াজা' নামে সু-উচ্চ মসজিদ (১৫০ ফুট উচ্চ) যার স্থাপত্যশৈলী বিশ্বের সকল শিল্প-রসিকদের এখনও মুগ্ধ করে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, দিল্লীতে নির্মিত বিখ্যাত 'দিল্লী গেট' এবং দিল্লীর লাল দুর্গের অভ্যন্তরে নানা প্রাদেশিক রীতিতে নির্মিত বিভিন্ন অট্টালিকা এবং ভবন এখনও আকবরের স্থাপত্যকীর্তির স্মৃতি বহন করছে।

জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭ খ্রীঃ) ঃ ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম 'নূর-উদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ গাজী' নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীর আকবরের ন্যায় গুণসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি বাদশাহী মস্‌নদে আসীন হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। খসরু আকবরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তাই আশা করেছিলেন, পিতামহ আকবর তাঁকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। আশাভঙ্গের জন্যই তিনি বিদ্রোহী হন। কিন্তু জাহাঙ্গীর অতি সহজেই খসরুর বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহী খসরুকে সাহায্য করার অপরাধে শিখগুরু অর্জুন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ফলে মুঘলদের সঙ্গে শিখদের শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে উঠল।

সম্রাট জাহাঙ্গীর

আকবরের ন্যায় রাজ্যজয়ের বলিষ্ঠ নীতি অনুসরণ করবার মত যোগ্যতা না

থাকলেও জাহাঙ্গীর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে উদ্যোগী হলেন। তিনি বঙ্গদেশে সামন্তরাজাদের বিদ্রোহ দমন করে মুঘল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি বাংলার ভৌমিক রাজাদের বশে আনতে সক্ষম হলেন।

মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের (মৃত্যু ১৫৯৭ খ্রীঃ) পুত্র অমর সিংহ পিতার ন্যায় বীরত্বের অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু তিনি মুঘল আধিপত্য মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। জাহাঙ্গীর তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান প্রেরণ করেন। অমর সিংহ অবশেষে মুঘলদের আধিপত্য মেনে নিয়ে এক সম্মানজনক চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন (১৬১৫ খ্রীঃ)। স্থির হল মেবারের রাণাকে ব্যক্তিগতভাবে মুঘল দরবারে উপস্থিত হতে হবে না এবং মেবার রাজ-পরিবারের সঙ্গে মুঘল বাদশাহের কোন বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপিত হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মেবার ব্যতীত রাজপুতনার অন্য কোন রাজ্য মুঘল বাদশাহের নিকট এইরূপ মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয় নাই।

মেবারের বিরুদ্ধে সাফল্যের পর মুঘলবাহিনী অন্যান্য রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। কিন্তু আসাম অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে গুরুতর পরাজয়ে এবং বহু সৈন্যক্ষয়ে। এরপর জাহাঙ্গীর কাঙ্ড়ার দুর্ভেদ্য দুর্গটি অধিকার করে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি এই সাফল্যকে স্মরণীয় করেন এক বিজয়োৎসবের মধ্য দিয়ে। আকবর খান্দেশ জয় করলেও দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর রাজ্যটির একটি অংশ তখনও নিজামশাহীর শাসনাধীন ছিল। ১৬১৬ খ্রীঃ যুবরাজ খুররমের অধিনায়কত্বে আহম্মদনগর সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হল। সন্তুষ্ট হয়ে জাহাঙ্গীর খুররমকে 'শাহ্‌জাহান' ('দুনিয়ার শাসনকর্তা) উপাধিতে ভূষিত করলেন।

দাক্ষিণাত্যের অভিযানে সফল হলেও জাহাঙ্গীর ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে সুবিধা করতে পারেন নাই। পারস্যরাজ শাহ্ আব্বাস মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করে কান্দাহার দুর্গ-শহরটি অধিকার করলেন (১৬২২ খ্রীঃ)।

জাহাঙ্গীরের প্রসঙ্গে নূরজাহানের ('নূর' = আলো ; 'জাহান' = পৃথিবী) সম্বন্ধে কিছু বলা অত্যাবশ্যক। জাহাঙ্গীরের জীবনে নূরজাহান (প্রথম জীবনে নাম মেহেরুন্নিসা) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করেন* এবং তারপর থেকে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু (১৬২৭ খ্রীঃ) পর্যন্ত নূরজাহানই হয়ে উঠেছিলেন সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্ত্রী। বস্তুত জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিবাহের পর থেকে নূরজাহানের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। তাঁর নামে সম্রাট এক নতুন মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তাঁর পিতা ইতিমাদ্-উদ্দৌলা কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাভোগী হয়ে উঠলেন। তাঁর ভ্রাতা আসফ খান উপাধি নিয়ে সম্রাটের একজন প্রভাবশালী আমীর হয়ে উঠলেন। অতঃপর নূরজাহান ইতিমাদ্-উদ্দৌলা,

* আকবরের জীবিতকালে নূরজাহানের প্রথমে বিবাহ হয় বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের সঙ্গে। পরে জাহাঙ্গীরের চক্রান্তে শের আফগান নিহত হলে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে।

আসফ খান ও খুররম* (পরে শাহজাহান) এই কয়জনের একটি গোষ্ঠীই মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করলেন। নামে সম্রাট থাকলেও জাহাঙ্গীর কার্যতঃ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়লেন। তাঁর শেষজীবনে প্রথমে যুবরাজ খুররম, পরে জাহাঙ্গীরের একান্ত বিশ্বাসভাজন মহব্বত খাঁ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। কিন্তু উভয়েই পরাজিত হন ও সম্রাটের ক্ষমা লাভ করেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে চেষ্টা করেও কান্দাহার পুনরায় অধিকার করা সম্ভব হয় নাই। ১৬২৭ খ্রীঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। ইউরোপীয় ভ্রমণকারী টেরি লিখেছেন, "এখন ওই সম্রাটের স্বভাব সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলতে হয়, আমার মতে তাঁর স্বভাব ছিল পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ, কখনও মনে হত তিনি অতি নিষ্ঠুর, আবার কখনও মনে হত তিনি অতিশয় ন্যায়পরায়ণ এবং ভদ্র।" জাহাঙ্গীরের রুচি ছিল উন্নত। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত "তুজুকে-ই-জাহাঙ্গিরী" তাঁর সাহিত্যিক রুচির পরিচয় বহন করছে। ব্যক্তিগত চরিত্রে তিনি ছিলেন আরামপ্রিয় ও বিলাসী। ধর্ম বিষয়ে তিনি ছিলেন পিতার বিপরীত, গোঁড়া ও হিন্দুবিদ্বেষী। জাহাঙ্গীর আকবরের ন্যায়ই শিল্পরসিক ছিলেন। তাঁর সময়ে নূরজাহানের উদ্যোগে তাঁর শ্বশুর (নূরজাহানের পিতা) ইতিমাদ-উদ্দৌলার শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত মসজিদটি (১৬১৬ খ্রীঃ) এখনও শিল্পরসিকদের প্রশংসার উদ্রেক করে। সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি মন্দিরের নির্মাণের কাজ জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাপ্ত হয়েছিল। চিত্রশিল্পে জাহাঙ্গীরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। আকবরের ন্যায় জাহাঙ্গীরও সাধুসন্তদের সঙ্গে নানারূপ দার্শনিক আলোচনায় যোগ দিতেন।

শাহ্‌জাহান (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রীঃ)

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র খুররম 'শাহ্‌জাহান' নাম ধারণ করে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শ্বশুর আসফ খানের সহায়তায় তিনি নূরজাহানের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেন এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের অতি নির্মমভাবে অপসারিত করে নিজেকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

শাহ্‌জাহানের রাজত্বের প্রথম দিকেই তিনি বুন্দেলখণ্ডের রাজা জুঝরসিংহের প্রবল বিদ্রোহ দমন করেন। তার পরে দাক্ষিণাত্যে জাহাঙ্গীরের এক প্রিয়পাত্র, আফগান নেতা খান জাহান লোদী বিদ্রোহী হয়ে আহম্মদনগরের সুলতানের সঙ্গে যোগ দেন কিন্তু তাঁদের মিলিত বাহিনী পর্যুদস্ত হয় এবং খান জাহান লোদী পরে ষড়যন্ত্রে নিহত হন।

এদিকে বঙ্গদেশের হুগলী বন্দরে ইউরোপ থেকে আগত পর্তুগীজ বণিকদিগের

---

* খুররম আসফ খানের কন্যা আর্জুমন্দ বানু বেগমকে (পরে নাম মমতাজ মহল) বিবাহ করেছিলেন। এই মমতাজ মহলের নামানুসারেই শাহ্‌জাহান কর্তৃক পরে তাজমহলের জগদ্বিখ্যাত সৌধটি নির্মিত হয়েছিল।

প্রতিপত্তি দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।* এই সময়ে হুগলী বন্দর কার্যতঃ তাদের অধীন হয়ে গিয়েছিল। হুগলী বন্দরে তারা তামাকের উপর কর ধার্য করল, বলপূর্বক অধিবাসীদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে লাগল এবং সমুদ্রের উপকূলবর্তী গ্রামগুলিতে হানা দিয়ে গ্রামবাসীদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসরূপে বিদেশে চালান দিতে লাগল। এই অবস্থায় বাংলার সুবাদার কাশিম আলি খানের পক্ষে বিপন্ন গ্রামবাসীদের সাহায্য করা জরুরী হয়ে পড়ল। অবশেষে শাহ্‌জাহানের আদেশে দীর্ঘ সময় ধরে হুগলী বন্দর অবরোধ করা হল। পরে এক ঝটিকা-আক্রমণে পর্তুগীজের বাধা চূর্ণ করে মুঘল সৈন্য হুগলী দখল করল। কয়েক হাজার বন্দী ভারতীয়দের তারা পর্তুগীজদের কবল থেকে মুক্ত করল। বন্দী পর্তুগীজদের আগ্রায় চালান দেওয়া হল। বন্দীদের মধ্যে যারা ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী হল তাদের পরে মুক্তি দেওয়া হয়। অবশিষ্ট বন্দীদের হত্যা করা হয়।

শাহ্‌জাহান

দাক্ষিণাত্য জয়

দাক্ষিণাত্য অধিকার করাকে শাহ্‌জাহান তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ হিসাবে গণ্য করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন বুরহানপুরে। আহম্মদনগরের বেশ কয়েকটি দুর্গ মুঘলবাহিনী জয় করে নিল। তখন ভূতপূর্ব উজির মালিক অম্বরের পুত্র ফতে খাঁ আহম্মদ নগরের সুলতানকে হত্যা করে রাজ্যটি অধিকার করলেন এবং মুঘলদিগের পক্ষে যোগ দিলেন। এইভাবে আহম্মদনগর হারাল তার স্বাধীনতা (১৬৩২ খ্রীঃ)।

দাক্ষিণাত্যের গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর ছিল দুটি স্বাধীন মুস্‌লিম রাজ্য। মুসলিম হলেও রাজ্য দুটির সুলতানগণ ছিলেন ইস্‌লামের 'সিয়া' মতাবলম্বী। গোঁড়া 'সুন্নী' মতাবলম্বী মুঘল বাদশাহ শাহ্‌জাহান স্থির করলেন বিরুদ্ধ ধর্মমতবাদী এই

* পর্তুগীজরা বঙ্গদেশে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে হুগলী নদীর মোহনায় সাতগাঁও বন্দরে ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এক বাদশাহী ফারমানবলে। পরে হুগলীর চারিদিকে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে। সাতগাঁও অপেক্ষা বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির দিক দিয়ে হুগলী বন্দর তাদের নিকট অধিক লোভনীয় হয়ে উঠে। জাহাঙ্গীর পর্তুগীজদের তেমন গুরুত্ব দেন নাই। কিন্তু শাহ্‌জাহানের সময় তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা নানারকম বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়।

দুটি রাজ্যকে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আনতে হবে। সুযোগ পেতে অসুবিধা হল না। গোলকুণ্ডার শাহ্ ও তাঁর প্রভাবশালী উজির মীরজুমলার মধ্যে বিরোধ হলে মীরজুমলা মুঘল পক্ষে যোগ দিলেন। গোলকুণ্ডা মুঘলের অধিকৃত হল (১৬৫৬ খ্রীঃ)। শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী গোলকুণ্ডা রাজ্যের একাংশ ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থদণ্ডের বিনিময়ে গোলকুণ্ডা মুঘলের অধীনে সামন্ত রাজ্যের মর্যাদা পেল।

গোলকুণ্ডাকে পদানত করার পর মীরজুমলার সহায়তা নিয়ে মুঘলবাহিনী বিজাপুর আক্রমণ করল। বিজাপুর মুঘলের বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য হল। নতুন সার্বভৌম শাসক মুঘল সম্রাটকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ ও বার্ষিক কর প্রদানের শর্তে তাদের মুঘল সম্রাটের অধীনে সামন্তরাজের মর্যাদা দেওয়া হল।

শাহ্জাহান পর পর কয়েকটি অভিযানের মাধ্যমে শিখদিগের প্রতিরোধ কঠোর হস্তে দমন করলেন। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে মেওয়াটি উপজাতিদিগের বিদ্রোহও তিনি দমন করলেন।

কিন্তু শাহ্জাহানের রাজত্বের শেষভাগে মুঘল বাহিনীর সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ও মধ্য এশিয়ায় মুঘল প্রভুত্ব বিস্তারের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শাহ্জাহানের আমলে একাধিক অভিযান করেও কান্দাহার পুনরধিকারে মুঘলবাহিনী ব্যর্থ হয়।

এদিকে ১৬৫৭ সালে বাদশাহ শাহ্জাহান কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। এই সময়ে তাঁর চার পুত্র দারা শিকোহ (বা শুকোহ), শাহ্সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ সিংহাসন লাভের জন্য গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হন। এই গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেব জয়ী হন। বৃদ্ধ সম্রাট শাহ্জাহান ঔরঙ্গজেবের হস্তে দীর্ঘ আট বৎসর আগ্রা দুর্গে বন্দী অবস্থায় নিদারুণ অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৬৫৮ খ্রীঃ)।

জাহাঙ্গীর ও শাহ্জাহান উভয়েই, বিশেষতঃ শাহ্জাহান, মুঘলদিগের শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতার ঐতিহ্য বজায় রেখে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। আগ্রার কয়েকমাইল পশ্চিমে সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধটির পরিকল্পনা যদিও আকবরের নিজেরই ছিল তবু এটি বাস্তবে সম্পাদিত হয় জাহাঙ্গীরের আমলেই (১৬১৩ খ্রীঃ)।

মুঘল আমলেই অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তির ন্যায় ততটা জাঁকজমক পূর্ণ না হলেও সুদৃশ্য উদ্যানের মধ্যে স্থাপিত কয়েকটি তলে বিভক্ত সুউচ্চ তোরণবিশিষ্ট আকবরের এই সমাধি সৌধটি দর্শকের অন্তরকে অবশ্যই স্পর্শ করবে।

সম্রাট শাহ্জাহান ছিলেন মুঘল বাদশাহ্দিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক জাঁকজমক-প্রিয়। তাঁর সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যের উল্লেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শা-জাহান কবিতায় 'হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা'র কথা বলেছেন। শাহ্জাহানের দরবার পূর্বেকার সকল সম্রাটের ঐশ্বর্য ও জাঁকজমককে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল

শিল্প ও স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান শহরে নির্মাণ করা হয়েছিল শ্বেতমর্মর ও মূল্যবান্ মণি-মাণিক্যে খচিত (আগ্রার তাজমহলসহ) চোখ-ধাঁধান নানা সৌধ ও অট্টালিকাসমূহ। সম্রাটের ব্যক্তিগত উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য-শিল্পের এমন উন্নতি ঘটেছিল যে, আজও তাঁর স্থাপত্য কীর্তি বিশ্বের সকল জাতির শিল্পরসিকদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে রাখে।

শাহ্‌জহানের আমলে মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর পাশাপাশি স্থান পেয়েছিল ভারতীয় শিল্পরীতির ঐতিহ্য। বস্তুতঃ, শাহ্‌জাহানের সময়ে নির্মিত সৌধগুলি ছিল স্থাপত্য-শৈলীতে যেমন সমৃদ্ধ তেমনই জমকালো। তাঁর আমলে আগ্রা ও দিল্লীতে শোভিত হয়েছিল মূল্যবান্ মণিরত্নে খচিত শ্বেত প্রস্তরের ব্যবহার।

সঞ্চিত ঐশ্বর্যের একটি বৃহদংশ শাহ্‌জাহান ব্যয় করেছিলেন দিল্লী ও আগ্রাকে তাঁর উন্নত রুচি অনুযায়ী মনের মত করে সজ্জিত করতে। শাহ্‌জাহানের আমলে নির্মিত সৌধগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল আগ্রার তাজমহল, মোতি মস্‌জিদ, দিল্লীর জাম-ই-মসজিদ, লাল কিল্লার অভ্যন্তরাস্থিত দেওয়ান-ই-আম (সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য দরবার কক্ষ) ও দেওয়ান-ই-খাস্ (উচ্চপদস্থ সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারী, মন্ত্রী, সম্রাটের বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের জন্য)। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে নির্মিত 'খাস-মহল', 'শিস্-মহল' প্রভৃতিও শাহ্‌জাহানের স্থাপত্য-কীর্তির অন্যতম নিদর্শন। সম্রাটের ময়ূর সিংহাসনটি ছিল শাহ্‌জাহানের আর একটি শিল্পকীর্তি। দিল্লীতে শাহ্‌জাহানাবাদ নামে যে প্রাসাদ-শহর তিনি নির্মাণ করেছিলেন তার কতকগুলি সৌধের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। দিল্লীর 'লাল কেল্লা' এই শহরের মধ্যেই অবস্থিত। বিশ্ব-বিখ্যাত 'কোহিনূর মণি' সম্রাট তাঁর মুকুটে ধারণ করতেন। জাঁকজমক ও আড়ম্বরের জন্য শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল বিখ্যাত হলেও তাঁর সময় থেকেই মুঘল শাসনের দুর্বলতা প্রকট হতে থাকে। সাম্রাজ্যের পতনের বীজ এই সময় থেকেই অঙ্কুরিত হতে থাকে। কান্দাহার পুনরুদ্ধারে ব্যর্থতা থেকেই মুঘল সামরিক শক্তির দুর্বলতা প্রমাণিত হয়।

ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ)

১৬৫৭ সালের শেষদিকে (সেপ্টেম্বর) সম্রাট শাহ্‌জাহান কঠিন রোগক্রান্ত হন। এমন কি সংবাদ রটে যায় সম্রাট জীবিত নাই এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারা ক্ষমতা দখল করেছেন। ইতিমধ্যে শাহ্‌জাহানের অপর তিন পুত্র স্ব স্ব স্থান থেকে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হলেন সিংহাসন অধিকার করবার জন্য। শুরু হল "উত্তরাধিকারের যুদ্ধ"। শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে সিংহাসন অধিকার করবার জন্য প্রস্তুত হলেন তাঁর চার পুত্র দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ।

উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ঃ বাদশাহ্ শাহ্‌জাহান অনেকটা সুস্থ হলেও ঘটনা দ্রুত-

গতিতে এগিয়ে চললো। মুরাদ গুজরাটে নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ্ বলে ঘোষণা করলেন। বঙ্গদেশে সুজাও নিজেকে বাদশাহরূপে ঘোষণা করলেন। ঔরঙ্গজেব যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ সেনাপতি মীরজুমলার গোলন্দাজ বাহিনীসহ আগ্রা অভিমুখে রওনা হলেন (মার্চ ১৬৫৮ খ্রীঃ)। উজ্জয়িনীর নিকটে মুরাদ তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। ঔরঙ্গজেব ইতিপূর্বেই মুরাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন। যুদ্ধে সাফল্য লাভ করলে মুরাদ পাঞ্জাব ও আফগানিস্থান সহ কয়েকটি প্রদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করবার অধিকার পাবেন।

প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হল বারাণসীর নিকটে বাহাদুরপুর নামক স্থানে (ফেব্রুয়ারী ১৪, ১৬৫৮ খ্রীঃ)। এখানে দারার পুত্র সুলেমান শিকোহ্ ও অম্বরের রাজা জয়সিংহের নিকট সুজা পরাজিত হলেন। যোধপুরের যশোবন্ত সিংহ ও কাশিমখানের অধীনে সেনাবাহিনী প্রেরিত হল ঔরঙ্গজেব ও মুরাদকে বাধা দিতে। উজ্জয়িনীর নিকট ধর্মাটের যুদ্ধে (এপ্রিল ১৫, ১৬৫৮ খ্রীঃ) কাশিমখান ও যশোবন্ত সিংহের অধীনে দারার অনুগত মুঘল বাহিনী ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের নিকট শোচনীয় ভাবে পরাজিত হল। দুপক্ষের মধ্যে পরবর্তী এবং চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হল আগ্রার নিকট সামুগড় নামক স্থানে (২৯ মে, ১৬৫৮ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধের দ্বারাই নির্ধারিত হল উত্তরাধিকারের ভাগ্য।

সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পাঞ্জাবে পালিয়ে যান দারা, ঔরঙ্গজেব আগ্রায় প্রবেশ করলেন (জুন, ১৬৫৮)। শুরু হল বৃদ্ধ সম্রাট শাহ্জাহানের বন্দীজীবন। সেই সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের আদেশে বন্দী হলেন মুরাদ। কয়েক বৎসর গোয়ালিয়রে বন্দী থাকার পর তাঁর শিরশ্ছেদ করা হল (ডিসেম্বর, ১৬৬১ খ্রীঃ)। অতঃপর ঔরঙ্গজেব দারার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। হতভাগ্য দারা পলায়ন করলেন। ইতিমধ্যে সুজা এলাহাবাদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে খাজোয়ার যুদ্ধে (জানুয়ারী ৫, ১৬৫৯ খ্রীঃ) পরাজিত হন। ঔরঙ্গজেবের আশ্বাসে প্রলুব্ধ হয়ে যশোবন্ত সিংহ ও অম্বরের রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি প্রধান রাজপুত নায়কগণ দারাকে পরিত্যাগ করে ঔরঙ্গজেবের পক্ষে যোগ দিলেন। নিরুপায় হয়ে দারা দেওরাইয়ের গিরিবর্ত্মে ঔরজেবের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। ঔরঙ্গজেব যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। তাঁর আদেশে দারার শিরশ্ছেদ করা হল (আগস্ট ৩০, ১৬৫৯ খ্রীঃ)। বাহাদুরপুর ও খাজোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সুজা বঙ্গদেশে আশ্রয় নেন কিন্তু সেখানেও ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। নিরুপায় সুজা আরাকানে পলায়ন করেন। সেখানে মগ দস্যুদিগের হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন (১৬৬১ খ্রীঃ)। দারার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শ্রীনগরে পলায়ন করেন, কিন্তু ধৃত হন, পরে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয় (১৬৬২ খ্রীঃ)। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগ্রা দুর্গে বাকী আট বৎসর বন্দী জীবন কাটিয়ে বৃদ্ধ শাহ্জাহান (৭৪ বৎসর বয়সে) ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ঔরঙ্গজেব—আলমগীর

"আবুল-মুজাফফর মুহী-উদ্দীন মুহম্মদ ঔরঙ্গজীব বাহাদুর আলমগীর পদশাহ্ গাজী" উপাধি নিয়ে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করলেন (জুলাই ২১, ১৬৫৮ খ্রীঃ) ঔরঙ্গজেবের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্পর্কে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। একদিকে এই ঘটে সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিস্তৃতি। অন্যদিকে এই সময়েই প্রকাশ পেতে থাকে এমন কতকগুলি অবস্থার, যার ফলে এই বিশাল সাম্রাজের পতন ঘটে।

সাম্রাজ্যের বিস্তার—কোচবিহার ও আসাম জয়

উত্তর-পূর্ব প্রান্তে মুঘল সাম্রাজ্য আরও সম্প্রসারিত হয়। এই সময় কোচবিহার এবং আসামের রাজা কিছু মুঘল অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিলেন। তাঁকে এবং আরাকানের মগদস্যুদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে ঔরঙ্গজেব সেনাপতি মীরজুমলাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠালেন। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দেই গোয়ালপাড়া এবং পশ্চিম আসামের কামরূপ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল এবং গোহাটিতে একজন মুঘল ফৌজদারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু কোচবিহারের রাজা ও অহোমগণ মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা মান্য করলেন না। ঢাকা থেকে সসৈন্যে বহির্গত হয়ে মীরজুমলা কোচবিহার অধিকার করে আসামে প্রবেশ করলেন (১৬৬২ খ্রীঃ)। অহোমদিগের রাজধানী গহরগাঁও অধিকৃত হল, বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুণ্ঠিত হল। অহোমরাজ জয়ধ্বজ পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। মুঘল নৌবাহিনী অহোম নৌশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করল কিন্তু বর্ষাকালে যাতায়াতের অসুবিধা, মুঘল তাঁবুতে খাদ্যাভাব প্রভৃতির দরুন অহোমরা কয়েকটি মুঘল ঘাঁটি পুনরাধিকারে সমর্থ হল। কিন্তু বর্ষার অন্তে আবার অভিযান শুরু করলেন মীরজুমলা। অহোমরাজ কয়েকটি জেলা ও কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হলে উভয়পক্ষে অহোম সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রত্যাবর্তনকালে মীরজুমলার মৃত্যু হলে অহোমরা গোহাটিসহ হৃত অঞ্চলগুলি পুনর্দখল করে নেয়। তবে কোচবিহারের রাজা রংপুর জেলা ও পশ্চিম কামরূপ মুঘলদিগের অধিকারে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মীরজুমলার পরবর্তী মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁ আরাকানের রাজাকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন (১৬৬৬ খ্রীঃ)। চট্টগ্রামে একজন ফৌজদার নিযুক্ত হল। বঙ্গোপসাগরের সন্দ্বীপ দ্বীপটিও এইসময় শায়েস্তা খাঁ অধিকার করলেন।

ঔরঙ্গজেব

উত্তর পশ্চিম নীতি—উপজাতি দমন

এরপর উত্তর পশ্চিম প্রান্তে দৃষ্টি দিলেন বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেব। আফগানিস্থানের পাঠান উপজাতিগুলি বরাবরই মুঘল আধিপত্য স্বীকারে অনিচ্ছুক ছিল। তাঁরা ভারত থেকে মধ্য এশিয়ায় বাণিজ্যের আদানপ্রদানের পথের উপর কর্তৃত্ব দাবি করল। এই অঞ্চলে অশান্তি ও উপদ্রব বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মুঘল প্রশাসন আফ্রিদি, ইউসুফজাই ও খট্টক প্রভৃতি দুর্ধর্ষ উপজাতিগুলির বাণিজ্য-কর আদায়ের অধিকার স্বীকার করে নিল। ১৬৬৭ সালে ইউসুফজাইগণ বিদ্রোহ করলে মুঘল সেনাপতি আমিন খান তা দমন করলেন। কয়েক বৎসর পরে আফ্রিদিগণ পুনরায় বিদ্রোহ করে বহু মুঘল সৈন্যকে হত্যা করল এবং অনেক মুঘল সৈন্যকে তারা বন্দীও করেছিল। এরপরে মুঘল সেনাপতি সুজায়েৎ খানকে আফ্রিদিদের দমনের নির্দেশ দিলেন বাদশাহ্। যশোবন্ত সিংহ তাঁকে সাহায্য করবার জন্য প্রেরিত হলেন। কিন্তু দুর্গম গিরিবর্ত্মে সুজায়েৎ খান পাঠানদিগের হস্তে নিহত হলেন।

এই অবস্থায় ঔরঙ্গজেব স্বয়ং এই সীমান্ত প্রদেশে প্রায় এক বৎসরকাল সসৈন্যে অবস্থান করে বলপ্রয়োগে ও কুটকৌশলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধনে সক্ষম হন। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সুযোগ্য আমীর খানকে সুবাদার পদে নিযুক্ত করে সম্রাট দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। আমীর খান 'চাণক্য নীতির' সাহায্যে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টির দ্বারা মুঘল আধিপত্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হলেন। তিনি কিছু সাফল্য অর্জন করলেন কিন্তু খট্টক নেতা খুশান খান পাঠানদিগের স্বাধীনতা বিসর্জন দিলেন না। কিন্তু পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে খুশল খান মুঘলদের হাতে বন্দী হন। পরে তাঁকে গোয়ালিয়রে প্রেরণ করা হল। আফগানদের বিদ্রোহ সাময়িকভাবে দমন করা সম্ভব হল। আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে মুঘলদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। যদিও আফগান উপজাতিদের ঔরঙ্গজেব শেষ পর্যন্ত দমন করতে সক্ষম হন, তবু আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে মুঘলদের সৈন্যক্ষয় ও অর্থব্যয় দুইই হয়েছিল। তাছাড়া দীর্ঘসময় ধরে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সম্রাটের ব্যস্ত থাকার ফলে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা নায়ক শিবাজীর উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। মধ্য এশীয় দুর্ধর্ষ মুঘল সৈন্যগণ আফগানিস্থান ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সামরিক সংঘর্ষে ব্যাপৃত থাকায় প্রথমে শিবাজী ও তাঁর মারাঠা সৈন্যের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে অগ্রসর হতে পারেন নাই। বারবার আফগান বিদ্রোহের ফলে শিবাজী ও রাজপুত, শিখ প্রভৃতি হিন্দু শক্তিগুলির পক্ষে মুঘলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করা সহজ হয়।

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি

ঔরঙ্গজেবের 'দাক্ষিণাত্য নীতি' প্রভাবিত হয়েছিল দুটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দ্বারা। প্রথমতঃ তাঁর পরবর্তী সম্রাটদের ন্যায় তিনিও চেয়েছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যকে দাক্ষিণাত্যে সম্প্রসারিত করতে। আকবর ও জাহাঙ্গীরের অভিযানের ফলে যথাক্রমে খান্দেশ

(বেরার সহ) ও আহম্মদনগর রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। অবশিষ্ট ছিল দাক্ষিণাত্যের সিয়া-মতাবলম্বী সুলতান-শাসিত রাজ্য—বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—এই দুটি সমৃদ্ধ রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে মুঘল সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। ঔরঙ্গজেবের ন্যায় প্রতাপান্বিত মুঘল সম্রাটের সাম্রাজ্যবাদী নীতির সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণই ছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য-সম্প্রসারণের নীতি অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা পেল বিজাপুরের অধীন এক ক্ষুদ্র জায়গীরদার শাহজী ভোঁসলার পুত্র শিবাজীর (১৬২৭ মতান্তরে ১৬৩০-১৬৮০ খ্রীঃ) অভ্যুদয়ের ফলে।

শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের অভ্যুদয়ঃ শৈশবে পিতার সান্নিধ্য-বঞ্চিত মাতা জিজিবাই ও দূরদর্শী অভিভাবক দাদাজীর দ্বারা প্রতিপালিত এই দুঃসাহসী তরুণ শিবাজীর লক্ষ্য ছিল দাক্ষিণাত্যে মুঘল অগ্রগতি রোধ করা এবং পরে স্বাধীন এক মারাঠা, তথা হিন্দুরাজ স্থাপন করা। এই সঙ্কল্প পূরণের লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই শিবাজী তাঁর বাল্যের সহচর পাহাড়িয়া মাওয়ালী কৃষকদের নিয়ে গড়ে তুললেন এক সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনাদল। স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে 'গেরিলা যুদ্ধে' শত্রুকে বিপর্যস্ত করে শত্রুর এলাকায় লুণ্ঠন চালিয়ে মারাঠাদিগের সম্পদ ও শক্তিবৃদ্ধিতে মনোযোগ দিলেন শিবাজী। এই নীতি রূপায়ণে তাঁর প্রথম সাফল্য এল বিজাপুর সুলতানের অধীন তোর্না দুর্গ জয়ে (১৬৪৬ খ্রীঃ), যখন শিবাজীর বয়স ছিল মাত্র ১৬ বৎসর (মতান্তরে ১৯ বৎসর)। এখান থেকেই শুরু হল শিবাজীর দুঃসাহসিক জীবনের জয়যাত্রা। তিনি একের পর এক দুর্গ জয় করে বা নির্মাণ করে মহারাষ্ট্রের এক বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন। দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসক ঔরঙ্গজেব বিজাপুরের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানকালে শিবাজীকে স্বপক্ষে আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু শিবাজী সে ফাঁদে পা দিলেন না। তিনি নিজ পরিকল্পনা মতই এগিয়ে চললেন এবং পরবর্তী দু বৎসরে উত্তর কোঙ্কন জয় করলেন। বিজাপুর সুলতান এইবার তাঁকে দমন করতে অগ্রসর হলেন।

শিবাজী

বিজাপুরের সঙ্গে সংঘর্ষঃ বিজাপুরের সুলতানের নির্দেশে সেনাপতি আফজল খাঁ শিবাজীকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে বা হত্যা করতে পারলেন না। সন্ধির ছলে শিবাজীকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই নিহত হলেন (১৬৫৯ খ্রীঃ)। এরপর শিবাজী বিজাপুর বাহিনীর তাঁবু লুণ্ঠন করলেন। দক্ষিণ কোঙ্কন মারাঠাদের দ্বারা অধিকৃত হল।

মুঘলদের সঙ্গে সংঘর্ষ ঃ ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে দাক্ষিণাত্যের মুঘল প্রতিনিধি শায়েস্তা খাঁ (তাঁর মাতুল) শিবাজীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অগ্রসর হলেন। পুণা ও চাকণ দুর্গসহ উত্তর কোঙ্কন মুঘলের অধিকৃত হল। শিবাজীর অতর্কিত আক্রমণে শায়েস্তা খাঁ আহত হলেন। কোনরকমে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করলেন (১৬৬৩ খ্রীঃ)। মুঘলের বিরুদ্ধে এই সাফল্যের ফলে শিবাজীর মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। সুরাট লুণ্ঠন করে তিনি প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করলেন। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সম্রাট এবার শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন অম্বরের রাজা জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে। একজন রাজপুত সেনাপতিকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠাবার পিছনে ঔরঙ্গজেবের কূটনৈতিক বুদ্ধি কাজ করেছিল। জয়সিংহ শিবাজীর পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করলেন। শিবাজী বাধ্য হয়ে জয়সিংহের সঙ্গে পুরন্দরের সন্ধি সম্পাদন করলেন (১৬৬৫ খ্রীঃ)। জয়সিংহ বাদশাহের প্রতিনিধি হিসাবে শিবাজীকে মুঘল রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানালেন।

শিবাজী বুঝেছিলেন যে একই সঙ্গে বিজাপুর ও মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে নবপ্রতিষ্ঠিত মারাঠা রাজ্যের বিপদ বৃদ্ধি পাবে, তাই মুঘলের সঙ্গে সন্ধি করে ধীরে ধীরে মারাঠাদের শক্তিশালী ও সংহত করতে পারলে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের পথ সহজ হবে। তাই পুরন্দরের সন্দি অনুসারে তিনি মুঘলকে ২৩টি দুর্গের অধিকার ও ১৬ লক্ষ টাকা প্রদানে এবং মুঘলের আনুগত্য স্বীকার করতে রাজী হলেন। জয়সিংহের আমন্ত্রণে পুত্র শম্ভুজী সহ মুঘল রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে বাদশাহের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করতেও সম্মত হলেন। জয়সিংহের আশঙ্কা ছিল শিবাজী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুঘলকে অসুবিধায় ফেলতে পারেন। এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব যাতে না ঘটে সেই উদ্দেশ্যই তিনি শিবাজীকে আগ্রায় মুঘল রাজধানীতে পাঠাতে ব্যাকুল হয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহের দরবারে শিবাজী তাঁর প্রতি আচরণে অপমানিত বোধ করলেন। তিনি কৌশলে পুত্র শম্ভুজী সহ আগ্রা দুর্গ থেকে পলায়ন করে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পূর্ব-ভারতের দুর্গম অরণ্য পথে যাত্রা করে শেষ পর্যন্ত নিজ রাজধানীতে পৌঁছুলেন। পরবর্তী তিন বৎসর (১৬৬৫-৬৮ খ্রীঃ) শিবাজী অপেক্ষাকৃত নীরবতায় কাটালেন এবং ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলদের সঙ্গে পুনরায় সন্ধি করলেন। ঔরঙ্গজেব শিবাজীর রাজা উপাধি স্বীকার করে নিলেন। মুঘলসৈন্য পাঠান বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় এই সময় শিবাজীর সঙ্গে আর কোন সংঘর্ষ ঘটল না। এই সুযোগে শিবাজী তাঁর শাসন সংগঠনে মন দিলেন।

১৬৭০ সালে শিবাজী আবার মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন। এবং তাঁর অনেকগুলি দুর্গ পুনরুদ্ধার করলেন। দ্বিতীয় বার সুরাট লুণ্ঠন করলেন। বেরার প্রদেশে অভিযান করে নিজ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করলেন।

ছত্রপতি শিবাজী ঃ ১৬৭৪ সালে ৬ই জুন রায়গড়ে মহাসমারোহে শিবাজীর

রাজ্যাভিষেক হয়। তিনি 'ছত্রপতি', 'গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। মুঘলদের প্রতিনিধি শিবাজীর সঙ্গে সন্ধি করলেন। গোলকুণ্ডার সুলতানও বার্ষিক ৪½ লক্ষ 'হান' (১ হান = ৪ টাকা) করপ্রদানের শর্তে শিবাজীর সঙ্গে সন্ধি করলেন। প্রয়োজনে ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেও রাজী হলেন।

অতঃপর শিবাজী পূর্ব উপকূলস্থিত জিঞ্জি ও ভেলোর জয় করলেন। একশত দুর্গসহ কর্ণাটকের এক বিরাট এলাকাও তাঁর অধীনে এল। তাঞ্জোরের কতকাংশও তিনি জয় করলেন। মহীশূর রাজ্যের উত্তর-পূর্ব এবং মধ্য অংশও শিবাজী তাঁর রাজ্যভুক্ত করলেন। অবশেষে ৩রা এপ্রিল, ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হল। মৃত্যুকালে মহারাষ্ট্র ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শিবাজীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শিবাজীর অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা ঃ শিবাজী 'অষ্ট প্রধান' মন্ত্রিসভার সাহায্যে দেশ শাসন করতেন। পেশোয়া বা মুখ্য প্রধান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী।*

রাজা ছিলেন শীর্ষে, সকল বিভাগের অধিকর্তা। শিবাজীর রাজ্য বিভক্ত ছিল কয়েকটি প্রান্ত বা প্রদেশে। প্রতিটি প্রদেশ বিভক্ত ছিল কতকগুলি পরগনায় ও তরফে (জেলায়)। প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল গ্রাম। রাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন শস্যের দশ ভাগের চারভাগ। এ ছাড়া 'চৌথ' (রাজস্বের এক চতুর্থাংশ) এবং 'সরদেশমুখী' (রাজস্বের একদশমাংশ) নামক দুটি সামরিক করও আদায় করা হত বিজিত অঞ্চল থেকে।

শিবাজীর সামরিক শাসন-ব্যবস্থা ঃ শিবাজীর 'মাওয়ালি' সৈনিকগণ ভারতের সামরিক ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। শিবাজীর সেনাবাহিনীতে ছিল হাল্কা অস্ত্রধারী পদাতিক এবং অনুরূপ হাল্কা অস্ত্রধারী অথচ দ্রুতগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী সৈন্য। অশ্বারোহী সৈন্যগণ 'বারগির' (বর্গী) ও 'শিলাদার'—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। 'বারগির' সৈন্যদের অশ্ব সরবরাহ করা হত রাষ্ট্র থেকে আর শিলাদারগণ তাঁদের অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র নিজেরাই নিয়ে আসতেন। তাঁর জন্য সরকারের অর্থসাহায্য পেতেন। সামরিক শিবিরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। লুণ্ঠিত যাবতীয় সম্পত্তি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হত। শিবাজী সৈনিকদের বেতন দিতেন নগদ অর্থে অথবা জায়গীরে। সৈন্য বিভাগে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করা হত। পদাতিক বাহিনীর সর্বোচ্চ ছিলেন সেনাপতি, তাঁর পর জুমলাদার, তাঁর পর হাবিলদার এবং সর্বনিম্নে 'নায়ক'। শিবাজীর কতকগুলি সুরক্ষিত দুর্গও ছিল। এই সকল পার্বত্য দুর্গ শত্রুর পক্ষে ছিল দুর্ভেদ্য। শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁর রাজ্যের দুর্গ-সংখ্যা ছিল প্রায় দুইশত চল্লিশটি।

---

* শিবাজীর অষ্টপ্রধান মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রিগণ ছিলেন—মজুমদার বা অমাত্য, ওয়াকিয়ানবিশ বা মন্ত্রী, দবীর বা সামন্ত, সুর্নিশ্ বা সচিব, সেনাপতি, পণ্ডিতরাও বা ন্যায়াধীশ। বিভিন্ন মন্ত্রিগণ অর্থ, দলিলরক্ষণ, বিচার, সেনা প্রভৃতি বিভিন্ন দপ্তরগুলির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। পণ্ডিতরাও এবং ন্যায়াধীশ ব্যতীত অন্যসকল মন্ত্রীই সামরিক কর্তব্য পালন করতেন।]

শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্বঃ শিবাজীর অভ্যুত্থান ও সাহসিকতাপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামরিক কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে ভারত-ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর সেনা সংগঠন, দুর্গস্থাপন এবং নিজ বুদ্ধি, সাহস ও শক্তিবলে প্রবল-প্রতাপ মুঘল বাদশাহের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত একটি বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিকারী হওয়া কম কৃতিত্বের নয়। নববিজিত রাজ্যে সুশৃঙ্খল সামরিক ও অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তুলে শিবাজী তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভারও স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শিবাজীর মৃত্যুর পরেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য নানা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে টিকে ছিল আরও অন্ততঃ দেড় শত বৎসর। ঐতিহাসিকদিগের দৃষ্টিতে শিবাজীর অবিস্মরণীয় কীর্তি হল মারাঠাদের একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে গড়ে তোলা।

তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর গভীর ধর্মবোধ বিস্ময়ের বস্তু। মারাঠা সাধকদের আধ্যাত্মিক সাধনাকে তিনি নিজের জীবনে ও মারাঠাদের জাতীয় জীবনে সার্থক করে তুলেছিলেন। তাঁর পরম নিন্দুক ঐতিহাসিক কাফি খাঁ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে শিবাজী মসজিদ স্থাপনের জন্য মুসলমানদের নিষ্কর ভূমি দান করেছেন, লুণ্ঠনের সময়েও মসজিদ, কবরাদি, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের অসম্মান করেননি। মুসলমান নারীদের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান তিনি এবং তাঁর সহযোগী সেনানায়কেরা সর্বদাই প্রদর্শন করেছেন।

দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ—সুদূরপ্রসারী ফল

ওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের একটা সুদীর্ঘ সময় কেটেছিল দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে। তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে (১৬৫৮-১৬৮১ খ্রীঃ) শিবাজীর জীবিতকাল পর্যন্ত তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু মাত্র একবার ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়সিংহের অধীনে মুঘলবাহিনী উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছিল এবং পুরন্দরের সন্ধির শর্তানুযায়ী মারাঠা নায়ক শিবাজী মুঘল বাদশাহের আধিপত্য স্বীকারে বাধ্য হন। এই একটি সাফল্য ছাড়া ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের প্রথম তেইশ বৎসরের মধ্যে উত্তর ভারতের রাজপুত রাজ্যগুলি এবং দক্ষিণ ভারতের মারাঠা, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার স্বাধীন মুসলিম রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে কোন বড় রকম সাফল্য লাভ করতে পারেন নাই। অবশ্য এর একটা কারণ ছিল, আফগানিস্থানের উপজাতিদের বিদ্রোহ দমনে সম্রাটের ব্যস্ত থাকায়। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের পর শিবাজীর সঙ্গে বিজাপুরের সুলতানের এবং পরে গোলকুণ্ডার সুলতানের সঙ্গেও শিবাজীর সমঝোতা হয়েছিল। কিন্তু শিবাজীর মৃত্যুর (১৬৮০ খ্রীঃ) পর ঘটনার গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। বাদশাহের বিদ্রোহী পুত্র আকবর শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর আশ্রয় লাভ করে-ছিলেন। এই সংবাদে বিচলিত হয়ে ঔরঙ্গজেব স্বয়ং শম্ভুজী ও আকবরকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। ঔরঙ্গাবাদে সদর দপ্তর স্থাপন করে তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে লাগলেন (১৬৮২ খ্রীঃ)। তাঁর সঙ্গে অবশ্য যোগ

দিয়েছিলেন তাঁর তিন পুত্র এবং শ্রেষ্ঠ সেনাপতিরা। ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের একটা বিপুল পরিমাণ সম্পদ এই যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের শক্তির একটা বৃহদংশ নিয়োগ করলেন। ঔরঙ্গজেবের এই সামরিক অভিযান দাক্ষিণাত্যের সব কয়টি শক্তির পক্ষেই যে চরম বিপদের সঙ্কেত তা বুঝবার মত রাজনৈতিক বিচক্ষণতা শম্ভুজীর ছিল না।

প্রথমে বিজাপুর (১৬৮৬ খ্রীঃ), পরে গোলকুণ্ডা (১৬৮৭ খ্রীঃ) মুঘলদিগের দ্বারা অধিকৃত হন। মুঘলের দৌলতবাদের কারাগারে বন্দীদশায় কাটালেন বিজাপুরের আদিলশাহী এবং গোলকুণ্ডার কুতুবশাহীর সুলতানদ্বয়। এর পরই শম্ভুজী ও তাঁর শিশুপুত্র ঔরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী হলেন (১৬৮৯ খ্রীঃ)। ঐতিহাসিকেরা অনেকেই বাদশাহকে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সিয়া-মতাবলম্বী মুসলিম রাজ্য দুটির স্বাধীনতা হরণের জন্য রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব বলে দোষারোপ করেছেন। তাঁদের মতে এই মুসলিম রাজ্য দুটির স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হলে পরবর্তী মারাঠা অভিযানে বাদশাহ সাফল্য লাভ করতে পারতেন।

ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে ব্যস্ত থাকায় মধ্য এশিয়ায় মুঘল শক্তির অধিকার রক্ষায় যথোপযুক্ত শক্তি নিয়োজিত করতে পারেন নাই। জাতীয়তাবাদী মারাঠাদের শক্তি-সামর্থ্যকেও তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন নাই। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের ফলে মুঘলদের সামাজিক গৌরব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেলেও ঔরঙ্গজেবের জীবনের শেষ ১৮ বৎসরের ঘটনাবলীর মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ স্পষ্টতঃই লক্ষিত হয়। ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাবে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য তাঁকে রাজপুতনার মানসিংহের মত মুঘলের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ করতে ব্যর্থ হন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ না করে সামান্য উদারতার মাধ্যমে তাঁদেরকে মিত্ররূপে গ্রহণ করতে পারতেন তিনি। সবদিক দিয়ে পরবর্তী ঘটনাবলীর বিচার করলে সম্রাটের দাক্ষিণাত্য নীতি কোন রকমেই প্রশংসার দাবী করতে পারে না।

মুঘল-সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিস্তার : ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল। উত্তর-পশ্চিমে গজনী থেকে দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত ২১টি সুবায় বিভক্ত ছিল এই বিশাল সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যের রাজস্ব খাতে বার্ষিক জমা হতো সমকালীন মুদ্রায় প্রায় তেত্রিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা। সম্পদ, ঐশ্বর্য সবদিক দিয়ে বাদশাহ ক্ষমতার উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। একজন ঐতিহাসিকের মতে ১৬৮৯ সালে বাদশাহ সব কিছুটা পেয়েছিলেন, আবার সব কিছু হারাবার পথও এ সময়েই প্রস্তুত হয়েছিল।

মারাঠাদের সাথে বাদশাহ এ সময়ে সুদীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। দক্ষিণের মুসলমান সুলতানদের শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হওয়ায় নবজাগ্রত মারাঠা হিন্দু শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে দক্ষিণ ভারতে বাদশাহের আর কোন বন্ধু রাজ্য ছিল না। শিবাজীর

পুত্র শম্ভুজী মুঘল বাদশাহের হাতে পূর্বেই নিহত হয়েছিলেন। তাঁর কিশোর পুত্র তখনও বাদশাহী কারাগারে বন্দী। এই সংকটকালে শম্ভুজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারাম রায়গড় দুর্গ থেকে পালিয়ে কর্ণাটকে আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকেই বাদশাহের বিরুদ্ধে মারাঠাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসাহিত করতে থাকেন। পর্বতসংকুল মারাঠা প্রদেশে

মারাঠীদের অতর্কিত আক্রমণে বিশাল মুঘলবাহিনী প্রায়ই বিপর্যস্ত হতে লাগলো। শান্তাজী ছোড়পাড়ে, ধনাজী যাদব প্রভৃতি মারাঠা সেনাপতির অতর্কিত আক্রমণে মুঘল বাহিনী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মারাঠা নায়কগণ পূর্বের মতই মুঘলদের নিকট হইতে 'চৌথ' আদায়ও বন্ধ করলেন না। এ সময়ে মুঘলবাহিনী রাজারামের প্রধান ঘাঁটি জিঞ্জি আক্রমণ করলে রাজারাম সেখান থেকে পলায়ন করে সাতারায় আশ্রয় নিলেন।

মুঘল আক্রমণে সাতারার পতন হল (১৭০০ খ্রীঃ)। রাজারাম মুঘলদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রথমা স্ত্রী তারাবাঈ তাঁর শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে মারাঠাদের রাজা বলে ঘোষণা করে, নিজেই মারাঠাদের নেতৃত্ব দান করে মুঘলদের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে লাগলেন। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ মারাঠাবাহিনী মালব, গুজরাট, বরোদা এমনকি আহম্মদনগরে ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ শিবিরও আক্রমণ করল। অসমাপ্ত মারাঠা যুদ্ধের মধ্যে চারদিকে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলায় বিব্রত হয়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী আহম্মদ নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

ঔরঙ্গজেবের অসামরিক ও সামরিক শাসন ব্যবস্থা ঃ ঔরঙ্গজেব ছিলেন একজন সৎ এবং খাঁটি মুসলিম কিন্তু তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নীবাদী, ধর্মান্ধ ও সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। তিনি শাসন নীতি পরিচালনা করতেন শরিয়তের বিধিনির্দিষ্ট ইসলামের আইন অনুযায়ী। রাজার কর্তব্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল উচ্চ এবং রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার কাজে তিনি নিজের যাবতীয় শক্তিসামর্থ্য ব্যয় করতেন। শাসন ব্যবস্থার যাবতীয় খুঁটিনাটি ঔরঙ্গজেব নিজে দেখাশুনা করতেন। যাবতীয় সরকারী চিঠিপত্র পাঠ করে তিনি নিজেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। বাদশাহের দরবারে শিষ্টাচারের কোন ব্যতিক্রম তিনি সহ্য করতেন না। নিয়ম বা আইন-ভঙ্গকারী যেই হোক না কেন, তাকে তিনি কঠোর শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। নিজে কঠোর পরিশ্রমী হয়ে সম্রাট অপর সকলের নিকটেও অনুরূপ কর্তব্যপালন আশা করতেন। আকবরের সময়ে প্রচলিত রীতিতে শাসনকার্য পরিচালিত হ'ত কিন্তু পরবর্তী সময়ে কর্মচারী নিয়োগে যোগ্যতা ও উৎকর্ষ সব সময় প্রধান স্থান পেত না। ব্যক্তির ধর্মীয় মতবাদকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হত! প্রজাদিগের ব্যক্তিগত জীবনেও রাষ্ট্রের প্রভাব ছিল অসীম। ধর্মত্যাগীদের উৎসাহদানের নিমিত্তে সরকারী চাকরিতে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হত। মুঘল সামন্তবর্গের ক্ষেত্রে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের নিয়ম কঠোরভাবে প্রযুক্ত করা হত এবং এর কোন ব্যতিক্রম হলে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হত। উত্তরাধিকারী বিহীন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় বিত্ত-সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

বিচারকার্য সম্পন্ন হত ইসলামী আইন অনুযায়ী। কাজী বা বিচারক তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী কোরাণের নির্দেশ অনুসরণ করতেন। মানুচী এবং বার্নিয়ে উভয়েই বলেছেন যে আবেদনকারীকে নিজে উপস্থিত হয়ে সম্রাটের সম্মুখে তার অভিযোগ পেশ করতে হত এবং সম্রাট নিজেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। ঔরঙ্গজেব জায়গীরদারি প্রথা পুনরায় চালু করেন। জিজিয়া কর ও আকবরের সময়ে রহিত তীর্থযাত্রীদের উপর কর আবার তিনি ধার্য করলেন। মুসলিম আইনবিধির বিখ্যাত সংকলন ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে এই সময়েই প্রস্তুত হয়। ঔরঙ্গজেব সমগ্র কোরাণ-শরীফ মুখস্থ করেছিলেন এবং স্মৃতি থেকেই সমস্ত বিধি-বিধান বলতে পারতেন।

ঔরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী ছিল বিশাল। সৈন্যবিভাগে পূর্বের ন্যায় শৃঙ্খলা ছিল না। বার্নিয়ে বাদশাহের সামরিক সংগঠনের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন কোন কারণে মুঘলবাহিনীতে শৃঙ্খলা একবার বিঘ্নিত হলে সেই শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা খুবই কঠিন হত। দূরবর্তী দেশে দীর্ঘস্থায়ী অভিযান ব্যর্থ হলে সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ত। সাধারণ সৈনিক ও সেনাধ্যক্ষগণ সামরিক শিবিরে সকল রকম বিলাসের সামগ্রী ভোগ করতেন। ঐতিহাসিক গ্রান্ট ডাফ্ আহম্মদনগরে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিশাল সেনা-ছাউনীর উল্লেখ করে লিখেছেন, "এই রকম জাঁকজমকপূর্ণ তাঁবু সৈন্যদিগের দ্রুত যাতায়াতের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াত। অথচ এইরূপ বিপুল সংখ্যক লোক-লস্করের জন্য খাদ্যদ্রব্য দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যেত, তার ফলে আর্থিক যোগানের উপর চাপ পড়ত এবং শীঘ্রই অতি প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থাদিও ভেঙে পড়ত।" জায়গীর প্রথার যথেচ্ছ প্রয়োগের ফলে সেনাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও বড় বড় জায়গীরের মালিক হয়ে সাধারণ অসামরিক আমীর ওমরাহ্দের ন্যায়ই বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। বস্তুতঃ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে মুঘল সামরিক শৃঙ্খলার সামান্যই অবশিষ্ট ছিল।

মারাঠাদের দমনের জন্য ঔরঙ্গজেবের ক্রমাগত দাক্ষিণাত্যে অবস্থান এবং রাজধানী থেকে অনুপস্থিতি মুঘল সাম্রাজ্যের শান্তির পরিবেশ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করেছিল। ইটালীয় পর্যটক মানুচী বলেন যে, "১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব যখন মারাঠা দেশ ত্যাগ করে যান তখন তিনি পশ্চাতে রেখে যান ওই সব প্রদেশের শস্যবিহীন ধূ ধূ রুক্ষ প্রান্তর এবং সেই সঙ্গে ছিল শুধু মানুষের এবং জন্তুজানোয়ারের কঙ্কাল।" দীর্ঘকাল ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্য বিনষ্ট হয় এবং সর্বত্র বিশৃঙ্খলার শিকার হয়ে অনেক অঞ্চল জনবিহীন হয়ে যেন শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, উত্তর ও মধ্য ভারতের সর্বত্র চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল।

ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি : ঔরঙ্গজেবের অনুসৃত ধর্মনীতি ছিল গোঁড়া সুন্নী-বাদী ইসলামী মতানুসারী। তাঁর এই নীতির ফলে পূর্ববর্তী সম্রাটদিগের আমলের রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হল। যদিও সাম্রাজ্যের গরিষ্ঠ জনসাধারণ ছিলেন হিন্দু তথাপি ঔরঙ্গজেব চাইলেন এই রাষ্ট্রকে গোঁড়া সুন্নীবাদী ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে। এই উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলিও এমন ছিল যে তার ফলে সমগ্র দেশে রাষ্ট্রের প্রতি হিন্দুদিগের সহানুভূতি ও আনুগত্যবোধে দারুণভাবে চির ধরল। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এক ফতোয়া জারি করে তিনি নির্দেশ দিলেন যে মুসলিম ও হিন্দু বণিকদিগের দেয় বাণিজ্য করের পরিমাণ হবে যথাক্রমে শতকরা ২½ টাকা ও ৫ টাকা। অল্পদিন পরে আর এক আদেশবলে মুসলিমদিগের দেয় কর রহিত করা হল। কিন্তু হিন্দুদিগের দেয় কর অপরিবর্তিত রইল। প্রাদেশিক শাসকদের নির্দেশ দিলেন যে অতঃপর কোন বিধর্মী শিক্ষা ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানে বাদশাহের কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। কয়েক বৎসর পরে এক আদেশ জারি হল যে একমাত্র

মুসলিমগণই করণিক ও হিসাব পরীক্ষকপদে নিযুক্ত হতে পারবেন। পরে বাধ্য হয়ে এই আদেশের পরিবর্তন করে পেশকারদিগের অর্ধেক সংখ্যক হিন্দু নিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হয়।

১৬৯৫ সালে অপর এক আদেশ জারি করা হয়। রাজপুত ব্যতীত সকল হিন্দুর পক্ষে পাল্‌কি চড়া, হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করা, অস্ত্রবহন করা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হল। এই সমস্ত নিষেধাত্মক ধর্মীয় আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন শিবাজী নিজে। রাঠোর এবং মেবারের গুহিলোট রাণারা এবং শিখরাও এই প্রতিবাদের সামিল হলেন। ঔরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণ, ধর্মদ্বেষী আদেশের ফলে অপমানিত, ক্ষুব্ধ জাঠ, বুন্দেলা, মারাঠা, রাজপুত, শিখ ও সৎনামী প্রভৃতি হিন্দু সম্প্রদায় মুঘল সাম্রাজ্যের বিরোধিতায় ফুঁসে উঠলেন।

বাদশাহের ধর্মান্ধ নীতির ফলে 'সিয়া'পন্থী মুসলিমগণও নানাভাবে নির্যাতিত হন এবং তাঁরাও মুঘল সাম্রাজ্যের বিরোধী হয়ে উঠেন। মথুরা অঞ্চলের জাঠগণ একাধিকবার ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন। অবশ্য এই অভ্যুত্থান নিষ্ঠুরভাবে দমিত হয়। ঔরঙ্গজেবের হিন্দু মন্দির ধ্বংস-নীতির ফলে বুন্দেলা রাজপুতগণ বীরসিংহ, ছত্রশাল প্রভৃতি নেতাদিগের অধীনে বার বার বিদ্রোহী হন, অবশ্য এই সকল বিদ্রোহও দমিত হয়েছিল। শিখদিগের গুরু তেগবাহাদুরও ধর্মীয় কারণেই ঔরঙ্গজেবের রোষভাজন হন এবং নিহত হন। ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর নীতির ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ রাজপুতগণ মেবারের গুহিলোট ও যোধপুরের রাঠোরগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের ফলে পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

ঔরঙ্গজেবের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ঃ সম্রাট ঔরঙ্গজেব এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁর নীতিবোধ ছিল কঠোর, তাঁর সঙ্কল্প কখনও বিচলিত হত না। প্রিয়-পাত্রদিগের প্রতিও তিনি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করতেন না। নিজে পরমাত্মীয়দিগের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করে সিংহাসন লাভ করায় তিনি ছিলেন সর্বদা সন্দিগ্ধচিত্ত ; একান্ত ঘনিষ্ঠ পুত্রপরিজনকেও তিনি বিশ্বাস্ করতেন না। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন চতুর এবং অভিজ্ঞ। শিবাজীকে প্রথমে "পার্বত্য মুষিক" আখ্যা দিয়ে উপেক্ষা করেছিলেন। শিবাজীরই সৃষ্ট মারাঠা বাহিনীর বিরোধিতায় বার বার উত্যক্ত হয়েছিলেন এবং জনৈক ঐতিহাসিকের মতে দাক্ষিণাত্যের "ক্ষত" (ulcer) যদি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে থাকে সেই ক্ষতকে যথাসময়ে যথোচিতভাবে নিরাময়ে ব্যর্থ হয়ে ঔরঙ্গজেব নিজেই সাম্রাজ্যের পতন ডেকে এনেছিলেন।

"ফতোয়া-ই-আলমগিরির" ন্যায় বিখ্যাত আইন সঙ্কলন করে ঔরঙ্গজেব তাঁর প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইসলাম-নির্দেশিত সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে তিনি ধর্মানুরাগের অকৃত্রিমতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিন্তু সঙ্গীত ও চারুকলার প্রতি ছিল তাঁর অনীহা।

শাসক হিসাবে ঔরঙ্গজেবের মূল্যায়ন ঃ শাসক হিসাবে ঔরঙ্গজেবের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কেউ কেউ তাঁকে মুঘল শাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে সামগ্রিকভাবে তাঁর কৃতিত্বের বিচার করলে বলতে হয়, তিনি রাজ্য জয়ের ক্ষেত্রে নানা সাফল্য অর্জন করলেও তাঁর অনুসৃত ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক নীতির ফলে তাঁর জীবিতকালেই মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে মুঘলদিগের সামরিক শক্তিও যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁর ভ্রান্ত ধর্মীয় নীতির দরুন মুঘল সাম্রাজ্যের মূল স্তম্ভরূপে পরিগণিত রাজপুতগণ মুঘলদিগের বিরোধী হয়ে উঠেন এবং দিকে দিকে বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে মুঘলশক্তির ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। সন্দিগ্ধচিত্ততার ফলে ঔরঙ্গজেব নিকট-আত্মীয়সহ প্রায় সকলকেই তাঁর শত্রুভাবাপন্ন করে তুলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর-দিগের অযোগ্যতার ফলে ক্ষীয়মাণ মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করবার আর কোন উপায় ছিল না। যে ধর্মীয় উদার নীতি এবং সুষ্ঠু অসাম্প্রদায়িক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানে সক্ষম হয়েছিলেন, তার সবকিছুই পরিবর্তন করে ঔরঙ্গজেব মুঘল সাম্রাজ্যের দ্রুত পতনের কারণ হয়েছিলেন, বলা যায়। রাজ্যশাসনে শ্রমশীলতা, সততা, সাহস, ন্যায়পরায়ণতা, কূটকৌশল প্রভৃতি নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অপরিণামদর্শী নীতি অনুসরণ করে ঔরঙ্গজেব শাসকের যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার জন্য তাঁকে যুগপৎ প্রশংসা ও অপ্রশংসা দুইই করতে হয়। এক কথায়, ঔরঙ্গজেব যে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের শাসনভার পেয়েছিলেন, তাঁর পঞ্চাশ বৎসর শাসনের পর তার ভিত্তি তিনি অধিকতর শক্তিশালী করে যাননি, বরং দুর্বল করে পতনের পথে এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এও উল্লেখ্য, একমাত্র শরিয়তের বিধানের সংকলন ছাড়া, তিনি শিল্পকলা, স্থাপত্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, ইতিহাস চর্চা প্রভৃতি নানাদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের কীর্তি বৃদ্ধি না করে বরং যথেষ্ট ম্লান করেই দিয়ে গিয়েছিলেন।

মুঘল আমলে ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে বাণিজ্য সম্প্রসারণ

সুলতানী যুগের শেষদিকেই লোদী বংশের রাজত্বকালে ১৪৯৮ সালের ২০শে মে তারিখে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দরে প্রথমে উপনীত হন। ভাস্কো-দা-গামা প্রথমে ভারতে পর্তুগীজ বাণিজ্যের সূত্রপাত করলেও ভারতে পর্তুগীজদের বাণিজ্য ব্যাপারে প্রভুত্ব স্থাপনের গৌরব কিন্তু আলফনজো আলবুকার্কের প্রাপ্য। তাঁরই সময়ে গোয়া, দমন, দিউ, সালসেট্, বেসিন ও বোম্বাই অঞ্চলে পর্তুগীজদের বাণিজ্যপ্রাধান্য স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের হুগলীতেও পর্তুগীজদের কুঠি নির্মিত হয়। বাদশাহ শাহজাহানের সময়েই ভারতে পর্তুগীজ প্রভুত্ব বিনষ্ট হয়। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে প্রথমে ইংরেজ, পরে ওলন্দাজ এবং ফরাসী প্রভৃতি বণিক-কোম্পানী ভারতে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিল।

উপকূল অঞ্চলে ওলন্দাজ বণিক ঃ ওলন্দাজরা কুঠি স্থাপন করল পশ্চিম উপকূলে সুরাট ও কোচিনে, এবং পূর্ব উপকূলে পুলিকট্, নেগাপত্তম্, বালেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলে। বাংলার চুঁচুড়া, বরাহনগর, কাশিমবাজার এবং বিহারের পাটনাতেও তারা কুঠি স্থাপন করেছিল। ওলন্দাজ বণিকরা ভারত থেকে প্রধানতঃ সুতীবস্ত্র পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রপ্তানি করত; আর সেখান থেকে ভারতের বন্দরগুলিতে নিয়ে আসত লঙ্কা ও নানারকম মসলাদ্রব্য।

পশ্চিম উপকূলের প্রাধান্য নিয়ে ওলন্দাজদের সঙ্গে দীর্ঘদিন পর্তুগীজদের সংঘর্ষ চলেছিল। শেষ পর্যন্ত ওলন্দাজরাই পর্তুগীজদের মালাবার উপকূল থেকে উচ্ছেদ করলো। ইংরেজদের নৌ-প্রাধান্যের জন্য ওলন্দাজেরা প্রতিযোগিতায় ইংরেজদের সাথে পেরে উঠলো না। তাই পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (যবদ্বীপ প্রভৃতি) তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

মুঘল দরবারে ইংরেজ কোম্পানীর দৌত্য ঃ রানী এলিজাবেথের আমলে এক চার্টার (সনদ) বলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য করতে এলো। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স্ মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পর্তুগীজদের বিরোধিতার জন্য তাঁরও চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন মিড্লটন্ সুরাটে বাণিজ্য করবার অনুমতি লাভ করলেন। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা এক নৌযুদ্ধে পর্তুগীজদের পরাজিত করে। অবশেষে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রদত্ত 'ফরমান্'-বলে ইংরেজরা সুরাটে স্থায়ীভাবে কুঠি নির্মাণ করল। গুজরাটের ব্রোচ্ (ভারুথ বা ভৃগুকচ্ছ) এবং বরোদাতেও তারা কুঠি নির্মাণ করল। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের রাজা প্রথম জেম্স স্যার টমাস রো'কে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে দূতরূপে প্রেরণ করলেন। 'রো' সাহেবের চেষ্টায় আহমেদাবাদ, বুরহানপুর, আজমীর ও আগ্রায় কুঠি স্থাপন করতে ইংরেজরা সমর্থ হলো।

নীলের কারবারে লাভ ঃ সে সময়ে আগ্রার পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচুর নীলের চাষ হত। ইংরেজরা প্রচুর পরিমাণে নীল ইউরোপে রপ্তানী করে এ ব্যবসায় লাভবান হত। ব্যাপকভাবে নীলের চাষ করবার জন্য তারা পরবর্তীকালে 'দাদন' প্রথার (শর্তাধীনে অগ্রিম অর্থ দান) প্রবর্তন করে। চাষীদের কাছ থেকে উৎপন্ন নীল পাওয়ার শর্তে ইংরেজ নীলকর সাহেবরা প্রচুর টাকা দাদন হিসাবে তাদের দিত। 'দাদন' গ্রহণ করে উপযুক্ত পরিমাণে নীল দিতে না পারলে চাষীদের নানা দুর্গতি ও নির্যাতন ভোগ করতে হত। মুঘল বাদশাহরা বিদেশীদের নির্যাতন থেকে নিজেদের প্রজাদের রক্ষায় তেমন কোন উৎসাহ দেখান নাই।

দক্ষিণ ভারতের উপকূলে ইংরেজ 'কুঠি' ঃ দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের সমৃদ্ধ

বন্দরগুলির মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল মসুলিপত্তম। এখানে রেশম ও সুতীবস্ত্র ছাড়া নানা দামী দামী পাথরের (যেমন—হীরা, চুনি-পান্না প্রভৃতি) লাভজনক ব্যবসা চলত।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬৩২ ও ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার সুলতানের নিকট থেকে দুটি ফরমান ('গোল্ডেন ফরমান' নামে পরিচিত) লাভ করে। এই ফরমানবলে বার্ষিক ৫০০ প্যাগোডা (দক্ষিণ-ভারতে তৎকালে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা) খাজনা প্রদানের শর্তে ইংরেজরা পূর্ব উপকূলের সমস্ত বন্দরে বাণিজ্য করবার অনুমতি পেল। তখন তারা মসুলিপত্তমে স্থায়ীভাবে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করল।

ইতিমধ্যে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট ইজারা নিয়ে বর্তমান মাদ্রাজ ইংরেজদের অঞ্চলে কুঠি স্থাপিত হল। এখানে ইংলন্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জের নাম অনুসারে 'ফোর্ট সেন্ট জর্জ' নামে একটি দুর্গ স্থাপিত হল। ধীরে ধীরে মাদ্রাজ পরিণত হল ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে। ১৬৫৪ সালে মাদ্রাজ একটি প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হল। করমণ্ডল উপকূলের ও বাংলার সকল বাণিজ্যকুঠি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কাউন্সিলের শাসনাধীন করা হল। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে ইংরেজদের কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতে কোম্পানীর সদর কার্যালয় সুরাট থেকে বোম্বাইতে স্থানান্তরিত হল।

উত্তর-পূর্ব উপকূলে বাণিজ্যের প্রসার ঃ ভারতের উত্তর-পূর্ব উপকূলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহানদীর মোহনায় হরিহরপুরে ও বালেশ্বরে। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে তারা স্থাপন করে হুগলীতে একটি বাণিজ্য-কুঠি এবং তার পরে স্থাপিত হয় পাটনা ও কাশিমবাজের কুঠিগুলি। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে কুঠিগুলি স্থাপিত হল উপকূল থেকে অনেকটা দূরে। এর কারণ ছিল এই যে এই সব স্থান থেকে কোম্পানী রেশম, সুতো, কাটা কাপড়, চিনি ও সোরা* প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য লাভজনক মূল্যে কিনে নিয়ে পরে উপকূলে অবস্থিত বন্দরগুলির মাধ্যমে ইউরোপে চালান দিত।

১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং করমণ্ডল উপকূলের কোম্পানীর যাবতীয় কুঠি ও উপনিবেশগুলি ফোর্ট সেন্ট জর্জের প্রশাসনিক অধীনে আসে।

রাজনৈতিক সুযোগ লাভের নির্দেশ ঃ ব্যর্থতা ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ভারতের রাজনীতিতে বিশৃংখলতা লক্ষ্য করে তার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণের জন্য কোম্পানীকে নির্দেশ দিলেন। মাদ্রাজের শাসনকর্তাকে জানিয়ে দেওয়া হল ঃ এখন সামরিক ও অসামরিক শাসন অধিকারের উত্তম সুযোগ উপস্থিত হয়েছে—রাজস্বের আয়ও বৃদ্ধি করতে হবে—চিরকালের মত কোম্পানীর শাসন কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার ব্যবস্থার প্রয়োজন (১৬৮৭ খ্রীঃ)।** ভারতের কোম্পানী কর্তৃপক্ষ পশ্চিম উপকূলের বোম্বাই ও অন্য কয়েকটি বন্দরে মুঘল বাদশাহদের অনেকগুলো মক্কাগামী

* সোরা কামান বন্দুকে ব্যবহারের জন্য লাগত।

** Advanced History of India (1948 ed.) pp-638-639.

তীর্থযাত্রী জাহাজ দখল করে নিল। ইংরেজ শক্তি অচিরেই বাদশাহী শক্তির সম্বন্ধে তাদের ভুল বুঝতে পারলো। বাদশাহের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো, ধৃত মুঘল জাহাজ প্রত্যর্পণ করলো এবং দেড় লক্ষ মুদ্রা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হলো (ফেব্রুয়ারী, ১৬৯০ খ্রীঃ)।

বাদশাহী অনুগ্রহ লাভে পূর্ণ উদ্যম ঃ নানাধরনের চেষ্টা-তদ্বির করে বাংলার সুবাদার শাহ্ সুজার কাছ থেকে একটি 'ফরমান' লাভ করে সুবা বাংলার সর্বত্র বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার কোম্পানী লাভ করলো। বিনিময়ে দিতে হলো বার্ষিক ৩০০০ টাকা খাজনা (১৬৫১ খ্রীঃ)। এ সময়েই একে একে হুগলী, পাটনা, কাশিম বাজার প্রভৃতি স্থানে ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয়েছিল। পাঁচ বছর পরে (১৬৫৬ খ্রীঃ) শাহ্ সুজা আর একটি 'নিশান' (নির্দেশ) ঘোষণা করে ইংরেজ কোম্পানীকে অবাধ বাণিজ্য করার অধিকার দিলেন।

ঔরঙ্গজেবের আমলে বাংলার সুবাদারদের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে কোম্পানীর বিরোধ দেখা দিয়েছিল। কোম্পানী তোষণ-নীতির সাহায্যে সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিত। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে (১৬৮০ খ্রীঃ) ইংরেজ কোম্পানীকে পণ্যদ্রব্যের উপরে শতকরা দুই টাকা হারে শুল্ক ও দেড় টাকা হারে 'জিজিয়া কর' দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। তবে তাদের উপরে উৎপীড়ন করতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু এতসব আদেশ-নির্দেশ সত্ত্বেও বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলা অঞ্চলের বাণিজ্য-কুঠি সমূহ বে-আইনী শুল্কের দায় থেকে অব্যাহতি পায়নি। তাদের পণ্য বোঝাই জাহাজও প্রায়ই আটক করা হতো। বাদশাহের তুষ্টি বিধান করে সাময়িক ভাবে শান্তি স্থাপিত হল। এভাবে সপ্তদশ শতাব্দীও প্রায় শেষ হতে চললো।

মুঘল যুগে ভারত

ভারতের একটা বৃহদংশের রাজনৈতিক ঐক্যসাধন—কেন্দ্রীয় শাসন সুনিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ—মুঘল শাসকগণ ও জায়গীরদাররা—রাজস্ব ব্যবস্থা—বিদেশীদিগের দৃষ্টিতে তৎকালীন শাসক সমাজ—ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প—ইউরোপীয় বণিকগণ—সাংস্কৃতিক জীবন ঃ শিল্পকলা, স্থাপত্য, চারুকলা ও চিত্রবিদ্যা, সাহিত্য—ইতিহাস লিখন—সঙ্গীত—কয়েকটি বিশিষ্ট আঞ্চলিক সংস্কৃতি

একাধিক বৈশিষ্ট্য মুঘল যুগকে ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় করেছে। প্রায় সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ ব্যাপী মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল সুবিশাল। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আসাম ও কোচবিহার এবং চট্টগ্রামের সীমান্ত অঞ্চল বিজিত হওয়ায় মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিস্তার ঘটে এই সময়ে। (২২টি*, পরে শাহ্জাহানের

*শাহ্জাহানের সময়ে ২২টি সুবা ছিল—

(১) দিল্লী, (২) আকবরাবাদ, (৩) লাহোর, (৪) আজমীর, (৫) দৌলতাবাদ, (৬) এলাহাবাদ, (৭) বেরার, (৮) মালব, (৯) খান্দেশ, (১০) আহ্মদাবাদ, (১১) অযোধ্যা, (১২) বিহার, (১৩) মুলতান, (১৪) তেলিঙ্গানা, (১৫) উড়িষ্যা, (১৬) বাগলানা (মহারাষ্ট্র), (১৭) থাট্টা (সিন্ধু), (১৮) কাবুল, (১৯) বলখ্, (২০) কান্দাহার, (২১) বাদাখ্সান, (২২) কাশ্মীর।

সময়ে কান্দাহার হস্তচ্যুত হলে ২১টি) বিভিন্ন সুবায় (প্রদেশে) বিভক্ত মুঘল সাম্রাজ্য এই সময়ে বিস্তৃত ছিল উত্তরে হিন্দুকুশ ও পামীর মালভূমি থেকে সুদূর দক্ষিণে পেন্নার ও কাবেরী পর্যন্ত এবং পশ্চিমে গজনী, কাবুল, বল্‌ক্‌ ও বাদাখশান থেকে পূর্বে বাংলা দেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত। আসামে মুঘল অধিকার দীর্ঘস্থায়ী না হলেও মীরজুম্‌লার অধিনায়কত্বে ওই অঞ্চলও এই সময়ে মুঘল অধিকারভুক্ত হয়। এইরূপে বাবর থেকে শুরু করে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের ন্যায় দোর্দণ্ড-প্রতাপ মুঘল সম্রাটদিগের বলিষ্ঠ প্রয়াসে ভারতের এক বিরাট অংশে রাজনৈতিক ঐক্য (কতকটা 'Pax Mughulia' বা মুঘল সার্বভৌমত্ব বলা যায়) স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য এই ঐক্যস্থাপন প্রাচীন যুগের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব স্থাপনের মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন রূপে অভিহিত করা অসঙ্গত হবে না। তবে বাদশাহ্‌দিগের উদ্যমী ব্যক্তিত্ব ও বিজয়গৌরবের আকাঙ্ক্ষার জন্যই মুঘল যুগের রাজনৈতিক ঐক্য সাধিত হয়েছিল বলা যায়।

মুঘল বাদশাহের মর্যাদা ও ক্ষমতা ঃ মুঘল শাসন ব্যবস্থায় শীর্ষে ছিলেন বাদশাহ্‌ স্বয়ং। শাসনের প্রকৃতি ছিল মূলতঃ স্বৈরতান্ত্রিক, কিন্তু প্রজার কল্যাণকামী বা মঙ্গল-কেন্দ্রিক (ইংরেজীতে যাকে বলা হয়, benevolent despotism)। আইনতঃ সকল ক্ষমতার উৎস ছিলেন বাদ্‌শাহ্‌ স্বয়ং। তাঁর কথাই ছিল আইন, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস কারও ছিল না। তিনি ছিলেন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র 'আলিফা' বা প্রতিনিধি, বিচার ও আইনের সর্বোচ্চ নির্ণায়ক, রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা, সেনা-বিভাগের সর্বাধিনায়ক এবং সার্বভৌম শাসক। মুঘল বাদশাহ্‌রা ছিলেন জাঁকজমক-প্রিয় এবং এই জন্যই তাঁদের প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়ে যেত—যে অর্থ তাঁরা প্রজার কল্যাণ সাধনে ব্যয় করতে পারতেন।

কিন্তু বাদশাহ্‌ স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না। তাঁর ক্ষমতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হত শরিয়তের বিধান অনুযায়ী। কোন লিখিত আইন না থাকলেও বাদ্‌শাহ্‌ সাধারণতঃ প্রচলিত প্রথা বা নিয়ম লঙ্ঘন করতেন না। তিনি স্বৈরতন্ত্রী হলেও প্রজার কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত সর্বাধিক শ্রম করা তাঁর কতর্ব্যরূপে জ্ঞান করতেন। বর্তমান কালের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নানা কার্যকলাপে লিপ্ত না হলেও বাদশাহ্‌ নিজেকে প্রজার অভিভাবকরূপে পালক ও রক্ষক হিসাবে গণ্য করতেন।

সরকারী নির্দেশ অমান্য না করলে বাদশাহ্‌ সাধারণতঃ প্রজাদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করতেন না। গুরুতর অপরাধ না ঘটলে প্রজাদের শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনে কোন বাধা প্রদান করা হত না।

মুঘল অভিজাতবর্গ ঃ মুঘল অভিজাতবর্গ ছিল একটি মিশ্র গোষ্ঠী। তুর্ক, তাতার, ভারতীয় মুসলিম, হিন্দু প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের মানুষ এই অভিজাতগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে মুঘল অভিজাততন্ত্র একটি সংহত শক্তিশালী সম্প্রদায়রূপে গড়ে

উঠতে পারে নাই। তাছাড়া মুঘল তাত্ত্বিক ধারণা অনুযায়ী অভিজাতরা বংশানুক্রমিক ছিলেন না। তাঁরা মর্যাদা লাভের অধিকারী হতেন একমাত্র পদাধিকারের ভিত্তিতে, বংশমর্যাদার ভিত্তিতে নয়। তাঁদের ভূসম্পত্তি (জায়গীর) ভোগের অধিকার জীবিতকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কোন অভিজাতের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির অন্তর্গত হয়ে যেত। এই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ভাণ্ডারকে বলা হত বায়তুল্‌মাল্‌, যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাদশাহ্‌ স্বয়ং বিশেষভাবে দায়ী থাকতেন।

মুঘল পাদ্‌শাহীতে উত্তরাধিকারের এই নিয়ম (ইংরেজী Law of Escheat) অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকারের মতে "যথেষ্ট ক্ষতিকর" ছিল। প্রথমতঃ এই নিয়মের ফলে যেহেতু মুঘল অভিজাতগণ তাঁদের অর্জিত সম্পত্তি সন্তান-সন্ততিকে দিয়ে যেতে পারতেন না সেইহেতু তাঁরা জীবিতকালে বিলাস-ব্যসনের মধ্য দিয়ে যথেচ্ছভাবে তাঁদের অর্জিত আয় অপব্যয় করতেন, ফলে তাঁদের জীবন হত উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসী। দ্বিতীয়তঃ এর ফলে প্রত্যেক প্রজন্মের অভিজাতগণকে চাকরির জন্য বাদশাহের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হত ; তৃতীয়তঃ এই প্রথা বলবৎ থাকায় মুঘল বাদশাহীর আমলে একটি বংশানুক্রমিক শক্তিশালী অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে নাই, যাঁরা, স্যার যদুনাথের মতে, "বাদশাহের বিরুদ্ধে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিবন্ধকরূপে জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষায় তৎপর হতে পারতেন, বাদশাহের অবাধ ক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারতেন, বাদশাহের খেয়ালিপনার বিরুদ্ধ সমালোচনায় সোচ্চার হতেন এবং প্রয়োজনে বাদশাহের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বা প্রতিবাদ করতেও সাহসী হতেন।" উত্তরাধিকারের এই আইনের ফলে অভিজাতগণ নিজ নিজ অর্জিত ধন নানা অনুৎপাদক উপায়ে ব্যয় করতেন। এর ফলে অভিজাতগণ অর্জিত ধন-সম্পদ সঞ্চিত করে রাখবার আর কোন প্রয়োজনই অনুভব করতেন না।

মুঘল জনসেবাবিভাগ ও আমলাতন্ত্র ঃ মুঘল শাসনের শক্তি নির্ভর করত সামরিক শক্তির উপর। কিন্তু এই সামরিক শক্তির জন্য বাদশাহ্‌কে অনেক সময় নির্ভর করতে হত বিদেশী ভাগ্যান্বেষীদের উপর। ফলে, জনসেবা বিভাগে বিদেশীর সংখ্যাধিক্য ঘটত, যা সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য কখনও কখনও বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াত। আকবরের সময় জনসেবা বিভাগের যে দক্ষতা ছিল তা পরে হ্রাস পায়। বিভাগীয় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আকবর হিন্দুদিগকে উচ্চপদে নিয়োগ করতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু পরে বিভাগীয় দক্ষতার অবনতি ঘটে, উৎকোচ গ্রহণ এবং দুর্নীতি বৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়।

মন্‌সব্‌দারি প্রথা ঃ বাদশাহী শাসন ব্যবস্থায় মন্‌সব্‌দারি প্রথা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক সরকারী কর্মচারী পদমর্যাদা অনুযায়ী শর্তাধীনে একটি মন্‌সব্‌ বা সরকারী পদ ভোগ করতেন। মন্‌সব্‌ ভোগের শর্ত ছিল মন্‌সব্‌দারকে তাঁর পদ

অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রতি সামরিক কর্তব্য করতে হত। সামরিক কর্তব্য সম্পাদনের বিনিময়েই মনসবদার তাঁর পদাধিকারী থাকতেন এবং নিজের পদ অনুযায়ী প্রত্যেক মনসবদার নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকতেন। স্যার যদুনাথ এই প্রথার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মনসবদারগণ ছিলেন "সরকারী অভিজাত শ্রেণী।" তিনি লিখেছেন, "এই ব্যবস্থার ফলে সেনাদল, অভিজাতবর্গ এবং আমলাতন্ত্র সকলে একাকার হয়ে মিশে গেল।" আকবর মনসবদারগণকে মোট ৩৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন (১০ জন অশ্বারোহীর অধিনায়ক থেকে ১০,০০০ জন অশ্বারোহীর অধিনায়ক পর্যন্ত)। মনসবদারগণ নগদ অর্থমূল্যে অথবা জায়গীরেও বেতন নিতে পারতেন। তবে আকবর নগদ বেতন দানই পছন্দ করতেন। আবুল ফজলের বিবরণ থেকে জানা যায় একজন পাঁচ হাজারি মনসবদার মাসে ১৮,০০০ টাকা এবং একজন এক-হাজারি মনসবদার মাসে ৫,০০০ টাকা বেতন পেতেন। সেনা সরবরাহে দুর্নীতি রোধ করবার উদ্দেশ্যে আকবর (পূর্ববর্তী সুলতান আলাউদ্দীনের অনুসরণে) "দাগ" প্রথা (সরকারী অশ্বকে চিহ্নিত করবার জন্য তার গায়ে "দাগ" বা "ছাপ" দেওয়া) প্রবর্তন করেন। মনসবদারদিগের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি বা পদচ্যুতি বাদশাহ্‌গণ নিজেরাই করতেন।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন সংগঠন : বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মচারিগণ : মুঘলদিগের কেন্দ্রীয় প্রশাসন ছিল সুসংগঠিত। শাসনকার্যে সাহায্য করবার জন্য মুঘল বাদশাহ্‌গণ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করে তাঁদের উপর বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করতেন। এই সকল বিভাগীয় কর্মচারিগণ ছিলেন—

১। খান-ই-সামান (বাদশাহের পরিবারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব)
২। দিওয়ান (রাজকোষ—রাজস্ব এবং অর্থ)
৩। মীর বক্‌সী (সামরিক বেতন ও হিসাব বিভাগ)
৪। প্রধান কাজী (বিচার ও আইন)
৫। প্রধান সদ্‌র বা সদ্‌র-উস্‌-সুদুর (ধর্মীয় বা দেবোত্তর সম্পত্তি)
৬। মুহ্‌তাসিব (জনগণের নৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ)

দিওয়ান বা উজীরের একটা প্রধান দায়িত্ব ছিল মনসবদার ও সেনাবিভাগের উচ্চ পদাধিকারীদিগের তালিকা রাখা।

উপরের কর্মচারীরা ছাড়াও ছিলেন 'দারোগা-ই-তোপখানা' (গোলন্দাজ বাহিনীর তত্ত্বাবধান) এবং 'দারোগা-ই-ডাক চৌকি' (সংবাদ আদান-প্রদান) ইত্যাদি। অন্যান্য কর্মচারীদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 'ওয়াকিয়া নবীশ' (সংবাদ প্রেরক), মীর-আর্জ (সকল আবেদনপত্রের দায়িত্ব), 'মীর-বহ্‌রি' (নৌবিভাগের অধ্যক্ষ) প্রভৃতি।

পুলিস প্রশাসন : মুঘল বাদশাহ্‌গণ অপরাধ দমন ও অপরাধীকে শাস্তিদানের নিমিত্ত পুলিস বিভাগের সুব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রামের ভার ছিল মোড়লের ও চৌকিদারের উপর। ঐতিহাসিকদিগের নিকট জানা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে

ব্রিটিশের আমলেও এই ব্যবস্থা ছিল। শহরাঞ্চলে পুলিসের দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের উপর। আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় কোতোয়ালের বহুবিধ কর্তব্যের মধ্যে ছিল—

(i) চৌর্যাপরাধীকে গ্রেপ্তার করা। (ii) দ্রব্য মূল্য এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ করা। (iii) রাত্রিবেলায় প্রহরা দেওয়া, শহরে "রোঁদে" বের হওয়া। (iv) বিদেশীদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখা। (v) সতীদাহ নিবারণ করা ইত্যাদি।

কোতোয়ালের প্রধান কর্তব্য ছিল শহরাঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা। 'সরকার' বা জেলায় আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব ছিল 'ফৌজদার' নামক কর্মচারীর। ফৌজদারের কাজে সাহায্য করবার জন্য তাঁর অধীনে থাকত একটি ছোট সেনাদল।

আইন ও বিচার : বিচারকদের শরিয়তের বিধান মেনে বিচার করতে হত। এই বিষয়ে সম্রাটের আদেশগুলি 'কানুন' নামে পরিচিত ছিল। প্রধান কাজী 'কাজী-উল-কাজাৎ' ও তাঁর অধীন কাজীগণ 'মীর আদলে'র ব্যাখ্যা মত মুসলিম আইন অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। কাজীদের প্রতি নির্দেশ ছিল, "সৎ হতে এবং নিরপেক্ষ ভাবে বাদী ও প্রতিবাদী দুই পক্ষের উপস্থিতিতে বিচার করতে।" বিচারকদের উপহার গ্রহণ করা, কোন ভোজসভায় যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তাদের বলা হল, মনে রাখতে যে "দারিদ্র্যই তাঁদের গৌরব।" গ্রামাঞ্চলে কাজীর অধীনে কোন নিম্ন আদালত ছিল না। "পঞ্চায়েৎ" (গ্রামের পাঁচজন) ও "সালিশের" (নিরপেক্ষ মধ্যস্থ) সাহায্যে গ্রামের ছোটখাট বিবাদের নিষ্পত্তি করা হত।

রাজস্ব ব্যবস্থা : মুঘল আমলে রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় বা বাদশাহী এবং স্থানীয় বা প্রাদেশিক। স্থানীয় রাজস্বের উৎস ছিল উৎপাদন ও উৎপাদিত দ্রব্যের উপভোগ, ব্যবসা, নানা বৃত্তি এবং পরিবহণ ও সামাজিক জীবনের ছোটখাট বিষয়ের উপর নির্ধারিত শুল্ক ও কর। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই সব স্থানীয় রাজস্ব আদায় করতে বা ব্যয় করতে পারতেন। কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব, আমদানি-রপ্তানি, টাঁকশাল, উত্তরাধিকার, লুণ্ঠন, ক্ষতিপূরণ, উপহার গ্রহণ বা দান, একচেটিয়া ব্যবসা এবং মাথাপিছু কর প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব।

আকবরের সময়ে ভূমি ছিল প্রথমে তিন প্রকারের, যেমন খালসা বা সরকারী জমি, 'জায়গীর' (যা থেকে রাজস্ব আদায় করে জায়গীরদার বা মালিক আদায়ীকৃত রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন এবং বাকিটা নিজের অধিকারে রাখতেন) এবং 'সয়ুরগাল' বা নিষ্কর জমি যা দেবসেবায় বা বিদ্বান্ ও পণ্ডিতদিগের শিক্ষামূলক কার্যের জন্য দান করা হত। কিছুদিন টোডরমল প্রথমে কানুনগোদিগের রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি সাময়িক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত করেন। ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুজরাটে "ক্রোরি ব্যবস্থা" নামে এক নতুন রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন কিন্তু দুর্নীতির

জন্য এই ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়। পরে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল তাঁর বিখ্যাত রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। প্রতিটি জমি নির্ভরযোগ্য ইলাহী গজ বা মাপার জন্য বিশেষভাবে উদ্ভাবিত গজের সাহায্যে সঠিকভাবে মাপ-জোখ করে আয়তন স্থির করা ;

২। জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ করা, যেমন—**পোলাজ** (নিরবচ্ছিন্ন চাষের যোগ্য), **পারাউতি** (২/১ বৎসর পতিত রেখে চাষ করার যোগ্য), **চাচার** (তিন বা চার বৎসর পতিত রেখে চাষের যোগ্য) এবং বনজর (তিন বা চার বৎসরের অধিককাল পতিত রাখার পর চাষের যোগ্য)।

৩। বিভিন্ন শ্রেণীর জমির বার্ষিক গড় উৎপাদনের ভিত্তিতে রাজস্ব স্থির করা।

সরকারে দেয় রাজস্বের হার নির্দিষ্ট ছিল উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ। নগদ অর্থ মূল্যে অথবা উৎপন্ন ফসলের দ্বারা রাজস্ব প্রদান করা যেত। সমগ্র উত্তর ভারত, গুজরাট এবং সামান্য পরিবর্তনসহ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এই রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল।

এখানে বিশেষ উল্লেখ্য এই যে জমির প্রকৃত চাষীরাই বাৎসরিক খাজনা প্রদানের জন্য দায়ী হতেন। এই রাজস্ব ব্যবস্থার নাম হল "রায়ত-ওয়ারি" বা "রাইয়ৎ-ওয়ারি ব্যবস্থা"। দূর প্রদেশগুলিতে আঞ্চলিক সুবিধা-অসুবিধার ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণের ও প্রদানের অনুমতি দেওয়া হল।

মুঘল যুগে সমাজ ঃ মুঘল যুগে ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্র থেকে বেশ কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। বাবরের 'আত্মজীবনী', আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী', জাহাঙ্গীরের 'আত্মজীবনী' প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক ইউরোপীয় কুঠিয়ালদিগের দলিলপত্র, ইউরোপীয় পর্যটকদিগের বিবরণী, সমসাময়িক হিন্দী, উর্দু, বাংলা, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি থেকেও নানা তথ্য পাওয়া যায়। ইংরেজ রাজদূত উইলিয়ম হকিন্স্ ও স্যার টমাস্ রো, ওলন্দাজ পর্যটক পেলসার্ট, ফরাসী পর্যটক তাভার্নিয়ে ও বার্নিয়ে, ইটালীয় পর্যটক ম্যানুচী প্রভৃতির বিবরণী থেকে একদিকে যেমন মুঘল দরবারের জাঁকজমকের তথ্যাদি পাওয়া যায়, তেমনি এ যুগের সমাজ-জীবনের নানা বিবরণও পাওয়া যায়।

মুঘল বাদশাহ্দিগের ঐশ্বর্য ও আমীর ওমরাহ্দিগের বিলাস সমারোহ পর্যটকদের বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। সবার উপরে সর্বশক্তির অধিকারী ছিলেন সম্রাট, মধ্যস্তরে মনসবদার। আমীর-ওমরাহ্-উলেমা, সুবাদার, দেওয়ান ও বিভিন্ন স্তরে, বিশেষতঃ রাজস্ব বিভাগের নিম্ন স্তরের বহু কর্মচারী, লক্ষ লক্ষ কৃষক, কারিগর-শিল্পী ও শ্রমিক, মুঘলযুগের এই সামাজিক চিত্রটি লক্ষ্য করা যায়। মুঘল বাদশাহেরা মধ্যস্তরের মনসবদার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের উপার্জিত সম্পত্তিতে বৈধ অধিকার স্বীকার করতেন না। সম্রাটদের নিকট থেকে সামন্তরা যে সব ধনসম্পত্তি জীবিতকালে লাভ করতেন বা তাঁদের মৃত্যুর পরে মর্যাদাজ্ঞাপক যে সব ধনদৌলত তাঁদের দান করা হত, মৃত্যুর পরে তাঁদের সে সব ভোগ করবার অধিকার লোপ পেত। উত্তরাধিকারীরা

কিছুই পেতেন না। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে সমাজে বিশেষ কোন শ্রেণীর হাতে মূলধন জমতে পারত না। রাষ্ট্রই ছিল শিল্পজাত পণ্য দ্রব্যের প্রধান উৎপাদক। ছোট ছোট হাতের কাজের ও হস্তচালিত যন্ত্রের কারখানায় যা উৎপন্ন হত তার পরিমাণ বেশি হতে পারত না। যা উৎপন্ন হত তা সম্রাট ও তাঁর আমীর-ওমরাহ্ গোষ্ঠীই প্রধানতঃ ব্যবহার করতেন। জনসাধারণের ভাগ্যে বিশেষ কিছু জুটত না। বার্নিয়ে বলেছেন যে সম্রাট যদি ভূসম্পত্তির মালিক না হতেন, যদি ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হত তবে দেশের জাতীয় মূলধন বৃদ্ধি পেত এবং শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটত।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় রাজকর্মচারীদিগের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁদের সঞ্চিত অর্থ গোপন রাখতে চেষ্টা করতেন। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গেই পরবর্তী স্তরের লোকদের যোগাযোগ বেশি হত। কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিকাশের পথ লোপ পাওয়ায় সাধারণ স্তরের লোকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। তবে উপকূলবাসী বণিকদের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। বার্নিয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বণিকদের প্রচুর ঐশ্বর্যের উল্লেখ করেছেন।

কৃষিজীবী সমাজের অবস্থা ছিল শোচনীয়। কৃষকেরা দিন-রাত পরিশ্রম করে যে ফসল ফলাত সরকারের সামরিক বাহিনী মাঠভরা ফসলের মধ্য দিয়ে যথেচ্ছ চলাচল করে তা নষ্ট করে দিলেও কৃষকদের প্রতিবাদ করার কোন শক্তি ছিল না। শাহ্‌জাহানের সময়ে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের আমলে যুদ্ধবিগ্রহ, জিজিয়া কর ও অন্যান্য করের চাপে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দেশ প্রায় উৎসন্ন হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ প্রজাদের অবস্থার উল্লেখ করতে গিয়ে ওলন্দাজ পর্যটক বোনমার্ট বলেছেন যে, রাজকর্মচারীরা দরিদ্র কৃষক, মজুর ও কারিগরদিগের উপর অত্যধিক জুলুম করত। কাজের অনুপাতে এদের কম বেতন দেওয়া হত, জোর করে বেগার খাটান হত, এবং আপত্তি করলে নানাভাবে দৈহিক উৎপীড়ন পর্যন্ত করা হত। তবে এ সময় দ্রব্যমূল্য কম ছিল, তাই সাধারণ লোকেরা কোন রকমে দিন কাটিয়ে দিত।

মুঘল স্থাপত্য: মুঘল যুগ স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য বিশেষরূপে খ্যাত হয়ে আছে। এই সময় থেকে হিন্দু শিল্পরীতির প্রয়োগ ইসলামিক শিল্পরীতির সঙ্গে পাশাপাশি চলতে থাকে। আকবরের আমলে আমরা স্থাপত্যের বিস্ময়কর বিকাশ লক্ষ্য করি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফতেপুর সিক্রীর মসজিদ সংলগ্ন বিখ্যাত বুলন্দ দরওয়াজার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি। বুলন্দ দরওয়াজা ও পাঁচ মহল প্রাসাদে ইন্দো-পারসিক স্থাপত্যরীতির অপূর্ব বিকাশ হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে এই শিল্পরীতি প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে। সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি সৌধ এবং আগ্রায় নূরজাহানের পিতা ইত্‌মদ্-উদ্দৌলার সমাধি সৌধটি এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখের দাবি রাখে।

শাহ্জাহান তাঁর জাঁকজমক প্রিয়তার জন্য ইতিহাসে বিশেষ ভাবেই বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর আমলে ইন্দো-পারসিক শিল্প স্থাপত্যরীতির চূড়ান্ত বিকাশ হয়।

মতি মসজিদ

শ্বেত মর্মর প্রস্তরে শাহ্জাহানের তৈরি তাজমহল আজও বিশ্বের "সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে একটি" রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে।

তাজমহল ছাড়াও আগ্রার মতি মসজিদ, দিল্লীর লাল কেল্লা প্রভৃতি ইন্দো-পারসিক স্থাপত্যরীতির বিস্ময়কর নিদর্শন সন্দেহ নাই। পর্যাপ্ত পরিমাণে মার্বেল প্রস্তর এবং যতটা সম্ভব কম রঙীন টালি ব্যবহার করে শাহ্জাহান বিশুদ্ধ পারসিক রীতির কিছুটা সংস্কার সাধন করেন। ঔরঙ্গজেবের ধর্ম গোঁড়ামির ফলে মুঘল স্থাপত্য ও শিল্পকলার দ্রুত অবনতি হয়েছিল।

চিত্রকলা : চিত্রকলায় মুঘল যুগ এক আশ্চর্যজনক উন্নতি করেছিল। স্থাপত্য-কলার ন্যায় মুঘল চিত্রকলায় চৈনিক, বৌদ্ধ, ইরানীয়, গ্রীক এবং মঙ্গোলীয় প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এ যুগের চিত্রশিল্পের নিদর্শন দেশের বিভিন্ন স্থানে (যেমন রাজপুতনা, বিজয়নগর, বিজাপুর, আহম্মদনগর প্রভৃতি) দেখা যায়। পাটনার বিখ্যাত খুদা বক্স্ লাইব্রেরীতে এই সকল চিত্র রক্ষিত আছে। এ যুগের রাজপুত ও মুঘল উভয় চিত্রকলায় পারসিক প্রভাব বেশ স্পষ্ট। তবে মুসলিম চিত্রশিল্পে মুসলিম ভাবই প্রধান আর রাজপুত চিত্রে হিন্দু আধ্যাত্মিক ভাবই প্রধান। এ সময়ের পাহাড়ী কাঙ্ড়া শিল্পের স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হীরাট থেকে আগত মীর সাঈদ আলি ("যাঁকে বলা হয় প্রাচ্যের র‍্যাফেল") এবং খোয়াজা আবদুস্ সামাদ—এ যুগের দুইজন প্রসিদ্ধ শিল্পী ছিলেন। এ যুগের হিন্দু চিত্রশিল্পীদের মধ্যে বসাওয়ান, লাল, কেশু, মুকুন্দ, হরিবনুস্ প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। জানা যায়, যে-১৭ জন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী আকবরের সভা অলঙ্কৃত করতেন তার মধ্যে ১৪ জনই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।

সঙ্গীতকলা : চিত্রকলার ন্যায় মুঘল যুগে সঙ্গীতকলারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। গোয়ালিয়রের কালোয়াতেরা আকবরের দরবারে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন ছিলেন এ যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গায়ক। তাঁর সম্বন্ধে আবুল ফজল লিখেছেন, "তাঁর ন্যায় সঙ্গীত কলাবিদ্ এক সহস্র বৎসরের মধ্যেও ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।" আবুল ফজল বলেছেন, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী তানসেন

সহ আকবরের সভা ৩৬ জন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীর দ্বারা অলংকৃত হত। বাজবাহাদুর সম্বন্ধে আবুল ফজল লিখেছেন, "সঙ্গীত শাস্ত্র, বিজ্ঞানে এবং হিন্দী সঙ্গীতে তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক গুণী।"

মুঘল যুগে সাহিত্য ঃ মুঘল যুগের প্রধান গৌরব জাতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধি। এ যুগে সংস্কৃত ও ফার্সীর চর্চা সমানভাবে চলেছিল। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী ও আকবর-নামা, কবি ফৈজীর কাব্য গ্রন্থসমূহ, হুমায়ুন কন্যা গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন-নামা', জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী (তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী), বদায়ুনী, ফিরিস্তা, খাফি খাঁ প্রভৃতি ঐতিহাসিকের গ্রন্থাবলী ফার্সী ভাষায় রচিত। হিন্দী, মারাঠি, গুজরাটি, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাও এ যুগে সামনভাবেই হয়েছিল। তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ, সুরদাসের হিন্দী ভজনগান, গুরু রামদাসের মারাঠি গাঁথা, পৃথিবরাজের মহাকাব্য ('পৃথিবরাজ রাসো') হিন্দী সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য লোক-সাহিত্যে বাংলা ভাষা এ যুগে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়। বাংলা সাহিত্যে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র (রায় গুণাকর উপাধি) ও রামপ্রসাদ, মারাঠা সাহিত্যে রামদাস, তুকারাম প্রভৃতি কবি ও লেখকেরা নিজ নিজ মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন।

মুঘল যুগে ইতিহাস লিখন ঃ মুঘল যুগে সাহিত্যচর্চার একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল ইতিহাস লিখন। বস্তুতঃ ধারাবাহিক এবং তথ্যভিত্তিক প্রামাণ্য ইতিহাস রচনায় মুঘল যুগের একটি বিশেষ অবদান আছে। বাবরের আত্মজীবনী এবং গুলবদন বেগমের কাব্যমূলক হুমায়ুন-নামার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃত। তাছাড়া এই যুগে রচিত ফার্সি ভাষায় একাধিক মূল্যবান্ ইতিহাস গ্রন্থের পরিচয় আমরা পাই। বাদশাহ্-দিগের ব্যক্তিগত উৎসাহে ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে আবুল ফজলের 'আকবর-নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী', আল্ বদায়ুনীর 'মুন্তাখাব-উৎ-তোয়ারিখ', আবদুল হামিদ লাহোরীর 'পাদশাহ্নামা', এনায়েৎ খানের 'শাহ্-জাহান-নামা', মীর্জা মুহম্মদ কাজিমের 'আলমগীরনামা', খোয়াজা নিজাম-উদ্দীনের 'তবাকাৎ-ই-আকবরী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইতিহাস রচনা নিষিদ্ধ হওয়ায় মীর্জা মহম্মদ হাশিম 'খাঁফি খাঁ' এই ছদ্মনামে মুন্তাখাব-উল্-লুব্বাব নামে একখানি ইতিহাস পুস্তক রচনা করেছিলেন। ফার্সি ভাষা ছাড়াও মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতেও সাধারণ সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাস গ্রন্থও রচিত হয়েছিল।

মুঘল যুগে কয়েকটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ঃ মুঘল যুগে কয়েকটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই সব আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় রাজপুতদিগের সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের এক চিত্রশিল্প। এই রাজপুত চিত্রাঙ্কন রীতি বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছিল পাঞ্জাবের

পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী অঞ্চলে এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে, বিশেষতঃ কাংড়ায়, যার জন্য এই ধরনের চিত্রগুলি "কাঙড়ী স্কুলের" চিত্রকলা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। এই সব চিত্রকলার বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী, রামায়ণের কাহিনী, সমাজজীবন প্রভৃতি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বিকাশও এই সময়েই ঘটে। এই সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কবি মাধবাচার্যের 'চণ্ডীমঙ্গল', তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তি রত্নাকর', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', মুকুন্দরাম দাসের 'কবি কঙ্কন চণ্ডী', শিখ গুরুদের উপদেশাবলী সমন্বিত পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত "গ্রন্থ সাহেব" ইত্যাদি।

প্রাদেশিক স্থাপত্যকীর্তিগুলির মধ্যে বিহারের সাসারামে নির্মিত শেরশাহের সমাধিমন্দির, সুউচ্চ প্রাচীর ও তোরণযুক্ত লাহোর দুর্গ, রাজপুতনায় উদয়পুরের জগমন্দিরে "গোল মণ্ডল" বা "মহল" নামে পরিচিত বিখ্যাত মন্দির, লাহোরে শাহদারায় নির্মিত জাহাঙ্গীরের সমাধিমন্দির, এলাহাবাদের চল্লিশ গম্বুজবিশিষ্ট প্রাসাদ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ ১০ ॥

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন (১৭০৭-১৭৪৭ খ্রীঃ)

ঔরঙ্গজেবের আমলে সাম্রাজ্যে ভাঙন

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, অসাধারণ রাজনীতিবিদ। মুসলমান হিসাবে তিনি অত্যন্ত গোঁড়া, কঠোর ও সংযমী ছিলেন। ধর্মের জন্য রাজ্যকে বিপন্ন করতেও তাঁর কোন কুন্ঠা ছিল না। আমোদ-প্রমোদ ও আড়ম্বর নিষিদ্ধ করায় অভিজাতরা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, এটা তিনি জানতেন। তিনি আরও জানতেন যে হিন্দু প্রজারা পীড়িত হচ্ছেন, বিশ্বস্ত সেনাপতিরা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক লেন্-পুল্ সাহেবের এরূপ অভিমতকে একেবার অস্বীকার করা যায় না।

স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থায় বাদশাহ ছিলেন বিস্ময়াতীতভাবে সক্ষম। কিন্তু মানুষের হৃদয় জয় করে তাদের আপন করার কাজে তিনি ছিলেন প্রায়-অক্ষম। অসীম ও মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে স্বীয় বিশ্বাসে অটল থেকে তিনি ভারতের সার্বভৌম সম্রাট পদে সমাসীন ছিলেন। তাঁরই শাসনকালে সাম্রাজ্যে ভাঙন শুরু হয়।

ধর্ম সম্বন্ধে বাদশাহের চরম গোঁড়ামি ও হিন্দুবিদ্বেষী নীতির ফলে উত্তরভারতে শিখ, সৎনামী সম্প্রদায়, জাঠ, বুন্দেলা ও রাজপুতরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। মেবারের রানা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে সম্রাট সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ছত্রপতি শিবাজীর বিরুদ্ধে সংগ্রামেও তিনি সফল হতে পারেন নাই।

দাক্ষিণাত্য অভিযান ঃ ব্যর্থতা ও বিপর্যয় ঃ শিবাজীর মৃত্যুর পরে তাঁর বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব গোটা মারাঠা রাজ্যকে গ্রাস করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু শিবাজীর শিক্ষায়, জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ মারাঠারা মুঘলের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। অনেক ঐতিহাসিক মুঘলের বিরুদ্ধে মারাঠাদের যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' নামে অভিহিত করেছেন।* প্রত্যেকটি মারাঠী তখন স্বাধীনতার সৈনিক—মুঘল-শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে জীবন-পণ সংগ্রামে ব্রতী। নবজাগ্রত মারাঠা-শক্তিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা মুঘল বাহিনীর ছিল না।

বাদশাহকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল পার্বত্য অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধে অভ্যস্ত এক গণ-বাহিনীর সঙ্গে, কোন সরকারের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে নয়। তাই এই ব্যর্থতা।

* 'Aurangzeb was in fact confronted by people's war and he could not end it, because there was no Marhatta Government or State army for him to attack and destroy.
—Advanced History of India, p. 517

মারাঠা শক্তিকে দমন করার জন্য বাদশাহ্‌কে সুদূর দাক্ষিণাত্যে বছরের পর বছর কাটাতে হয়েছিল। রাজধানী থেকে বহুদূরে অবস্থানের ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো। উত্তর ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অরাজকতা দেখা দিল। শাসন ব্যবস্থায় এসে গেল চরম শৈথিল্য। স্থানীয় ভূস্বামী ও রাজকর্মচারীরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলেন। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে প্রচুর অর্থব্যয়ের ফলে সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের পর্যন্ত নিয়মিত বেতন দেওয়ার সামর্থ্য সরকারের ছিল না। মুর্শিদকুলি খাঁর ন্যায় বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে রাজস্ব যথাসময়ে বাদশাহের কাছে পাঠাতে পেরেছিলেন বলেই বাদশাহ কোন প্রকারে দাক্ষিণাত্যের অভিযান পরিচালনা করতে পেরেছিলেন।

বাদশাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর এত সাধের সাম্রাজ্য তাঁর জীবদ্দশাতেই ভেঙে পড়ার উপক্রম হচ্ছে। তিনি যখন দাক্ষিণাত্যে বার্ধক্যের আক্রমণে প্রায় শয্যাশায়ী, তখন থেকেই তাঁর পুত্রেরা সিংহাসনের লোভে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি পুত্রদের পরস্পরের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করে নেওয়ার পরামর্শ পর্যন্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু সে পরামর্শ কেউ শোনেননি।

সম্রাটের শেষ জীবন কেটেছিল পরম দুঃখ ও হতাশায়। অন্তরের বেদনা প্রকাশ করে তিনি মৃত্যুর পূর্বে যে-সব চিঠি লিখে গেছেন তাতে প্রতি ছত্রে একাকীত্ব ও নিদারুণ হতাশার বেদনাই ফুটে উঠেছে। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে আহমদ নগরে সম্রাটের মৃত্যু হয়।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে রাজকোষে অর্থাভাব ঃ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য মুঘল বাদশাহরা তাঁদের শাসনকালের অধিকাংশ সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে রাজ-ভাণ্ডারে অর্থের অভাব হবেই।

বাদশাহদের আয়ের প্রধান পথ ছিল রাজস্ব আদায়। নৌশক্তির অভাবের জন্য বহির্বাণিজ্যের তেমন সুবিধা মুঘল বাদশাহেরা করতে পারেন নাই।

শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও দাক্ষিণাত্য-নীতি সফলতার দাবী করতে পারে না। অথচ যুদ্ধবিগ্রহে প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল। তাঁর আড়ম্বর ও স্থাপত্য-কীর্তি ঐতিহাসিক প্রবাদে পরিণত হলেও অর্থ-সংগ্রহের চাপটি কিন্তু পড়েছিল কৃষকদের উপরে। অত্যধিক করের চাপে কৃষকেরা দরিদ্র হয়ে পড়লো। গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

ঔরঙ্গজেবের গোটা রাজত্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায় সবসময়ই চলছিল। ভাইদের সাথে গৃহ-যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে সিংহাসনলাভ করলেন তিনি। রাজ্য-বিস্তার কামনায় বাংলা সীমান্তে মগ ও কোচদের দমন করা হল, আসাম, কুচবিহার, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চল মুঘল-সাম্রাজ্যভুক্ত হলো। ঔরঙ্গজেবের গোঁড়া ধর্ম-নীতির ফলে মথুরার জাঠেরা বুন্দেল নেতা ছত্রশাল, পাঞ্জাবের পাতিয়ালা অঞ্চলের সৎনামী সম্প্রদায় ও শিখেরা, রাজপুতনার রাজপুতেরা প্রায় সকলেই বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। উত্তর ভারতে

বিদ্রোহ-দমনে তিনি কিছুটা সফল হয়েছিলেন, কিন্তু মেবারের রাণা রাজসিংহের সাথে যুদ্ধে বাদশাহ আলমগীর সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে বাদশাহকে তাঁর জীবনের শেষ ছাব্বিশ বছর দাক্ষিণাত্যে কাটাতে হয়েছিল। নবজাগ্রত মারাঠা শক্তিকে দমন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

আর্থিক ব্যবস্থার অবনতি ঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিকট-সম্পর্ক সবসময় বিদ্যমান থাকে। মুঘল-শাসনের বেলায়ও এই নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই।

জায়গীরের সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ রাজস্বের বৃদ্ধি নেই ঃ বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেবের সময় হতেই মুঘল-জায়গীরদারদের নিকট থেকে নিয়মিতভাবে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হতো না। বিশেষতঃ বাদশাহ যখন দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন উত্তর ভারতের রাজস্বের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। আবার দক্ষিণ ভারতে মারাঠা-হামলার দরুন দাক্ষিণাত্যের জায়গীরগুলির আয় কমে গিয়েছিল। মনসব্দার বা জায়গীরদারেরা দাক্ষিণাত্যের জায়গীর ছেড়ে উত্তর ভারতে জায়গীর পাবার দাবী জানালেন—সে দাবী উপেক্ষা করাও সম্ভব হয় নাই। তাই উত্তর ভারতে জায়গীরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং দক্ষিণ ভারতে জায়গীরের সংখ্যা আনুপাতিক হারে কমে গেল। মুঘল বাদশাহরা জায়গীরদারদের শক্তি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা দূর করার জন্য তাঁদের এক জায়গীর থেকে অন্য জায়গীরে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিতেন। জায়গীর পরিবর্তনের পূর্বে জায়গীরদারেরা পুরানো জায়গীরটিকে শোষণের ফলে শেষ করে দিতেন।

ইজারা প্রথা ঃ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে ভূমি-ব্যবস্থায় ইজারা-প্রথা চালু হয়। জমির খাজনা নিলাম ডেকে যে-লোক সর্বোচ্চ মূল্য দিতে চাইতো তাকেই জমি ইজারা দেওয়া হতো। অল্প সময়ের জন্য ইজারা প্রাপ্তির ফলে ইজারাদাররা প্রজাদের উপর নির্বিচারে শোষণ চালাতেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের মতে অত্যাচারের ফলে চাষীরা জমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হতেন। অনেক সময়ে সংঘবদ্ধ হয়ে কৃষকেরা বিদ্রোহ করতেন। উত্তর ভারতে শিখ, জাঠ, রাজপুত বিদ্রোহের ফলে রাজস্ব আদায় কমে যেতে থাকে। তাছাড়া ভূমি রাজস্বের হারও ছিল বেশি। কৃষির উৎপাদন কমে যায়, সরকারী রাজস্বে ঘাটতি বেড়ে যায়। এ সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্য ইউরোপীয় বণিকদের হাতে চলে যেতে থাকে।

মুঘল মনসব্দারেরা যখন জায়গীর নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহে মত্ত তখন কৃষক-বিদ্রোহের আগুন নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের ভিত তখন নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। এই দুঃখজনক অবস্থার সুযোগ নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনসব্দারেরা তাঁদের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের শক্তির ঘাঁটি গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠলেন।

ক্ষমতাসীন অভিজাত সম্প্রদায়

মুঘল বাদশাহীর গৌরবময় যুগ থেকেই বাদশাহদের সভায় অভিজাতদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাদশাহদের অমাত্যবৃন্দ থেকে প্রদেশের সুবাদার ও মনসবদারেরাও ছিলেন প্রায় সকলেই অভিজাত বংশোদ্ভূত। অভিজাত সম্প্রদায়কে বাদশাহের গৌরবের প্রতীকও বলা যেতে পারে। মুঘল-প্রভুত্বের প্রথম যুগে বহিরাগত বাবরের পাশে দাঁড়িয়ে জীবনপণ যুদ্ধ করেছিলেন তাঁর মুঘল অনুচরবৃন্দ। তাঁদের বংশধরেরা অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হলেন। এছাড়া মধ্য এশিয়া থেকে অনেক ভাগ্যান্বেষী ভারতে এসে ধনী ও সম্ভ্রান্ত পর্যায়ভুক্ত হতেন। পরবর্তীকালে মুঘল রাজসভা ভারতীয় অভিজাতদের দ্বারাও অলংকৃত হয়েছে। কিন্তু বিদেশী অভিজাতদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

অভিজাতদের বিভিন্ন দল ঃ ইরাণী, তুরাণী, আফগানী প্রভৃতি অভিজাতদের বাদশাহী দরবারে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসীম। ইরাণীরা ছিলেন ইসলামের 'সিয়া'-সম্প্রদায়ভুক্ত। তুরাণীরা ছিলেন 'সুন্নী' সম্প্রদায়ভুক্ত।

ক্ষমতার লড়াই ঃ পরবর্তী সময়ে আফগান ও সৈয়দবংশীয় অভিজাতেরা নিজেদের 'হিন্দুস্থানী' নামে অভিহিত করতেন। ভারতে অনেক দিন বসবাসের জন্যই সম্ভবতঃ এ নামটি তাঁরা ব্যবহার করতেন। 'সিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত ইরাণী আসাদ খান্ ও জুলফিকার খান্ বাহাদুরশাহ্ ও জাহান্দর শাহের সিংহাসন লাভে সাহায্য করেছিলেন। জাহান্দর শাহের মৃত্যু ও পরবর্তী অরাজকতার নায়ক ছিলেন আফগান 'সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়'। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে মহম্মদ শাহের রাজ্য লাভে সাহায্য করেছিলেন 'তুরাণী' সুন্নী-সম্প্রদায়ভুক্ত চিন্ কিলিচ্ খান্। ইতিহাসে তিনি নিজাম্-উল্-মুল্ক নামে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রয়োজনবোধে ইরাণী-বিরোধী 'হিন্দুস্থানী' দলকেও সাহায্য করেছিলেন।

সামরিক বাহিনী ঃ অভিজাত মনসবদারেরা সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব করতেন। মনসবদারী প্রথা প্রবর্তিত ছিল। সেনা-সরবরাহ, সৈন্যবাহিনী সংগঠন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ব্যবস্থার কাজে বাদশাহেরা মনসবদারদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সেনাবাহিনী ছিল বিশাল। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে মনসবদারেরা তাঁদের দাবী-দাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই বেশি নজর দিতে থাকলেন। তাঁদের বিলাস-ব্যসন-বহুল জীবনের প্রভাব সাধারণ সৈনিকের উপরও পড়েছিল। রাজস্থানের গিরিবর্ত্মে ও মারাঠাদের পার্বত্য অঞ্চলে মুঘল-বাহিনীর পরাজয়ের কারণ বিশাল বাহিনীর পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ করার অনভিজ্ঞতা। বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হওয়ায় তাঁদের কাজে শৈথিল্যও এসে পড়েছিল। নৌবাহিনীর অভাব সামরিক বাহিনীর আর একটি বড় ত্রুটি। উপকূল অঞ্চল রক্ষা ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে মুঘল বাদশাহদের অক্ষমতা নৌবাহিনীর অভাবের জন্যই ঘটেছিল। নৌবাহিনীর দুর্বলতার সুযোগেই ইউরোপীয় ইংরেজ, ফরাসী বণিকগোষ্ঠী উপকূল প্রদেশ—বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে কুঠি নির্মাণ করেন ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন।

সাম্রাজ্যের বিশালতা : মুঘল সাম্রাজ্যের বিশালতা সাম্রাজ্যের পতনের আর একটি কারণ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ প্রদেশের সুবাদার হতেন। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে তাঁরা আরও শক্তি সঞ্চয়ের দিকে মন দিলেন। উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে মহীশূর এবং পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত অঞ্চলে সাম্রাজ্য পরিচালনা কঠিন ছিল। কান্দাহার অঞ্চল পারস্যের অধিকারভুক্ত হওয়ার ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কান্দাহারের পথেই নাদিরশাহ্ ও আহমদশাহ্ ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

রাজশক্তির অধঃপতন

মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর থেকে শুরু করে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত প্রথম ছ'জন মুঘল সম্রাট সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্যতিক্রম কেবলমাত্র বাবর-পুত্র হুমায়ুন। তবে তাঁর চরিত্রে যথেষ্ট গুণ ছিল। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল না। দুঃখের কথা যে ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটেরা তাঁদের পিতা, পিতামহ প্রভৃতির সামান্যতম যোগ্যতারও উত্তরাধিকারী ছিলেন না। তাঁদের কার্যকলাপ দেখলে মনে হয় যে তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন অস্থির চরিত্রের দুর্বল শাসক, ব্যক্তিত্বহীন ও অনভিজ্ঞ। তাঁরা থাকতেন সর্বদাই বিলাস-ব্যসনে মত্ত, শক্তিশালী অভিজাতদের হাতে হতেন ক্রীড়নক—তাঁদের সম্বন্ধে সমসাময়িক একজন লেখক দুঃখ করে বলেছিলেন, 'এ যেন ঈগল পাখীর বাসায় জুটেছে পেঁচা, কোকিলের বাসায় বাসা বেঁধেছে কাক'।

তবে একটা ব্যাপারে তাঁরা সবাই ছিলেন এককাট্টা। মুঘল মস্‌নদ্ বা 'তখত-তাউস্'-এর অধিকারের বেলায় ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ বা যে-কোন পথে চলতে তাঁরা কেউই পেছিয়ে পড়েননি। দিল্লীর সিংহাসন চাই, নতুবা চাই কবরে নিয়ে যাওয়ার 'কফিন' বা 'শবাধার'—এই উদগ্র লোভের কাহিনীতে পূর্ণ রয়েছে ঔরঙ্গজেব-পরবর্তী মুঘল-বাদশাহীর ইতিহাস।

সিংহাসনের জন্য গৃহযুদ্ধ : ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরেই তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য লড়াই শুরু হলো। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুয়জ্জম্ ছিলেন কাবুলের শাসনকর্তা। তাঁর অপর দুই পুত্র আজম্‌শাহ্ ও কামবকস্ ছিলেন যথাক্রমে গুজরাট ও বিজাপুরের শাসনকর্তা। দুই ভাইকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে মুয়জ্জম্ বাহাদুর শাহ্ বা প্রথম শাহ্ আলম উপাধি ধারণ করে দিল্লীর বাদশাহী মস্‌নদে উপবেশন করলেন (১৭০৭ খ্রীঃ)। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সিংহাসন লাভ করেছিলেন। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর পরে 'তখত্-তাউস্' অধিকারের জন্য আবার যথারীতি জীবন-পণ যুদ্ধ শুরু হলো। বাহাদুর শাহের প্রধানমন্ত্রী জুল্‌ফিকার খানের সাহায্যে বাহাদুর শাহের

পুত্র জাহান্দরশাহ্ তাঁর অপর ভ্রাতাদের হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন। ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যা কিন্তু সমানে চলতে লাগলো। জাহান্দারশাহ্ ছিলেন যেমন অপদার্থ তেমনই চরিত্রহীন। একবছরের মধ্যেই দরবারী-অভিজাত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে জাহান্দারের ভ্রাতুষ্পুত্র ফররুখসিয়ার জাহান্দারকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। ফররুখসিয়ারও ছিলেন দুর্বল কুটিল, এককথায় অপদার্থ। এরপরে দিল্লীর বাদশাহ্ তেরীর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন দুই প্রধান নট 'সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়'—পাটনার সহকারী শাসক হুসেন আলি আর এলাহাবাদের শাসক আবদুল্লা। ইতিমধ্যে ফররুখ-সিয়ার সৈয়দ ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পর্যন্ত শুরু করেছিলেন। ফলে সৈয়দ ভ্রাতারাই তাকে সিংহাসনচ্যুত করলো (১৭১৯)। শীঘ্রই ফররুখসিয়ারের পতন হলো। পরের কয়েক বছরের ইতিহাস হলো ক্ষমতালোভীদের হীন ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুর হত্যার ইতিহাস। সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় ফররুখসিয়ারকে হত্যা করে প্রথম বাহাদুর শাহের অপর দুজন বংশধর রফি-উদ্-দরজাৎ ও রফি-উদ্-দৌলাকে একবছরের মত (১৭১৯) দিল্লীর বাদশাহী-মসনদে বসিয়ে নিজেরাই যথেচ্ছাচারী হয়ে শাসন-ক্ষমতার অপব্যবহার করতে লাগলেন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বাদশাহ্ হলেন মহম্মদ শাহ্ (১৭১৯-৪৮ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন বাহাদুর শাহের পৌত্র। তাঁর পিতার নাম ছিল জাহান্‌শাহ্। তাঁর পিতার বরাতে কিন্তু মস্‌নদ জোটেনি।

মহম্মদ শাহের আমলেই 'সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের' স্বেচ্ছাচারিতার অবসান হলো। এ সময়ে দরবারে প্রাধান্য পেয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের নিজাম্-উল্-মুল্‌ক। তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্তৃত্বে বাধা দিলেন। মহম্মদ শাহ্ অবস্থা বুঝে নিজামের সাহায্য নিলেন। আব্দুল্লা কারাগারে বন্দী হলেন। বিষ-প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়। নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার পথে হুসেন আলিকে হত্যা করা হয়েছিল। মহম্মদ শাহ্ নিজামকে প্রধানমন্ত্রী করতে চাইলেন, কিন্তু বিচক্ষণ নিজাম্ মুঘল দরবারের হাল চাল বুঝতে পেরে নিজের রাজ্য দাক্ষিণাত্যে চলে গেলেন। সেখানেই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে শাসন চালাতে লাগলেন। এ-সুযোগে মহম্মদ শাহ্ কিন্তু নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সাম্রাজ্যের গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে পারতেন। কিন্তু সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার শক্তি তাঁর ছিল না।

'সিয়ারের' লেখক ঐতিহাসিক গোলাম হুসেন বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'তিনি একজন পরম সুন্দর যুবক—বাহশাহী মহলের প্রচুর ঐশ্বর্য, সম্পদ ও বিলাস-বসনের সমারোহে তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। দিন দিন তিনি এমন অকেজো হয়ে পড়লেন যে রাজ্য শাসনের সামান্য যোগ্যতাও তিনি হারিয়ে ফেললেন। এ অবস্থায় শাসন-ব্যবস্থা যেমন চলা সম্ভব, তাই চললো।'

সাম্রাজ্যের বড় বড় প্রদেশসমূহ বাদশাহের হস্তচ্যুত হতে লাগলো। দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলে জাঠ, রোহিলা, পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করলো।

রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ঃ বাদশাহেরা অভিজাতদের পরিচালনা করার শক্তি ইতিমধ্যেই হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা আর প্রভু রইলেন না। তবে অভিজাতদের দলাদলির সুযোগে তাঁদের মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টিতে সর্বদাই ইন্ধন যোগাতেন তাঁরা। সুযোগ বুঝে বাদশাহেরা প্রাদেশিক সুবাদারদের সাহায্য নিতেন রাজধানীর অভিজাতদের বিরুদ্ধে। বাদশাহদের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিতেন অভিজাত সম্প্রদায়। স্বদেশী-বিদেশী সকলেই স্বার্থসিদ্ধির প্রতিযোগিতায় কৃতঘ্নতার চরম পথের আশ্রয় নিতেন। গৃহযুদ্ধের ইন্ধন তাঁরাই যোগাতেন।

মুঘল যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সংগঠন এমন ভাবে গঠিত হয়েছিল যে অভিজাতদের মধ্যে যিনি যতই শক্তিশালী হোন না কেন, তাঁরা কেউ বাদশাহ মসনদে বসতে পারতেন না। তাই রাজনীতি চলতো অন্ধকার গলির চোরা-গোপ্তা পথে, পেছন দিক থেকে।

মুঘল যুগে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় নাই। তাই অভিজাতদের সমান্তরাল অন্য কোন বিরোধী শ্রেণী ছিল না। তবে বিদেশী ইরাণী, তুরাণীদের প্রতিপত্তি ছিল বেশী।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে* অভিজাতদের নৈতিক অধঃপতন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। তাঁর মতে এটি একটি চরম দুঃখজনক ঘটনা। এক সময়ে আব্দুর রহমান এবং মহাবৎ, সাদুল্লা ও মীরজুমলা, ইব্রাহিম এবং ইসলাম খান্ রুমী প্রভৃতি অভিজাতবৃন্দ বীরত্ব ও বিশ্বস্ততার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল যুগের গৌরব বৃদ্ধিতে তাঁরা ছিলেন বাদশাহদের নিষ্ঠাবান সৈনিক ও সহচর। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে এই অভিজাত-সম্ভূত বংশধরেরা মুঘল সাম্রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলেন। দিল্লীর লালকেল্লার বাদশাহী মহলে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়-হুসেন আলী ও আবদুল্লা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুর হত্যার দ্বারা যে রক্তাক্ত ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তার নজীর ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়।

প্রদেশে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অবসান

প্রদেশের পরে প্রদেশ কেন্দ্রীয় শক্তির কর্তৃত্ব থেকে সরে যেতে লাগলো। আগ্রার কাছেই জাঠেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। গাঙ্গেয় উপত্যকায় আফগান-রোহিলারা স্বাধীন রোহিলাখন্দ প্রতিষ্ঠা করলো। হায়দরাবাদে নিজাম স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলেন। দাক্ষিণাত্যে মুঘল-প্রভুত্বের অবসান হলো।

*'To the thoughtful student of Mughal History, nothing is more striking than the decline of the peerage. The heroes adorn the stage for one generation only and leave no worthy heirs sprung from their loins. Abdurrahim and Mahabat, Sadullah and Mirjumla, Ibrahim and Islam Khan Rumi who had made the history of India in the seventeenth century, were succeeded by no son, certainly by no grandson, even half capable as themselves.—Jadunath Sarkar : Advanced history of India, p. 523.

অযোধ্যা ও পাঞ্জাব : রাজধানী দিল্লীর সন্নিকটবর্তী দুটি প্রদেশ, অযোধ্যা ও পাঞ্জাব মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির প্রাণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে। পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য অযোধ্যার বিস্তৃত অঞ্চলে মুঘল-প্রভুত্বের প্রয়োজন ছিল। উত্তর-পশ্চিমের সামরিক ব্যবস্থার জন্য পাঞ্জাবের গুরুত্বও যথেষ্ট ছিল। বাণিজ্য ও রাজস্বের জন্যও পাঞ্জাবের গুরুত্ব স্বীকার্য। এ প্রদেশের মধ্য দিয়েই মুঘল বাদশাহেরা পারস্য ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। প্রথমদিকে যমুনা নদীর মধ্য দিয়ে বাণিজ্য-পণ্য আমদানী ও রপ্তানী হতো। কিন্তু মারাঠা ও বুন্দেলাদের বিদ্রোহের ফলে এ পথ বিপদসংকুল হয়ে পড়ে। সে সময়ে দিল্লী থেকে বেরিলি, লক্ষ্নৌ, জৌনপুর, বারাণসী, পাটনা হয়ে হুগলী ও মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো।

অযোধ্যার জমিদার ও মনসবদারেরা কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কেন্দ্রীয় শক্তির বিপর্যয়ের পূর্ণ সুযোগ নিতে তাঁরা উদ্যোগী হলেন। এই পরিস্থিতিতে অযোধ্যার সুবাদার অন্যান্য আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সাথে সমঝোতায় আসতে সচেষ্ট হলেন।

পাঞ্জাবের বিদ্রোহের মূল প্রেরণা ছিল মুঘল-স্বেচ্ছাচারিতা ও ধর্মনীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। ছোটখাটো জমিদার ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যেতো। আফগান আক্রমণ, মারাঠাদের পরাজয়—সব কিছু মিলিয়ে পাঞ্জাবে সৃষ্টি হয়েছিল দারুণ অরাজকতা।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মুঘল সাম্রাজ্যে বিপর্যয়ের জন্য প্রধানতঃ তিনটি কারণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন :

(ক) ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি ও দাক্ষিণাত্য অভিযান।
(খ) দুর্বল উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ।
(গ) অভিজাত শ্রেণীর নৈতিক অধঃপতন।

অধুনা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ঐতিহাসিক বলেন যে রাজনৈতিক ইতিহাস স্বতন্ত্র পথে চলতে পারে না। রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কলহ, কৃষি-ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ স্বরূপ, কৃষক-বিদ্রোহ (বিশেষতঃ অযোধ্যা ও পাঞ্জাবে)—এসব কারণের সূত্র অনুসন্ধান করলে মুঘল সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের কারণ ও সংকটের স্বরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব হবে।*

বৈদেশিক আক্রমণ

মুঘল সাম্রাজ্যের এই ঘোর দুর্দিনে পারস্যের সম্রাট নাদিরশাহ দিল্লী আক্রমণ করলেন (১৭৩৯ খ্রীঃ)। মুঘল বাদশাহদের দুর্বলতা এবং অভিজাতদের স্বার্থান্ধ

* আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র, ইরফান্ হাবিব, আলিগড় ঘরানার মুজাফ্ফর আলম রচিত 'Crisis of Empire in Mughul North India—Oudh and the Punjab'—সমালোচনা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫।১২।৮৬।

সংকীর্ণতায় ভারতের ইতিহাস তখন অন্ধকারের ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হচ্ছিল। নাদিরশাহের ভারত আক্রমণের ন' বছর পরে তাঁরই অন্যতম সেনাপতি দুররানী আহ্মদশাহ আবদালী ভারত আক্রমণ করলেন (১৭৪৮ খ্রীঃ)। ভারতের অফুরন্ত ধনরত্নের কাহিনীই বিদেশী আক্রমণকারীকে ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করেছিল।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদিরশাহ গজনী, কাবুল ও লাহোর জয় করে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। মুঘল বাদশাহ মহম্মদ শাহের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং দিল্লীর দরবারে নাদিরশাহের দূতদের অপমান—দিল্লী আক্রমণের কারণ বলে ঘোষণা করা হলো। পাণিপথের নিকটে কর্ণালে মুঘল-বাহিনী নাদিরশাহের আক্রমণে বিধ্বস্ত হলো। বাদশাহ সন্ধি-ভিক্ষা করলেন। বিজয়ী নাদিরশাহ সগৌরবে দিল্লীতে প্রবেশ করলেন। কিছুদিনের মধ্যে গুজব রটলো যে নাদিরশাহের মৃত্যু হয়েছে। মুঘলেরা তখন নাদিরশাহের কয়েকজন সৈনিককে হত্যা করলো। ক্রুদ্ধ নাদিরশাহ দিল্লী লুণ্ঠনের আদেশ দিলেন। অবাধ লুঠতরাজ, গৃহদাহ ও নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চললো।

সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে চাঁদনীচক্ আর জুম্মা মসজিদের নিকটবর্তী এলাকার প্রতিগৃহে অবাধ লুঠতরাজ, গৃহদাহ ও নির্বিচারে নরনারী-শিশু-বৃদ্ধ হত্যা চলেছিল। প্রায় দুমাস ধরে এই নারকীয় হত্যাকান্ড চলেছিলো। দিল্লী পরিত্যাগের সময় নাদির বিখ্যাত কোহিনূর সমেত বাদশাহের হীরা জহরত-মণি-মুক্তোর ভাণ্ডার সব উজার করে নিয়ে নিলেন। বাদশাহ শাহ্জাহানের ময়ূর সিংহাসনখানিও তিনি তুলে নিয়ে গেলেন।

১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হাতে নাদিরের মৃত্যুর পরে আবদালী বংশোদ্ভূত দুররানী (দুর্গের প্রধান) উপাধিধারী আহমদশাহ নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার, কাবুল আর পেশোয়ার জয় করে আহ্মদশাহ ভারত আক্রমণ করলেন। কিন্তু মহম্মদশাহের পুত্র যুবরাজ আহ্মদ-শাহের নিকট পরাজিত হলেন। মহম্মদশাহের মৃত্যুর পর আহ্মদশাহ দিল্লীর সম্রাট হলেন (১৭৪৮ খ্রীঃ)। দুররানী পুনরায় ভারত আক্রমণ করলেন। সম্রাট তাঁকে পাঞ্জাব ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। তিনি আরও চারবার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। চতুর্থবারে তিনি দিল্লী পৌঁছে গেলেন। সমৃদ্ধ শহর পুনরায় লুণ্ঠিত হলো। তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় আলমগীর—নামসর্বস্ব একজন বাদশাহ। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু আর সিরহিন্দ্ আবদালীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। আফগান ও মারাঠাদের চূড়ান্ত লড়াই হয়েছিল (১৪ই জানুয়ারী, ১৭৬১ খ্রীঃ) পাণিপথের প্রান্তরে। মারাঠারা পরাজিত হলেন। মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আবদালী ভেঙ্গে দিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবের শেষ রশ্মিটুকু অস্তমিত হলো। ইতিমধ্যে ভারতের উপকূল প্রদেশে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীসমূহের কুঠিগুলো আরও মজবুত হয়ে উঠলো। নতুন বিদেশী শক্তি অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে তাঁদের প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। ভারতে উদয় হলো বিদেশাগত তৃতীয় শক্তি—ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী।

॥ ১১ ॥

আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যের উত্থান

সপ্তদশ শতাব্দীর দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি শহর-নগরকে কেন্দ্র করে মুঘল ঐশ্বর্য-সম্পদের যে পরিচয় মিলবে তা দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর মুঘলযুগের বিচার করা চলবে না। তখন সকলেই বাদশাহের কৃপা-প্রার্থী। অভিজাতরা বাদশাহদের মন জুগিয়ে চলে সবকটা বড় চাকরির আশায় তাঁদের করুণা-লাভে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। সুবাদারী-লাভের পরে প্রদেশে ফিরে গিয়ে খানদানী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতেন তাঁরা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের পালা। পূর্ব থেকেই এ-ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছিল। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শক্তির পতন হলো। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্য দিল্লীতে চললো অভিজাতদের ষড়যন্ত্র; সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সুবাদাররা সম্পূর্ণ কর্তৃত্বলাভের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠলেন। প্রাদেশিক সুবেদাররা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তবে যে কারণেই হোক, দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করে তাঁরা চলতে চাইলেন। দাক্ষিণাত্য, বাংলা, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে সুবাদাররা স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠা করলেন।

আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যসমূহ

সুবে বাংলায় মুর্শীদকুলী খাঁ : ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব বিচক্ষণ রাজস্ব কর্মচারী মুর্শীদকুলী খাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেছিলেন। মুর্শীদকুলী খাঁ ছিলেন পারস্য থেকে আগত অন্যান্য বিদেশী অভিজাত কর্মচারীদের মধ্যে অন্যতম। নিজের কর্মকৃতিত্বেই তিনি বাদশাহের শুভেচ্ছা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে এসে দৌলতাবাদ, তেলেঙ্গানা, বেরার, খান্দেশ প্রভৃতি রাজ্যের রাজস্ব বিভাগ পরিচালনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি এ সমস্ত প্রদেশে রাজস্ব বিভাগের সংস্কারে রাজা টোডরমলের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি স্থানীয় প্রচলিত ব্যবস্থার অনেক সংস্কার সাধনও করেছিলেন। রাজস্ব বিভাগে তাঁর কৃতিত্ব ও সাফল্য আলোচনা করলে তাঁকে সমসাময়িককালের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিশারদ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

বাদশাহের মৃত্যুর মাত্র দু বছর পূর্বে তিনি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন (১৭০৫ খ্রীঃ)। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য জমিদারদের উপরে তিনি কঠোর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। প্রদেশে আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে তিনি ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন মোটেই বিবেচনা করতেন না। তাঁর শাসন ছিল অত্যন্ত কঠোর।

দিল্লীর বাদশাহদের সন্তুষ্ট করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইতিমধ্যে বাংলার উপকূল প্রদেশে বাণিজ্যের ব্যাপারে অনেক সুবিধা আদায় করে নিয়েছিলেন। ইংরেজ বণিকদের চাতুরী মুর্শীদকুলী খাঁ সহ্য করতেন না। প্রয়োজনমত তিনি কেন্দ্রীয় নির্দেশ অমান্য করতেও দ্বিধা করতেন না। বাণিজ্য-পণ্যের উপরে দেশীয় বণিকদের মত ইংরেজ কোম্পানীর দালাল ও কর্মচারীদেরও সমান শুল্ক দিতে তিনি বাধ্য করেছিলেন।

দিল্লীর বাদশাহের আনুগত্য মৌখিকভাবে স্বীকৃত হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা তখন একটি স্বাধীন রাজ্য হিসাবে গড়ে উঠেছিল। মুর্শীদকুলী খাঁর সময়ে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়।

নবাব সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খাঁ ও আলীবর্দী খাঁঃ মুর্শীদকুলী খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলার সুবাদার হলেন। তিনি বিহারপ্রদেশ বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সরফরাজ খাঁ বাংলার সুবাদার হলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে বিহারের শাসনকর্তা আলীবর্দী খাঁ সরফরাজকে রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। আলীবর্দী খাঁর আমলে বাংলার সুবা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়েছিল।

হায়দরাবাদে স্বাধীন নিজামশাহী

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম তিনদশকের মধ্যে কেন্দ্রীয় মুঘল শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজাম-উল্-মুল্ক হায়দরাবাদে স্বাধীন নিজামশাহীর প্রতিষ্ঠা করলেন।

নিজাম-উল্-মুল্কের পূর্ব নাম ছিল মীর কমরুদ্দীন চিন্-কিলিচ্-খান। তাঁর পূর্বপুরুষেরা বোখারা থেকে ভারতে এসেছিলেন। তিনি যখন দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর-প্রশাসনের একজন দায়িত্বশীল রাজকর্মচারী, তখন থেকেই তিনি মারাঠাশক্তির উত্থান প্রতিহত করতে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারের সংঘর্ষের সময়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। কিন্তু ফররুখসিয়ারের বাদশাহী লাভের সময়ে তিনি ছিলেন তাঁর পক্ষভুক্ত। নতুন বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে চিন্-কিলিচ্-খানকে "খানখানান্ ও নিজাম-উল্-মুল্ক ফতে জং" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের সুবাদারিও তিনি লাভ করলেন।

ভবিষ্যৎ গৌরবের সূচনাঃ দিল্লীতে তখন সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের অখণ্ড প্রতাপ। তাঁদেরই চক্রান্তে নিজামু-উল্-মুল্ককে দাক্ষিণাত্য থেকে প্রথমে মোরাদাবাদ এবং পরে মালবের সুবাদারি পদে স্থানান্তরিত করা হলো। এ সময় থেকেই তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নিজের ভবিষ্যৎ গৌরবের সূচনা করেন। বিচক্ষণ শাসক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠায় সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় সন্তুষ্ট ছিলেন না। মালব থেকে নিজামকে পুনরায় স্থানান্তরিত করার চক্রান্ত করা হলে নিজাম বিনাযুদ্ধে এ নির্দেশ মানতে রাজী হলেন না।

স্বাধীন নিজামশাহী ঃ সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের পরে বাদশাহী মস্‌নদে উপবেশন করলেন মহম্মদ শাহ। বাদশাহের উজীর বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হলেন নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক। কিন্তু দিল্লীর দরবারি রাজনীতি তাঁর পছন্দ হলো না। তিনি পুনরায় দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলেন। নিজামের বিচক্ষণতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বাদশাহ উপলব্ধি করেই তাঁর সুবাদারি পদের দাবী মেনে নিলেন ও তাঁকে 'আসফ জং' উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করেছিলেন। প্রবাদখ্যাত নৃপতি সুলেমানের মন্ত্রী আসফের ন্যায় পূর্ণ গৌরবের মর্যাদা লাভ করলেন নিজাম। মহম্মদ শাহের দুর্দিনে এক সময়ে বিজয়ী নাদির শাহ তাঁকে দিল্লীর মস্‌নদে স্থাপন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন—সবিনয়ে নিজাম তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় মারাঠারা ও ইউরোপীয় বণিকেরা নিজামকে সমীহ করে চলতেন। মুঘল বাদশাহের প্রতি নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করে প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকেই দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন নিজামশাহী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম্‌-উল্‌-মুল্‌কের মৃত্যু হয়।

অযোধ্যায় স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠা ঃ অযোধ্যার মন্‌সব্‌দারেরা পূর্ব থেকেই নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট ছিলেন। সুযোগ বুঝে অযোধ্যার সুবাদারেরা স্থানীয় মন্‌সব্‌দার ও আঞ্চলিক জমিদারদের সঙ্গে কিছুটা বোঝাপড়া করে স্বাধীন সুবাদারি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। অযোধ্যা সুবার পরিধিও ছিল বেশ বিস্তৃত; অযোধ্যা, বারাণসী, এলাহাবাদ এবং কানপুরের বিস্তৃত অঞ্চল নিয়েই সংগঠিত হয়েছিল অযোধ্যা সুবা।

সা-আদাত্‌-খান ও সফ্‌দর জং ঃ খোরাসানের অধিবাসী সা-আদাত্‌-খান ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার সুবাদারপদে নিযুক্ত হলেন। নাদিরশাহর আক্রমণের সময়ে তিনি দিল্লীর বাদশাহকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে (১৭৩৯ খ্রীঃ) তাঁর জামাতা সফ্‌দর জং হলেন পরবর্তী অযোধ্যার সুবাদার। প্রকৃতপকে সফদর জং-এর সময় থেকেই অযোধ্যায় স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠিত হয়।

হায়দর আলী

স্বাধীন মহীশূর রাজ্য প্রতিষ্ঠা ঃ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের পরে যাদব বংশীয় হিন্দু রাজারা শ্রীরঙ্গপত্তমে রাজধানী স্থাপন করে নতুন মহীশূর রাজ্য গঠন করেন। যাদব বংশীয় রাজা কৃষ্ণ রায়ের রাজত্বকালে রাজ্য-প্রশাসনে প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি নঞ্জরাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

হায়দর আলী ঃ হায়দর আলীর একজন পূর্বপুরুষ পাঞ্জাব হতে দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা নিজের বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে মহীশূরের রাজার অনুগ্রহ লাভ করে

সামরিক বিভাগে 'নায়ক' পদ লাভ করলেন। পরে তিনি 'ফৌজদার' পদেও উন্নত হয়েছিলেন। মহীশূর রাজা তাঁর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে বুদিকোটা নামক স্থানে তাঁকে কিছুটা জায়গীর দিলেন। এইখানেই হায়দরের জন্ম হয় (১৭২১, মতান্তরে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে)।

হায়দর আলী ধীরে ধীরে নিজের সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে মহীশূর রাজের প্রধানমন্ত্রীর সুনজর লাভে সমর্থ হলেন।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহীশূর রাজ্যের 'ফৌজদার' নিযুক্ত হলেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূরের রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি মহীশূর রাজ্য অধিকার করলেন। বিদেশী ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিরোধ করে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় হায়দর আলী ও তাঁর বীরপুত্র টিপু সুলতানের সংগ্রাম ভারত-ইতিহাসের একটি পরম উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শিখ শক্তির অভ্যুত্থান

গুরু নানক ঃ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে গুরু নানকের অভ্যুদয় একটি যুগান্তকারী স্মরণীয় ঘটনা। ধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি 'একেশ্বরবাদ' প্রচার করেছিলেন। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। 'শিখ' কথাটির অর্থ হলো 'শিষ্য'।

পাঞ্জাবের শিখেরা ছিলেন বীরের জাতি। গুরু নানকের পরবর্তী ধর্ম-গুরুদের প্রেরণায় জাতীয় চেতনায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ধর্ম-চেতনা রূপান্তরিত হলো জাতীয় চেতনায়। ধর্মগুরুরা ধীরে ধীরে জাতীয় নেতার স্থান অধিকার করে নিলেন।

গুরু নানকের তিরোধানের পরে শিখদের পরবর্তী গুরু হলেন অঙ্গদ (১৫৩৯-১৫৫২ খ্রীঃ)—নানকের অন্যতম প্রিয় শিষ্য। তাঁর মৃত্যুর পরে শিখদের পরবর্তী গুরুর পদ লাভ করলেন অমরদাস (১৫৫২-১৫৭৪ খ্রীঃ)। গুরু অঙ্গদ ও অমরদাসের আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং পবিত্র জীবন-যাপনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হ'য়ে অনেকেই নতুন ধর্মে দীক্ষিত হন। চতুর্থ গুরু রামদাসের (১৫৭৪-১৫৮১ খ্রীঃ) পরধর্মসহিষ্ণুতা বাদশাহ আকবরকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে রামদাসকে যে ভূমিখণ্ড দান করেন সেখানেই নির্মিত হলো অমৃতসরের প্রসিদ্ধ সুবর্ণ মন্দির বা গুরুদ্বার। রামদাসের সময় থেকেই শিখদের ধর্মগুরুর পদ বংশানুক্রমিক হতে থাকলো।

অর্জুনমল (১৫৮১-১৬০৬ খ্রীঃ) ঃ পঞ্চম গুরু অর্জুন মলের সময়ে শিখদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাজার মত সভাসদ পরিবৃত হয়ে তিনি বসতেন এবং শিষ্যদের পরিচালনা করতেন। গুরু অর্জুনই শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'আদিগ্রন্থের' সংকলন করেছিলেন। এই ধর্মগ্রন্থে পূর্বের গুরুদের বাণীসমূহ সংকলিত হয়। প্রসিদ্ধ হিন্দুধর্ম-সংস্কারক ও মুসলমান সন্তদের কিছু কিছু মূল্যবান উপদেশও এই ধর্মগ্রন্থে সংযুক্ত করা হয়েছে। এসময় থেকেই শিখেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন

মত মুঘল শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতেন। জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে সাহায্য করার জন্য গুরু অর্জুন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। গুরু অর্জুনের প্রতি এই নৃশংস আচরণে শিখেরা মুঘলদের শত্রুতে পরিণত হয়।

গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-১৬৪৫ খ্রীঃ) ঃ অর্জুনের পুত্র গুরু হরগোবিন্দের সময়ে মুঘলদের সঙ্গে শিখদের সম্পর্কের উন্নতি হয়নি। শাহজাহানের সঙ্গে হরগোবিন্দের কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছিল কিন্তু শিখেরা পরাজিত হয়েছিল।

গুরু তেগবাহাদুর (১৬৬৪-৭৫ খ্রীঃ) ঃ নবমগুরু তেগবাহাদুর হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। ক্রুদ্ধ বাদশাহ তাঁকে দিল্লীতে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। সম্রাট তাঁকে নির্দেশ দিলেন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে। উত্তরে তেগবাহাদুর বলেছিলেন—" 'শির' দিয়া 'সার' না দিয়া।" অর্থাৎ আমি শির দেব কিন্তু সার দেব না। জল্লাদের হাতে তাঁর শিরশ্ছেদ হলো। তেগবাহাদুরের আত্মত্যাগে শিখদের মধ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হলো।

গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮ খ্রীঃ) ঃ দশম ও শেষ গুরু হলেন তেগবাহাদুরের পুত্র গুরু গোবিন্দ সিংহ। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে শিখদের চরম শত্রুতা চলতে থাকে।

গুরু গোবিন্দ সিংহ

গুরু গোবিন্দ শিখদের পুরোপুরি সামরিক প্রথায় সংগঠন করেন। তিনিই শিখ 'সিংহ'দের ধর্মসঙ্ঘ-'খালসার' প্রবর্তন করেন। দীক্ষিত শিখদের 'সিংহ' উপাধি দেওয়া হলো। গুরু গোবিন্দ তাঁদের কেশ, কচ্ছ (ছোট পাজামা), কড়া (লৌহ বলয়), কৃপাণ ও কাঙ্গা (চিরুনী) ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। শিখেরা যুদ্ধের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে। গুরু গোবিন্দের শিক্ষার ফলে শিখেরা এক সামরিক জাতিতে পরিণত হলো। তাঁর রচিত 'দশম্ পাদ্শাহ' গ্রন্থখানিতে শিখদের প্রতি বিশেষ কয়েকটি উপদেশ পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

মারাঠা শক্তির বিস্তার

শিবাজীর মৃত্যুর পরে মারাঠাদের ইতিহাসে ঘোর দুর্দিন দেখা দিয়েছিল। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী মুঘল বাহিনীর কাছে পরাজিত ও নিহত হলেন। শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহু বন্দী হলেন। এই সময়ে শিবাজীর জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত মারাঠা সামন্তেরা শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারামকে রাজা বলে স্বীকার করে মুঘলের

বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁর শেষ শক্তি নিঃশেষ করেও দাক্ষিণাত্যের মারাঠা অভ্যুত্থানের উত্তাল তরঙ্গ রোধ করতে পারেননি। সম্রাটের মৃত্যুর পরে শম্ভুজীর পুত্র শাহু মুক্তিলাভ করে মারাঠাদের রাজা হলেন। তখন মহারাষ্ট্রে শিবাজীর বংশধরদের মধ্যে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে কিছুদিন অন্তর্বিপ্লব

চলেছিল। কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথ নামে একজন চিৎপাবন-বংশীয় বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের সাহায্যে শাহু রাজপদে অধিষ্ঠিত হলেন। কৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি বালাজী বিশ্বনাথকে পেশোয়া পদে নিযুক্ত করে তাঁর উপরে রাজ্য-শাসনের সকল দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের পর থেকে পেশোয়াদের বংশানুক্রমিক রাজ্য-

পরিচালনায় মারাঠাশক্তি দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠলো। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই মারাঠা প্রশাসনে 'পেশোয়া-তন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৪-১৭২০ খ্রীঃ) ঃ পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ তদানীন্তন মুঘল বাদশাহ ফররুখশিয়ারের নিকট হতে একটি ফরমান্ লাভ করে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা – খান্দেশ, বিদর, বেরার, বিজাপুর, হায়দরাবাদ ও ঔরঙ্গবাদ থেকে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হন। বিনিময়ে বাদশাহকে বার্ষিক দশলক্ষ টাকা কর ও যুদ্ধের সময় পনের হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্য দিতে বালাজী স্বীকৃত হলেন। এই ব্যবস্থা বালাজীর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বালাজীর চেষ্টায় দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০ খ্রীঃ) ঃ ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। পেশোয়াদের মধ্যে তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। বাজীরাও অতি সহজেই উপলব্ধি করেন যে মুঘল সাম্রাজ্য একটি মৃত শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য আঘাতেই তাকে ভূপাতিত করা যাবে।*

হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উত্তম সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। তাই তিনি 'হিন্দুপাদ-পাদশাহী' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতের হিন্দুরাজশক্তিকে সংহত করতে উদ্যোগী হলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ডে মারাঠাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাবাহিনী দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হলো। মুঘল বাদশাহ মহম্মদশাহ অত্যন্ত ভীত হয়ে হায়দরাবাদের নিজাম উল্-মুল্কের সাহায্যে মারাঠাদের অগ্রগতি প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলেন। মারাঠা বাহিনীর হস্তে নিজামী সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় মারাঠা আধিপত্য মুঘল বাদশাহকে স্বীকার করে নিতে হলো। পেশোয়াকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেওয়ার শর্ত হয়। অন্যদিকে মারাঠা নৌ-বাহিনী পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে সালসেট্ ও বেসিন বন্দর অধিকার করে নেয়। কিন্তু পারস্য-সম্রাট নাদিরশাহের ভারত আক্রমণের ফলে ঘটনাস্রোত ভিন্ন দিকে ঘুরে যায়। নাদিরশাহের ভারত আক্রমণের সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে বাজীরাও যখন হিন্দু-মুসলমানদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর মৃত্যু হয় (১৭৪০ খ্রীঃ)।

প্রথম বাজীরাও-এর ভ্রান্ত-নীতি ঃ পেশোয়া প্রথম বাজীরাওয়ের কাজে কিছু কিছু রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। উত্তরভারতে মারাঠা-শক্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে প্রকৃত পরাক্রান্ত

* 'Let us strike on the trunk of the withering tree. The branches will fall of themselves. Thus should the Marhatta flag fly from the Krishna to the Indus'—Baji Rao I, Advanced History of India, p. 538.

নিজামের শক্তির মূল্য স্বীকার করেন নাই। দক্ষিণে ভারতের উপকূল-প্রদেশে ইংরেজ বণিক কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান শক্তিও তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এ দুটি শক্তিকে দমন করা তাঁর অসাধ্য ছিল না। তাঁর এই ভুলের ফলেই ভবিষ্যতে মারাঠা-শক্তির পতনের সূত্রপাত হয়। ভারতে মুসলমান প্রভুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর হিন্দু সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে একটি দুঃস্বপ্ন বললে অত্যুক্তি করা হবে না। ভারতের বেশ কিছু মুসলমান শক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেন নাই। তাঁরা আফগান আহ্‌মদশাহ আবদালীকে সমর্থন করেছিলেন, হিন্দুরাজারাও তাঁর প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন। মারাঠা সামন্তদের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রতিও তিনি নজর দিতে সমর্থ হন নাই।

মারাঠাদের পাঁচটি সামন্ত রাজ্য : শিবাজীর অন্যতম পুত্র রাজারামের সময় থেকেই মারাঠা রাজ্যে সামন্ত বা জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন হয়েছিল। মারাঠা রাজ্যের অভ্যন্তরেই স্বাধীন সামন্ত রাজ্য সৃষ্টি হওয়াতে মারাঠাদের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পেশোয়া বাজীরাও সামন্তশক্তির উত্থানের পরিণাম তেমন উপলব্ধি করতে সমর্থ হন নাই।

বেরার রাজ্যে রঘুজী ভোঁসলা, বরদায় গাইকোয়ার, গোয়ালিয়রে রনোজী সিন্ধিয়া, ইন্দোরে মলহররাও হোলকার, মালবের ধারায় মারাঠা পবার-শক্তি—এই পঞ্চ মারাঠা সামন্ত শক্তি ধীরে ধীরে নিজেদের এলাকায় প্রভুত্ব বিস্তার করতে থাকেন। মারাঠা শক্তিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রবেশ করার ফলেই ভবিষ্যতে মারাঠা শক্তির পতনের সূত্রপাত হয়।

বালাজী বাজীরাও (১৭৪০-১৭৬১ খ্রীঃ) : প্রথম বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। পিতার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার যোগ্য উত্তরাধিকারী তিনি ছিলেন না। তখন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে। এই বিশাল সাম্রাজ্যের শবের উপরে শকুনি-গৃধিনীর যে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছিল, বালাজী বাজীরাও তাতে অংশ গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হলেন। বাজীরাওয়ের হিন্দু পাদ-পাদ্‌শাহীর আদর্শ পরিত্যক্ত হয়।

মারাঠা বাহিনী সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করলো। পেশোয়ার ভ্রাতা রঘুনাথ রাও ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব দখল করেন। মারাঠা নৌ-বহরও এ সময়ে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১ খ্রীঃ) : দুর্‌রানী আহমদশাহ মারাঠা বাহিনী কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকৃত হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। অযোধ্যা ও উত্তর ভারতের অন্যান্য মুসলমান শক্তি মারাঠাদের অত্যাচারে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। মুসলমান নবাবেরা আহমদ্‌শাহকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তাঁকে প্রয়োজন মত সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। আহ্‌মদশাহ পানিপথের প্রান্তরে শিবির সংস্থাপিত করে মারাঠা আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পেশোয়া আফগানদের বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। মারাঠা সেনাপতিদের মধ্যে আত্ম-কলহের ফলে শেষ পর্যন্ত পেশোয়ার সপ্তদশ বৎসরের পুত্র বিশ্বাস রাও প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হলেন। তাঁর প্রধান উপদেষ্টা হলেন

পেশোয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিবরাও ভাউ। আহ্মদশাহ এই যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব ও রোহিলাদের সাহায্যলাভ করেন। রাজপুত ও শিখেরা মারাঠাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ থাকায় নিরপেক্ষ রইলেন। পুনা হতে পানিপথ পর্যন্ত দীর্ঘপথে রসদ ও খাদ্য সরবরাহ প্রায় অসম্ভব ছিল। কোন মিত্র-শক্তির সাহায্যও মারাঠারা পেলেন না। মারাঠা শিবিরে খাদ্যাভাব দেখা দিল এবং মারাঠারা বাধ্য হয়ে আফগান বাহিনীকে আক্রমণ করলেন (১৪ই জানুয়ারী, ১৭৬১ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত। মারাঠারা এই যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করলেও সমতল ভুমিতে আফগান বাহিনীর তীব্র গতি প্রতিরোধে সমর্থ হলেন না। পানিপথের প্রান্তরে শোচনীয়ভাবে মারাঠাবাহিনী পরাজিত হলো। বিশ্বাসরাও, সদাশিবরাও প্রভৃতি মারাঠা সেনানায়কেরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। বিপুল সংখ্যক মারাঠা সৈন্য যুদ্ধে নিহত ও আহত হয়। এই নিদারুণ পরাজয়ের সংবাদে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব ঃ মারাঠা শক্তি পানিপথের যুদ্ধে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় নাই। আবদালীর পক্ষে ভারতে আধিপত্য স্থাপনও সম্ভব ছিল না। এমনকি পাঞ্জাবে শিখেরাও বিদেশী আফগান-প্রভুত্ব মানতে রাজী হলো না। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারাই দ্বিতীয় শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তির যে ক্ষতি হলো পরবর্তীকালে মারাঠাশক্তির পক্ষে সেটা আর পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। পাঞ্জাবে মারাঠা শক্তি বিনষ্ট হওয়ার ফলে মারাঠাদের উপর কোন ভারতীয় শক্তিই আর নির্ভর করার মত সাহস পেলো না। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মারাঠাদের যে প্রতিপত্তি ও খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল, ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের পরে তা উদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনা রইলো না।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। মারাঠাদের পরাজয়ের ফলে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল ইংরেজ শক্তি। ভারতের ভাগ্যাকাশে ইতিমধ্যেই ইংরেজ শক্তির উত্থান ঘটেছিল। পানিপথে মারাঠাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে ভারতে তৃতীয় শক্তির উত্থানের পথে আর কোন বাধা রইলো না। মুঘল-শক্তি কোন সময়েই শক্তিশালী নৌ-বহর গঠনে সমর্থ হয় নাই। অন্যদিকে বিশাল নৌ-বহিনীর অধিকারী ছিল ইংরেজ শক্তি। একটি বিদেশী তৃতীয় শক্তির উত্থানের কাহিনীই হলো পরবর্তী ভারত-ইতিহাসের কথা।

॥ ১২ ॥

ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর বাণিজ্য সম্প্রসারণ

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি সংঘর্ষ

ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ঘটেছিল সমুদ্রপথে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। ভারতের উপকূল অঞ্চলে পর্তুগীজ বণিকদের কুঠি নির্মিত হয়েছিল। তাঁদের প্রভাবপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলেও শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজ শক্তি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল—তাও আমরা জেনেছি।

ওলন্দাজ বণিক্ গোষ্ঠী : পর্তুগীজদের পরে ডাচ্ বা ওলন্দাজ এবং ডেন বা দিনেমারেরা ভারতের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করেন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজের 'ইউনাইটেড্ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী' নামে একটি সওদাগরী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। ইতিমধ্যে ওলন্দাজেরা পর্তুগীজদের অনেক উপনিবেশ দখল করে ফেললেন। সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, মালয় প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ওলন্দাজদের বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। কিন্তু ইংরেজদের নৌ-শক্তির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওলন্দাজেরা সুবিধা করতে পারলেন না। পর্তুগীজেরা ছিল ক্যাথালিক। পরবর্তী ওলন্দাজ ও ইংরেজরা ছিল প্রোটেস্টান্ট্। ভারতীয় বাণিজ্যে এই তিন-শক্তির প্রতিযোগিতায় ধর্মমতের পার্থক্য লক্ষ্য করার মত। সামুদ্রিক বাণিজ্যে পর্তুগীজদের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল ওলন্দাজ শক্তি। ওলন্দাজেরা পর্তুগীজদের হটিয়ে দেওয়ায় ইংরেজদের সুবিধা হয়েছিল। ধর্মমতে এক হলেও বাণিজ্যিক স্বার্থে ইংরেজ ওলন্দাজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু কোন সময়েই কম ছিল না।

ভাস্কো-ডা-গামা

দিনেমার : বাণিজ্যের স্বার্থে দিনেমারেরা ভারতে এসে তাঞ্জোর জেলায় ট্রান্‌কুইবার (Tranquebar)-এ প্রথমে একটি কুঠি স্থাপন করেছিলেন (১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে)। শ্রীরামপুরে কুঠি নির্মিত হল (১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে)। ভারতের বাণিজ্যে তেমন কোন সুবিধা করতে না পেরে ব্রিটিশদের কাছে দিনেমারের সব কুঠিগুলি বিক্রী করে দিলেন (১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে)।

ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী : ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ভারতীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী' নামে

একটি বাণিজ্য সংস্থা লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়—তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। ওলন্দাজেরা ইন্দোনেশিয়াতে তাঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র সরিয়ে নেওয়ায় পরোক্ষভাবে ভারতে ইংরেজদের বাণিজ্য বিস্তারে ও প্রভুত্ব অর্জনে তা সাহায্য করেছিল।

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংল্যান্ডের রাজদূত হিসাবে এসেছিলেন স্যার টমাস্ রো (১৬১৫ খ্রীঃ)। তিনি বিচক্ষণ ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে সন্তুষ্ট করে তাঁর অনুগ্রহে সুরাটে ইংরেজদের একটি বাণিজ্য-কুঠি প্রতিষ্ঠায় তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে পর্তুগীজ এবং ওলন্দাজ-শক্তির ন্যায় স্বার্থ-সংঘর্ষে লিপ্ত হলে ইংরেজ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সমঝোতা রক্ষা করে শুধুমাত্র বাণিজ্য বৃদ্ধির দিকেই ইংরেজ বণিক কোম্পানীর অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। দেশীয় অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়লে ইংরেজদের সমূহ ক্ষতি হবে।

১৬৩৯ সালে ফ্রান্সিস-ডে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট থেকে মাদ্রাজের ইজারা লাভ করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বোম্বাইতেও ইংরেজরা কুঠি নির্মাণে সমর্থ হয়েছিলেন —এ প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

১৬৮৬ সালে বাদশাহী শক্তির সাথে বিবাদের ফলে হুগলী, বালেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ইংরেজরা বিতাড়িত হয়ে এক সময়ে হুগলী নদীর মোহনায় জাহাজে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের অনুগ্রহে বিরোধের অবসান ঘটলো। কোম্পানীর বিচক্ষণ এজেন্ট জব চার্ণক হুগলী নদীর তীরে সুতানুটীতে একটি কুঠি নির্মাণ করলেন (১৬৯০ খ্রীঃ)। এইভাবেই সূত্রপাত হলো কলকাতা মহানগরীর। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আত্মরক্ষার অজুহাতে ইংরেজরা সুতানুটিতে 'ফোর্ট উইলিয়াম' দুর্গটি নির্মাণ করলেন। দুবছর পরে ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক বারোশ টাকা খাজনার বিনিময়ে কোম্পানী সুতানুটি, কলিকাতা (কালিঘাটা) ও গোবিন্দপুর—এ তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব লাভ করলেন। ফোর্ট উইলিয়ামকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে পাটনা, হুগলী, কাশিমবাজার, মালদহ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ কোম্পানীর আরও কুঠি গড়ে উঠতে থাকে।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমগ্র জলপথে ইংরেজ নৌ-শক্তির আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে পড়লো। ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ নিয়ে বিব্রত, তখন সুচতুর ইংরেজ সুযোগ বুঝে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করলেন।

ফরাসী ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ঃ ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের অভিপ্রায়ে ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুইয়ের বিচক্ষণ মন্ত্রী কোলবার্টের উদ্যোগে ফরাসী ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সিস্ ক্যারোন (Francis Caron) নামে একজন ফরাসী সুরাটে প্রথম কুঠি স্থাপন করলেন (১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে)। মসুলীপত্তমেও তিনি ফরাসীদের কুঠি স্থাপন করলেন (১৬৬৯

খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে); গোলকুন্ডার নবাবের নির্দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি তিনি লাভ করলেন। ফ্রাংকোয়া মার্টিন ও বেলেঞ্জার লেস্‌পিনে নামে দুজন ফরাসী বণিক তদানীন্তন মুসলমান শাসনকর্তার নিকট থেকে ভারতের পূর্ব উপকূলে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ইজারা নিলেন। এখানেই ফরাসীদের সুবিখ্যাত উপনিবেশ পন্ডিচেরী গড়ে উঠলো।

ফাংকোয়া মার্টিনের বিচক্ষণতায় পন্ডিচেরী ও তার পার্শ্ববর্তী স্থান একটি সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয়। এদিকে হুগলী জেলার চন্দননগরে ফরাসী কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে ঢাকা, কাশিমবাজার, বালেশ্বর, পাটনা ও কালিকটে ফরাসী কুঠি স্থাপিত হতে থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে মাহে এবং কারিকলও ফরাসীদের অধিকারে আসে। পন্ডিচেরী, চন্দননগর, মাহে ও কারিকল—এ চারটি উপনিবেশে ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো।

কর্ণাটক ঃ দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূল বা করমন্ডল উপকূল ও তার সন্নিহিত অঞ্চলকে ইউরোপীয় বণিকেরা কর্ণাটক (Cornatic) নামে অভিহিত করতেন।* বিরাট সমুদ্র উপকূলে নৌবাহিনীর প্রাধান্য সহজেই গড়ে উঠলো। ইংরেজ ও ফরাসী বণিকেরা এ অঞ্চলে বাণিজ্য-সম্প্রসারণের জন্য নতুন নতুন শহর বন্দর গড়ে তুললেন। মাদ্রাজ হলো ইংরেজদের সামরিক ঘাঁটি এবং পন্ডিচেরী হলো ফরাসীদের সামরিক ঘাঁটি। দুপক্ষই এসব অঞ্চলে দুর্গ নির্মাণ করে নিজেদের সুরক্ষিত করতে উদ্যোগী হলেন।

দাক্ষিণাত্যের নিজাম-উল্-মুল্কের শাসনাধীনে ছিলো কর্ণাটক। কিন্তু নিজামের উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও দুর্বলতার সুযোগে 'আর্কট'কে রাজধানী করে এখানে স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠা করলেন দোস্ত আলী। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা বাহিনী কর্ণাটক লুণ্ঠন করলো, দোস্ত আলী নিহত হলেন, তাঁর জামাতা চাঁদাসাহেব সাতারার দুর্গে বন্দী হলেন। দোস্ত আলীর পুত্র সফ্দরআলী মারাঠাদের এক কোটি টাকা দানের বিনিময়ে কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করলেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের ফলে তিনিও নিহত হলেন। এ অবস্থার সুযোগে নিজাম পুনরায় কর্ণাটকে প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যে আনোয়ার উদ্দীন নামে তাঁর এক বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীকে কর্ণাটকের নবাবী পদে বসালেন। দোস্ত আলীর বংশধরেরা একাজে অসন্তুষ্ট হলেন। তাছাড়া কর্ণাটকের বেশ কয়েকটি দুর্গ তখনও তাঁদের অধিকারে ছিল।

ইংরেজ ও ফরাসী বণিক কোম্পানী কর্ণাটকের রাজনৈতিক অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে কেবলমাত্র সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

* "'Cornatic'—the name given by the Europeans to the Coromandel Coast and its hinterland." —Advanced History of India. p. 637, Reprinted 1973-1973.

পাঁণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা ডুপ্লেঃ ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্লে পাঁণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান উচ্চাভিলাষী কূটনীতিবিদ, বিচক্ষণ শাসনকর্তা। দেশীয় শক্তিগুলির দুর্বলতা লক্ষ্য করে তিনি ভাবলেন যে, ইউরোপীয় সামরিক কর্মচারীদের সাহায্যে ভারতীয় সিপাহীদের শিক্ষিত করে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত করতে পারলে অনায়াসে দেশীয় রাজ্যগুলিকে পরাজিত করা সহজ হবে।

ডুপ্লে

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (১৭৪০-১৭৪৮ খ্রীঃ)ঃ কোথায় ইউরোপের অস্ট্রিয়া, কোথায় বা ভারতের কর্ণাটক! কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি-পরীক্ষার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কেন্দ্রস্থল হলো কর্ণাটক এবং দক্ষিণভারতের উপকূলবর্তী কয়েকটি শহর-বন্দর।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়াধিপতি সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা মেরিয়াথেরেসার সিংহাসন-দাবী সমর্থন করলেন ইংলণ্ডের রাজসরকার। পূর্ব থেকেই ফরাসী রাজশক্তির সঙ্গে অস্ট্রিয়ার রাজশক্তির শত্রুতা চলছিলো। মেরিয়াথেরেসার সিংহাসনের দাবীর বিরোধিতা করলেন ফরাসী সরকার। ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিসমূহ নিজেদের সুবিধা মত কোন এক পক্ষকে সমর্থন করলেন। এ নিয়েই অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধের প্রারম্ভ এবং দীর্ঘ আট বছর অবিরত যুদ্ধের পর ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আয়-লা-শ্যাপেলের (Aix-la-Chapella) সন্ধির ফলে সাময়িকভাবে শান্তি স্থাপিত হলো।

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি সংঘর্ষ

প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধঃ ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ব থেকেই চলছিল। ইউরোপের যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে এই দুই ইউরোপীয় শক্তি দক্ষিণ ভারতেও শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী অধিকৃত মরিসাস্ দ্বীপ থেকে ফরাসী সেনাপতি লাবুরদনের নেতৃত্বে এক ফরাসী নৌবাহিনী ইংরেজ অধিকৃত মাদ্রাজ শহর দখল করলেন।

কর্ণাটকের নবাব আনোয়ার উদ্দিন আশা করলেন যে ফরাসীরা তাঁকেই মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ করবেন। পাঁণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা ডুপ্লে তখন ইংরেজ শক্তিকে বিধ্বস্ত করার পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন। মাদ্রাজ শহর তিনি নবাবকে ছেড়ে দিলেন না। ক্রুদ্ধ নবাব ফরাসীদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন। ফরাসী সামরিক প্রথায়

শিক্ষিত মাত্র পাঁচশো সৈন্যের কাছে নবাবের দশ হাজার সৈন্য শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। এই প্রকারে ডুপ্লের নীতি কার্যকরী হওয়ায় তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ: হায়দরাবাদে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম আসফ্‌জা নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের মৃত্যু হলে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ ও দৌহিত্র মুজাফ্‌ফরজঙ্গ উভয়েই হায়দরাবাদের সিংহাসন দাবী করলেন। এদিকে কর্ণাটকের সিংহাসনের জন্য বর্তমান নবাব আনোয়ারউদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন চাঁদাসাহেব নামে কর্ণাটকের ভূতপূর্ব নবাব দোস্ত আলীর জামাতা। ডুপ্লে মজাফ্‌ফরজঙ্গ ও চাঁদাসাহেবের সঙ্গে যোগ দিলেন। অপরদিকে নাসিরজঙ্গ ও আনোয়ারউদ্দিনের পক্ষ সমর্থন করলেন ইংরেজরা।

প্রথমদিকে ডুপ্লে এবং তাঁর মিত্রপক্ষেরই জয় হতে লাগলো। নাসিরজঙ্গ আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন। এবং মুজাফ্‌ফরজঙ্গ ফরাসীদের সাহায্যে নিজামের সিংহাসনে উপবেশন করলেন (১৭৫০ খ্রীঃ)। দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলো। ডুপ্লে এক বিশাল অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। মসুলিপত্তন বন্দর ফরাসীদের অধিকারে এলো। মুজাফ্‌ফরজঙ্গ বেশিদিন নিজামী ভোগ করতে পারলেন না বটে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ফরাসী সেনাপতি বুসী সালাবৎজঙ্গ নামে নিজামের আর এক পুত্রকে হায়দরাবাদের সিংহাসনে বসালেন। বুসী সসৈন্যে হায়দরাবাদে অবস্থান করতে লাগলেন। ফরাসী সৈন্যদের ব্যয়নির্বাহের জন্য করমণ্ডল উপকূলের পাঁচটি জেলার (উত্তর সরকার) রাজস্ব সংগ্রহের ভার ফরাসীদের উপর অর্পণ করে নিজাম একটি চুক্তি করলেন (১৭৫৩ খ্রীঃ)।

কর্ণাটকের নবাবী পদের দাবীদার ইংরেজ-আশ্রিত মহম্মদ আলী (নবাব আনোয়ার-উদ্দিনের পুত্র) ত্রিচিনপল্লীতে চাঁদাসাহেব এবং ফরাসী সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হলেন। এই প্রকারে ডুপ্লের পরিকল্পনা যখন প্রায় সিদ্ধিলাভের পথে তখন রবার্ট ক্লাইভ নামে ভারতে একজন প্রতিভাশালী ইংরেজ সেনাপতির অভ্যুদয় হলো।

রবার্ট ক্লাইভ

রবার্ট ক্লাইভ ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৭ বছর বয়সে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সামান্য একটি কেরানীর চাকরি নিয়ে এদেশে এসেছিলেন। পরে তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগ দিলেন। মাত্র শ-দুয়েক ইংরেজ এবং শ-তিনেক ভারতীয় সিপাহী নিয়ে তিনি অতর্কিতে কর্ণাটকের রাজধানী আর্কট অবরোধ করে দখল করে নিলেন। চাঁদাসাহেবের পুত্র আর্কট উদ্ধার করতে এসে ক্লাইভের হাতে পরাজিত হলেন। দীর্ঘ পঞ্চাশদিন ধরে অবরোধ সত্ত্বেও ক্লাইভ আর্কট রক্ষায় সমর্থ হলেন। অতঃপর তিনি ত্রিচিনপল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। চাঁদাসাহেব এবং ফরাসীদের

সম্মিলিত বাহিনী তাঁর নিকট পরাজিত হলো (১৭৫২ খ্রীঃ)। ইংরেজদের মিত্র মহম্মদ আলি পুনরায় কর্ণাটকের নবাব হলেন।

ক্লাইভ

ক্লাইভের বিজয়ের পরে ডুপ্লের ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের সকল পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ফরাসী সরকার তাঁকে দেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন (১৭৫৪ খ্রীঃ)। দেশে ফেরার পর তিনি তাঁর কাজের কোনই পুরস্কার পেলেন না। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সঞ্চয় পর্যন্ত অকাতরে ব্যয় করেছিলেন। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর শেষ জীবন কেটেছিল। ফ্রান্সেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ ঃ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে বিখ্যাত 'সপ্তবর্ষ যুদ্ধ' (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) শুরু হলে এদেশে দাক্ষিণাত্যেও ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফরাসী সরকার কাউন্ট লালীকে প্রধান সেনাপতি এবং শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান।*

কাউন্ট লালী ফরাসী সরকারের প্রধান শাসনকর্তা ও সেনাপতি হিসাবে পণ্ডিচেরীতে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু ডুপ্লের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতা সত্ত্বেও যে পুরস্কার তিনি দেশীয় সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তাতে লালীর পক্ষে নতুন উদ্যমে কাজ করার মত কোন অনুপ্রেরণা ছিল না। লালীর বীরত্ব ও সাহসিকতার অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি ছিলেন অবিবেচক, বদমেজাজী, হঠকারী। তিনি তাঁর সহযোগীদের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করার প্রয়োজনও মনে করতেন না। ফরাসীদের পণ্ডিচেরীর শাসন-ব্যবস্থায় এ সময়ে নানা গলদ প্রবেশ করেছিল। একদিকে শাসন-ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন, অন্যদিকে দুর্ধর্ষ ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে গেলে যে অসাধারণ শক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, দুঃখের বিষয়, তার কোনটারই তিনি অধিকারী ছিলেন না। পক্ষান্তরে তাঁর অধঃস্তন কর্মচারীরা তাঁর কাজে এতই বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থতার অপবাদ মাথায় নিয়ে দেশে ফিরে দেশবাসীর কাছে অভিযুক্ত হলেই তাঁরা যেন সুখী হতেন। এক কথায়, ফরাসীদের ভাগ্যলক্ষ্মী সব দিক থেকেই তাঁদের উপরে বিরূপ হয়েছিলেন। লালী ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে এসে প্রথমে ইংরেজদের সেন্ট ডেভিড্ দুর্গ দখল করে নিলেন। মাদ্রাজ জয়ের উদ্দেশ্যে কাউন্ট লালী সেনাপতি বুসীকে হায়দরাবাদ থেকে সরিয়ে আনেন। বুসীর হায়দরাবাদ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ফরাসী-প্রভাব অবলুপ্ত হয়। লালী

* The Cambridge Shorter History of India, Dodwell, p. 334.

মাদ্রাজ আক্রমণ করলেন। কিন্তু ইংরেজ নৌবাহিনী তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচেরী ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। সেই বছরেই ইংরেজ সেনাপতি স্যার আয়ারকুট বন্দীবাসের যুদ্ধে লালীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করলেন (১৭৬১ খ্রীঃ)।

ইংরেজেরা নয় মাস পণ্ডিচেরী অবরোধ করে কামানের গোলায় বিধ্বস্ত করলেন। জিঞ্জি এবং মাহের পতন হলো। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসানে ফরাসীরা তাঁদের উপনিবেশগুলি ফিরে পেলেও দক্ষিণভারতে তাঁদের প্রাধান্যের অবসান ঘটলো। এদেশে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পথে ইংলন্ডের একটি মস্ত বড় বাধা দূর হলো।

ফরাসীদের ব্যর্থতা ঃ ইংরেজদের সাফল্যের মূলে ছিলো—ইংলন্ডের নৌ-শক্তি, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাহায্য, ও সহযোগিতা, ক্লাইভ প্রভৃতি ইংরেজ সেনাপতির রণ-দক্ষতা ও বিচক্ষণতা এবং বাংলায় ইংরেজদের প্রভুত্বলাভ।

অন্যদিকে ভারতে ফরাসী শক্তির পক্ষে ছিল নৌ-শক্তির অভাব, দেশীয় ফরাসী সরকারের অসহযোগিতা, ডুপ্লে প্রভৃতি ফরাসী-শাসকদের সাম্রাজ্য স্থাপনে অত্যধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তার ফলে বাণিজ্য সম্প্রসারণে হতোদ্যোগ এবং ভারতে যুদ্ধরত ফরাসী সেনানায়কদের পূর্ব রণনৈপুণ্যের ব্যর্থতা।

ইংলন্ডের নৌ-বাহিনী ছিলো অপরাজেয়। করমণ্ডল এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ইংরেজরা তাঁদের শক্তিশালী নৌ-ঘাটি গড়ে তুলেছিলেন। অন্যদিকে করমন্ডলের বিস্তীর্ণ উপকূলে ফরাসী-নৌ-শক্তির অস্তিত্ব বজায় রাখতে নির্ভর করতে হতো বহির্ভারতে ফরাসী অধিকৃত কয়েকটি দ্বীপের নৌ-বহরের উপরে। ফরাসী দেশ থেকে কোন শক্তিশালী নৌ-বহর ভারতে প্রেরণের আশা ছিলো সুদূরপরাহত। সুদীর্ঘ নৌ-পথে তখনও ইংরেজ নৌ-বাহিনীর কর্তৃত্ব অব্যাহত ছিলো।

রাজ্য-জয়ের নেশায় ডুপ্লে তখন প্রায় উন্মত্ত। কিন্তু ইংরেজরা বাণিজ্য বিস্তারেই বেশি মনোযোগী ছিলেন। ইংলন্ডের পার্লামেন্টও ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীকে নানা সনদ দিয়ে বাণিজ্য-সম্প্রসারণে উৎসাহিত করছিলেন।

১৭৩৬-৫৬ খ্রীঃ—এই বিশ বছরের হিসাবে দেখা যায়, ফরাসী বণিক কোম্পানীর তুলনায় ইংরেজ বণিক কোম্পানীর ব্যবসা প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিলো। অর্থের অভাবে যখন ভারতীয় ফরাসীশক্তি বিপন্ন, তখনও স্বৈরাচারী ফরাসী সরকার ডুপ্লে বা অন্যান্য ফরাসী-শাসকদের কোন সাহায্যই করলেন না। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সময়ে ফরাসীদের রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ইংলন্ডের পার্লামেন্ট ভারতীয় ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। ইংরেজদের বাণিজ্যে তখনও কোন ঘাটতি ছিলো না।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময়েও ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম পিট (বড়) ভারতে ও উত্তর আমেরিকায় ইংলন্ডের সাফল্য সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ইউরোপে

প্রাশিয়ার সামরিক শক্তিকে সাহায্য করে প্রতিবেশী ফ্রান্স সরকারকে সর্বদা বিব্রত রেখেছিলেন। এই কারণেই ফরাসী দেশ থেকে ভারতে সামরিক সাহায্য পাঠান সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র জনসাধারণের অন্তরে প্রকৃত বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেন নি।

ডুপ্লের ভারতে আসার প্রায় পঞ্চান্ন বছর পূর্ব থেকেই ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপনের একটা পরিকল্পনা ইংরেজ কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই শুরু করেছিলেন। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ২০২)। ভারতে ফরাসী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় তাই ডুপ্লের পরিকল্পনাকে অভিনব বলা উচিত হবে না। তবে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাবে যে, দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ব স্থাপনে ইংরেজরা ডুপ্লের নীতিকেই কাজে খাটিয়েছিলেন এবং সম্পূর্ণ লাভবান হয়েছিলেন।*

সান্ডার্স আয়ারকুট, ফোর্ড, ক্লাইভের ন্যায় ইংরেজ সেনাপতিদের তুলনায় ফরাসী সেনাপতিরা যেন পূর্বের নৈপুণ্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফরাসী সেনাপতি বুসী নিঃসন্দেহে একজন রণ-দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু হায়দরাবাদে বিলাসিতার পরিবেশের মধ্যে অবস্থানের ফলে তাঁর চরিত্র ও কর্মদক্ষতায় ঘুণ ধরেছিলো। যুদ্ধ পরিচালনাতেও তিনি অনেক ভুলভ্রান্তি করেছিলেন। কাউন্ট লালির মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলেও তাঁর বীরত্বের এবং বাধা-বিপত্তির মধ্যে এগিয়ে চলার সাহসের প্রশংসা করতে হয়।

ভারতের রাজনৈতিক শক্তি তখন বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় শক্তি ভেঙ্গে পড়েছে। ভারত তখন খণ্ডিত—ছোট-বড় সকল রাজশক্তিই নিজেদের শক্তি-বৃদ্ধি করতে বিদেশীদের সাহায্য নিতেও কোন সংকোচ বোধ করছে না। এই অবস্থায় বাংলাদেশে তখন ইংরেজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলার ধন-সম্পদ, সমুদ্রে অপ্রতিহত প্রতাপ, ইংলন্ডের পার্লামেন্টের সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রভৃতির সাথে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজ বীরদের অসামান্য রণ-কৌশল। সবদিক দিয়ে অদৃষ্ট-লক্ষ্মী ইংরেজদের সহায় ছিল। কোন একজন ঐতিহাসিক বলেছেন—'বাংলা যাদের হাতে আর সমুদ্রে যারা বিপুল শক্তির অধিকারী পাঁন্ডচেরীর ঘাঁটি থেকে তাদের হঠাতে হলে আলেকজান্দার বা নেপোলিয়নের প্রতিভাও পর্যাপ্ত ছিল না।'**

---

* "We accomplished for ourselves against the French exactly every thing that the French intended to accomplish for themselves against us." —'Alfred Lyall's estimate of Duplex',—V. D. Mahajan, p. 27.

** "There is a large element of truth in the remark of a historian that neither Alexander the Great nor Napoleon could have won the empire of India by starting from Pondicherry as a base and contending with a power which held Bengal and command of the Sea."—Advanced History of India, p. 661.

॥ ১৩ ॥

বাংলাদেশে ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধি : রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাংলায় ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হচ্ছিল। পর্তুগীজ শক্তিকে বিপর্যস্ত করে ওলন্দাজেরা পরোক্ষ ভাবে ইংরেজদেরই সাহায্য করছিলেন। ইংরেজরা বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় তাঁদের নৌ-শক্তির কেন্দ্র গড়ে তুললেন। এদেশের বাণিজ্যে পুরোপুরি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে লাগলেন ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী।

বাংলাদেশে বাণিজ্য বিস্তার : ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্বের ভিত্তি ছিল ইংলন্ডের পার্লামেন্ট থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি "চার্টার" বা পার্লামেন্টের আইন অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ। কিন্তু ভারতীয়দের উপর এক মামুলী জমিদারের ভূমিকায় কোম্পানী আধিপত্য করত।

বাদশাহী সনদ : দিল্লীর বাদশাহের অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে ১৭১৫ সালে কলকাতা থেকে বাদশাহের দরবারে কোম্পানীর দূত হিসাবে যাঁরা গেলেন, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মিঃ হ্যামিলটন্ নামে একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। তিনি বাদশাহ ফর্রুখ-সিয়ারকে কঠিন রোগ থেকে সারিয়ে তুললেন। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী পুরস্কার হিসাবে বাদশাহী "ফরমান" লাভ করলেন। বাদশাহ সকল সুবাদারকে নির্দেশ দিলেন যাতে ইংরেজদের বাণিজ্যিক অধিকার কোন ভাবেই লঙ্ঘিত না হয়। বছরে মাত্র তিন হাজার টাকা বাদশাহকে নজরানা দেওয়ার শর্তে বিনা শুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করলেন ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী। কলকাতার নিকটবর্তী কয়েকটি অঞ্চল ইংরেজরা ইজারা নিতেও সমর্থ হলেন।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ দেখা গেল যে কলকাতার বন্দরে কোম্পানী বছরে দশ হাজার টন মালের আমদানী-রপ্তানী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৭৩৫ সালে কলকাতার আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল প্রায় একলক্ষ। "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্বরী, রাজদণ্ড রূপে"—নিকট-ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর ইঙ্গিত ক্রমশঃই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সাথে বিবাদ : অষ্টাদশ শতব্দীর মধ্যভাগে বাংলা-দেশের শাসনকর্তা ছিলেন নবাব আলিবর্দী খাঁ। তাঁর শাসনকালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়েছিল। নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদ্ লাভ করেন (১৭৫৬ খ্রীঃ)।

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কলকাতাস্থিত ইংরেজদের দুর্গ সংস্কারে বাধা দিলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করলো। ইংরেজরা ইতিমধ্যে কলকাতায় 'ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গ' নির্মাণ করেছিলেন। ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে ইংরেজরা কলকাতার দুর্গটিকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুরক্ষিত করে তুললেন। নবাব কাশিম বাজারের ইংরেজ কুঠিয়াল ওয়াট্‌স্‌কে দুর্গ-সংস্কার স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন। ইতিমধ্যে দেওয়ান রাজবল্লভ নবাবের বিশ্বাস হারালেন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাস সপরিবারে কলকাতায় ইংরেজদের দুর্গে আশ্রয় নিলেন। কৃষ্ণদাস ও তাঁর পরিবারকে অবিলম্বে মুর্শিদাবাদে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন নবাব। ইংরেজরা নবাবের নির্দেশ মানলেন না।

সিরাজ-উদ্-দৌলা

কলকাতা অধিকারঃ নবাব সসৈন্যে কাশিমবাজারে উপস্থিত হয়ে ইংরেজদের কুঠি অধিকার করলেন, (৪ঠা জুন, ১৭৫৬ খ্রীঃ) তিনি সসৈন্যে দ্রুতগতিতে কলকাতায় উপস্থিত হলেন (১৭ই জুন, ১৭৫৬ খ্রীঃ)। তিনি কলকাতায় ইংরেজদের দুর্গ অবরোধ করলে দুর্গাধিপতি ড্রেক এবং অন্যান্য ইংরেজরা জাহাজে করে কলকাতা থেকে পলায়ন করলেন। নবাব ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করলেন। হলওয়েল সহ কিছু ইংরেজকে বন্দী করলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে নবাব একশো ছেচল্লিশজন ইংরেজকে ১৮ ফিট্ দৈর্ঘ্য এবং ১৪ ফিট্ ১০ ইঞ্চি প্রস্থের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে বন্দী করে রেখেছিলেন। এ বন্দীদের মধ্যে তেইশজন মাত্র জীবিত ছিলেন, অবশিষ্ট সকলে প্রাণ হারালেন। ইংরেজরা এটাকেই 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে অভিহিত করে নবাবের চরিত্রে হীন কলঙ্ক আরোপ করেছিলেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা নানা গবেষণার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে এ ঘটনাটি মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত। কলকাতা থেকে পলায়ন করে বেশির ভাগ ইংরেজ তখন ফলতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। জনমানসে নবাবকে হেয় করার উদ্দেশ্যে হলওয়েলের উর্বর কল্পনায় কাহিনীটি সাজানো হয়েছিল।

কলকাতা পুনরুদ্ধারঃ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের পতনের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছালে ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সনের নেতৃত্বে এক বিশাল নৌ-বহর কলকাতায় উপস্থিত হল। ক্লাইভের সঙ্গে নয়শো ইউরোপীয় ও বারো-শো ভারতীয় সৈনিক ছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ এক নৈশ অভিযান পরিচালনা করে কলকাতা উদ্ধার করলেন। নবাবের সঙ্গে ইংরেজ-কোম্পানী একটি সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হলেন এবং সাময়িকভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে বিরত হলেন। ইতিহাসে এই সন্ধি আলিনগরের সন্ধি নামে পরিচিত।

চন্দননগরে ফরাসী শক্তি ঃ

ইতিমধ্যে ইংলন্ডের সাথে ফরাসীদের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ইউরোপে শুরু হয়েছে। ফরাসীদের চন্দননগর ক্লাইভ অবরোধ করলেন। নবাব প্রথমে ক্লাইভের কাজটি অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু পরে নানা চিন্তা করে কিছু কিছু ফরাসী পলাতকদের মুর্শিদাবাদে আশ্রয় দিলেন। ইংরেজরা আশঙ্কা করলেন, নবাব ফরাসীদের সাথে ইংরেজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হচ্ছেন। মুর্শিদাবাদের মস্‌নদ থেকে নবাবকে অপসারণের অভিপ্রায়ে ইংরেজদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ এ সময়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করলো।

সিরাজ্‌-উদ্‌-দৌলার নবাবী লাভে তাঁর সেনাপতি মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার-লতিফ খাঁ এবং রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ নামে ধনী মহাজন প্রভৃতি উচ্চপদে আসীন রাজকর্মচারীরা কেউই সন্তুষ্ট ছিলেন না। উমিচাঁদ নামে এক পাঞ্জাবী বণিক ইংরেজদের নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন। অর্থলোভী পাঞ্জাবী বণিককে প্রচুর অর্থদানে প্রলুব্ধ করে ক্লাইভ এক জাল সন্ধি-পত্র প্রস্তুত করলেন। ওয়াট্‌সন এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে অসম্মত হলে তাঁর স্বাক্ষর জাল করতেও ক্লাইভের বিবেকে বাধলো না।

কলকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নবাব-বিরোধী মীরজাফরের পক্ষভুক্ত দলের সাথে একটি গুপ্ত সন্ধি দ্বারা স্থির করলেন যে, সিরাজ-উদ্‌-দৌলাকে অপসারিত করে মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের নবাব করা হবে; বিনিময়ে মীরজাফর, কোম্পানীকে এবং কোম্পানীর প্রধান প্রধান কর্মচারীদের প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দেবেন।

পলাশীর যুদ্ধ ঃ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন বর্তমান নদীয়া জেলার পলাশী নামক স্থানে নবাবের সঙ্গে ক্লাইভের যুদ্ধ হয়। ক্লাইভের সেনাবাহিনীতে মাত্র তিন হাজার সৈনিক ছিল। নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধক্ষেত্রে পুতুলের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। আর বিশ্বস্ত সেনানায়কদের মধ্যে মীর মদন, মোহনলাল প্রভৃতি অল্প কয়েকজন বীর সেনানী মরণপণ যুদ্ধে ব্রতী হলেন। কিন্তু আকস্মিক ভাবে মীরমদনের মৃত্যু হয়। সিয়ার-উল্‌-মুতাক্ষরীনের লেখক সমসাময়িক ঐতিহাসিক গুলাম হুসেনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মীরমদনের মৃত্যুর পরে মোহনলাল ইংরেজদের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বীর মোহনলালের আক্রমণে ইংরেজ বাহিনী এত বিপন্ন হয়ে পড়েছিল যে স্বয়ং ক্লাইভ পর্যন্ত বিচলিত হয়ে যুদ্ধ স্থগিত রাখার উপক্রম করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মীরজাফরের প্ররোচনায় নবাবের ক্রমাগত নির্দেশের ফলে মোহনলাল যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই মোহনলালের মৃত্যু হয়। নবাবের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে লাগলো। নবাব যদি মোহনলালকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত না করতেন তাহলে হয়ত যুদ্ধের পরিস্থিতি অন্য রকম হোত। যেখানে ইংরেজদের পরাজয়ের সমূহ সম্ভাবনা ছিল, সেখানে ইংরেজরাই জয়ী হলেন। নবাব মুর্শিদাবাদে

পলায়ন করলেন। রাজধানী রক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যদের পুনরায় যুদ্ধ করতে প্রলুব্ধ করার চেষ্টায়ও ব্যর্থ হলেন এবং গোপনে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করলেন ; কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত হয়ে মুর্শিদাবাদে নীত হলেন এবং মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে নিহত হলেন।

পলাশী যুদ্ধের ফল ঃ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের ফলে বাংলাদেশে ইংরেজ-প্রভুত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হলো। ইতিমধ্যেই ইংরেজ বণিক-কোম্পানী বাংলা দেশে বাণিজ্য করে প্রভুত ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। পলাশীতে যুদ্ধরত সামরিক বাহিনীর খরচও ইংরেজ বণিক কোম্পানী বাংলাদেশ থেকেই তুলে নিয়েছিলেন।

মীরজাফরের নেতৃত্বে নবাব-সরকারের উচ্চপদে সমাসীন কর্মচারীদের একটি বৃহৎ অংশ কলকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাথে নবাবের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, পলাশীর যুদ্ধে সেটাই সত্যে পরিণত হলো। পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর কোন অংশ গ্রহণ করলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে মীরমদন আকস্মিক মৃত্যুবরণ করলেন। মোহনলালকে জোর করে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করা হলো। নবাবের গোলন্দাজদের বারুদের স্তূপ বৃষ্টিতে ভিজে অকেজো হয়ে পড়েছিল। একপ্রকার বিনা ব্যয়ে, বিনা যুদ্ধে ইংরেজ পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হলেন।

ইংরেজ বণিক কোম্পানীর মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে একচেটিয়া বাণিজ্য বিস্তার এবং বিনা শুল্কে তাঁরা বাংলায় বাণিজ্য করবেন। নবাব এর বিরোধিতা করেছিলেন। পলাশীতে বিজয়ী হয়ে ইংরেজরা তাঁদের বাণিজ্যিক স্বার্থ পুরোপুরি বজায় রাখতে সমর্থ হলেন।

ইংলন্ডে অবস্থিত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কিন্তু ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহে ইংরেজদের জড়িত হওয়া পছন্দ করতেন না। বাণিজ্য সম্প্রসারণের দিকেই তাঁরা কোম্পানীকে নজর দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পরে ইংরেজরা প্রত্যক্ষভাবে বাংলার শাসন ব্যাপারে যুক্ত হলেন না। কিন্তু পরোক্ষভাবে ইংরেজ বণিক-কোম্পানী ভারতের রাজনীতিতে একটি বৃহৎ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ধীরে ধীরে ইংরেজরা একটি সুসংহত সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হলেন। ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কোম্পানী সরকার একপ্রকার বিনা বাধায় এগিয়ে যেতে লাগলেন। এ কারণেই ভারতের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতিদের রণ-নৈপুণ্যের তেমন কোন পরিচয় না মিললেও এদেশের রাজা-প্রজা সকলের অন্তরেই ইংরেজদের ক্ষমতা ও কূটনৈতিক বুদ্ধি সম্বন্ধে একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠতে লাগলো। মীরজাফর নবাবী লাভ করার পরেও সামরিক সাহায্যের জন্য ইংরেজদের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সমগ্র ভারত তখন খণ্ডিত এবং সর্বক্ষেত্রে অধঃপতিত। বাংলার প্রভূত সম্পদ শোষণ করাই তখন ইংরেজদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলায়

ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালীর স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। ইংরেজ শাসন ভারতবাসীকে সহ্য করতে হয়েছে বহু বছর ধরে। ভারতে ফরাসী-শক্তি তখন বিপর্যয়ের মুখে। বাংলায় সম্পদ লাভ করে এবং নৌ-শক্তিতে অপরাজেয় থেকে ইংরেজ শক্তি ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে প্রভুত্ব বিস্তারের পথে অগ্রসর হতে লাগলো।

নবাবীর ভাঙা-গড়া

নবাব মীরজাফর (১৭৫৭-৬০ খ্রীঃ)ঃ সিরাজের শোচনীয় পরিণতির পরে ইংরেজদের অনুগ্রহে বাংলা-বিহার, উড়িষ্যার নবাব হলেন মীরজাফর। কিন্তু রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা রইল ইংরেজদের হাতে। এই নামসর্বস্ব নবাবী মীরজাফর বেশীদিন ভোগ করতে পারলেন না। প্রচুর অর্থ ও ভূমি-সম্পদ রবার্ট ক্লাইভ ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েও তিনি তাঁদের অর্থের চাহিদা মেটাতে সমর্থ হলেন না। এক সময়ে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে ইংরেজদের বিতাড়িত করার জন্য মীরজাফর ওলন্দাজদের সাহায্য নিতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ক্লাইভ বিদেরার যুদ্ধে (১৭৫৯ খ্রীঃ) ওলন্দাজদের পরাজিত করে নবাবের ইংরেজ বিতাড়নের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মীরজাফর পদচ্যুত হলেন। অতঃপর ইংরেজ কোম্পানীর অনুগ্রহে নবাবী পদ লাভ করলেন মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম।

মীরজাফর

নবাব মীরকাশিম (১৭৬০-৬৪ খ্রীঃ)ঃ নতুন নবাব মীরকাশিম নবাবী লাভের বিনিময়ে কোম্পানী-সরকারকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার জমিদারী স্বত্ব দান করেন এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দেন। তিনি ইংরেজদের প্রভাব হতে দূরে থাকবার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

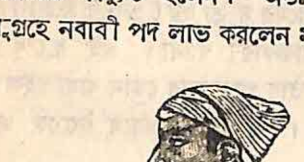

মীরকাশিম

মীরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা, সাহসী ও সুদক্ষ শাসক। শীঘ্রই বাণিজ্য-শুল্ক নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের সংঘর্ষের সূত্রপাত হল। ইংরেজ কোম্পানীর ন্যায় তাদের কর্মচারীরাও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করে যাচ্ছিলেন। মীরকাশিম এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু এই প্রতিবাদের কোন ফল না হওয়ায় ক্ষুব্ধ নবাব বাণিজ্য

শুল্ক একেবারে উঠিয়ে দিলেন। এই ব্যবস্থায় ইংরেজ বণিকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। পাটনার কুঠিয়াল এলিস্ সাহেব নবাবের নতুন বাণিজ্য নীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। ঐতিহাসিক র‍্যামসে মুইর-এর মতে এলিস সাহেব মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। কারণ মীরকাশিম কর্তৃক বাণিজ্য-শুল্ক রদ করার নীতিতে তাঁর ব্যক্তিগত বাণিজ্যের লাভ বন্ধ হয়ে গেল, তাঁর বন্ধুরাও বাণিজ্যে লোকসান দিতে লাগলেন। শীঘ্রই নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু হয়।

বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়ঃ পাটনা কুঠির শাসনকর্তা এলিস. পাটনা শহর দখল করলে নবাব অতি সহজেই নগরটি পুনরুদ্ধার করেন। মেজর অ্যাডামসকে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করা হল (জুন, ১৭৬৩ খ্রীঃ)। কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালা পর পর কয়েকটি যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হন। পরাজিত নবাব মীরকাশিম পাটনায় উপস্থিত হলেন। ক্রোধে ও হতাশায় দিশেহারা হয়ে প্রথমেই তিনি বিশ্বাসঘাতক রাজা রাজনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি বন্দীদের হত্যার আদেশ দিলেন। তিনি এলিসসহ অন্যান্য ইংরেজ বন্দীদেরও হত্যার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কেউ এ কাজ করতে সম্মত না হলে সমরু নামে পরিচিত একজন জার্মান কারাগারে বন্দীদের উপর গুলি চালিয়ে এলিসসহ সমস্ত ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করলেন। এরপরে নবাব শক্তিসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা ও মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ-আলমের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রীঃ) ইংরেজ সেনাপতি মনরো নবাবের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। মীরকাশিম পলায়ন করতে বাধ্য হন। নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মীরকাশিমের মৃত্যু হয় (১৭৭৭ খ্রীঃ)।

বক্সারের যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার ফলে ভারতে ইংরেজ শক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পথে আর কোন বাধা রইল না। অযোধ্যাতেও ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। শীঘ্রই ভারতবর্ষে ইংরেজ একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে পরিগণিত হলো।

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫ খ্রীঃ)ঃ পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করে ব্রিটিশ শক্তি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ হলেন বটে, কিন্তু তখনও কোম্পানীর শাসনের অধিকার লাভ হয়নি। নবাব মীরকাশিম পরাজিত হলে ইংরেজদের অনুগ্রহে বৃদ্ধ মীরজাফর পুনরায় নবাবের মসনদ লাভ করলেন।

বাংলাদেশে যখন একবার মীরজাফর, একবার মীরকাশিম, আরেকবার মীরজাফরকে নবাব করে নবাবী ভাঙা-গড়ার খেলা চলছিলো, তখন পলাশীর যুদ্ধ-বিজেতা ক্লাইভ ছিলেন ইংলন্ডে। তখন বাংলার গর্ভনর পদে সমাসীন ছিলেন ভ্যান্সিটার্ট। কোম্পানীর শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে উচ্চপদস্থ-কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রচণ্ড ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শাসন ব্যবস্থায় শৃংখলা স্থাপনের জন্য ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষ ক্লাইভকে বাংলার গর্ভনর করে পাঠালেন। ক্লাইভের শাসনকালে (১৭৬৫-৬৭ খ্রীঃ) ইংরেজ

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আমলের "ফরমান" অনুসারে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেন।

বক্সারের যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা মীরকাশিমকে সাহায্য করেছিলেন। ক্লাইভ অযোধ্যার নবাবকে কারা এবং এলাহাবাদ প্রদেশসহ পঞ্চাশ লক্ষ

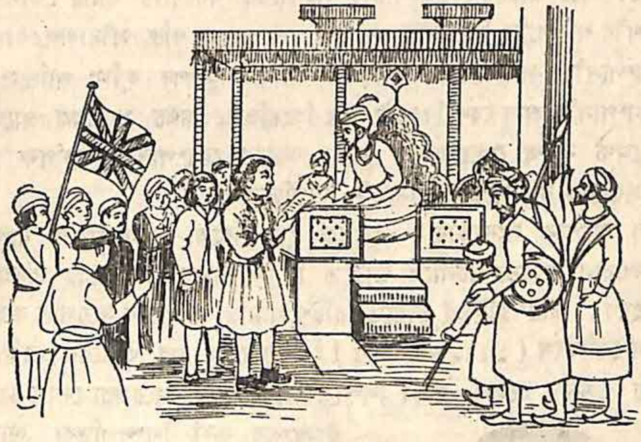

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ

টাকা ইংরেজকে দিতে বাধ্য করলেন। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি তাঁকে অযোধ্যা ও কারা প্রদেশটি প্রত্যর্পণ করলেন। মুঘল সম্রাট ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হলেন। এই বৃত্তির পরিমাণ ছিল বছরে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তার

ইংলন্ডস্থিত কোম্পানীর পরিচালক সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল যে, দেশীয় রাজ্যসমূহের উপরে ভারতের কোম্পানী সরকারের খবরদারি করার কোন প্রয়োজন নেই। দেশীয় শক্তিগুলি নিজেদের স্বার্থেই পরস্পরের শক্তি সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হবে। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু বাণিজ্যে কোম্পানীর আয় বেশ কিছুটা কমে গিয়েছিল, অথচ সামরিক খাতে খরচের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। নানা কারণে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সামরিক-বেসামরিক সবদিকে ব্যয়-সঙ্কোচের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সাম্রাজ্য স্থাপনে মনোভাব ঃ ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের ঘটনাকে ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ বলা সঙ্গত হবে। লর্ড ক্লাইভই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) ঃ ক্লাইভের পর ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলাদেশের গভর্নর হলেন, তখন শিল্প-বিপ্লবের সুফল ইংরেজরা ভোগ করেছিলেন। ইংলন্ডের ধনী শিল্পপতিরা ভারত থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। ভারতের বাজার দখল করতে তাঁরা খুবই ব্যাকুল ছিলেন। আমেরিকার উপনিবেশ-বাসীর সাথে ইংলন্ড তখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ব্যাপৃত। ওয়ারেন হেস্টিংসের পক্ষে ইংলন্ডের সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রভাব উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ওয়ারেন হেস্টিংস ব্রিটিশ-অধিকৃত রাজ্যগুলি যেমন সুদৃঢ় করতে চাইলেন, তেমনি কোম্পানীকে বাণিজ্য সংস্থা থেকে একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে সর্বপ্রকার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস

তিনি ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, ভারতে ব্রিটিশ-আধিপত্য স্থায়ী করতে হলে দেশীয় রাজাদের ইংরেজের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে তুলতে হবে। প্রয়োজন হলে ইংলন্ডের রাজবংশের আনুগত্য তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

লর্ড ওয়েলেসলী (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রীঃ) ঃ লর্ড ওয়েলেসলির আমলে ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিলো। ইউরোপে ফরাসী-শক্তির সাথে ইংরেজ শক্তির সংঘর্ষ, ট্রাফালগারে নেলসনের কাছে নৌ-যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়—এসব ঘটনার

প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছিল। তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ও ক্ষমতা-প্রিয় শাসক। ব্রিটিশ-শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভারত-শাসনে তার উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। ভারতীয় বাদশাহ্-নবাব-হিন্দু রাজারা নিজেদের স্বার্থে ইংরেজদের ছত্রতলে নিরাপদে আশ্রয় নেবেন—এটাই ছিল তাঁর অভিপ্রায় বা রাজনৈতিক কৌশল।

লর্ড হেস্টিংস ও ডালহৌসী ঃ লর্ড হেস্টিংসের সাম্রাজ্যবাদী কাজকর্মে তাঁর পূর্ব-সূরীদের প্রভাব লক্ষণীয়। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী-নীতি প্রয়োগে লর্ড ডালহৌসীর কাছে ওয়েলেসলিও যেন কিছুটা ম্লান হয়ে পড়লেন। রিচার্ড টেম্প্ল-এর মতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মধ্যে ডালহৌসীর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। এদিক থেকে সমকালীন প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোনের তিনি ছিলেন একজন যোগ্য শিষ্য।

[ক] ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পেশোয়া বালাজী-বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম মাধবরাও পেশোয়া পদ লাভ করেন (১৭৬১ খ্রীঃ)। তাঁর সামরিক নৈপুণ্যে ও সুদক্ষ শাসনে মারাঠাদের লুপ্ত গৌরবের কিছুটা উদ্ধার হয়। তিনি বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে দিল্লী পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন। মহীশূরে হায়দর আলীকে পরাজিত করে মহীশূর রাজ্যের কিছু অংশ তিনি মারাঠা অধিকারভুক্ত করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মাধবরাও মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর ভাই নারায়ণ রাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর পিতৃব্য রঘুনাথ রাওয়ের (রাঘোবা) চক্রান্তে তিনি নিহত হন।

নানা ফড়নবিশ

নানা ফড়নবিশ—পুনা-দরবার ঃ মারাঠা রাজনীতিতে এই সময়ে আবির্ভূত হলেন কূটনীতি-বিশারদ্ নানা ফড়নবিশ। নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুর পরে তাঁর যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে তাঁকে নানা ফড়নবিশ অন্যান্য মারাঠা সামন্তদের সাহায্যে পেশোয়া পদে বসালেন। মারাঠা সামন্তদের মধ্যে এ সময়ে আর একজন উল্লেখযোগ্য রাজনীতি বিশারদ এবং সমরনায়ক ছিলেন মহাদজী সিন্ধিয়া। রঘুনাথরাও পেশোয়া পদ ছাড়তে বাধ্য হলেন বটে কিন্তু আশ্রয় নিলেন বোম্বাইতে ইংরেজ শিবিরে।

প্রথম মারাঠা-যুদ্ধ ঃ ইংরেজদের বোম্বাই কাউন্সিল রঘুনাথের পেশোয়া পদ সমর্থন করলেন। রঘুনাথকে সুরাটের সন্ধি (১৭৭৫ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করতে হয়। সন্ধির শর্তানুসারে সালসেট্ ও বেসিনে ইংরেজপ্রভুত্ব স্বীকৃত হলো। ইংরেজ সৈন্যের খরচ নির্বাহের জন্য মাসিক দেড়লক্ষ টাকা এবং আমানত হিসাবে ছয় লক্ষ টাকা জমা

দিতে রঘুনাথ রাও স্বীকৃত হলেন। রঘুনাথ ও তাঁর সহায়ক ইংরেজ বাহিনী পুনায় প্রতিষ্ঠিত মারাঠা বাহিনীকে পরাজিত করলেন।

কলকাতার ইংরেজ কাউন্সিল এবং গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস বোম্বাই কাউন্সিলকে অগ্রাহ্য করে পুনায় অবস্থিত মারাঠা সরকারের সঙ্গে পুরন্দরের সন্ধি (১৭৭৬ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করলেন। এই সন্ধির শর্তানুসারে ঠিক হলো যে, ইংরেজ সরকার রঘুনাথ-রাওকে সমর্থন করবেন না। পুনার মারাঠা সরকার রঘুনাথকে উপযুক্ত ভাতা দেবেন। সলসেট্ ও বেসিন ইংরেজদের অধিকারেই থাকবে।

কলকাতা-বোম্বাই এর ইংরেজ কাউন্সিলের মতানৈক্যের ফলে এই প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন ভারতীয় ইংরেজ শক্তি। ইংলন্ডের কোম্পানীর পরিচালকবর্গ বোম্বাই কাউন্সিলের প্রস্তাবিত সুরাট সন্ধির শর্ত অনুমোদন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের পক্ষ নিয়ে ইংরেজ শক্তি পুনায় প্রতিষ্ঠিত মারাঠা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ইতিমধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস্ রেগুলেটিং-আইনের ফলে গভর্নর জেনারেলের পদে সমাসীন হয়েছিলেন (১৭৭৪ খ্রীঃ)।

নানা ফড়নবিশের অপূর্ব রণকৌশলে তলেগাঁও-এর যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয় ঘটলো। অবশেষে, ওয়ারগাঁওয়ের সন্ধির (১৭৭৯ খ্রীঃ) শর্তানুযায়ী ঠিক হলো যে ইংরেজরা মহারাষ্ট্রবীর মহাদজী সিন্ধিয়ার হাতে রঘুনাথকে সমর্পণ করবেন এবং বিজিত স্থানগুলি ইংরেজদের প্রত্যর্পণ করবেন।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ঃ ওয়ারগাঁওয়ের অপমানজনক সন্ধিশর্ত গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের মনঃপূত না হওয়াতে, তিনি সেনাপতি গডার্ডকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। গডার্ড (১৭৮০ খ্রীঃ) আহ্‌মেদাবাদ ও বেসিন অধিকার করলেন। কিন্তু ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গডার্ড পুণার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে মারাঠাদের হাতে পরাজিত হলেন। এত বিপদেও হেস্টিংসের মনোবল অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁরই নির্দেশে পরবর্তী সেনাপতি হলেন পপ্‌হাম। তিনি সিন্ধিয়ার দুর্ভেদ্য গোয়ালিয়র দুর্গ জয় করে নিলেন।

অন্যদিকে নানা ফড়নবিশও এত জটিলতার মাঝেও ধৈর্য ও মনোবল হারান নি। মহাদজী সিন্ধিয়াও যুদ্ধ পরিচালনায় এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মহাদজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সলবাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হলো এবং ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হলো।

সলবাই-এর সন্ধি (১৭৮২ খ্রীঃ) ঃ ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষে এই সন্ধিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্ধির শর্তাবলী ঃ

(ক) পুনা-দরবার সমর্থিত নারায়ণরাওয়ের পুত্র মাধবরাও নারায়ণের পেশোয়া পদে ন্যায্য দাবী ইংরেজ সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

(খ) রঘুনাথকে মারাঠাদের হাতে অর্পণ করা হলো। তাঁকে মাসে পঁচিশ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হলো।

(গ) সলসেটে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো।

(ঘ) যমুনা নদীর পশ্চিম দিকস্থ সিন্ধিয়ার অধিকৃত রাজ্য মহাদজী সিন্ধিয়াকে প্রত্যর্পণ করা হলো।

সলবাইয়ের সন্ধির ফলে ইংরেজদের কাছে পুনা-দরবারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নানা ফড়নবিশ কিন্তু সলসেট্ ও অন্যান্য কয়েকটি দুর্গ হারাবার জন্য বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি মহাদজী সিন্ধিয়ার কাছে এ জন্য ক্ষোভও প্রকাশ করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তিনি এ সন্ধি মেনে নিয়েছিলেন।

সলবাইয়ের সন্ধিতে ওয়ারেন হেস্টিংস রাজনৈতিক সুবিধা যথেষ্ট লাভ করেছিলেন। এ কারণে তিনি মহাদজী সিন্ধিয়াকে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছিলেন। সিন্ধিয়ার স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সন্ধির ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।*

নানা ফড়নবিশ ও মহাদজী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে মারাঠারা গভীর রাজনৈতিক সংকটের মাঝেও হতোদ্যম হননি। সলবাই-এর সন্ধি মহাদজী সিন্ধিয়ার বীরত্ব ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।** বিশ বছর পর্যন্ত মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজদের তেমন কোন সংঘর্ষ আর হয় নি। ফলে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ এসে গেলো।

লর্ড ওয়েলেসলি

বিশ বছর পর্যন্ত শান্তি রক্ষিত হলো বটে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মারাঠাশক্তির দুর্বলতা সম্বন্ধে ইংরেজ শক্তি সর্বদাই নজর রাখতো। পুনরায় ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ যখন শুরু হলো—সৌভাগ্য যে তখন গভর্নর জেনারেলের পদে সমাসীন ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলির ন্যায় একজন বিচক্ষণ সাম্রাজ্যবাদী শাসক।

অধীনতামূলক মিত্রতা (১৭৯৮ খ্রীঃ) ঃ আত্মকলহে জীর্ণ ভারতীয় শক্তিসমূহকে নিঃশেষ করে ভারতে একচ্ছত্র ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হয়েছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। তিনিই আনুগত্য বা অধীনতামূলক মৈত্রীর **(Subsidiary Alliance)** প্রবর্তক।

* **V. D. Mahajan, p. 61.**

** Mahadaji Sindhia was the most outstanding Marhatta chief of the period. The Treaty of Salbai recognised him as far as related to the British Government an independent prince but at the same time he continued to observe on all other points which referred to his connection with the Poona Government, the most scrupulous attention to forms'.
—Advanced History of India, p. 672

ইংরেজদের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে ভারতীয় রাজাদের কাছে তিনি প্রস্তাব করলেন। আনুগত্যের শর্ত হলঃ রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা সমর্পণ করে ইংরেজদের আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে হবে। শত্রুর আক্রমণ থেকে ইংরেজ সরকার সর্বদা তাঁদের রক্ষা করবেন।

ইংরেজ-পরিচালিত সৈন্য বাহিনীর খরচ নির্বাহের জন্য আশ্রিত রাজাকে তাঁর রাজ্যের উপযুক্ত পরিমাণ এলাকা ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হবে। ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে আশ্রিত পক্ষ অন্য কোন শক্তির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন না। তাঁদের সৈন্যবাহিনীতে অন্য কোন বিদেশীকে নিযুক্ত করাও চলবে না।

হায়দরাবাদের নিজাম এই অপমানজনক শর্ত মেনে নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে বশ্যতা-মূলক চুক্তি করলেন (১৭৯৮ খ্রীঃ)। হায়দর আলী মৃত্যুমুখে পতিত হলেন (১৭৮২ খ্রীঃ)। তাঁর পুত্র মহীশূরের টিপু সুলতান এই ঘৃণ্য চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করলেন। কর্ণাটক ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হলো। তাঞ্জোর ও সুরাটের অধিপতিরা অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিগ্রহণে বাধ্য হলেন। অযোধ্যার নবাব তাঁর রাজ্যের বৃহৎ অংশ ইংরেজদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। একটি ক্ষুদ্র অংশের কর্তৃত্ব নিয়ে তিনি কিছুদিন টিকে রইলেন।*

দাক্ষিণাত্যের আর দুটি বৃহৎ শক্তি মারাঠা ও মহীশূরের সাথে ইংরেজদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল।

মারাঠাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, মারাঠা বীর মহাদজী সিন্ধিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হলেন (১৭৯৪ খ্রীঃ)—নানা ফড়নবিশও গত হলেন (১৮০০ খ্রীঃ)।

এই সময়ে পেশোয়া পদে আসীন হলেন দ্বিতীয় বাজীরাও-এর ন্যায় একজন অযোগ্য ব্যক্তি। মারাঠা শক্তি সংঘের অন্তর্ভুক্ত হোলকার, সিন্ধিয়া, ভোঁসলা প্রভৃতি মারাঠা সামন্তবৃন্দ আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। মারাঠা সামন্তদের আত্মকলহে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে দ্বিতীয় বাজীরাও অনন্যোপায় হয়ে "বেসিনের সন্ধি" দ্বারা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে "বশ্যতামূলক মৈত্রী" চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ঃ মারাঠা সামন্তেরা পেশোয়ার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরা বেসিনের চুক্তি অমান্য করে পেশোয়াতন্ত্রের পূর্ণ মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। ইংরেজদের সাথে সিন্ধিয়া-ভোঁসলার সক্রিয় বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হলো। পেশোয়াও গোপনে তাঁদের ইংরেজ-বিরোধী কাজে উৎসাহ দিতে লাগলেন। কিন্তু জাতির এ রকম রাজনৈতিক সংকটেও তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে সমর্থ হলেন না। সিন্ধিয়া, ভোঁসলা প্রভৃতি মারাঠা সামন্তেরা ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে পরাজিত হলেন।

---

* According to Thomas Munro, "Wherever subsidiary system is introduced, the country will soon bear the marks of it in decaying villages and decreasing population."—V. D. Mahajan, p. 87.

মধ্য ভারতে একমাত্র যশোবন্তরাও হোলকারই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ইংরেজের কাছেও 'চৌথ' দাবী করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। হোলকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লেক, আর্থার ওয়েলেসলী প্রভৃতি নামকরা ইংরেজ সেনাপতিরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সেনাপতি লেক যখন কানপুরে তখন তাঁর দুজন কর্নেল মারে এবং মনসন্ হোলকারের হাতে পরাজিত হলেন। হোলকারের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ভরতপুরের রাজা ইংরেজ পক্ষ পরিত্যাগ করে হোলকারের দলে যোগ দিলেন। সেনাপতি লেক ভরতপুরের বিখ্যাত দুর্গ অধিকার করতে গিয়ে চারবার ব্যর্থ হলেন। ভরতপুরের পক্ষে যুদ্ধ চালান আর সম্ভব না হওয়ায় ইংরেজকে দশলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে ভরতপুর ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। হোলকার তখনও অপরাজিত। লর্ড ওয়েলেসলীর শাসনকালও শেষ হয়ে গেলো।

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ঃ পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস ওয়েলেসলীর নীতিই অনুসরণ করলেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের যতই ভাগ্য-বিড়ম্বনা ঘটুক না কেন, তিনি সর্বদাই গোপনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মারাঠা সামন্তদের সম্মিলিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি পূর্ব-চুক্তি অমান্য করে পুণার অনতিদূরে কিরকিতে অবস্থিত ইংরেজ সামরিক শিবির আক্রমণ করে পরাজিত হন (১৮১৭ খ্রীঃ)।

যশোবন্তের পুত্র দ্বিতীয় মলহররাও হোলকার এবং ভোঁসলার মন্ত্রী আপ্পা সাহেব ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। শিপ্রা নদীর তীরে মাহিদপুরের যুদ্ধে হোলকারের বাহিনী পরাজিত হলো। সীতাবল্দীর যুদ্ধে আপ্পাসাহেব পরাজিত হলেন (নভেম্বর ২৭, ১৮১৭ খ্রীঃ)। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও আরও কয়েকটি যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু অস্টির যুদ্ধে (ফেব্রুয়ারী, ২০, ১৮১৮ খ্রীঃ) তাঁর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলো। পেশোয়া বিনাশর্তে ইংরেজদের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। মারাঠা শক্তি-সংঘ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হলো। মারাঠা ঐক্যের প্রতীক পেশোয়া পদ অবলুপ্ত হয়ে গেলো। কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হয়ে পেশোয়াকে কানপুরের অন্তর্গত বিঠুরে অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে শেষ জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল।

মারাঠা-শক্তির পতন ঃ মারাঠা-শক্তির পতনের ইতিহাস ভারত-ইতিহাসের একটি নিদারুণ দুঃখজনক কাহিনী। ছত্রপতি শিবাজী একটি স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির অভ্যুদয় ঘটালেন। শিবাজীর পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদের প্রবল বন্যায় ঔরঙ্গজেবের বিশাল মুঘলবাহিনী ভেসে গেলো। প্রথম বাজীরাও, প্রথম মাধবরাও, নানা ফড়নবিশ, মহাদজী সিন্ধিয়া ও অন্যান্য মারাঠা সামন্তরা ব্রিটিশ-অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে দুর্জয় সংগ্রাম করেছিলেন।*

* 'With some exception like Sivaji, Bajirao I, Madhab Rao I, Malhar Rao Holkar, Mahadaji Sindhia and Nanafadnavis, the Marhatta chiefs particularly those of later times indulged more in finesse or intrigue than well calculated statesmanlike action, which produced disastrous reaction on the destiny of the state...'. — Advanced History of India, p. 70?

পরবর্তী সময়ে দেখতে পাই মারাঠাদের মধ্যে কেবল আত্মকলহ। এর সুযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করলেন ব্রিটিশ-শক্তি। ব্রিটিশ সমরনায়কদের রণনৈপুণ্য, উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার এবং ব্রিটিশ কূটনীতির কাছে মারাঠারা যেন তুলনায় নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন।

[খ] ইঙ্গ-মহীশূর সংঘর্ষ

মহীশূরের গৌরব প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন হায়দর আলী। তাঁর অভ্যুত্থানকে ইংরেজরা কখনই সুনজরে দেখেননি। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের আর দুটি বৃহৎ শক্তি পেশোয়া এবং নিজামও হায়দরের প্রতিপত্তিতে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি হায়দরের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তাঁরা ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিতেও দ্বিধা করেননি। হায়দরের রাজ্যের পূর্বাংশ জুড়ে ছিল ইংরেজ এলেকা। ইংরেজরা স্বাধীন মহীশূরের অস্তিত্ব কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ঃ কর্ণাটক এবং বাংলায় তখন ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। হায়দর আলী মারাঠাদের অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে নিজের রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বল নিজাম হায়দর আলীর শক্তিবৃদ্ধিতে শংকিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিলেন। তাই হায়দর একাই যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হয়ে তিনি খাস ইংরেজ-এলাকা মাদ্রাজের নিকটে উপস্থিত হলেন। আকস্মিক বিপর্যয়ে ইংরেজরা হায়দর আলীর শর্ত অনুযায়ীই সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। ইংরেজগণ হায়দর আলীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কোন প্রতিবেশী রাজ্য বা অন্য কোন শক্তি মহীশূর আক্রমণ করলে ইংরেজরা হায়দরকে সাহায্য করবেন (১৭৬৯ খ্রীঃ)।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ঃ ইংরেজদের সঙ্গে এই সন্ধি বেশী দিন স্থায়ী হলো না। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা শক্তি সঞ্চয় করে যখন পূর্ব-শত্রু মহীশূরকে আক্রমণ করলেন তখন ইংরেজরা সন্ধিশর্ত মেনে হায়দর আলীকে সাহায্য করা হতে বিরত রইলেন। এমন কি, তাঁর নিষেধ অমান্য করে ইংরেজরা ফরাসী উপনিবেশ মাহে দখল করে নিলেন। এতে ইংরেজদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পেলো। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

হায়দর আলীর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং স্বদেশ-প্রেমের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্ব-শত্রুতা ভুলে গিয়ে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ-বিরোধী শক্তিকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজাম এবং মারাঠাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজ শক্তিকে বাধা দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি দুর্বার গতিতে অগ্রসর

হয়ে ইংরেজদের পরাজিত করে আর্কট অধিকার করেন (১৭৮০ খ্রীঃ)। এই বিপর্যয়ের মধ্যে অবিচল থেকে ওয়ারেন হেস্টিংসও নানা কৌশলে পুনরায় নিজাম ও মারাঠাদের হায়দরের পক্ষ থেকে সরিয়ে নিতে কৃতকার্য হলেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টোনোভোর যুদ্ধে স্যার আয়ারকুটের নিকট হায়দর পরাজিত হলেন। হায়দর হতোদ্যম হবার ব্যক্তি ছিলেন না। ইংরেজ সেনাপতি ব্রেথওয়েট্ মহীশূরের নিকটে হায়দরের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ইংরেজদের বিপদের এই সুযোগ গ্রহণ করতে ফরাসীদের একটি নৌবহর ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ না করেই ফরাসী নৌবাহিনী প্রত্যাবর্তন করলো। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ষাট বছর বয়সে হায়দর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি ঃ হায়দরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তিনি ম্যাঙ্গালোর অবরোধ করে ইংরেজ সেনাপতি ম্যাথুসকে তাঁর সৈন্যবাহিনীসহ বন্দী করলেন (১৭৮৩ খ্রীঃ)।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি-চুক্তি অনুযায়ী মহীশূর ও ইংরেজ পক্ষ বন্দী-বিনিময় এবং পরস্পরের রাজ্য-প্রত্যর্পণে সম্মত হয়। যুদ্ধও শেষ হলো। কিন্তু সন্ধির শর্ত হেস্টিংসের মোটেই মনঃপূত হয়নি। ছয় বছর এই চুক্তি টিকে ছিল।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ঃ লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি অনুসারে টিপু সুলতান এবং ইংরেজদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু টিপু জানতেন ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে তিনি ফ্রান্সেও দূত পাঠালেন। কিন্তু সেখান থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিই মিললো, কোন সাহায্য এলো না। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করলে, ইংরেজদের সাথে তাঁর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই হলো তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। নিজাম এবং মারাঠাগণ ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিলেন। টিপুর বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন স্বয়ং গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে কর্নওয়ালিস কিন্তু বিচক্ষণ সেনাপতি হিসাবে কোন কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করে তিনি টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের কাছে উপস্থিত হলেন। টিপু সুলতান যুদ্ধে প্রশংসনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজ

টিপু সুলতান

বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি সাফল্য লাভে অসমর্থ হলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে টিপু সুলতান বাধ্য হলেন ইংরেজদের সঙ্গে শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি স্বাক্ষর করতে। এই সন্ধি অনুযায়ী টিপু সুলতানকে রাজ্যের প্রায় অর্ধাংশ ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হলো এবং তিন লক্ষ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিতে তিনি বাধ্য হলেন। তিনি তাঁর দুই পুত্রকে জামিন-স্বরূপ কর্নওয়ালিসের শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ—মহীশূরের পতন : টিপু সুলতান ছিলেন অসাধারণ স্বদেশ-প্রেমিক। কিছুতেই শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গ আরও সুরক্ষিত করতে উদ্যোগী হলেন। ইংরেজ শত্রু ফরাসী সমরনায়কদের প্রশিক্ষণে নিজের বাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তুলতে লাগলেন। ইউরোপে চলছে তখন ফরাসী বিপ্লব। টিপু ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ফ্রান্সের সাহায্য প্রার্থনাও করেছিলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদ্র একদল ফরাসী সেনাবাহিনী ম্যাঙ্গালোরে উপস্থিত হল।

তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলী। তিনি টিপুর কার্য-কলাপ লক্ষ্য করলেন। ইতিপূর্বেই তিনি নিজামের মিত্রতা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বাহিনী টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করলে টিপু অসীম বীরত্বের সাথে বাধা দিলেন। যুদ্ধ করতে করতে স্বদেশ-প্রেমিক টিপু মৃত্যু বরণ করলেন। মহীশূরের গৌরব রবি অস্তমিত হলো। আর একটি স্বাধীন রাজ্যের পতন ঘটলো।

[গ] অন্যান্য রাজ্য অধিকার

লর্ড হেস্টিংসের পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড মিন্টো যথেষ্ট রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের শিখ-প্রধান রণজিৎ সিংহের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধি-আফগানিস্থানে ইংরেজ-স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে দূত হিসাবে এলফিনস্টোনকে প্রেরণ, সিন্ধু দেশের আমীরদের সাথে শান্তি স্থাপনের প্রয়াস ইত্যাদি লর্ড মিন্টোর রাজনৈতিক কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখযোগ্য। অমৃতসরের সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা হবে।

লর্ড হেস্টিংসের সময়ে মারাঠা-সংঘর্ষের কাহিনী পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তাঁরই সময়ে নেপালের গোর্খা বংশের রাজারা দক্ষিণ দিকে রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হলে গোর্খাদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ ঘটে। সেনাপতি অক্টারলোনী সসৈন্যে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর সন্নিকটে উপস্থিত হলে গোর্খারা সগোলীর সন্ধি (১৮১৫ খ্রীঃ) করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্তানুসারে কুমায়ুন, গাড়োয়ালসহ তরাই অঞ্চলের একটি বৃহৎ অংশে ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি বাস করতে লাগলেন।

মধ্য ভারতে পিণ্ডারী দস্যুরা হোলকার ও সিন্ধিয়ার সামরিক বাহিনীতেও যুদ্ধ

করতো। আবার অবসর সময়ে লুঠতরাজও করতো। লর্ড হেস্টিংস কঠোর ভাবে পিণ্ডারী দস্যুদের দমন করলেন।

ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ চলার সময়েও মারাঠাদের আক্রমণে রাজপুতনার অনেক রাজ্য বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। লর্ড হেস্টিংস রাজপুত রাজাদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও কূটনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নিয়ে রাজপুতনার উদয়পুর, জয়পুর, কিষণগড়, প্রতাপগড়, জয়সলমীর প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করেন।

লর্ড হেস্টিংসের পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ হয়। ব্রহ্মদেশের রাজা পরাজিত হয়ে 'ইয়ান্দাবুর' সন্ধি (১৮২৬ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী আরাকান ও টেনাসেরিম্ অঞ্চল ইংরেজদের ছেড়ে দিতে ব্রহ্মরাজ বাধ্য হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে আসাম, জৈন্তিয়া, কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্য প্রত্যক্ষভাবে না হলেও কার্যত ইংরেজ-অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ে।

লর্ড অক্‌ল্যান্ডের শাসনকালে সিন্ধু দেশের আমীরেরা ইংরেজ সেনাপতি নেপিয়রের হাতে পরাজিত হলেন। সিন্ধু দেশ ইংরেজদের অধিকারে আসে (১৮৪৩ খ্রীঃ)।

লর্ড অক্‌ল্যান্ড ও তাঁর পরবর্তী গভর্নর জেনারেল এলেনবরার শাসনকালে (১৮৪২-১৮৪৪ খ্রীঃ) আফগানিস্থানের সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষ ঘটে। ইঙ্গ-আফগান সমস্যার সমাধান করতে বহু বছর লেগেছিল।

পাঞ্জাবে শিখশক্তি

দুররানীর ভারত-পরিত্যাগের পরে তাঁর অধিকৃত পাঞ্জাব অঞ্চল শিখদের দখলে আসে। শিখদের মধ্যে তখন বিভিন্ন দল বা 'মিস্‌ল' সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন দলের মধ্যে রেষারেষি ও বিরোধ প্রায় সব সময়েই লেগে থাকতো।

রণজিৎ সিংহ ঃ বিবদমান শিখদের একত্রিত করে একটি ঐক্যবদ্ধ শিখরাজ্য গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলেন রণজিৎ সিংহ। তাঁকে পাঞ্জাব-কেশরী বলা হয়। তিনি ছিলেন শিখদের 'সুকের চাকিয়া' মিস্‌লের নায়ক মাহাসিংহের পুত্র।

রণজিৎ সিংহ আফ্‌গান রাজ জামান শাহের পক্ষে যোগ দিয়ে প্রথমে শক্তি সঞ্চয় করেন। মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে স্বীয় কর্মদক্ষতার গুণে তিনি কাবুলের রাজা জামান শাহের নিকট থেকে লাহোরের শাসনভার ও "রাজা" উপাধি লাভ করেন। পাঞ্জাবে তখন শান্তি-শৃংখলা বলতে কিছুই ছিল না। রণজিৎ সিংহ বুঝেছিলেন যে, শিখ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত। তিনি একটির পর একটি শিখ-মিস্‌লের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করে শিখ শক্তিকে সংঘবদ্ধ করতে উদ্যোগী হলেন। লাহোর, অমৃতসর, লুধিয়ানায় প্রভুত্ব বিস্তার করে তিনি ক্রমশঃ সমগ্র পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন।

শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরস্থ শিখ-মিস্‌লের নায়কেরা রণজিৎ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তাঁরা কিন্তু রণজিৎ-এর মহান উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। এই সময়ে ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড মিন্টো (১৮০৭-১৮১৩ খ্রীঃ)।

রণজিৎ সিংহ

বড়লাট মিন্টো প্রথমেই রণজিৎকে শত্রু করতে চাইলেন না। কারণ তখন তুরস্ক ও পারস্যের সাহায্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ফরাসীদের অভিযানের একটা সম্ভাবনা ছিল। ইউরোপে তখন ফরাসী নায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলছিল। লর্ড মিন্টো আলাপ-আলোচনার জন্য চার্লস মেটকাফ্‌কে রণজিৎ সিংহের দরবারে প্রেরণ করেন। রণজিৎ শতদ্রুর পশ্চিম ও পূর্ব তীরস্থ সমস্ত শিখরাজ্যের উপরে নিরংকুশ কর্তৃত্ব দাবী করেন। তখন মিন্টো রণজিৎ-এর বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠালেন। দূরদর্শী রণজিৎ সিংহ ইংরেজ শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ সমুচিত মনে করলেন না।

অমৃতসরের সন্ধি : অমৃতসরে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর একটি সন্ধি হলো (১৮০৯ খ্রীঃ)। সন্ধির শর্তানুযায়ী রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর পশ্চিম তীরস্থ শিখ-রাজ্যের অধীশ্বর হলেন এবং পূর্বতীরস্থ শিখ-রাজ্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইংরেজদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

অতঃপর রণজিৎ সিংহ উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হলেন। তিনি কাংড়া জেলা অধিকার করলেন। আফ্‌গানদের পরাজিত করে আটক্‌ দখল করলেন। ধীরে ধীরে মুলতান, কাশ্মীর, পেশোয়ার প্রভৃতি অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত হলো। তাঁর সময়েই শিখ শক্তির চরম বিকাশ ঘটে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়।

প্রথম-ইঙ্গ শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৬ খ্রীঃ) : রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখদের জাতীয় জীবনে যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল, তাঁর পুত্র খরক সিংহের পক্ষে তা রোধ করার শক্তি ছিল না। খরক সিংহের রাজত্বকাল ছিল মাত্র এক বছরের। তাঁর মৃত্যুর পরে শাসন ব্যাপারে বিশৃংখলার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো খালসা বাহিনীর সামরিক নেতৃবৃন্দ। অবস্থা আরো সংকটজনক হলো যখন রণজিৎ-এর নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে রাজপদে অভিষিক্ত করে রাজমাতা ঝিন্দনকে নামেমাত্র অভিভাবিকা ঠিক করা হলো। এই সময়ে সামরিক নেতা লাল সিংহ ও তেজ সিংহ শাসন কর্তৃত্ব অধিকার করে

ফেললেন। এ দুজন সামরিক নেতার পক্ষে খালসা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করার শক্তি ছিল না। রাজমাতা ঝিন্দনও খালসা বাহিনীকে সংযত করতে না পেরে সৈন্যদের পার্শ্ববর্তী ইংরেজ রাজ্য আক্রমণে উৎসাহিত করলেন।

ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে প্রথম শিখযুদ্ধ হয়। শতদ্রুর পূর্বতীরস্থ ইংরেজ-অধিকৃত অঞ্চল শিখেরা আক্রমণ করলো। মুদকী, ফিরোজশাহ, আলিওয়াল ও সোবরাও নামে চারটি স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধে শিখদের পরাজয় হয়।

ইংরেজরা লাহোর অধিকার করবার পর শিখদের সঙ্গে সন্ধি হয়। এই সন্ধিকেই লাহোর সন্ধি (১৮৪৬ খ্রীঃ) বলা হয়। এই সন্ধিতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের শর্তানুসারে শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী অঞ্চল ইংরেজদের দখলে আসে। ইংরেজরা সমগ্র শিখ-রাজ্য অধিকার করলেন না বটে; কিন্তু শিখদের প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হলো, এবং

(১) শিখদের সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করা হলো।

(২) লাহোরে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলো। তার নির্দেশেই পাঞ্জাবের শাসন চলতে থাকে।

(৩) শিখ রাজ্যের আয়তন কমাবার জন্য গুলাব সিংহ নামে লাহোর দরবারের এক সর্দারের কাছে কাশ্মীর ও জম্মু বিক্রী করে দিলেন। তবে কার্যতঃ সেখানে ইংরেজ কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(৪) দলীপ সিংহ শিখ রাজ্যের মহারাজা এবং রানী ঝিন্দন তাঁর অভিভাবিকা স্বীকৃত হলেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ) ঃ লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে শিখেরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। নাবালক রাজা দলীপ সিংহ ইংরেজ রেসিডেন্টের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মুলতানে বিদ্রোহ দেখা দিল। রাজমাতা ঝিন্দনকে ব্রিটিশ-বিরোধী চক্রান্তের জন্য চুনার দুর্গে নির্বাসন দেওয়া হলো। রানী ঝিন্দনের প্রতি এই হীনতম আচরণে শিখেরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। হাজারা জেলার শাসনকর্তা ছত্র সিংহ ও তাঁর পুত্র শের সিংহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। ডালহৌসী শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। চিলিয়ানওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধে (১৮৪৯ খ্রীঃ) আবার শিখ-বাহিনী পরাজিত হলো। বীরত্ব ও সাহসিকতার অভাব তাঁদের ছিল না, কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে তাঁরা সমর্থ ছিলেন না।

লর্ড ডালহৌসী ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি ঘোষণাপত্র দ্বারা পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করলেন। রাজা দলীপ সিংহকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়ে রাজমাতা ঝিন্দনসহ তাঁকে সুদূর লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী নীতি ঃ লর্ড ডালহৌসী ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে শ্রেষ্ঠ শাসক বলেছেন। লর্ড ওয়েলেসলী বশ্যতা-মূলক নীতির উদ্ভাবন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করেছিলেন। ডালহৌসী-উদ্ভাবিত স্বত্ব-বিলোপ নীতির ফলে (Doctrine of Lapse) কয়েকটি আশ্রিত রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশের সাম্রাজ্য-ভুক্ত হলো।

লর্ড ডালহৌসী

স্বত্ব-বিলোপ নীতি ঃ স্বত্ব বিলোপ নীতির মূল কথা ছিল যে, ইংরেজ-আশ্রিত রাজ্যের কোন রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে তাঁর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই নীতির ফলে সাতারা, ঝাঁসী, নাগপুর প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

স্বত্ব-বিলোপের নীতির প্রয়োগ ছাড়াও তিনি নানা অজুহাতে বা কুশাসনের অভিযোগে সিকিম রাজ্যের কিছু অংশ এবং অযোধ্যা রাজ্য অধিকার করলেন। স্বত্ব-বিলোপ নীতির প্রয়োগে সম্বলপুর রাজ্য ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত হয়। পাঞ্জাবেও ইতিমধ্যে ইংরেজপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ডালহৌসীর অবদান ঃ জনহিতকর কাজ ঃ ডালহৌসীর শাসনকালেই কোম্পানীর সরকার বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশ-শাসন অর্থ কেবলমাত্র রাজস্ব আদায় নয়, দেশবাসীর উন্নতির জন্য কিছু কিছু কাজও সরকারকে করতে হবে।

ডালহৌসীর শাসনকালেই ভারতবর্ষে রেলগাড়ীর পত্তন হয়। রেলওয়ে স্থাপিত হওয়াতে জনসাধারণের যেমন যাতায়াতের সুবিধা হলো, তেমনি ব্রিটিশ শিল্পবিস্তারের সুযোগও আশাতীতভাবে বৃদ্ধি হলো। ভারত থেকে তুলা ইংলন্ডে পাঠান হতো এবং বিলাতের তৈরী বস্ত্র ভারতের গ্রামে-গঞ্জে-শহর-বন্দরে পাঠাবার সুবিধা হলো। প্রথমে বোম্বাইতে মাত্র বিশ মাইল রেল লাইন পাতা হলো। পরে কয়লাখনির কেন্দ্র রানীগঞ্জ থেকে কলকাতা পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হলো। রেলপথ নির্মাণের দায়িত্ব পেলেন কয়েকটি বিলাতী কোম্পানী। রেলপথ নির্মাণের ফলে নতুন নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগলো।

রেলের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় রাজপথ নির্মাণের কাজ শুরু হলো। কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণের কাজ শেষ হলো। রেলযোগে ও সড়কযোগে মাল চলাচলের সুবিধা হলো এবং সড়কযোগে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হতে থাকলো। চাষের জন্য জল সরবরাহের একান্ত প্রয়োজন দেখা দিল। সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য

বড় বড় খাল কাটা শুরু হলো। রেল, রাস্তা, সেচ-খাল প্রভৃতির কাজ পরিচালনার জন্য পূর্ত বিভাগ গঠিত হলো।

এ সময়েই ডাক-তার বিভাগের পত্তন হলো। আধুনিক ডাক-ব্যবস্থা চালু হওয়াতে অল্প পয়সায় সংবাদ আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা হলো।

ডালহৌসীর শাসনকালে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হলো। কোম্পানীর বড়কর্তা উড্ সাহেবের নির্দেশনামার (১৮৫৪ খ্রীঃ) প্রত্যক্ষ ফল হলো শিক্ষা-বিভাগ গঠন। শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তাকে বলা হতো ডি. পি. আই., বা ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক্ ইন্স্ট্রাকশন্।

কেবল সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, আধুনিক ভারত-গঠনে ডালহৌসীর অবদান অস্বীকার করা যায় না।

॥ ১৫ ॥

ব্রিটিশ কোম্পানীর আমলে শাসনব্যবস্থা

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে গোটা ভারতের এক সময়ে প্রভু হয়ে বসলেন। কার্যত বিজিত দেশে উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে কোম্পানীকে বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মুঘল-শাসন-ব্যবস্থাকে একেবারে অস্বীকার করার উদ্দেশ্য কোম্পানীর ছিল না। অথচ ইংলন্ডে প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার কাঠামো সামনে রেখে পাশ্চাত্য শাসনব্যবস্থার অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তনে কোম্পানীর উদ্যোগের অভাব ছিল না।

শাসনব্যবস্থার প্রথম যুগ ঃ ব্রিটিশ-শাসনের প্রথমদিকে ছিল চরম অব্যবস্থা। প্রথমে নেতিবাচক পথে চলে পরে একটা ইতিবাচক ভূমিকায় কোম্পানীর শাসকবর্গকে পোঁছাতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পরে ক্লাইভের প্রতিপত্তি ও সম্মান দুইই সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। এমনকি কলকাতার কাউন্সিল ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ার পূর্বেই তাঁকে কলকাতার গভর্নর পদে বসালেন। কোম্পানীর শাসনে তিনিই তখন একমাত্র প্রধান ব্যক্তি।

ক্লাইভের ইংলন্ডে গমন এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন—সময়ের ব্যবধান খুব বেশি ছিল না। এর মধ্যেই মুর্শিদাবাদে নবাবী ভাঙ্গা-গড়ার অনেক কাহিনী ঘটে গেল। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পরে ইংরেজ তখন ভারতে সর্বপ্রধান সামরিক শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

মীরজাফর নবাব হয়ে মুর্শিদাবাদের রাজকোষ উজাড় করে প্রচুর ধনরত্ন কোম্পানীকে উপঢৌকন দিলেন। ক্লাইভের ভাগে পড়েছিল সিংহভাগ। কলকাতার পদস্থ কর্মচারীরাও ঘরে বসে নানা উপঢৌকন লাভ করলেন। কোম্পানীর ছোট বড় সব কর্মচারী বিনাশুল্কে অবাধে বাণিজ্য করতে লাগলেন। ইংরেজরা এ সম্পদ স্বদেশে পাঠিয়ে প্রায় সকলেই উঠ্‌তি নবাবের পর্যায়ভুক্ত হলেন। বাঙালীরা এসময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে চাকরি বা চাষ-বাস করে কোন রকমে দিন চালাতে লাগলেন। তখন শাসন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব নবাবের, কোম্পানী নেপথ্যে থেকে চাবিকাঠি ঘুরাতেন। এটাই হলো কোম্পানীর নেতিবাচক শাসনের প্রথম যুগের কথা। সর্বস্তরে শোষণের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

দেওয়ানী লাভের পরে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার প্রকৃত প্রাধান্য লাভ করলেন ইংরেজ কোম্পানী। মুর্শিদাবাদের নবাবকে ইতিমধ্যেই ইংরেজদের বৃত্তিভোগী করা হয়েছিল।

ক্লাইভের দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা ঃ অধিকৃত রাজ্যসমূহ শাসনের জন্য ক্লাইভ-প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থাকে 'দ্বৈত-শাসন' নামে অভিহিত করা হয়। রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার কর্তৃত্ব দিল কোম্পানীর হাতে, আর শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব রইলো নবাবের হাতে।* কোম্পানীর পক্ষে রাজস্ব-ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো দুজন নায়েব-নাজিমের হাতে। রেজা খাঁ পেলেন বাংলাদেশের রজেস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব, আর সিতাব রায় পেলেন বিহারের কর্তৃত্ব। নবাব শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম ছিলেন।

দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা বাংলার ইতিহাসে চরম অ-ব্যবস্থার সূচনা করেছিল। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেলো। রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের অত্যাচারে জনসাধারণের চরম দুর্গতি ঘটলো।

ক্লাইভের পরবর্তী গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হলেন ভেরলেস্ট্ (১৭৬৭-৬৯ খ্রীঃ)। এসময়ে ইংরেজ কোম্পানী বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর। বাণিজ্য-সম্প্রসারণেও কোম্পানী ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু জনসাধারণের সুখ-সুবিধার দিকে কোম্পানী সরকার মোটেই নজর দিলেন না।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঃ ভেরলেস্ট-এর পরবর্তী গভর্নর হলেন কার্টিয়ার (১৭৬৯-৭২ খ্রীঃ)। তাঁর আমলেই এলো ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬, ইংরেজী ১৭৭০)। ঐতিহাসিক হান্টারের মতে এই দুর্ভিক্ষের প্রভাব পরবর্তী চল্লিশ বছরের ইতিহাসেও লক্ষ্য করার মত। তাঁর মতে কৃষক সমাজের অর্ধেক লোক মারা গিয়েছিলেন। বাংলার তিন কোটি অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় এককোটি মন্বন্তরে প্রাণ হারালেন।** কিন্তু পরম পরিতাপের কথা যে দুর্ভিক্ষের বছরেই (১৭৭০ খ্রীঃ) কোম্পানী রাজস্ব আদায় করেছিলেন কড়ায়-ক্রান্তিতে। ১৭৭১ সালে রাজস্বের পরিমাণ আরো শতকরা দশ টাকা বেশী হারে বৃদ্ধি করা হলো। দুর্ভিক্ষে বাংলা শ্মশানে পরিণত হলো। অথচ দুর্ভিক্ষের সময়েও ক্ষুধার্ত নরনারীকে বঞ্চিত করে সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য-শস্য মজুত রাখা হয়েছিল। রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়ের অত্যাচারে রাজস্ব আদায় ঠিকই চলছিল। কোম্পানীর এক কর্মচারী "বেচার", মুর্শিদাবাদের সমসাময়িক ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন—এই সুন্দর দেশে অপ্রতিহত স্বৈরাচারী শাসনেও সমৃদ্ধি দেখা দিত, কিন্তু এদেশ আজ ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্নওয়ালিস লিখেছিলেন, মন্বন্তরে প্রপীড়িত বিশেষ অঞ্চলগুলির মধ্যে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভুম প্রভৃতি এখনও যেন কোন বন্যজন্তু-অধ্যুষিত জঙ্গলের মত মনে হচ্ছে।

ভারত শাসনে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ভূমিকা ঃ লর্ড ক্লাইভ যে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করেছিলেন তা ছিল দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ। কোম্পানীর ভারতীয় শাসকেরাও ভারত

* 'The great disadvantage of the scheme was that it separated power from responsibility'—Dodwell, vide V. D. Mahajan, p. 41.

** কৃষক সভার ইতিহাস—আবদুল্লাহ্ পৃঃ ২২।

শাসনের দায়িত্ব বৃটিশ পার্লামেণ্টের উপরে ছেড়ে দিতে পারলে অসুখী হতেন না। এই রকম পরিস্থিতিতে বৃটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানীর শাসন-নীতি ও বাণিজ্য-নীতির নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা অনুভব করে কয়েকটি আইন পাস করেছিলেন। ভারত শাসনে ইংলন্ডের সরকার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালন করতে কিছুটা অগ্রসর হলেন। এসময় থেকেই ভারতে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে থাকে।

লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট ঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ শাসনব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য যে আইনটি পাস করলেন তার নাম 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট, ১৭৭৩ খ্রীঃ'।

কোম্পানীর ডিরেক্টরদের সংখ্যা নির্দিষ্ট হলো চব্বিশ জন। তাঁরা নির্বাচিত হবেন চার বছরের জন্য। প্রতি বছরে এই সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ছয়জন বিদায় গ্রহণ করবেন। ভারত শাসন-সংক্রান্ত সামরিক ও বে-সামরিক কার্যকলাপের সমস্ত বৃত্তান্ত ডিরেক্টরদের জানাতে হবে। একজন মন্ত্রীকে রাজস্বের হিসাব-নিকাশ বছরে অন্ততঃ দুবার ব্রিটিশ-পার্লামেন্টে পরীক্ষার জন্য পেশ করতে হবে।

বাংলা প্রেসিডেন্সীর জন্য গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলে চারজন সদস্য নিযুক্ত হবেন। ব্যংলার গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গভর্নরদের কাজের তত্ত্বাবধান করার অধিকার স্বীকৃত হলো। যুদ্ধ-ঘোষণা, সন্ধি-স্থাপন প্রভৃতি বিশেষ দায়িত্ব থাকবে গভর্নর জেনারেলের হাতে। কলকাতায় একজন প্রধান বিচারক ও তিনজন বিচারক নিয়ে একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হবে এবং ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী ভারতের ব্রিটিশ-শাসনাধীন প্রজাদের অপরাধের বিচার করা হবে।

রেগুলেটিং অ্যাক্টের বিধানসমূহ সুদীর্ঘ। এই আইনটি অনেক জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, এই আইনের দ্বারা ইংলন্ডের সরকার কোম্পানীর উপরে সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্ব স্থাপনে সমর্থ হলেন না। কাউন্সিলের উপরেও গভর্নর জেনারেল সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করলেন না। গভর্নর জেনারেল মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গভর্নরদের উপরেও তেমন কোন কর্তৃত্ব খাটাতে পারলেন না।

নর্থ সাহেবের রেগুলেটিং অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে সবচেয়ে বিপদে পড়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস্—প্রায় পদত্যাগ করে দেশে ফিরে যাওয়ার উপক্রমও তাঁর হয়েছিল। তবে বিপদে তিনি মুষড়ে পড়েননি। নিজের জেদ বজায় রেখে চলার ক্ষমতা তিনি বজায় রেখেছিলেন।

পিটের ভারত-শাসন আইন ঃ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট বা ভারত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ হয়। উইলিয়ম পিট (ছোট পিট্) তখন ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী। এই আইনের সাহায্যে রেগুলেটিং আইনের অনেক ত্রুটি দূর করা হলো। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এই আইনের সাহায্যেই মোটামুটি ভারত-শাসন নিয়ন্ত্রিত

হয়েছিল, যদিও এর মধ্যে কোম্পানীর সনন্দ বা চার্টার কয়েকবার পাস করতে হয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের অবসর গ্রহণ করার পূর্বেই এই আইনটি বিধিবদ্ধ হয়েছিল।

এই আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকারের অর্থ-সচিব, আর একজন মন্ত্রী এবং রাজা কর্তৃক মনোনীত চারজন প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নিয়ে বোর্ড অব্ কন্ট্রোল নামে একটি সংস্থা ভারত শাসন বিষয়ে তত্ত্বাবধান করার জন্য গঠিত হয়। তাছাড়া কোম্পানীর তিনজন ডিরেক্টরকে নিয়ে একটি গোপন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির কাজ হলো, ভারতবর্ষে কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছে বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের অভিমত বা নির্দেশ পাঠানো এবং তাঁদের কাছ থেকে শাসন-সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করা। পিটের আইনের এই বিধানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিধানবলে ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষ ভাবে কোম্পানীর ভারত-শাসনে হস্তক্ষেপ করলেন। তবে এ সময়েও কোম্পানীকে সামনে রাখা হলো। গোপন কমিটিতে কোম্পানীর ডিরেক্টররাই ক্ষমতার অধিকারী হলেন।

পিটের ভারত-শাসন আইনের অন্যান্য বিধানাবলীও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলো। কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা তিনজন করা হলো।

কাউন্সিলের তিনজন সদস্যের মধ্যে একজন থাকবেন সেনা বিভাগের অধ্যক্ষ। গভর্নর জেনারেল নিজস্ব ভোটটি ছাড়াও অপর একটি ভোটের অধিকারী হলেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাই গভর্নমেন্টের উপরে গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব সু-প্রতিষ্ঠিত হলো।

ওয়ারেন হেস্টিংস ঃ সংস্কারমূলক কাজ ঃ ওয়ারেন হেস্টিংস শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে নায়েব নাজিম রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে পদচ্যুত করলেন। সরকারী রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হল। সঙ্গে সঙ্গেই নবাবের ভাতা ৩২ লক্ষ থেকে ১৬ লক্ষ টাকায় কমানো হলো। এ সময়ে কালেকক্টরগণও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। হেস্টিংস এই ব্যবস্থা দূর করার জন্য ১৭৭৩ খ্রীঃ কালেক্টর পদ তুলে দিলেন। দেওয়ান নামে ভারতীয় কর্মচারীদের হাতে তিনি জেলার খাজনা আদায়ের ভার দেন। এর ফলে হেস্টিংসের বাস্তব বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বিচার বিভাগের সংস্কার ঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কোম্পানী দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করায় হেস্টিংস দেওয়ানী মামলার ভার কোম্পানীর হাতে তুলে নিলেন।

ফৌদারী বিচার-ব্যবস্থাও তিনি সুসংহত করেন। এজন্য প্রতি জেলায় কালেক্টরের অধীনে দেওয়ানী আদালত এবং কাজীর অধীনে ফৌজদারী বা নিজামত-আদালত স্থাপিত হয়। এই সকল আদালত থেকে আপীলের শুনানীর জন্য তিনি কলকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামে দুটি আদালত স্থাপন করেন। রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস হওয়ার পরে কলকাতায় একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন বিচারক নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হয়।

লর্ড কর্নওয়ালিস ঃ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস একই সঙ্গে গভর্নর জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়ে ভারতে উপস্থিত হলেন। প্রয়োজন হলে কাউন্সিলে সংখ্যাধিক্য সদস্যদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার ক্ষমতাও বিশেষ আইন করে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

বিচার-বিভাগের সংস্কার ঃ লর্ড কর্নওয়ালিস বিচার-বিভাগ ও পুলিস-বিভাগের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বা কালেক্টরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলো। এই সময়েই পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদের সৃষ্টি করা হয়। জেলাগুলিকে কতকগুলি অঞ্চলে বিভক্ত করে শান্তিরক্ষার জন্য "দারোগা" পদের সৃষ্টি করা হয়। কালেক্টরদের বিচার করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দিয়ে কর্নওয়ালিস স্বতন্ত্র দেওয়ানী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করলেন। বিভিন্ন জেলায় আদালত স্থাপন করা হলো।

লর্ড কর্নওয়ালিস

কলকাতার গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত সদর-দেওয়ানী আদালতে বড় বড় মামলার আপীল শুনানীর ব্যবস্থা করলেন। সর্বনিম্নে ছিল সদর আমীন ও মুনসেফী আদালত; তার উপরে ছিল জেলার দেওয়ানী-আদালত। এখানে বিচারক ছিলেন ইংরেজ। ভারতীয় আইনজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে তাঁরা রায় দিতেন।

ফৌজদারী মামলা বিচারের জন্য সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হলো। চারটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয়ের ব্যবস্থা করা হলো। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে লর্ড কর্নওয়ালিস ইংরেজ আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রচুর উন্নতিসাধন করেছিলেন। তাঁর এই সংস্কারমূলক আইন বা বিধানসমূহ "কর্নওয়ালিস কোড" বা "বিধান" নামে পরিচিত।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক কর্তৃক বিচার বিভাগের সংস্কার ঃ লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক প্রথম সমগ্র ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হন (১৮২৮-৩৫ খ্রীঃ)। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ অনুসারে এ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল। তিনি কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থায় কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ বিচারপতিদের উপর বিচারের দায়িত্ব অর্পণ নীতি বাতিল করে দিলেন এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নপদে কর্মরত ভারতীয় বিচারকদের বিচার-ক্ষমতা বাড়িয়ে ছিলেন। বিচারালয়ে প্রচলিত ফরাসী ভাষার পরিবর্তে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের
ছিলেন। বিচারালয়ে প্রচলিত ফরাসী ভাষার পরিবর্তে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের
নিয়ম তিনি প্রবর্তন করলেন।

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ঃ ক্রমাগত রাজ্যবিস্তার এবং বিজিত রাজ্যের শাসন-পরিচালনার জন্য ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সরকারের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দিল। সরকার গঠন করার পরে বাণিজ্যের আয় কমে গিয়েছিল। সরকার পরিচালিত কোন শিল্প-সংস্থার প্রতিষ্ঠা তখনও সম্ভব হয়নি। তাই সরকারী আয়বৃদ্ধির একমাত্র হাতিয়ার ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি।

ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি ঃ পাঁচসালা বন্দোবস্ত ঃ ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব সংস্কারের অভিপ্রায়ে প্রথমে পাঁচসালা বন্দোবস্তের প্রবর্তন করলেন। একদল ইজারাদারের সাথে পাঁচবছরের জন্য জমির বন্দোবস্ত করা হলো। অল্প সময়ের জন্য জমির মালিক হয়ে জমির উন্নতি বা চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে ইজারাদারদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। পাঁচবছরে যতটা সম্ভব রাজস্ব আদায় করে সরকারী দেয় টাকা মিটিয়ে, নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধিই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ ভূমি রাজস্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৯৩ খ্রীঃ)। লর্ড কর্নওয়ালিস প্রথমে দশসালা অর্থাৎ দশবছরের জন্য জমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করলেন (১৭৯০ খ্রীঃ)। তিন বছরের মধ্যেই (১৭৯৩ খ্রীঃ) দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করা হল। কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত জমিদারী ব্যবস্থাকে **মহলওয়ারী ও রাইয়তওয়ারী** বলা যেতে পারে। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশে বিলাতী ছাঁচের জমিদারী রাইয়ত ব্যবস্থা কায়েম করতে, কিন্তু তা পরিণত করা সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশে বিলাতি ধরনের বৃহদায়তন জমিদারীর অপকৃষ্ট নকল সৃষ্টি করা হলো। বিহার ও উড়িষ্যাতেও এই ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ (বারাণসি ব্যতীত), মধ্যপ্রদেশ এবং বোম্বাইয়ের কিছু কিছু অংশে স্বল্পস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল।

পাঞ্জাবের ভূমিব্যবস্থাকে মহলওয়ারী বলা হয়। রাইয়তওয়ারী ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল মাদ্রাজ, বোম্বাই, আসাম ও সিন্ধু প্রভৃতি স্থানে।

জমির চিরস্থায়ী মালিক হলেন জমিদারেরা। কোম্পানী-সরকারকে নির্দিষ্ট হারে বার্ষিক রাজস্ব দিতে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। জমির মালিকানা তাঁদের হাতে এসে গেলেও সেচব্যবস্থা এবং জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির কোন দায়িত্বই তাঁরা নিলেন না।

চাষীদের স্বার্থ হলো সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। জমিদারেরা খেয়াল-খুশীমত খাজনা বৃদ্ধি করতেন। ইচ্ছামত জমি থেকে প্রজাদের উচ্ছেদ করতেন। তাছাড়া প্রজাদের উপর চাপানো হতো বহুবিধ "আবওয়াব" বা বে-আইনী কর।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল ঃ লর্ড কর্নওয়ালিস এক নতুন জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে আনলেন একটা মারাত্মক অভিশাপ। কোম্পানীর প্রয়োজন ছিল টাকার। জমিদারের সাহায্যে সম্পদ-শোষণ করে বার্ষিক স্থায়ী আয়ের একটা ব্যবস্থা হলো। বিদেশী কোম্পানীর দালাল হিসাবেই জমিদাররা কাজ করতেন।

এক সময়ে কৃষকেরা ছিলেন জমির মালিক। এখন তাদের কাছ থেকে মালিকানা কেড়ে নিয়ে তা তুলে দেওয়া হলো নতুন জমিদার শ্রেণীর হাতে। প্রায় ১৬০ বছর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল ভারতবাসীকে ভোগ করতে হয়েছে।

লর্ড কর্নওয়ালিস ছিলেন ইংলন্ডের এক জমিদার বংশের সন্তান। তাঁর ধারণা ছিল এদেশে ইংলন্ডের অনুরূপ জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে জমিদারেরা রাজভক্ত প্রজা হিসাবে ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষা করতে উদ্যোগী হবেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পরশ্রম-ভোগী পরগাছার সামিল জমিদারের ও তাঁদের কর্মচারী নায়েব-তহশীলদার প্রভৃতি কর্মচারী নিয়ে আর একটি নতুন শ্রেণী সৃষ্টি হলো। জমিদারেরা তাঁদের হাতে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অনেকেই শহরবাসী হয়ে নিশ্চিন্তে বিলাসী জীবন কাটাতে অভ্যস্ত হলেন। অনেক জমিদার খাজনা আদায়ের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে মধ্য-স্বত্বভোগী নামে আর এক শ্রেণীর সৃষ্টি করলেন। তাঁরা জমিদার ও প্রজার মাঝখানে থেকে জমির স্বত্ব ভোগ করতেন। প্রজাদের নির্যাতন করে খাজনা আদায় করতেন। পরবর্তীকালে এরাই হলেন মধ্যবিত্ত-শ্রেণী। তাঁদের ছেলেমেয়েরাই বেশির ভাগ ইংরেজী শিক্ষালাভ করে অফিস-আদালতে চাকরি করতেন এবং সময় সময় রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন।

জমিদার ও তাঁদের কর্মচারীরা তাঁদের সঞ্চিত অর্থের বেশির ভাগ জমি কিনে টাকা মাটিতেই নিবদ্ধ করতেন। শিল্প-প্রসারে তাঁরা উদ্যোগী হতেন না।

এ ধরনের ভূমি-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কার্ল মার্কস প্রায় একশো বছর পূর্বে। তিনি এ ব্যবস্থাকে বলেছেন, নিতান্ত অবাস্তব এবং ব্যর্থ। বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছিল বিলাতী ধরনের বৃহৎ জমিদারীর অপকৃষ্ট নকল। বাকরগঞ্জ (বরিশাল, বর্তমান বাংলাদেশ) জেলার সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে মেজর জ্যাক নামে একজন ইংরেজ চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে বলেছেন, "দুনিয়ার সুশৃঙ্খল ভূমিব্যবস্থার সবচেয়ে বিস্ময়কর অপকৃষ্ট নকল।"*

---

* কৃষক সভার ইতিহাস—আবদুল্লাহ্ রসুল, পৃঃ ১৯-২০

॥ ১৬ ॥

ব্রিটিশ আমলে শিল্প ও বাণিজ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ কোম্পানী বাংলার প্রভুত্ব লাভ করলেন। ইংরেজ-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত দেশীয় বণিকদের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে সুতীবস্ত্র, রেশমী বস্ত্র, তুলা, চিনি, লবণ, পাট, যবক্ষার (Carbonate of Potash) এবং আফিম প্রভৃতি পণ্যসম্ভার বিদেশের বিভিন্ন বাজারে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করা হতো। ঢাকাই-মসলিন তো বিশ্বের বাজারে খুবই জনপ্রিয় ছিল। করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলের বন্দরে বন্দরে বাংলার শিল্পের চাহিদা তো ছিলই, এমন কি পারস্য-উপসাগরের বন্দরগুলিতে, ম্যানিলা, চীন এবং আফ্রিকার উপকূলভাগের বন্দরগুলিতেও বাংলা-শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

দেওয়ানী লাভের পর থেকে ইংরেজ বণিকদের একমাত্র লক্ষ ছিল বাংলার বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভ করা।

বাণিজ্যে বাংলার অর্থের বিনিয়োগ

কোম্পানী সরকার প্রতিবছর 'ইনভেস্টমেণ্ট' বা 'লগ্নী' নামে বাংলাদেশের রাজস্বের একটা অংশকে পৃথক করে রাখতেন। এই টাকা দিয়ে কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলাদেশ থেকে মাল কিনে বিলেতে চালান দিতেন।

কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীরা যে লুটের পথে অগাধ সম্পত্তি অর্জন করতেন, তার পরিমাণ নির্ধারিত হত এই 'লগ্নী'র পরিমাণ দিয়ে। এই 'লগ্নী'ই ছিল ভারতের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। বিলাতী পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টেও 'লগ্নী'র লভ্যাংশের তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছিল। লগ্নীর টাকা এবং কোম্পানীর হাতে রাজস্বের যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকতো তা দিয়ে ভারত থেকে নানারকম দ্রব্য কিনে নেওয়ায় কোম্পানীর রপ্তানী-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

চীনের সাথে বাণিজ্য ঃ এসময়ে কোম্পানী চীন দেশে ব্যবসা-বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে ভারত থেকে নানারকম জিনিস কিনে চীন দেশে পাঠাতে লাগলো, চীন দেশে ইংরেজদের আফিমের ব্যবসার সূত্রপাত এসময় থেকেই শুরু হয়েছিল।

বাণিজ্যে লাভ ঃ ১৭৫৭-১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় তেইশ বছর ধরে এদেশ থেকে বিলাতে তিন কোটি আশি লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে প্রায় ষাট কোটি টাকা কোম্পানীর কর্মচারীরা ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিলেন। এই শোষণের ফলে দেশের সমৃদ্ধি হ্রাস পেল, ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাঙন ধরল। বিদেশী প্রভুরা দেশের দৌলত লুট করে স্বদেশে পাচার করতে লাগলেন। ইংরেজ বণিকেরা 'দস্তকের' অপব্যবহার করে ক্রমাগত বিনা-শুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে উৎসাহী হলেন।

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মীরকাশিম কোম্পানীর কলকাতা-কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশের সাধারণ লোকের কাছ থেকে সিকি ভাগ দাম দিয়ে যে জিনিস কিনতো তা আবার এদেশের লোকের কাছেই দ্বিগুণ দামে বিক্রি করত। ইংরেজের সঙ্গে নবাব মীরকাশিমের বিবাদের প্রধান কারণ হয়েছিল যে, তিনি কোম্পানীর কর্মচারীদের অবাধ-বাণিজ্যে বাধা দিয়েছিলেন।

দেশীয় শিল্পের পতন

সুতিবস্ত্র ঃ ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করে কোম্পানীর লোভ ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগলো। সুতী-বস্ত্রের বাজার একচেটিয়া করার উদ্দেশ্যে কোম্পানীর কর্মচারীরা ভারতীয় তাঁতিদের সামান্য কিছু দাদন দিয়ে নির্ধারিত দিনে তাদের তৈরী সমস্ত কাপড় কিনে নেবার ব্যবস্থা করলেন। চাবুক মেরে ও অন্যান্য দণ্ড দেবার ভয় দেখিয়ে তাঁতিদের চুক্তি করতে বাধ্য করা হলো। কোম্পানী কখনও ভারতীয় তাঁতিদের উৎপন্ন বস্ত্র কিনতে তাঁদের ন্যায্য দাম দিতেন না। কোম্পানীর শাসনের প্রথম দিকেই পশ্চিম ভারতে ভরুচ (বর্তমান ব্রোচ—প্রাচীন নাম-ভৃগুকচ্ছ) এবং বরোদার তাঁতিরা শাসকদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করেছিলেন। কোন কোন ইংরেজ এই ধর্মঘটকে 'মিউটিনি' বা বিদ্রোহ বলেছেন। বাংলার তাঁতিরা কোম্পানীর গোমস্তাদের অত্যাচার এড়াবার জন্য তাঁতের কাজে ইস্তফা দিয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। শান্তিপুরের নামজাদা তাঁতিরা নিজেদের নেতাদের নির্দেশে কোম্পানীর কাজ নিতে অস্বীকৃত হয়ে জেলে যেতে পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন।

কোম্পানীর অত্যাচারে রেশমী বস্ত্রের কারিগরদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। কলকাতার গভর্নর ভেরলেস্ট্-এর বিবরণী (১৭৬৭ খ্রীঃ) থেকে জানা যায় যে, অনেক তাঁতি তাঁদের পৈতৃক ব্যবসা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বস্ত্র-শিল্প ধ্বংসের উদ্যোগ ঃ ভারতবর্ষের রেশমী ও সুতী কাপড়ের চাহিদা বিলাতের বাজারে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শিল্পপতিরা এদেশের বস্ত্র শিল্পকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হলেন। পার্লামেন্টে আইন করে (১৭২০ খ্রীঃ) বলা হল যে ভারতবর্ষ থেকে আমদানী স্তুতী বা রেশমী কাপড় বিলাতে কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের বাজারে ভারতীয় রেশমী ও সুতী বস্ত্রাদি কিছুদিন বিক্রী হতো বটে কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকায় সে সব রাজ্যের বাজার ক্রমে নষ্ট হয়ে গেল। ফলে এদেশের বস্ত্র-শিল্প প্রচণ্ড আঘাত পেলো। বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রস্তুত সুতী ও রেশমী বস্ত্রাদি বিলাতে প্রস্তুত বস্ত্রাদির তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ৬০ ভাগ কম দামে বিক্রী হতো। বিলাতী মাল 'সংরক্ষণ'-এর জন্য ভারতীয় আমদানী বাণিজ্যের উপরে শতকরা ৭০ বা ৮০ ভাগ শুল্ক বৃদ্ধি করে ধীরে ধীরে বিদেশে ভারতীয় বস্ত্রের আমদানী একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলো।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্পে বিস্ময়কর পরিবর্তনের সূচনা হলো। ‘পাওয়ার লুম্’ বা কলের তাঁত আবিষ্কৃত হওয়ায় অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদন সম্ভব হলো। ভারত থেকে তুলো এবং বস্ত্র শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিলাতে রপ্তানির ব্যবস্থা করা হলো। ভারতের তুলা দিয়ে ম্যাঞ্চেস্টারের মিলের তৈরী কাপড়ে ভারতের বাজার ছেয়ে গেলো। পার্লামেণ্ট থেকে আইন পাস করে ভারতের সুতী বস্ত্র ও রেশমী বস্ত্রের চাহিদা বিলাতের বাজারে কমিয়ে দেওয়া হলো। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ১৭৮৬-১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ড থেকে যে পরিমাণ বস্ত্র ভারতে রপ্তানি করা হয়েছিল তার গড় মূল্য ছিল মাত্র বার লক্ষ পাউণ্ড কিন্তু ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে রপ্তানি-জাত শিল্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে গড় মূল্য দাঁড়ালো প্রায় এক কোটি চুরাশি লক্ষ পাউণ্ড।*

পুঁজিবাদী কারখানায় তৈরী জিনিসের দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা হত। এদেশের বাজার দখল করার উদ্দেশ্যে আরও সস্তা দরে বিলাতী জিনিস বিক্রী করা হত। প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির শিল্প পিছু হটতে লাগলো। ভারতীয় হস্ত-শিল্পের সৌন্দর্য বজায় রেখে উৎপন্ন করতে শিল্পীদের বেশী সময়ের প্রয়োজন হত। কলের তৈরী শিল্পের উৎপাদনের সঙ্গে হস্তশিল্প পাল্লা দিয়ে কিছুতেই চলতে পারলো না। যে সব শিল্পী কুটির শিল্পের সাহায্যে বেশ কিছু আয় করত, এখন তাঁরা বাধ্য হল কুটির শিল্প ত্যাগ করে একমাত্র চাষের উপর নির্ভর করতে। স্বভাবতই তাদের আয় কমে গেল, অন্যদিকে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত পেছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে বলা যায় যে ইংরেজ সরকার এদেশে কলকারখানা বৃদ্ধি করতে মোটেই আগ্রহ দেখান নি। ১৮৫১ সাল নাগাদ বহু বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে ভারতীয়দের উদ্যোগে বোম্বাইয়ে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রায় বারটি কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পরে ইংলণ্ডেও অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায়। তাই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কলের তৈরী কাপড় বিক্রী করতে বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।**

দেশীয় শিল্পের বাজার বন্ধ ঃ বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে জোর করে আমদানীর ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলিও ধ্বংসের পথে চললো। ইংরেজরা এদেশে এসে এখানকার পল্লী সমাজকে ধ্বংস করলো। চরকা আর তাঁত ভেঙে দিল। নানা আইন পাস করে এদেশের শিল্পকে শৃংখলিত ও বিলুপ্ত করার চেষ্টায় ইংরেজ সরকার সফল হলেন। ভারত থেকে লুট করা সম্পদ ব্যতীত ব্রিটেনের অর্থনৈতিক উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হতো না।

---

* The average value of the cotton goods annually exported from England was about £ 12,00,000 between 1786 and 1790. By 1809 it has increased to £ 1,84,00,000.—Advanced History of India, p. 803.

** ভারতবর্ষের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৫৪।

ভারতের হস্তশিল্পসমূহের সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মকাজ বিদেশীদেরও বেশ পছন্দসই ছিল। বাংলা ব্যতীত লক্ষ্ণৌ, আহ্মেদাবাদ, নাগপুর এবং মাদুরা প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত বস্ত্র শিল্পের উপরেও প্রচণ্ড আঘাত পড়লো। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের শালের চাহিদাও কমে যেতে লাগলো। বাংলা, বারাণসী, তাঞ্জোর, পুণা, নাসিক, আহ্মেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের কারিগরদের তৈরী পিতল-তামা-কাঁসার বাসনের চাহিদাও একসময় কম ছিল না। অন্যান্য কারিগরি শিল্পের মধ্যে রকমারি পাথর বসানো সোনা, রুপার অলংকার, মার্বেল, চন্দন কাষ্ঠ, হাতীর দাঁতের সূক্ষ্ম শিল্প-কার্য একসময় বিদেশের বাজারে প্রচুর বিক্রী হতো। ভারতের মণি, মুক্তো, জহরত, রকমারি সুগন্ধ দ্রব্য, বিভিন্ন জাতের মসলা, চিনি এবং আফিমের চাহিদাও বিদেশের বাজারে মোটেই কম ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত ভারতীয় বণিকেরা এই সমস্ত শিল্প দূর-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করে প্রচুর লাভ করতেন।

সুতী বস্ত্রের একচেটিয়া অধিকার করায়ত্ত করার পরেও ইংরেজ বণিকদের তৃপ্তি হলো না। তাঁদের লোভ আরও বেড়ে গেল। এসময় থেকে ইংরেজ সরকার নানা আইন পাস করে বিদেশের বাজারে ভারতের শিল্প রপ্তানির পথ বন্ধ করে দিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসযজ্ঞের যে উদ্যোগ ইংরেজরা শুরু করেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই তাতে শেষ আহুতি দান সম্ভব হলো। ভারতবাসীর আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তাদের উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলো।*

দেশীয় লক্ষ লক্ষ কারিগরের জীবিকা যখন ইংরেজ শাসনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, তখন শিল্পের বিকাশের অন্য কোন পথের সন্ধান খুঁজে বের করতে ভারতীয় বণিকেরা সমর্থ হয়নি। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধ শহর পূর্ব গৌরব হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়তে লাগলো।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টের এক অনুসন্ধান কমিটিতে স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ন বলেন, ভারতবর্ষের 'ম্যাঞ্চেস্টার ঢাকা' শহরের লোকসংখ্যা দেড় লক্ষ থেকে কমে গিয়ে ত্রিশ কি চল্লিশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। একসঙ্গে জঙ্গল আর ম্যালেরিয়া রোগ শহরকে গ্রাস করতে আসছে। প্রায় একই সময়ে ঐতিহাসিক মণ্টগোমরী মার্টিন লেখেন, সুরাট, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য ভারতীয় শিল্পকেন্দ্রসমূহের অবনতি ও সর্বনাশ একান্ত পীড়াদায়ক। আমার মনে হয় যে দুর্বলের উপর সবলের চাপেই এ ধরনের শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।**

---

* 'The broad fact remains that during the first half of the nineteenth centuary India lost the proud position of supremacy in the trade and industry of the world, which she had been occupying for well-night two thousand years, and was gradually transformed into a plantation for the production of raw materials and a dumping-ground for the cheap manufactured goods from the West.'—Advanced History of India, p. 805.

** ভারতবর্ষের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪২৬।

॥ ১৭ ॥

ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি

[ক] পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন

ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ঃ বৈদিক যুগে আর্যসন্তানদের শিক্ষা শুরু হতো ব্রহ্মচর্যাশ্রমে—গুরুগৃহে। শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার সাথে চলতো ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন, সুশৃংখল সামাজিক জীবন গঠন এবং স্বাবলম্বনের শিক্ষা। এ যুগে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক ও আবাসিক, পরবর্তী বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষার আমলে উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রসমূহকে বলা হতো চতুষ্পাঠী বা টোল। বৌদ্ধ যুগে শিক্ষার মাধ্যম ছিল জনসাধারণের কথ্যভাষা—পালি। এ সময়ের পাঠ্যসূচী ছিল আরও ব্যাপক। শিক্ষার-ব্যবস্থা ছিল অবৈতনিক ও আবাসিক। শিক্ষা শুরু হতো বৌদ্ধ সংঘ বা মঠ-বিদ্যালয়ে। পরবর্তীকালে মঠ-বিদ্যালয়সমূহ সম্প্রসারিত হয়ে পরিণত হয়েছিল তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতো সাধারণতঃ বিদ্যার্থীদের গৃহ-পরিবেশে।

ইসলামী শিক্ষা ঃ মুসলমান আমলে সুলতান-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে প্রবর্তিত হয় ইসলামী শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী, ফারসী ভাষা। ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা অবশ্যই ছিল, সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নানা ধরনের ব্যবহারিক বিষয়, যেমন—রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, শিল্পকলা ইত্যাদি। উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'মাদ্রাসা' আর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 'মক্তব' ও 'পাঠশালা'। এখানে ভাষা, গণিত, জমি-জরীপ, হিসাব-পরীক্ষা, হাতের লেখার উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি শেখানো হতো। ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় পড়াশোনা করত। ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি, বিশেষ করে, পল্লী অঞ্চলে চলতো প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষা—এ শিক্ষাকে তখন হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থা বলা হতো। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পরে গোটা ভারতীয় শিক্ষাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত না করে একসাথে বলা হতো 'দেশীয় শিক্ষা'।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ একটা নিয়ম করেছিলেন যে ভারতগামী প্রত্যেকটি জাহাজে কিছুসংখ্যক খ্রীষ্টান মিশনারীদের ভারতে নিয়ে আসা হবে। ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের বণিকদের সাথেও একই জাহাজে ভারতে চলে আসতেন খ্রীষ্টান মিশনারীরা; পর্তুগীজ বণিকদের সময় থেকেই এ ব্যবস্থা চলে এসেছিল। প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই মিশনারীরা এদেশে আসতে থাকেন। পরে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্মপ্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে

প্রোটেস্টান্ট মিশনারীরা এস. পি. সি. কে. (Society For Promoting Christian Knowledge) নামে একটি সংস্থা গঠন করলেন। ধর্মান্তরিত অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য বহু আশ্রয়শিবির এবং তাদের শিক্ষার জন্য অনেক অবৈতনিক বিদ্যালয় (Charity School) এই সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশনারীদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ছিল স্থানীয় ভাষা। দক্ষিণ-ভারতে এস. পি. সি. কে-র উদ্যোগেই প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

শ্রীরামপুর ত্রয়ী ঃ বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে উইলিয়ম কেরী, উইলিয়ম ওয়ার্ড এবং জোসুয়া মার্সম্যান প্রমুখ মিশনারীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসে তাঁরা 'শ্রীরামপুর ত্রয়ী' (Serampore Trio) নামে প্রসিদ্ধ।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কেরী সাহেব কলকাতায় আসেন। শ্রীরামপুরে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। বাংলা ছাপার হরফের প্রবর্তন শ্রীরামপুরের মিশনারীদের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। তাঁদের উদ্যোগেই বাংলা ভাষায় 'সমাচার-দর্পণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৮১৮ খ্রীঃ)।

শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায় অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যালয়গুলি সবই ছিল অবৈতনিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই তাঁরা বাইবেলের বিশেষ বিশেষ অংশ—প্রধানতঃ 'নিউ টেস্টামেন্ট' বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে নিজেদের ছাপাখানায় প্রকাশ করেছিলেন। কেরী নিজে একাধিক বাংলা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রণীত বাংলা অভিধান সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর শহরে কেরীসাহেবের মৃত্যু হয়।

এ সময়ে কয়েকজন প্রকৃত শিক্ষিত ইংরেজ মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলন ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে আগ্রহশীল ছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি **উইলিয়ম জোন্স** কলকাতায় 'রয়াল-এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৮৪ খ্রীঃ)। প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলন ও গবেষণার জন্যই এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল। **হোরাস হেম্যান উইলসন্** ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

ডেভিড হেয়ার ঃ ঘড়ির ব্যবসা উপলক্ষে কলিকাতায় উপস্থিত হলেন ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২ খ্রীঃ)। বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে এবং মানবদরদী ব্যক্তি হিসাবে ডেভিড হেয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলাদেশকে মাতৃভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, এবং মৃত্যু পর্যন্ত বাঙালীদের সেবা করে গেছেন। শিক্ষা-বিস্তারে তাঁর সহযোগী ছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং সমসাময়িক বেশকিছু শিক্ষিত বাঙালী ও ইংরেজ। রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, তৎকালীন বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট, উইলসন প্রমুখ ব্যক্তিদের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী তারিখে কলকাতায় 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেভিড হেয়ার 'School-Book Society' প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের

ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত 'Calcutta School Society' কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কিছু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসন-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের পার্লামেন্ট একটি চার্টার আইন পাস করলেন। আইনটির ৪৩ ধারায় ভারতবর্ষের শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথমে একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। শিক্ষা-পরিচালনার জন্য জি. সি. পি. আই. (General Committee of Public Instruction)—নামে একটি শিক্ষা-সংস্থা এ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৮২৩ খ্রীঃ)। প্রাচ্য বিদ্যাচর্চায় উৎসাহী হোরাস হেম্যান্ উইল্সন্ এই সংস্থার সদস্য-সম্পাদক ছিলেন। চার্টার আইনে মঞ্জুরীকৃত অর্থে সংস্কৃত শিক্ষার আরও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রাচ্যপন্থীরা কয়েকটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

রাজা রামমোহন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে একখানি চিঠিতে প্রস্তাব করলেন যে, মঞ্জুরীকৃত অর্থের সাহায্যে পাশ্চাত্য ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিদ্যায় ভারতীয় যুবকদের শিক্ষিত করে তুলতে পারলে দেশবাসী উপকৃত হবে। দেশের যুবকদের সরল মনটিকে ব্যাকরণের সূক্ষ্মতা আর ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের চুলচেরা ব্যবধানের তথ্যাদি দিয়ে ভারাক্রান্ত করা ঠিক হবে না। দেশীয় যুবকদের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজন উন্নত ধরনের ব্যবহারিক শিক্ষা-লাভ। রামমোহন ছিলেন যুগোপযোগী ও বাস্তববাদী মহাপুরুষ।

ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল ঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারে এক ধরনের উন্মাদনা সৃষ্টি করলেন হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ খ্রীঃ)। তিনি কলকাতার এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা 'ফিরিঙ্গী' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও একজন শিক্ষক হিসাবে হিন্দু কলেজে যোগ দেন। তিনি বাংলাদেশকে স্বদেশ মনে করতেন। কবিতা, সাহিত্য, দর্শন আলোচনায় এই যুবকের প্রতিভা প্রথম থেকেই সমসাময়িক শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি প্রচলিত অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার, শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচার প্রভৃতির উপরে চরম আঘাত দিতে উদ্যত হলেন।

ডিরোজিও

'একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি সমিতির যুব-সদস্যদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করে জনকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত হতে উৎসাহিত

করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় এক নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করে তিনি ছাত্রদের মাতিয়ে তুললেন। তাঁর ছাত্ররাই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত হয়। এই নব্যগোষ্ঠীর অনুগামিগণ দেশে প্রচলিত রীতিনীতি, সামাজিক আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।

সমসাময়িক শাসকগোষ্ঠী ডিরোজিওকে সমর্থন করলেন না। হিন্দু কলেজ থেকেও পদত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হলেন। ১৮৩১ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ডিরোজিও'র শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা ডিরোজিওর নতুন ভাবধারা আত্মস্থ করে পরবর্তী কালে দেশের প্রগতিমূলক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন।

শিক্ষার মাধ্যম ঃ বেণ্টিঙ্কের সিদ্ধান্ত ঃ লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্কের শাসনকালে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ আইনে শিক্ষাখাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দশ লক্ষ করা হয়েছিল। শিক্ষা-সংস্থার (G.C.P.I.) সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে মতভেদের ফলে 'প্রাচ্যপন্থী' ও 'পাশ্চাত্যপন্থী' নামে দুটি দল সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষা-সংস্থার সদস্য-সম্পাদক এইচ. টি. প্রিন্সেপ ছিলেন 'প্রাচ্যপন্থী'। সংস্থার অন্যান্য তরুণ ইংরেজ সদস্যরা ছিলেন 'পাশ্চাত্যপন্থী'। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে মেকলে সাহেব বড়লাটের আইন-সদস্য হিসাবে ভারতে এসে পৌঁছালেন। শিক্ষা-সংস্থার সভাপতি পদেও তিনি নিযুক্ত হলেন।

উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক

মেকলের অভিমত গ্রহণ করে বড়লাট বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ তারিখে পাশ্চাত্যপন্থীদের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইংরেজী ভাষাকে ভারতীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পথ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত করেছিলেন। বেণ্টিঙ্কের সিদ্ধান্তে বলা হলো ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য হবে ভারতবাসীর জন্যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে যথোপযুক্ত উপায়ে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি সাধন। শিক্ষাখাতে এখন থেকে যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে তার সবটাই এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে। বড়লাটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে বঙ্গদেশে, পরে গোটা ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হলো। বেন্টিঙ্কের শাসনকালেই কলকাতার মেডিকেল কলেজ এবং বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়।

চার্লস উডের ডেসপ্যাচ ঃ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে পুনরায় ঘোষিত হলো যে,

ভারতবাসীর ধর্মমতে কোন প্রকার আঘাত দেওয়া চলবে না। মিশনারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন উদ্যোগও সরকার সমর্থন করবেন না।

কোম্পানীর বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস্ উড্ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রশাসনিক উন্নতির জন্যে একটি নির্দেশনামা পাঠালেন (১৮৫৪ খ্রীঃ)। তখন লর্ড ডালহৌসী ভারতের বড়লাট। নির্দেশনামায় (Despatch) দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সুসংহত করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিশেষ সুপারিশের উল্লেখ নিম্নে করা হল :

(ক) পৃথক শিক্ষা বিভাগ গঠন : বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম-প্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে শিক্ষা অধিকর্তার (D.P.I.)-র পদ সৃষ্টি হলো। তিনিই হবেন শিক্ষা বিভাগের প্রধান।

(খ) লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে এদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হবে পরীক্ষা গ্রহণ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

(গ) প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে কর্মচারী নিযুক্ত করে শিক্ষা-প্রশাসনে সংহতি স্থাপনের সুপারিশ করা হলো।

(ঘ) বে-সরকারী বিদ্যালয়ে অনুদান-ব্যবস্থার সুপারিশ করা হলো।

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করা হলো বটে, কিন্তু জনসাধারণ ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ হারাবার আশংকায় ছেলেমেয়েদের আর দেশীয় পাঠশালায় পাঠাতে চাইলেন না। সরকারী সাহায্যপুষ্ট অনেক ইংরেজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রাথমিক বিভাগটি জুড়ে দেওয়া হলো।

ডালহৌসীর শাসনকালেই মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন স্কুলটি স্থাপিত হয় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। নারী শিক্ষার বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে ছিলেন। তিনি দেশীয় শিক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপরে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করার জন্য তিনি ভূগোল, ইতিহাস, জীবনী-সাহিত্য, গণিত, জ্যামিতি, প্রাকৃতিক ও নৈতিক দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করেছিলেন (১৮৫৪ খ্রীঃ)।

উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার জন্য ডালহৌসীর সময়েই রুরকীতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

কেরী সাহেবের সহকর্মী ওয়ার্ড সাহেব বাংলাদেশের দেশীয় বিদ্যালয়গুলির যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। এই বিদ্যালয়গুলি ছিল অবৈতনিক। স্থানীয় ব্যক্তিদের অর্থ-সাহায্যেই এগুলি পরিচালিত হত। বড়লাট লর্ড হেস্টিংস দেশীয় পাঠশালার শিক্ষার জন্য নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন চার দশকের মধ্যে মাদ্রাজের গভর্নর টমাস মনুরো, বোম্বাইয়ের গভর্নর এলফিন্স্টোন্ এবং বাংলাদেশের উইলিয়ম অ্যাডাম কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টসমূহে

দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেশীয় শিক্ষার প্রশংসনীয় ভূমিকার কথাই জানা যায়।

টমাস মনরো মাদ্রাজের দেশীয় শিক্ষা অনুসন্ধান করে দেখেছিলেন যে ৫-১০ বছরের বালকদের কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ দেশীয় বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতো। মাদ্রাজের মোট জনসমষ্টির নয় ভাগের এক ভাগ কোন না কোন দেশীয় শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করতো। বোম্বাইয়ের গভর্নর এলফিনস্টোন সাহেব বোম্বাই অঞ্চলের দেশীয় শিক্ষার অনুসন্ধান করে সুপারিশ করেছিলেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুস্তক প্রকাশিত করে দেশীয় শিক্ষার উন্নতি সাধন প্রয়োজন। দেশীয় বিদ্যালয়গুলির গুণগত মান উন্নয়ন করে আরও নতুন নতুন দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

উইলিয়ম অ্যাডাম তৎকালীন বড়লাট বেন্টিঙ্কের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করে বাংলা ও বিহারের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসন্ধানে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৮৩৫-১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি তিনটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিলেন। অ্যাডাম সাহেব রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে গৃহ-বিদ্যালয়ের এবং উচ্চশিক্ষার জন্য টোল-চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অবদানের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। তখন মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চলতো।

অ্যাডাম দেশীয় শিক্ষাকে ভিত্তি করে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা রচনা করার সুপারিশ করেছিলেন। প্রতি জেলায় একজন করে পরীক্ষক বা Examiner নিয়োগ করার কথা তিনি বলেছিলেন। দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের সহযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ের উপরে পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষা-পদ্ধতির উৎকর্ষবিধানের জন্য তিনি বিনামূল্যে শিক্ষা-নীতি বিষয়ক পুস্তকাদি শিক্ষকদের সরবরাহ করবেন। শিক্ষকরা অবসর সময়ে সেগুলি পড়বেন। বছরে একবার শিক্ষকদের পরীক্ষায় বসতে হবে এবং ঐ পরীক্ষায় সাফল্যের উপরে তাঁদের বেতনের হার নির্ধারিত হবে। বিদ্যালয়ের খরচ নির্বাহের জন্য সরকার জমির ব্যবস্থা করবেন। জমির পরিমাণ কতটা হবে তা সরকারই ঠিক করবেন। পরিকল্পনাটি প্রথমে পরীক্ষামূলক হিসাবে চালু করে ফলপ্রসূ হলে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে অ্যাডামের সুপারিশসমূহের যৌক্তিকতা লক্ষ্য করার মত। কিন্তু বড়লাট বেন্টিঙ্ক এ বিষয়ে কোন গুরুত্ব না দিয়েই মেকলের অভিমত গ্রহণ করে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করেছিলেন। মেকলের মতে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলো ছিল খুবই দুর্বল। ঐ ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন মোটেই সম্ভব হতো না।

দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার পতন ঃ ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পরেও দেশীয় টোল-চতুষ্পাঠী এবং মাদ্রাসার, অস্তিত্ব একেবারে বিলোপ হয়েছিল, তা বলা ঠিক হবে না। কিন্তু জনশিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান, পাঠশালাগুলি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত

হয়েছিল। উডের নির্দেশ-নামায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। দেশীয় পাঠশালাগুলির উন্নতি সাধনের জন্যও তেমন কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি।

সরকারী আর্থিক সাহায্যের অভাবেই দেশীয় বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা দিন দিন কমে যেতে লাগলো। বিদ্যালয়গুলিতে দেশীয় চরিত্র বজায় রাখা আর সম্ভব হলো না। ইংরেজী স্কুলের সাথে প্রাথমিক বিভাগ যুক্ত করে দেওয়ার ফলে প্রথম থেকেই সেখানে ইংরেজী পড়ানো শুরু হতো। পাঠশালাসমূহের প্রয়োজন আর তেমন রইলো না। তাই এগুলো উঠে যেতে লাগলো। ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে এক ধরনের অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই দেশীয় বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া গেল না। নিতান্ত অবহেলায় তা বিলীন হয়ে গেল।*

পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে সংস্পর্শ : ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাসের প্রথম পর্ব আরম্ভ হয়েছিল ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের পর থেকেই। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হবার পর থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে ভারতের আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো। পাশ্চাত্য সভ্যতা ছিল তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এই সভ্যতা তখন পরিণত হয়েছে একটি শিল্পভিত্তিক সভ্যতায়। যানবাহনের উন্নতির ফলে পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পেল।

মেকলে বলেছিলেন, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী, ভারতীয় হলেও মতপ্রকাশের স্বাধীনতায়, উন্নত রুচি প্রদর্শনে, এবং নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে হবেন পুরোপুরি ইংরেজ।**

তিনি বলেছিলেন, উচ্চসম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং তাঁদের কাছ থেকেই অপেক্ষাকৃত নিম্নতর সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা ইংরেজী শিক্ষালাভ করবেন —এই হলো মেকলের পরিস্রুতি-মতবাদ (Filtration theory)।

বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলেন (১৮৪৪ খ্রীঃ) যে, সরকারী চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সরকারী কর্মচারী-নির্বাচনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন-শ্রেণীর চাকরির জন্যও ইংরেজী ভাষায় সামান্য দক্ষতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। চাকরির প্রত্যাশায় ইংরেজী স্কুলের দরজায় ভিড় ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

মেকলে-পরবর্তী যুগে ডঃ আলেকজান্ডার ডাফ্ ও তাঁর অনুগামীদের প্রচেষ্টায় ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক পর্যন্ত বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশে অনেক মিশনারী

* "They were treated as untouchables in the caste-system of the education department and died out of sheer neglect."—ভারতের শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১১৫।

** "Indian in blood and colour, but English in tastes in opinions, in morals and intellect.—ঐ, পৃঃ ৩২।

বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। ডাফ্ ও তাঁর অনুগামী মিশনারীরা শিক্ষা ব্যবস্থায় একচেটিয়া সরকারী কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে বে-সরকারী মিশনারী সংস্থার উপরে শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সরকার শিক্ষাব্যবস্থায় মিশনারীদের প্রাধান্য দিতে স্বীকৃত হন নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ডঃ ডাফ্ সিনেটের সদস্য ছিলেন। তিনি 'জেনারেল অ্যাসেম্ব্লীজ ইনস্টিটিউশন্' (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ডাফের সমসাময়িক জেমস্ টমসন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান নিয়ে গঠিত) জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলির উন্নতির এক পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে এ শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় বে-সরকারী উদ্যোগের প্রস্তাব তিনিই দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে উডের নির্দেশ-নামায় এবং হান্টার কমিশনের নানা সুপারিশে টমসনের প্রস্তাব কিছুটা প্রাধান্য পেয়েছিল।

যে-সব ভারতবাসী প্রথম যুগে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন, তাঁরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার বহিরঙ্গ দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন ; কিন্তু তার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে এবং বিচার-বিবেচনা করে এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি তখনও গ্রহণ করতে সমর্থ হননি। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ এই শিক্ষালাভের সুযোগ পায় নাই। জনশিক্ষার হার কমে যেতে লাগলো। নিরক্ষরতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেলো। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা পোশাকে-আশাকে, খাওয়া-দাওয়া, চলন-বলন—সবটাতেই যেন কেমন এক নতুন মানুষ হয়ে যেতে লাগলো। গান্ধীজীর মতে এসময় থেকেই তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত এবং সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে দুস্তর সামাজিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল।

[খ] সমাজ সংস্কার—সাংস্কৃতিক আন্দোলন

বেণ্টিঙ্কের সমাজ সংস্কার ঃ সমাজ সংস্কারের জন্যই লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক স্মরণীয় হয়ে আছেন।

সতীদাহ প্রথা ঃ ভারতীয় হিন্দু সমাজে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় হিন্দু বিধবাদের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ বা সতীদাহ প্রথা বহু বছর ধরে চলে আসছিলো। আকবর প্রমুখ ভারতীয় অনেক রাজা-বাদশা সতীদাহ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। কর্নওয়ালিস, ওয়েলেসলী, মিন্টো, লর্ড হেস্টিংস্ প্রমুখ বড়লাটেরা এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রথা বন্ধ করা হলে উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হতে পারে—এই আশংকায় ইংরেজ সরকারের পক্ষেও কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঃ লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণের আইন বিধিবদ্ধ করলেন (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে)। এ বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের

সমর্থন লাভ করেছিলেন। রাজা রামমোহনও সতীদাহ প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। শিক্ষিত বাঙালীদের একটি বৃহৎ অংশ রাজা রামমোহনকে সমর্থন করেছিলেন। এতে লর্ড বেন্টিঙ্কের কাজের সুবিধা হয়েছিল।

লর্ড বেন্টিঙ্ক এদেশ থেকে ক্রীতদাস প্রথারও উচ্ছেদ সাধন করেন। পার্বত্য অঞ্চলের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষকেরা অতিরিক্ত শস্য লাভের আশায় নরবলি দিয়ে ভূমি-দেবতাকে তৃপ্ত করতে চাইতো। এই নিষ্ঠুর নরবলি-প্রথা বন্ধের জন্য বেন্টিঙ্ক আর একটি আইন পাস করলেন।

'ঠগী' নামক দস্যুদের দমন করে বেন্টিঙ্ক জনসমাজের নিরাপত্তা বিধান করেছিলেন। এই ঠগীরা ছদ্মবেশে পথিকদের সঙ্গে মিশে যেত এবং সুযোগ বুঝে পথিকদের হত্যা করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করে নিত। মেজর স্লিম্যান্-এর সাহায্যে বেন্টিঙ্ক ছয় বছরের মধ্যে ঠগীদের সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিয়েছিলেন। মেজর সাহেব তখন থেকেই 'ঠগী স্লিম্যান' নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ঃ হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ (মতান্তরে ১৭৭৪) খ্রীষ্টাব্দে এক বনেদী ব্রাহ্মণ পরিবারে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। বারাণসীতে সংস্কৃত, পাটনায় আরবী ও ফারসী, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের অধ্যয়নের সাথে ইংরেজী, গ্রীক্, হিব্রু প্রভৃতি ভাষাতেও তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। অবিরত জ্ঞান-সাধনা করে মহাজ্ঞানী এবং নির্যাতীত মানুষের সেবা করে তিনি হলেন একজন মহাপুরুষ। সতীদাহ প্রথা নিবারণে ও পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকার কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

রাজা রামমোহন রায়

তিনি হিন্দু ধর্মদর্শন বেদান্ত ও উপনিষদকে আশ্রয় করে হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক দিক বর্জন করে 'একেশ্বরবাদ' বা 'নিরাকার ব্রহ্মে'র আরাধনার প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়সভা' বা 'ব্রাহ্মসভা' পরবর্তীকালে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে বিখ্যাত হয়। ব্রাহ্মসমাজকে ধর্মসম্প্রদায়ের ভিন্ন একটি সংগঠন না বলে তাকে নতুন যুগের একটি সামাজিক আন্দোলনের প্রথম সুফল বলাই ঠিক হবে। রামমোহনই এ আন্দোলনের প্রবর্তক। বাংলাদেশের নবজাগরণ-আন্দোলনের সর্বপ্রধান নেতা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে বিদেশাগত সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

এই কারণেই তিনি বিশ্বের মহাপুরুষদের অন্যতম এবং আধুনিক ভারতের জনক হিসাবে পরিগণিত। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের ব্রিস্টল শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধি-মন্দিরটি বিদেশের মাটিতে দক্ষিণ-ভারতীয় হিন্দুমন্দির স্থাপত্যের একটি চমৎকার নিদর্শন হিসাবে ব্রিস্টলের সমাধিস্থলে এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

রাজা রাধাকান্ত দেব ঃ রামমোহনের প্রগতিবাদী চিন্তার সমর্থক না হলেও শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্তদেব একসাথে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী চর্চায় যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি রক্ষণশীল মতের সমর্থক হলেও স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি জ্ঞানচর্চায় অগ্রণী ও শিক্ষা বিস্তারে অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন। তাঁর শিক্ষার আদর্শ ছিল 'সেকুলার'। নক্ষত্র-বিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। তিনি কৃষি ও শিল্প-শিক্ষার কথা বলেছেন। বৃত্তিমুখী শিক্ষায় ছিলেন আগ্রহী এবং মাতৃভাষা চর্চার প্রচারক ও সংগঠক ছিলেন। তাঁর রচিত 'বাংলা শিক্ষাগ্রন্থ' বিশেষভাবে খ্যাত। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি শবব্যবচ্ছেদকে সমর্থন করেছিলেন।*

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাদেশের নবজাগরণের নেতাদের মধ্যে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কৃতী সন্তানদের নাম সব দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ) রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের সমর্থনে আরও অনেক মৌলিক তত্ত্বের সংযোজন করেছিলেন।

রামমোহন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা' তাঁর জীবিতকালেই 'ব্রাহ্ম সভা' নামে পরিচিত হয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে এই 'ব্রাহ্মসভা'—'ব্রাহ্ম সমাজ' নামে প্রসিদ্ধ হয়। তাঁর সময় থেকেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। তিনি পৌত্তলিকতার পরিবর্তে নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনাকে জনপ্রিয় করে হিন্দু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'পরোপকার পরম ধর্ম', এই আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভার' প্রতিষ্ঠা করেন। 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'—একই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী শিক্ষার জন্য এই পত্রিকাটির অবদান খুবই প্রশংসনীয়। অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে এই পত্রিকাটির অসামান্য অবদান রয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম'

---

* রাজা রাধাকান্ত দেব, দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী স্মরণিকা—সমালোচনা, চিত্তরঞ্জন ঘোষ

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর পুত্র রবীন্দ্রনাথ এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ করে 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা করেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে খ্রীষ্টান মিশনারীদের আক্রমণ থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন ঃ নববিধান ঃ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্র সেন প্রচার করলেন, যুক্তির চেয়ে ভক্তি বড়। তাঁর বক্তৃতায় জনচিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন। কেশবচন্দ্রের অতি-প্রগতিশীল কাজকর্মের ফলে ব্রাহ্মবাদিগণ দুটি সমাজে বিভক্ত হয়ে পড়লেন।

কেশবচন্দ্র সেন

প্রগতিবাদী ব্রহ্ম-সম্প্রদায় কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করলেন 'নববিধান-সমাজ'। আর প্রাচীনপন্থীরা 'আদি-ব্রাহ্ম সমাজে'র মধ্যেই থেকে গেলেন। কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টার ফলেই 'সিভিল-ম্যারেজ অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হয়। নারীজাতি আইনের দৃষ্টিতে সামাজিক ও মানবিক অধিকার লাভ করেন। কেশবচন্দ্র সেন 'সমাজ-সংস্কার-সভা' স্থাপন করে নারীশিক্ষা, শ্রমজীবী-বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি সামাজিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রীঃ) ঃ সমাজ-সংস্কারে রামমোহনের আরব্ধ কাজ সম্পাদন করতে অগ্রণী হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেছিলেন।

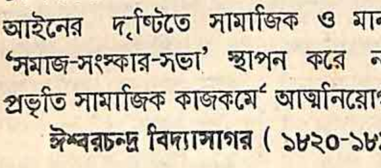
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র আচার-ব্যবহারে পুরোপুরি বাঙালী ব্রাহ্মণ হলেও পশ্চিমের প্রগতিশীল ভাবধারাকে তিনি কখনও বর্জন করেননি। বাংলা গদ্য সাহিত্যের তিনি জনক। তাঁর রচিত 'বোধোদয়', 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা' প্রভৃতি বিদ্যালয় স্তরের পুস্তকসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে তিনি বাংলা ভাষার উন্নতি সাধন করেন। তাছাড়া, 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করে সংস্কৃত-শিক্ষা সহজ করেছিলেন।

বাঙালী জাতীয়তাবাদের তিনি নিজেই ছিলেন একটি জবলন্ত দৃষ্টান্ত। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, বহুবিবাহ ও বাল্য-বিবাহ বন্ধের জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করে গিয়েছেন। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে বিধবা-বিবাহ আইন-বিধিবন্ধ হয়। তিনিই উদ্যোগী হয়ে নিজের খরচে কলকাতায় সর্বপ্রথম একটি বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। নারীজাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এবং তাঁদের মানবিক অধিকার রক্ষায় বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য।

বোম্বাই শহরে প্রার্থনা সমাজ : ব্রাহ্ম-সমাজের আন্দোলন বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিলো। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের উৎসাহে বোম্বাই শহরে "প্রার্থনা সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৬৭)। মহাদেব গোবিন্দ রানাডের উদ্যোগে 'প্রার্থনা সমাজ' বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

রানাডে পুণায় 'বিধবা-বিবাহ সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। 'দাক্ষিণাত্যে শিক্ষা-সমিতির' প্রতিষ্ঠাও তিনি করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রার্থনা সমাজ হিন্দু ধর্মকে যুক্তিগ্রাহ্য করে সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল।

দয়ানন্দ সরস্বতী : আর্যসমাজ : 'আর্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮৭৫ খ্রীঃ)। ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ প্রভৃতি হিন্দু ধর্মের সংস্কারে উদ্যোগী হয়ে পৃথক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিল। ফলে হিন্দুসমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দয়ানন্দ 'আর্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করে বিশুদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে হিন্দু-জাতি ও হিন্দু-সমাজকে সুগঠিত করেছিলেন। তিনি বেদোক্ত আর্য-ধর্মের প্রচার করেছিলেন। হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আর্য-সমাজ মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। তাঁর বিশেষ অবদান ছিল শুদ্ধি-আন্দোলন। 'শুদ্ধি আন্দোলন' আর্য সমাজের একটি সফল প্রয়াস। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের 'শুদ্ধ' করে হিন্দু সমাজে পুনরায় ফেরানো হয়েছিল।

দয়ানন্দ সরস্বতী

উত্তর ভারতে 'আর্য সমাজ' প্রগতিবাদী আন্দোলনে বেশ বড় রকমের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে 'শুদ্ধি আন্দোলন' বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। সমাজ, শিক্ষা, ধর্মনীতি প্রচারের জন্য আর্যসমাজ কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলো। 'গুরুকুল' প্রভৃতি বিদ্যায়তন আর্য সমাজের কৃতিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর্য সমাজকে একটি সাম্প্রদায়িক সমাজ না বলে একটি জাতীয়তাবাদী-প্রগতিবাদী সমাজ বলাই ঠিক হবে। 'আর্য সমাজ' জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেছিল। দয়ানন্দের প্রদর্শিত পথে লালা হংসরাজ, পণ্ডিত গুরুদত্ত, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লালা লাজপৎ রাই প্রমুখ ব্যক্তিরা এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। অ-হিন্দুকে জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে রাখার নীতি তাঁরা কখনই সমর্থন করেননি।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব : ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আর এক মহাপুরুষ

বাংলা তথা ভারতের ধর্মজগতে এক মহাবিপ্লবের সূচনা করেন ; তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-৮৬ খ্রীঃ)। রামকৃষ্ণের দেশী বা বিদেশী কোন প্রকার বিশেষ শিক্ষা ছিল না ; কিন্তু তিনি কঠোর তপস্যার বলে সর্বধর্মের মূল সত্যকে উপলব্ধি করে নিজের জীবনে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং খ্রীষ্টান ও ইস্‌লাম ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, বিভিন্ন ধর্মের পৃথক উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। সহজ সরল ভাষায় বিভিন্ন ধর্মের গভীর তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করে ধর্ম-বিরোধের মীমাংসা করেন। তাঁর ধর্মমতই হলো 'যত মত, তত পথ।' অসাধারণ উদার ও সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতামুক্ত এবং সুগভীর ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ পরমহংসদেব ধর্মকে বহু মানবের হিত বা মঙ্গলের পথে নিয়ে এলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই ধর্মমত বাংলাদেশে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ও প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রীঃ) গোটা ভারতে এবং বিশ্বের নানা স্থানে রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করে বিশ্ব সমাজে হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতার বাণী প্রচার করেন। তিনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে আহূত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে (**Parliament of Religions**) উদার হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতার বাণী প্রচার করে বিশ্ববাসীর অন্তরে হিন্দু ধর্মের প্রতি নতুন উৎসাহের সঞ্চার করলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মহান কীর্তি হলো রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা (১৮৯৭ খ্রীঃ)। তিনি মানুষের অধিকার ও জনসেবার আদর্শ প্রচার করেছিলেন। সর্বজীবে ঈশ্বর বিরাজমান—এই ছিল তাঁর মূল শিক্ষা। তাঁর রচিত কর্ম-যোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বপ্রকার কাপুরুষতা বর্জন করে ভারতবাসী আবার জগৎ সভায় যথাযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে—এটাই ছিল স্বামীজীর কামনা। দরিদ্র ভারতবাসীর অন্তরের দুঃখ তিনি উপলব্ধি

স্বামী বিবেকানন্দ

করেছিলেন, তাই সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ হলো রামকৃষ্ণ মিশন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের নবজাগরণে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন।

আলিগড় আন্দোলন

হিন্দু সমাজসংস্কার ও শিক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য প্রগতিশীল আন্দোলন শুরু হয়েছিলো। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হাজী মহম্মদ মহসীন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উৎসাহদানের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে অর্থ দান করেছিলেন। মুসলিমদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। উত্তর ভারতে আলিগড় পাশ্চাত্য শিক্ষা-আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ (১৮১৭-৯৮ খ্রীঃ) ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও নেতা।

ধর্ম ও গোঁড়ামীর ঊর্ধ্বে উঠে মুসলমানদের আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কথা তিনিই সর্বপ্রথমে প্রচার করতে লাগলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গাজীপুরে একটি বিজ্ঞান ও সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি উর্দুতে অনুবাদ করার কাজ এই সভা গ্রহণ করেছিল। আলিগড় অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৮৭৬ খ্রীঃ)। আলিগড়-আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমান ধর্মের সংস্কার সাধন এবং প্রগতিবাদী ও যুক্তিবাদী মুসলমান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। পরবর্তীকালে আলিগড়ের প্রগতিশীল আন্দোলন বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়ে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেছিল।

॥ ১৮ ॥

কৃষক-আন্দোলন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম আঘাত পড়েছিল ভারতীয় কৃষকদের উপরে। দূর অতীত থেকে ভারতে প্রচলিত 'রায়তারি-প্রথা' বন্ধ করে দেওয়া হলো। জমির উপরে কৃষকদের কোন অধিকারই আর রইলো না। বর্ধিত-রাজস্বের চাপ পড়লো কৃষক-প্রজাদের উপর। সরকার চাপ দিতেন জমিদারদের, আর জমিদারেরা চাপ দিতেন কৃষকদের উপরে বেশী খাজনা আদায় করার জন্য। শাসকশ্রেণীর আস্থাভাজন জমিদার ও তাঁদের কর্মচারীদের অত্যাচারে কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। সামান্য অজুহাতে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ পর্যন্ত করা হতো। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম রেগুলেশনে হফ্‌তম্ আইন জারী করে রাইয়ত ও কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য জমিদারদের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হল। আইনে বলা হল, প্রজারা এক জমিদারের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় যেতে পারবে না। অন্য জমিদারের জমি চাষ করতে পারবে না।* অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক থেকেই কৃষক আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

[ক] ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলন

বাংলাদেশের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতে তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবী-আন্দোলন (১৮৩১ খ্রীঃ) এবং ফরিদপুর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) দিদুমীর বা দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ফারায়েজী আন্দোলন (১৮৪৯ খ্রীঃ)—দুটিই মূলতঃ কৃষক-আন্দোলন।

তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবি-আন্দোলন ঃ ওয়াহাবী-আন্দোলনের নেতা মীর নিসারআলী ওরফে তিতুমীর বারাসতের বাদুড়িয়া থানার হায়দারপুর গ্রামে এক গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন (১৭৭২ খ্রীঃ)। মক্কায় হজ্ করতে গিয়ে তিনি সৈয়দ-আহমদ ব্রেল্‌বির নিকট ওয়াহাবী মতবাদ অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের সংস্কারমূলক মতবাদ গ্রহণ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। ব্রেলবি ছিলেন ভারতীয় ওয়াহাবী-আন্দোলনের নেতা এবং পরবর্তীকালে বেরিলীর সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম অধিনায়ক। তিতুমীর তাঁর নিজের এলাকায় ওয়াহাবী মত প্রচার করতে থাকেন। বহু মুসলমান কৃষক এই ধর্মমতে আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠলেন।

আন্দোলনের প্রসার ঃ জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের শোষণ-পীড়নে স্থানীয় কৃষকেরা পূর্ব থেকেই যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ ছিল। দেশের শাসকশ্রেণী এবং গোঁড়া মোল্লা-মৌলভীরা ওয়াহাবী মতের বিরোধিতা করেছিলেন। মুসলমান জমিদারেরাও নিজেদের স্বার্থে ওয়াহাবী মতবাদ সমর্থন করতে পারেন নাই। করভারে নিপীড়িত কৃষকশ্রেণীর

* কৃষক সভার ইতিহাস—আবদুল্লাহ্ রসুল, পৃঃ ২৩

কাছে আন্দোলনটি যেন মুক্তির পথ নির্দেশ করলো। তাই ওয়াহাবী আন্দোলন আর ধর্মের পর্যায়ে না থেকে স্পষ্ট ভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ ধারণ করলো। একটি শিবিরে মিলিত হলো হিন্দু-মুসলমান সকল কৃষক। অপর শিবিরে মিলিত হলো হিন্দু ও মুসলমান জমিদাররা। সরকারী নির্দেশে পুলিস, জেলার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি কর্মচারীরা কৃষকদের আন্দোলন দমন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। সরকার সরাসরি জমিদারদের পক্ষ নিলেন এবং কৃষক আন্দোলন বন্ধ করতে কৃতসংকল্প হলেন।

সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে তিতুমীর কৃষকদের সংগঠিত করে একটি গণ-ফৌজ গঠন করলেন। সে সময়ে ফকির-দরবেশ, সন্ন্যাসীরাও শোষক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত শোষিত শ্রেণীকে সমর্থন করতেন। মিস্‌কিন্‌ শাহ্‌ নামে এক ফকির তাঁর শিষ্যদের নিয়ে তিতুমীরের দলে যোগ দিয়ে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করলেন।

তিতুমীরের নেতৃত্বে তাঁর গণ-ফৌজ ইংরেজ শাসনকে অস্বীকার করলো। গণ-ফৌজের নেতা হিসাবে তিতুমীর স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তিনি জমিদারদের নিকটেও রাজস্ব দাবী করলেন। ওয়াহাবী মতবাদী মুসলমানরা তিতুমীরকে সমর্থন করলেন। জমিদাররা কিন্তু সংঘবন্ধ হয়ে নীলকরদের সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করে তিতুমীরের বাহিনীকে ক্রমাগত আক্রমণ করতে লাগলেন। তিতুমীর তাঁর নিজস্ব বাহিনী নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে কয়েকটি সংঘর্ষে জমিদারদের পরাজিত করলেন।

এই জয়ের ফলে তিতুমীরের শক্তি ও মর্যাদা দুইই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তিনি এক হাজার লোকের এক সামরিক বাহিনী গঠন করলেন। তাঁর ভয়েই মহাজন, নীল-করের দল এবং পুলিসেরা তাঁর এলাকা ছেড়ে সাময়িকভাবে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

ওয়াহাবী আন্দোলনের পরিণতি ঃ তিতুমীরের নির্দেশে হিন্দু-মুসলমান কৃষকেরা জমিদার-সরকারের খাজনা দেওয়া বন্ধ করলেন। তাঁরা নীল-চাষও বন্ধ করে দিলেন। অত্যাচারী নীলকরদের কুঠিগুলি লুঠ হতে লাগলো, সেগুলি ধ্বংসও করা হলো। কুঠিয়ালরা কুঠি ছেড়ে কলকাতায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিতুমীর তাঁর স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে থাকেন। হিন্দু-মুসলমানরা তাঁর শাসন মেনে নিলেন। তিতুমীর তাঁর প্রধান ঘাঁটি নারিকেলবেরিয়া গ্রামে আত্মরক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ 'বাঁশের কেল্লা' নির্মাণ করেন। কিন্তু ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই নভেম্বর ইংরেজ সরকারের কামানের আক্রমণ প্রতিরোধ করা এই কেল্লার পক্ষে সম্ভব হলো না। তিতুমীর নিজেও কামানের গোলার আঘাতে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ওয়াহাবী আন্দোলন বন্ধ হলো বটে, কিন্তু এ সময় থেকেই কৃষকশ্রেণী শোষকশ্রেণীর একটি প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো।

ফারায়েজী আন্দোলন ঃ ফরিদপুর জেলার হাজি শরিয়তুল্লাহ্‌র পুত্র মোহম্মদ মহসীন ওরফে দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ফারায়েজী আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনটিও ওয়াহাবী ধরনের ধর্মমত প্রচার থেকে শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে কৃষক-আন্দোলনে পরিণত হয়।

এই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি অনেকটা বারাসতের আন্দোলনেরই মত। সেখানেও কৃষকদের উপর নানারকম শোষণ ও উৎপীড়ন চলতো। তাই শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের পক্ষ নিয়ে এ আন্দোলনটিও রীতিমতো শ্রেণী-সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল। অত্যাচার যে শুধু জমিদাররাই করতেন তা নয়, ইংরেজ সরকারও কৃষকদের উপরে অন্যায়-অবিচার চালাতেন।

আন্দোলনের পরিণতি ঃ কৃষকদের উপর অত্যাচার ও জুলুম বন্ধ করতে কৃষকদের নেতা হিসাবে দুদুমিয়া নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। পাল্টা শাসন-ব্যবস্থা ও বিচারের জন্য নিজেদের আদালত স্থাপন করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রায় দশ বছর এ আন্দোলন চলেছিল।

সরকার ও পুলিস বারবার দুদুমিয়াকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করে। তাঁকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলায় জড়িয়েও হয়রান করা হয়।

ফারায়েজী মতবাদ প্রচার করে ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি জেলার কৃষক সম্প্রদায়কে বিদ্রোহী করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কৃষক-আন্দোলন ও সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ছিল ফরিদপুর জেলায়। দুদুমিয়াই ছিলেন একমাত্র নেতা। তিনি কোন বিপ্লবী স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন নাই।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে সেপ্টেম্বর দুদুমিয়ার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের জুলুম ও পুলিসের অত্যাচারের ফলে ফারায়েজী আন্দোলনের গতি ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে গেল।

[খ] উপজাতিদের নেতৃত্বে আন্দোলন

ভারতের পার্বত্য প্রদেশসমূহ ছিল সাধারণতঃ উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল। উপজাতিরা নিজেদের মৌলিক প্রকৃতি অনুসারে পার্বত্য-পরিবেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতো। পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী ও যূথবদ্ধ এই উপজাতি সম্প্রদায় দলপতিদের শাসন মেনে চলতো। সরল-সহজ এই মানুষেরা নৃত্য-গীতে অবসর সময় যাপন করতো। কিন্তু কেউ যদি তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতো বা তাদের দলপতিকে অপমান করতো তবে কিছুতেই তা বরদাস্ত করা হতো না। দলপতিদের নির্দেশে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে জীবন-পণ-সংগ্রামেও তারা পেছিয়ে পড়তো না।

দক্ষিণ-ভারতে ভীল-উপজাতি সর্দারেরা মারাঠা-শক্তির পতন ঘটাবার জন্য ইংরেজদের শত্রু মনে করতো। পশ্চিমঘাট ও খান্দেশের অরণ্যবাসী ভীলেরা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের মন্ত্রী ত্রিম্বকজীর প্ররোচনায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল (১৮১৮ খ্রীঃ)। ইংরেজরা সহজেই এ বিদ্রোহ দমন করেছিল। ভীলেরা ছিল কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত এবং প্রয়োজনমত তারা সৈন্যবাহিনীতেও কাজ করত।

ছোটনাগপুর অঞ্চলের কোল, হো, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতীয়দের আন্দোলন (১৮৩১ ১৮৩২ খ্রীঃ) এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতালদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোল মুন্ডাদের সংগ্রাম, সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৮০ খ্রীঃ) এবং মালবারের উপকূলে মোপলা কৃষক-

আন্দোলন—সবকয়টিই শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত।

কোল-হো- মুন্ডা আন্দোলন ঃ ছোটনাগপুর অঞ্চলের কোল, হো, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতির মৌলিক অধিকার হরণ করে সেখানে ইংরেজ-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ইংরেজ সরকার এ সকল অঞ্চলের প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য বাইরের লোক নিযুক্ত করাতে উপজাতি-কৃষকেরা তীব্র প্রতিবাদ জানাল এবং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। প্রায় একই সময়ে এ অঞ্চলের সাঁওতালেরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সাঁওতাল বিদ্রোহে এ অঞ্চলের সকল উপজাতীয় কৃষকেরা যুক্ত হয়েছিল।

সাঁওতাল আন্দোলন ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে জমিদার-মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাল সাঁওতাল কৃষকেরা। তারা ইংরেজ সরকারের অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বহুবার আন্দোলন করেছিল। সাঁওতাল আন্দোলনের প্রধান প্রধান এলাকা ছিল তখনকার বীরভুম জেলা, বিহারের ভাগলপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশ। এ সকল অঞ্চলের অধিকাংশই এখন বিহারের সাঁওতাল পরগনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বিদ্রোহের কারণ ঃ সাওঁতাল আন্দোলন মূলতঃ ছিল কৃষক আন্দোলন—জমিদার-মহাজনদের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ইংরেজ সরকারের পুলিসী জুলুম বন্ধ করতে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং ব্যাপারীদের শোষণ ও প্রতারণার বিরুদ্ধে বাধা দান। শোষক শ্রেণীর লোকেরা সাঁওতালদের কাছ থেকে জোর করে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করতো। টাকা দিতে অসমর্থ হলে তাঁদের গরু, মোষ, তৈজসপত্র পর্যন্ত নিলামে বিক্রী করে দেওয়া হত। খাজনা অনাদায়ের অজুহাতে জমিও চলে যেত জমিদার-মহাজনদের হাতে। দেনার দায়ে অনেককে মহাজনের ঘরে সপরিবারে গোলাম হিসাবে বাঁধা পড়ে থাকতে হত। এ সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরকারী আদালতে মামলা করেও কোন সুবিচারের আশা থাকতো না, তাদের ভাগ্যে জুটতো কেবলমাত্র (জমিদার-মহাজনদের) অত্যাচার ও পুলিসের জুলুম। এই ধরনের শোষণ, নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য সাঁওতাল কৃষকেরা বাধ্য হয়ে বিদ্রোহের পথে এগিয়ে গেল। তাদের অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। কিন্তু শাসকবর্গ প্রতিকারের কোন চেষ্টাই করলেন না। ইতিমধ্যে শোষক-বিরোধী শ্রেণীচেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রচার ও সংগঠনের কাজও সমান উদ্যমে চলছিল।

বীরসিংহ মাঝির নেতৃত্ব ঃ প্রথমে বীরসিংহ মাঝির নেতৃত্বে সাঁওতালেরা সংঘবদ্ধ হল। ধনী-মহাজন ও জমিদারেরা আতংকগ্রস্ত হয়ে প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে প্রার্থনা জানালেন। পাকুড়ের রাজ-এস্টেটের সাহায্যও প্রার্থনা করা হলো। এস্টেটের দেওয়ান জগবন্ধু রায় বীর সিংহকে কাছারিতে ডেকে এনে জরিমানা ও নিষ্ঠুর ভাবে

জুতা-পেটা করেন। বীরসিংহের অপমানে সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি উপজাতিদের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠলো।

'ভগ্‌নাডিহির'-নির্দেশ ঃ ভগ্‌নাডিহি গ্রামে বাস করত দুই ভাই সিধু ও কানু। তাদের নেতৃত্বে তাদেরই গ্রামে ৩০শে জুন ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জমায়েত হয় প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল কৃষক। কৃষক-সভা থেকে এক ফরমান জারি করে নিম্নলিখিত নির্দেশ জমিদার-সরকারকে জানানো হল ঃ

(১) জমিদার-সরকারে সাঁওতালেরা কোন রকম খাজনা দেবে না। প্রত্যেক কৃষকের নিজের জমি চাষ করার অধিকার থাকবে। (২) জমিদার-সরকার ও মহাজনদের দাবী বাতিল করে সমস্ত ঋণ-মকুব করতে হবে। (৩) সাঁওতালেরা নিজেদের অঞ্চলে প্রয়োজনমত স্বাধীন সরকার স্থাপন করবে।

সরকারের বিভাগীয় কমিশনার, ভাগলপুর ও বীরভুমের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের এবং রাজমহল থানার দারোগা ও অন্যান্য জমিদারদের চিঠি লিখে ফরমানের নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হল। জমিদারদের কাছে লেখা চিঠিগুলি ছিল চরমপত্র। আন্দোলনের মূল দাবি ছিল—'জমি চাই', 'মুক্তি চাই'।

সিধু, কানুর নেতৃত্বে ভগ্‌নাডিহির উদাত্ত আহ্বানে সাঁওতাল অ-সাঁওতাল, কোল, হো-মুণ্ডা প্রভৃতি সমস্ত শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের জমাট বিক্ষোভ সশস্ত্র বিদ্রোহে পর্যবসিত হলো। রাঁচি, হাজারিবাগ, মানভূম প্রভৃতি স্থান নিয়ে গঠিত প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইল অঞ্চলে আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়লো। 'জমি চাই', 'মুক্তি চাই' —এই আওয়াজ সমস্ত সাঁওতাল, কোল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতীয় সম্প্রদায়কে মাতিয়ে তুলল। ১৮৫৫ সালে সিধু-কানুর নেতৃত্বে বিদ্রোহী সাঁওতালেরা কোম্পানীর অধীনতা অস্বীকার করল।

আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলো। বিদ্রোহে মোট ৩০ থেকে ৫০ হাজার সাঁওতাল অস্ত্র ধারণ করেছিল। সরকারী তরফে ১৪ হাজার সুসজ্জিত সৈন্য তার মোকাবিলা করতে নেমেছিল। জমিদার ও মহাজনেরা ইংরেজ সরকারকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। ইংরেজ সৈন্যরা গ্রাম, ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে অত্যাচার ও গণ-হত্যা করে সাঁওতালদের গ্রামগুলিকে ধ্বংস করলো। ১৮৫৫ সালে বিহারের ভাগলপুর ও বাংলার মুর্শিদাবাদে ইংরেজ সরকার সাঁওতালদের সঙ্গে যুদ্ধে সাময়িক বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ অঞ্চলে সামরিক আইনও জারি করা হয়। শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল শক্তি বিধ্বস্ত হলো। বিদ্রোহীদের অধিকাংশই সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ না করে মরণপণ সংগ্রাম করে শহীদ হলেন।

মোপলা কৃষক-অভ্যুত্থান ঃ ভারতের ঐতিহাসিক সিপাহী যুদ্ধের পূর্বে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা হলো দাক্ষিণাত্যে মালাবার উপকূলে বর্তমান কেরালা রাজ্যের তিনটি তালুকের (এরনাদ্‌, বল্লুব্‌নাদ ও উত্তর পোন্নানির) মোপলা কৃষকদের সংঘবদ্ধ অভ্যুত্থান। এ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল মোপলা কৃষক। তাঁরা

ছিল ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী। এ অঞ্চলের জমিদারেরা (জেনমি) ছিলেন হিন্দু। কিন্তু মোপলা আন্দোলন মূলতঃ কৃষক আন্দোলন, তাকে কোনমতেই সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলা ঠিক হবে না।

এ অঞ্চলে জমির খাজনার হার ছিল চড়া। উৎপন্ন ফসল থেকে নিজেদের সামান্য খাদ্য সঞ্চিত করে ফসল-বিক্রী করে যা পাওয়া যেত, তা দিয়ে জমিদারের খাজনা শোধ করার আর্থিক ক্ষমতা কৃষকদের ছিল না। খাজনা মেটাতে মহাজনদের কাছ থেকে জমি বন্ধক রেখে টাকা কর্জ নিতে হতো। সুদ সমেত কর্জের টাকাকড়ি শোধ করা সম্ভব হতো না। তাই জমি চলে যেতো গদীয়ান মহাজনের হাতে. অথবা জমিদার-সরকারে। মামলা-মোকদ্দমায় প্রজাদেরই হার হতো। ভিটেমাটি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করা হতো। কৃষকেরা ভূমিহীন সম্প্রদায়ে পরিণত হত।

বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা মহাজন-জমিদার ও সরকারের নির্যাতনে বাধ্য হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। প্রথম মোপলা কৃষক বিদ্রোহ ঘটে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। পুলিসী নির্যাতনে বিদ্রোহ সাময়িকভাবে বন্ধ করা হলেও বিদ্রোহের আগুন নিভ্‌লো না। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের কৃষক বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক বাহিনীর সাহায্যও নেওয়া হয়েছিল। পুলিস ও সামরিক বাহিনীর সাথে মোপলা-বিদ্রোহীরা দলে দলে লড়াই করে শহীদ হলেন।

সরকারী তদন্তে কৃষক-বিদ্রোহীরাই অপরাধী সাব্যস্ত হল। জমিতো হাতছাড়া হলই, তার উপরে তাঁদের ভোজালি রাখার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হলো। মোপলারা এ অপমান সহ্য করতে পারলো না। একদল বিক্ষুব্ধ কৃষক ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বাড়ী চড়াও হয়ে কালেক্টর মিঃ কনোলিকে হত্যা করল। পুলিস বাহিনীর সঙ্গে একটানা সাতদিন লড়াই করে প্রায় সকল কৃষকই শহীদ হলেন।

সাময়িকভাবে বিদ্রোহ দমন করা হল; কিন্তু বিদ্রোহীদের অন্তরের আগুন নেভানো সম্ভব হলো না। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দিল। এ সময়ে মিঃ লোগান নামে একজন কর্মচারী বিদ্রোহের তদন্ত করে কৃষকদের দাবীর কিছুটা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

লোগানের সংস্কারের প্রস্তাব :

১। কৃষকদের জমির উপরে তাঁদের পুরনো অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে তাদের স্থায়ী রাইয়তী স্বত্ব এবং স্থিতিশীল হারে খাজনা দেবার অধিকার সাব্যস্ত করা হোক।

২। আইনসঙ্গত কারণে কোন কৃষককে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হলে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

লোগানের সুপারিশ কার্যকর করা সম্ভব হলো না। জমিদারের শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখাই ছিল সরকারী-নীতির লক্ষ্য। তাই মোপলা-কৃষক বিক্ষোভের অবসান হলো না। পরবর্তী সময়েও মোপলা আন্দোলন সমান উদ্যমে চলছিল।

॥ ১৯ ॥

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী একশো বছরে তার উপরে প্রকাণ্ড ইমারত বানানো হয়।

পরাধীনতার গ্লানি ঃ জনসাধারণের কাছে একটা কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল যে পলাশীর যুদ্ধ থেকে শতবর্ষ কেটে গেলে, পাপের পসরা পূর্ণ হলে, দুর্দৈব দূর হবে। ইংরেজ প্রভুত্বের পতন হবে। বাংলাদেশে কিছু কিছু রাজনীতিক সভা-সমিতি এ সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করতেন। কিন্তু তাঁদের জনসাধারণের প্রতিনিধি বলা ঠিক হবে না। সমাজ-ধর্ম ও শিক্ষা আন্দোলনের জন্য প্রগতিবাদী কিছু কিছু নেতার শিক্ষার গুণে জন-চেতনা বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইতিমধ্যে রেলপথ, পোস্ট-টেলিগ্রাফ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জন-সংযোগ সম্প্রসারিত হয়েছিল। ভারতবাসী নিজেদের সম্বন্ধেও নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখলো।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ

লর্ড ক্যানিং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন ১৮৫৬ সালে। পরবর্তী এক বছরের মধ্যেই ভারতীয় সিপাহীরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। নানা কারণে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল।

রাজনৈতিক কারণ ঃ সিপাহী বিদ্রোহের কারণ বহু ব্যাপক। ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকে এই সময় পর্যন্ত ইংরেজশক্তি ভারতে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে এবং আরও নানা উপায়ে বহু দেশীয়-রাজ্য গ্রাস করেছিল। যে-সকল রাজ্য ইংরেজের কবলে পড়ে স্বাধীনতা হারিয়েছিল, তাদের শাসকদের আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশ্য বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নাই।

ডালহৌসীর আগ্রাসী-নীতি ঃ লর্ড ডালহৌসীর নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী নীতি এই আক্রোশকে উদ্দীপ্ত করে তুললো। ইতিপূর্বে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অনেক রাজার বংশধরেরা সামন্তরূপে ইংরেজের আশ্রিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছিল। ডালহৌসী তাঁর 'স্বত্ববিলোপ নীতি' প্রয়োগ করে এবং কুশাসনের অভিযোগে সাতারা, ঝাঁসী, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য গ্রাস করেছিলেন। তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজাদের ও পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁদের দত্তক পুত্রদের বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, বিঠুরে (কানপুর) নির্বাসিত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

মুঘল বাদশাহদের গৌরব সম্পূর্ণ লুপ্ত করার উদ্দেশ্যে ডালহৌসী নামেমাত্র বাদশাহকে দিল্লীর প্রাসাদ থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। ঝাঁসী রাজবংশের উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য দত্তক গ্রহণ বে-আইনী ঘোষণা করা হয় এবং রানী লক্ষ্মী বাঈয়ের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অযোধ্যার নবাব রাজ্যচ্যুত : নিতান্ত অকারণে ডালহৌসী অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলীকে রাজ্যচ্যুত করে অযোধ্যা-রাজ্য গ্রাস করেছিলেন। রাজপরিবারের অমর্যাদা ঘটিয়ে নবাবের প্রাসাদ এবং কোষাগার নির্লজ্জভাবে লুন্ঠন করা হয়েছিল। নবাবের রাজ্যচ্যুতি এবং কলকাতায় তাঁর নির্বাসন ঘটায় নবাবের পোষ্য বহু পরিবার অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

ঠগী দমনের নায়ক মেজর স্লীম্যান্ লর্ড ডালহৌসীকে অযোধ্যা সম্বন্ধে পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অযোধ্যা অধিকারের মূল্য দিতে হতে পারে। এসব ঘটনায় ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে অনিবার্য প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। নানা কারণে দেশীয় রাজারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ প্রধূমিত হয়ে উঠলো।

সামাজিক কারণ : অষ্টাদশ শতাব্দী সম্বধে বহু তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ সিয়ার-উল্-মুতাখ্খরিন থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশ শাসকের দল এদেশের লোকদের ঘৃণা করতো। তাঁদের সংস্পর্শ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো। ইংরেজরা ভারতীয়দের তেমন শ্রদ্ধা করতো না। এই বৈষম্যের ফলে উভয়পক্ষের মানসিক আবহাওয়া এমন হয়ে উঠেছিল যে, ইংরেজদের সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ, শিক্ষা-সংস্কার, এমন কি জনহিতকর কাজের মধ্যেও সাধারণ লোক দুরভিসন্ধি খুঁজে পেতো।

শ্বেতাঙ্গ সামরিক কর্মচারীরা ভারতীয় সিপাহীদের প্রায়ই কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করতো। এদেশের ভাষা না জানলেও বাছাই-করা কয়েকটি বিশ্রী গালাগালি তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তারা বুঝতে চাইতো না যে এদেশের সিপাহীরা তাদের ব্যবহারে মানসিক নির্যাতন সহ্য করছে।

ভারতীয় সিপাহীরা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্যর চাইতে কম দক্ষ ছিল না অথচ তাদের বেতন ছিল ইংরেজ সৈন্যের চাইতে অনেক কম। সিন্ধু বা পাঞ্জাবে যুদ্ধ করতে গেলে সিপাহীদের একটা ভাতা দেওয়া হত! কিন্তু পরে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সিপাহীদের এ অভিযোগ দীর্ঘকালের। ১৮০৬ সালের ভেলোর বিদ্রোহ এবং ১৮২৪ সালে ব্যারাকপুরের বিদ্রোহে এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, ভারতীয় সিপাহীরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল বটে, কিন্তু সরকার অভিযোগের মূল কারণগুলো দূর করতে সচেষ্ট হয়নি।

অর্থনৈতিক কারণ : ইংরেজ শাসনে এদেশের অর্থনীতি যে ভেঙে পড়েছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ বাহাদুর শাহের নামে যে

ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বিভিন্ন করভারে ভারতবাসী অত্যন্ত পীড়িত হয়েছিল, তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত ছিল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে ইংলন্ডের চাহিদা সব সময়েই মেটাতে হতো। বিলাতী শিল্পজাতদ্রব্য এদেশে জোর করে আমদানী করে ভারতীয় কুটীর শিল্পসমূহকে ধ্বংস করা হয়েছিল। ইংরেজদের রাজস্বনীতি দেশের দুর্দশাকে আরও সঙ্গীন করে তুলেছিল।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্দশার সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের কারণ জড়িত রয়েছে। বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল মীরাট, অযোধ্যা, লক্ষ্নৌ, কানপুর, দিল্লী, এলাহাবাদ, বুন্দেলখণ্ড, ঝাঁসী প্রভৃতি স্থানের জনসাধারণ আর্থিক কারণে বহুপূর্ব থেকেই বিক্ষুব্ধ ছিল।

মুঘলযুগের শেষে দোয়াব অঞ্চলে বৈশ, চৌহান প্রভৃতি গোত্রে বিভক্ত রাজপুত ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উঁচু জাতির কর্তৃত্ব প্রায় একচেটিয়া ছিল। কোনও অঞ্চলে তারা ছিল জমিদার, কোথাও বা যৌথ মালিকগোষ্ঠী। ব্রিটিশ আমলে নিত্য নয়া বন্দোবস্তের ফলে বহু মালিক কৃষকে পরিণত হয়। ওপর থেকে কালেক্টর এবং নিচ থেকে প্রকৃত চাষীর চাপে তাদের আয় কমে যায়। শুধু আর্থিক সংকটের মোকাবিলার জন্য নয়, জাতভাইয়ের সামনে লাঙল ধরার অপমান এড়াতে তাঁরা দলে দলে সেনাবাহিনীতে নাম লেখায় (পঞ্চাশের দশকে তাদের মধ্যে অনেকেই সেনাবাহিনীতে আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় পালিয়ে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।) গ্রাম-সমাজে পূর্ব প্রভাব খাটিয়ে তারা সামরিক বিদ্রোহকে গণ-বিদ্রোহে পরিণত করে তুললো। ঐতিহাসিক এরিকস্টোকস্* এই উঁচু জাতের 'রায়ত শ্রেণী'র মধ্যে পেয়েছেন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের চাবিকাঠি। তিনি বলেছেন, 'এ বিদ্রোহ কৃষক-বাহিনীর বিদ্রোহ'।

রাজস্বের চাপ যেখানে বেশী পড়তো এবং যেখানে আবাদ কোন রকমে বাড়ানো যেতো না, সেখানেই গণ-বিক্ষোভ বেশী দেখা দিত। কোন কোন অঞ্চলে রাজস্ব বাকীর দায়ে নিলামের বর্ধিত হার দেখে বোঝা যায় যে, রাজস্বের চাপ বাড়ছিল এবং বিক্ষোভও সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেখানে জমির ফসল বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেখানে বিক্ষোভ কম দেখা যেতো। পরিশ্রমী জাঠেরা বাড়তি রাজস্ব দিতে আপত্তি করেনি। কিন্তু পাশের এলাকার কৃষকেরা কম হারে রাজস্ব দিচ্ছে, এটা তাদের ঈর্ষার কারণ হওয়ায় তাঁরা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। জাঠেরা লাঙল ধরতে আপত্তি করতো না। তবে 'চামারদের' মত জনমজুর খাটা মর্যাদাহানিকর বলে মনে করতো।

বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ কিন্তু নেতা ছাড়া চলতে পারতো না। যেখানে স্বাভাবিক নেতার অভাব ছিল, সেখানে স্ব-বিঘোষিত নেতাদের নির্দেশ মান্য করা হতো। বিদ্রোহের কারণ বেশীর ভাগ অর্থনৈতিক। কিন্তু কিছুটা মনস্তাত্ত্বিকও ছিল। গোষ্ঠীমনের বিশেষ প্রক্রিয়া, তা যতটা অস্পষ্ট থাকুক না কেন, বিদ্রোহ ঘটাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

* The peasant armed the Indian rebellion of 1857—সমালোচনা—অমলেশ ত্রিপাঠী

প্রত্যক্ষ কারণ : ধর্মমতে আঘাত : বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ঘটলো নব-প্রবর্তিত এন্‌ফিল্ড রাইফেলের প্রচলনের জন্য। এই রাইফেলের টোটার ভিতর চর্বি মাখানো কাগজ থাকতো এবং ব্যবহারের পূর্বে এই টোটার এক অংশ দাঁতে কেটে নিতে হতো। গুজব রটলো, এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি ব্যবহার করে ইংরেজ সরকার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধর্মনাশ করবার চক্রান্ত করছে। বিদ্রোহের পূর্বে কারা যেন তাদের মধ্যে 'চাপাটি ও পদ্ম' পৌঁছে দিত। এ দুটি ছিল বিদ্রোহের সংকেত। ধর্মনাশের চক্রান্ত অমূলক হতে পারে, কিন্তু যে-চর্বি কারখানায় টোটা তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত হতো, তা পরীক্ষা করার কথা কর্তৃপক্ষের মনে কখনও উদয় হয়নি। গুজব অনেকদিন থেকেই রটেছিল, সরকারের সতর্ক হওয়ার যথেষ্ট সময়ও ছিল।

ব্যাপক বিদ্রোহ : বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সর্বশ্রেণীর মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয়শ্রেণীর প্রতিনিধিরা সবসময়েই বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিল। নানা সাহেবের অধীনে ছিল আজিমউল্লা খাঁ, বাহাদুর খাঁ, শোভারাম, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের অধীনে ছিল আফগান রক্ষিবাহিনী। যেসব

নানাসাহেব

রানী লক্ষ্মীবাঈ

স্থানে বিদ্রোহ গণ-যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল সেখানে স্বঘোষিত নেতার নির্দেশ গণ-ফৌজ মান্য করতো।

বিদ্রোহীদের প্রধান প্রধান নেতাদের মধ্যে কানপুরের নানা সাহেব, তাঁর সহচর তাঁতিয়া তোপী, অযোধ্যার ফৈজাবাদের বিখ্যাত মৌলভী আহমদ উল্লা শাহ প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিহারের জগদীশপুরের জমিদার কুমার সিংহ (কোঙর সিং) ও অমর সিংহ বিহারের বিদ্রোহ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কুমার সিংহ একটি চক্ষু এবং একটি বাহু হারিয়েও বৃদ্ধবয়সে যে

তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা বহু লোক-গাথায় কীর্তিত হয়েছে। নানা সাহেব মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সহযোগিতা লাভ করে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে ইংরেজ-বিতাড়নের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয়া হয়ে রয়েছেন ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ। তাঁর সাহস, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা শত্রুপক্ষেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। ফৈজাবাদের আহমদ্ উল্লা শাহ্ এবং তাঁতিয়া তোপী এ দুজন দেশভক্ত বীরের প্রতিও শত্রুরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন।

রবার্টসের মত ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছেন যে, বিদ্রোহীরা মুঘল-সাম্রাজ্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং মহারাষ্ট্রে পেশোয়ার ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার কথা ভেবেছিল, কিন্তু পূর্ব থেকে প্রস্তুতির অভাবে তাদের স্বপ্ন ভেঙে গেলো।

বাহাদুর শাহ, নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়াতোপী, যদি পূর্ব থেকে পরিকল্পনা করে সে মত কাজ করতেন তবে ভারতের ইতিহাস অন্য খাতে প্রবাহিত হতো। বাহাদুর শাহের দেশভক্তি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুললেও তাঁর বেগম জিন্নৎমহল সম্ভবতঃ ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেন নি।

'বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ধর্মীয় যুদ্ধ হিসাবে। কিন্তু সমাপ্তিতে উহা স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিণত হয়। কারণ বিদ্রোহীরা বৈদেশিক শাসন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিল এবং দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধিত্বে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'*

বিদ্রোহের বিস্তারঃ বিদ্রোহের সূত্রপাত হলো ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ব্যারাকপুরে। ব্যারাকপুরের সামরিক ছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এখানকার অন্যান্য সিপাহীরা মঙ্গল পাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলে ব্রিটিশ সরকার ব্যারাকপুরের পল্টনটি ভেঙ্গে দিলেন। মঙ্গল পাণ্ডে ও তাঁর সহযোগী ঈশ্বরী পাণ্ডেকে **প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো**। তাঁরাই হলেন সিপাহী-যুদ্ধের প্রথম দুজন শহীদ। এরপরে বাংলাদেশের বহরমপুর ও পাঞ্জাবের আম্বালায় সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্

মীরাটের সামরিক ছাউনিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে (১৮৫৭ খ্রীঃ) কর্নেল ফিনিস্‌কে মীরাটের

* ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, 1857

সামরিক ছাউনিতে গুলি করা হলে বিদ্রোহ প্রকৃতভাবে শুরু হয়ে গেল। মীরাটের বিদ্রোহী সিপাহীরা ইংরেজ-নিধনে প্রবৃত্ত হলো। তারা দিল্লীতে প্রবেশ করে ঔরঙ্গজেবের বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে সম্রাট বলে ঘোষণা করলো।

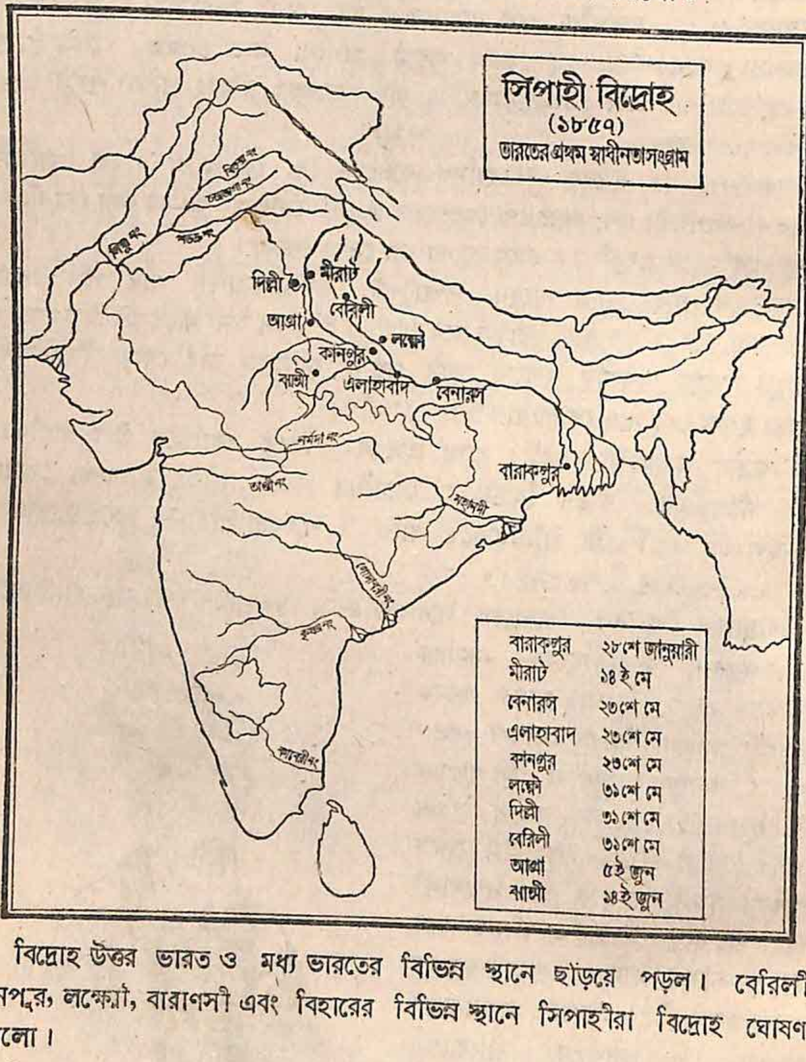

বিদ্রোহ উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। বেরিলী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী এবং বিহারের বিভিন্ন স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো।

বিদ্রোহ দমন ঃ বারাণসীর বিদ্রোহ কর্ণেল নীল দমন করলেন এবং এই অঞ্চলে বিদ্রোহী, সন্দেহজনক ব্যক্তি, এমন কি রাস্তার বালকদের পর্যন্ত নির্বিচারে হত্যা করা হলো কানপুর, লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লীতে বিদ্রোহীদের শক্তি সর্বাধিক সংহত ছিল। কানপুরের বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানা

সাহেব। এখানে অবরুদ্ধ ইংরেজদের এলাহাবাদে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো, কিন্তু তাঁরা নদীতীরে পৌঁছুবামাত্র গুলি করে তাঁদের অধিকাংশকে হত্যা করা হলো।

এই বছরের ডিসেম্বর মাসে স্যার কলিন্ ক্যাম্পবেল্ কানপুর অধিকার করেন। পাঞ্জাব থেকে প্রেরিত নিকল্সন নামক একজন অফিসার বহু কষ্টে দিল্লী অধিকার করলেন এবং সেখানকার বহু নির্দোষ অধিবাসীকে হত্যা করলেন। সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ধৃত ও রেঙ্গুনে নির্বাসিত হলেন। তাঁর পুত্রদের ও এক পৌত্রকে নিষ্ঠুর ভাবে গুলি করে হত্যা করা হলো। উভয় পক্ষই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু নিষ্ঠুরতায় ইংরেজ সেনাপতিদের সমকক্ষ কিন্তু ভারতীয় নেতা বা সিপাহীরা হতে পারেনি। লক্ষ্ণৌতে ইংরেজরা বহু কষ্টে বার বার বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করলেও বহিরাগত কোন সাহায্য সময়মত না পৌঁছাবার ফলে স্যার হেনরী লরেন্স নিহত হলেন। স্যার কলিন্ ক্যাম্পবেল্ পরে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের উদ্ধার করলেন। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহ দমন করা হলো।

মধ্যভারতে গোয়ালিয়রে তাঁতিয়া তোপী বিশ হাজার সৈন্য সহ প্রথমে নানা সাহেব ও পরে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর সঙ্গে যোগ দেন। কঠোর সংগ্রাম করেও তাঁতিয়া তোপী প্রথমে ক্যাম্পবেল ও পরে হিউরোজের নিকট পরাজিত হন। অদম্য তাঁতিয়া তোপী পরে ঝাঁসীর রানীর সঙ্গে একত্রে গোয়ালিয়র অধিকার করেন। ইংরেজ আশ্রিত সিন্ধিয়াকে বিতাড়িত করে নানাসাহেবকে পেশোয়া হিসাবে ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত স্যার হিউরোজ এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং গোয়ালিয়র দখল করেন। ঝাঁসীর রানী পুরুষের বেশে যুদ্ধ করে রণক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জন দিলেন। তাঁতিয়া তোপী ধরা পড়েন এবং বিদ্রোহের অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে পলায়ন করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে সাধারণের বিশ্বাস। এইরূপে সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হলো।

তাঁতিয়া তোপী

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ঃ সমগ্র ভারতব্যাপী ব্যাপক বিদ্রোহ পরিচালনা করতে যে সংগঠন এবং নেতৃত্বের প্রয়োজন, সিপাহী বিদ্রোহের পশ্চাতে তা অতি সামান্য পরিমাণেও ছিল না। অন্যদিকে টেলিগ্রাফ, ডাক-বিভাগ, রেলওয়ে প্রভৃতি বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা ইংরেজদের হাতে থাকায় দ্রুত খবর দেওয়া-নেওয়া ও

সাহায্য পাঠানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। পক্ষান্তরে সিপাহীদের প্রাচীন ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করতে হয়েছিল। নবাবিষ্কৃত উন্নত অস্ত্রাদির সাহায্য ইংরেজরা সম্পূর্ণ রূপে লাভ করেছিলো। পুরাতন গাদা বন্দুকের সাহায্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিপাহীদের যুদ্ধ করতে হয়েছিলো। অন্যদিকে ইংরেজরা দূরপাল্লার শক্তিশালী বন্দুক ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিলো।

জন ও হেনরী লরেন্স, হ্যাভেলক, আউটরাম, কলিন ক্যাম্পবেল প্রভৃতি ইংরেজ সমর-নায়কদের সমরকৌশল, উপস্থিতবুদ্ধি, শিখ ও গোর্খাদের সক্রিয় সাহায্যে বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়েছিল।

সিপাহীদের পরাজয়ের অন্যান্য কারণগুলি আরও গুরুতর। সিপাহীদের যুদ্ধ কয়েকটি বিশেষ অঞ্চল ব্যতীত গোটা ভারতবর্ষে গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করতে পারেনি। বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহে জনসাধারণও তখন অংশ নিতে পারেনি। দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে ডালহৌসীর নীতিতে বিক্ষুব্ধ ছিলেন, তাঁরাই এ বিদ্রোহে যোগ দেন। অন্যদিকে দেশীয় নৃপতিদের অনেকেই ইংরেজদের প্রচুর সাহায্য করেছিলেন।

গোয়ালিয়রের স্যার দিনকররাও, হায়দরাবাদের নিজাম এবং নেপালের জঙ্গ বাহাদুরের নিকট থেকে ইংরেজরা যে সাহায্য পেয়েছিলেন, তা না পেলে তাঁদের আরও অনেক বিপন্ন হতে হত। প্রকৃতপক্ষে শিখ ও গোর্খা সৈন্যদের সাহায্য না পেলে বিদ্রোহ দমন হতো কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ইংরেজ সেনাপতিদের সমরকৌশল ও রণনৈপুণ্যের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

ভারত শাসনে পরিবর্তন : সিপাহী-বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ফল হলো ভারত শাসনে কোম্পানীর কর্তৃত্বের অবসান। ভারতের শাসনভার ইংলন্ডের মহারানী স্বহস্তে গ্রহণ করে এক ঘোষণাপত্র জারি করেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ব্যতীত সকলকেই ক্ষমা করা হলো। দেশীয় রাজন্য-বর্গের সঙ্গে কোম্পানীর মিত্রতা নতুন আমলেও বলবৎ রাখা হলো। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো যে, ভারতবাসীর ধর্ম-বিশ্বাস, সামাজিক রীতি-নীতি, প্রাচীন আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী পার্লামেন্টে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ হলো।

ভারতের শাসনভার হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে ভারতের গভর্নর জেনারেলকে এখন থেকে রাজপ্রতিনিধি বা 'ভাইসরয়' বলা হলো। ইংলন্ডের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য 'ভারত-সচিব' অ্যাখ্যা পেলেন, এবং পনেরো জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ (ইন্ডিয়া কাউন্সিল) ভারত-সচিবকে পরামর্শ ও সাহায্য দান করবার জন্য নিযুক্ত হলো।

বিদ্রোহের প্রকৃতি : সমসাময়িক চিন্তাশীল ইংরেজ শাসকদের মধ্যে অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতে ইংরেজ শাসনে অনুরাগী ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম।

আলেকজান্ডার ডাফের লেখা থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ শাসনে অসংখ্য ভারতবাসীর মনে গভীর বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরেজ শাসনের অনুকূলে থাকলেও তাঁরা ঐ শাসনের প্রতি অনুরক্ত বললে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে।*

সিপাহী যুদ্ধকে প্রায় সকল ঐতিহাসিকই "সিপাহী বিদ্রোহ" ছাড়া অন্য কোন ব্যাপক আখ্যা দিতে চাননি। "Mutiny" শব্দটি ব্যবহার করে অভ্যুত্থান যে মূলত ফৌজের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রখ্যাতনামা দেশপ্রেমিক বিনায়ক দামোদর সাভারকর "ভারতীয় মহাবিদ্রোহ" বা "ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ" নাম দিয়ে সিপাহী যুদ্ধকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্ব হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন ও রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে, সমর বাহিনীতে আলোড়নের মধ্য দিয়ে সিপাহী অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছে। ভারতীয় সিপাহীরা দেশের নানা স্থানে জনতার সমর্থনও লাভ করেছে। তবে সিপাহী যুদ্ধকে পুরোপুরি জাতীয় বিদ্রোহ বলা ঠিক হবে না।

পশ্চিমে বিহার থেকে পাঞ্জাবের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখন্ডে এ-বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। মূল বিদ্রোহের কেন্দ্র অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজদের সাথে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে ইঞ্চি পরিমাণ ভূমিরক্ষার জন্যও সিপাহীদের পাশে দাঁড়িয়ে জনগণ যুদ্ধ করেছে। তারা নিজেদের নিকৃষ্ট হাতিয়ার নিয়ে শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। লর্ড ক্যানিং সরকারী বিবৃতিতেই বলেছিলেন যে, অযোধ্যা প্রদেশে বিদ্রোহ এক জাতীয় অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিল।

ইংরেজ বাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় সিপাহীরাই এ-যুদ্ধে প্রধান অংশ নিয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং মৌলানা আবুল-কালাম-আজাদ-এর ন্যায় লেখকেরাও স্বীকার করেছেন যে, এ বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ সেন নানা তথ্যাদি উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, জনসাধারণের স্তর থেকেই বিদ্রোহীরা এসেছিলেন। জনসাধারণের ক্ষুদ্রতম অংশ পার্সী সম্প্রদায় এ বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। তারা কিন্তু বিদ্রোহের এলাকা থেকে বহুদূরে বাস করতো।

বঙ্গদেশে যুদ্ধ না হলেও সেখানে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মোটেই কম ছিল না। বাহাদুরশাহের নামে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে আগস্ট যে ফতোয়া জারি করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'ফতোয়াতে যেমন একদিকে হিন্দুর শাস্ত্র ও মুসলমানদের শরিয়তের কথা ছিল, তেমনি অন্যদিকে সর্বসাধারণের রাজনৈতিক অসন্তোষের কারণ উল্লেখিত থাকায়, জাতি যে বিপ্লবের জন্য জাগ্রত ও সম্পূর্ণ প্রস্তুত তা বোঝা গিয়েছিল।'

* ভারতবর্ষের ইতিহাস, (২য় খণ্ড), হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪১৩.

বারাণসী, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক বিক্ষোভ ছিল বহুদিনের। বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা এই ব্যাপক আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত ছিল—যার ফলে ইংরেজ শাসন কঠোর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল।

বাহাদুরশাহ্‌কে নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত করার পিছনে মুঘল আমলের অতীত গৌরবের কথাই বিদ্রোহী নেতারা স্মরণ করেছিলেন। বাদ্‌শাহকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সিপাহীরা নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের কথাও চিন্তা করেছিল। বিজাতীয় শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থানের বেশকিছু লক্ষণ এ আন্দোলনে দেখা গিয়েছে।

এমন একজনও ভারতবাসী নেই যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনে রাজস্ব দেওয়ার গুরুভার থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। বিদেশী শক্তির অধীন হয়ে থাকার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবেই তারা সবকিছু অন্যায় সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে গভীর জাতীয়তাবাদের তেমন লক্ষণ খুঁজে না পাওয়া গেলেও এ আন্দোলনে জাতীয়তাবোধের কোন প্রকাশ নেই, এটা চিন্তা করা ঠিক হবে না। ভারতের জনমানসে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবাত্মক কাজের দৃষ্টান্ত অনস্বীকার্য। পরবর্তী যুগে জাতীয় আন্দোলনে, এ বিদ্রোহের স্মৃতি যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দিয়েছে – এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ—

(১) ভারতের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিমের আয়তন কত ?
(২) ভারতের কোন অঞ্চলকে আর্যাবর্ত ও কোন অঞ্চলকে দাক্ষিণাত্য বলা হয় ?
(৩) নৃতত্ত্ববিদদের বিচারে ভারতের জনগোষ্ঠিগুলির নাম লেখ।
(৪) ঐতিহাসিকরা ভারত ইতিহাসকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন ?
(৫) কত খৃষ্ট পূর্বাব্দে ঋগ্বেদ রচিত হয় ?
(৬) নালন্দা কোথায় অবস্থিত ?
(৭) আর্যদের প্রধান ধর্মদর্শন কয়টি ?
(৮) "অরেল স্টেইন" কে ছিলেন ?
(৯) টলেমি কে ছিলেন ?
(১০) কত খৃষ্ট পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন ?
(১১) 'অর্থশাস্ত্রের' রচয়িতা কে ?
(১২) মুদ্রারাক্ষস কে রচনা করেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—

(১) প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতের ভৌগলিক বিভাগগুলি উল্লেখ কর।
(২) ভারতের আদিবাসী উপজাতিরা সাধারণতঃ কোন কোন অঞ্চলে বাস করে ?
(৩) আর্যগ্রন্থে অনার্যদের কি কি বলা হয়েছে ?
(৪) প্রত্নতাত্বিক উপাদান বলিতে কি বোঝ ?
(৫) ইতিহাসের উপাদান বলিতে কি বোঝ ?
(৬) 'পেরিপ্লাস জবদি ইরিত্রিয়ান সী' গ্রন্থটি থেকে কি জানা যায় ?
(৭) কয়েকজন বিখ্যাত বৈদেশিক পর্যটকের নাম লেখ ?
(৮) 'বেদ' কি ? বেদের কয়টি ভাগ ?
(৯) 'রাজতরঙ্গিনী' ও 'হর্ষচরিতের' লেখক দুজনের নাম উল্লেখ কর ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—

(১) দক্ষিণ ভারতের মালভূমির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কি কি ? এ অঞ্চলের উপকুল ভাগের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্ণনা কর।
(২) নৃতত্ত্ববিদদের মতে ভারতের মানুষদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
(৩) ভারতবাসীদের মধ্যে মৌলিক ঐক্যগুলি গড়ে তুলতে ভারতের ইতিহাস কিভাবে সাহায্য করেছে ?
(৪) ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে বিদেশী পরিব্রাজকদের বিবরণীর গুরুত্ব আলোচনা কর ?
(৫) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় নিম্নলিখিত উপাদানগুলির অবদান উল্লেখ কর।
(ক) শিলালিপি (খ) মুদ্রা (গ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প।
(৬) ইতিহাস রচনায় প্রাচীন সাহিত্যের গুরুত্ব নির্ণয় কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

(১) প্রাচীন প্রস্তর ও নতুন প্রস্তরের মধ্যবর্তী যুগের পার্থক্য কি ?
(২) সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা কোন ধাতুর ব্যবহার জানত ?
(৩) ঐতিহাসিকেরা কোন যুগকে তাম্রযুগ আখ্যা দেন ?
(৪) মহেঞ্জোদারো কথার অর্থ কি ? মহেঞ্জোদারোতে অবস্থিত স্নানাগারটির আয়তন কত ?
(৫) হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রস্তর মূর্তিগুলি কোন ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনীয় ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :—

(১) প্রস্তর যুগ বলিতে কি বোঝায় ?
(২) প্রাচীন ও নতুন প্রস্তর যুগের পার্থক্য কি প্রকারে জানা যায় ?
(৩) 'নিওলিথিক' যুগ বলিতে কি বোঝায় ?
(৪) সিন্ধু-সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা কেন বলবো ?
(৫) তাম্রযুগীয় সভ্যতা বলিতে কি বোঝ ?
(৬) সিন্ধু-সভ্যতার সমসাময়িক কোন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :—

(১) প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও মিসোথিলিক যুগের মানুষদের জীবনযাত্রার বিবরণ দাও। ভারতে এ বিষয়ে কি কি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।
(২) নতুন প্রস্তর যুগের কি কি বৈশিষ্ট্য বিস্তারিত আলোচনা কর।
(৩) সিন্ধু সভ্যতাকে নাগরিক সভ্যতা বলা হয় কেন ? ভারতের ইতিহাসে এই সভ্যতার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
(৪) সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।
(৫) সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

(১) বেদ কোন ভাষায় রচিত ?
(২) কোন অঞ্চলকে 'সপ্তসিন্ধু' বলা হয় ?
(৩) দস্যু বা দাস কাদের বলা হয় ?
(৪) 'সূত্র সাহিত্য' কয়টি ভাগে বিভক্ত ?
(৫) রাজা চক্রবর্তী কাকে বলা হত ?
(৬) আর্যদের দু'খানি মহাকাব্যের নাম উল্লেখ কর।
(৭) হিন্দুদের দু'খানি দার্শনিক ধর্মগ্রন্থের নাম লিখ।
(৮) কখন লৌহযুগের সূচনা হয় ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :—

(১) চতুরাশ্রম বলিতে কি বোঝ ?
(২) সপ্তসিন্ধু বলিতে কি বোঝায় ?

(৩) বেদের আর এক নাম 'শ্রুতি' হল কেন ?
(৪) 'সংহিতা' কাকে বলা হয় ?
(৫) বৈদিক সমাজে নারীদের স্থানের মূল্যায়ন কর ?
(৬) আর্যদের প্রধান বৃত্তিগুলি কি কি ?
(৭) বৈদিক যুগে পুরোহিতদের কি কর্তব্য ছিল ?
(৮) বৈদিক পরবর্তী যুগে সম্রাটেরা কিভাবে নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতেন ?
(৯) লৌহ ধাতুর আবিষ্কারের ফলে সমাজ জীবনে কি পরিবর্তন ঘটে ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—

(১) বৈদিকযুগে আর্যদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(২) 'আর্য' কাদের বলা হয় ? তাঁদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবরণ দাও।
(৩) পরবর্তী বৈদিক যুগে কি ভাবে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল ?
(৪) লৌহযুগ বলিতে কি বোঝ ? কিভাবে লৌহযুগের সূচনা হয়েছিল ?

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ—

(১) চব্বিশতম বা শেষ তীর্থংকরের নাম কি ?
(২) মহাবীরের অনুগামী শিষ্যদের কি বলা হত ?
(৩) জৈনধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন ?
(৪) গ্রামাঞ্চলের স্বাধীন কৃষকদের কি বলা হত ?
(৫) গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান কোথায় ?
(৬) অষ্টমার্গ কি কি ?
(৭) বুদ্ধদেব কোথায় 'বোধি-উত্তান' লাভ করেন ?
(৮) বৌদ্ধ ধর্মের মূল বাণী কি ছিল ?
(৯) বৌদ্ধরা কি কি শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—

(১) 'চতুর্যাম' কাকে বলে ?
(২) 'ত্রিপিটক' বলিতে কি বোঝায় ?
(৩) মহাবীরকে ,জিন' বলা হয় কেন ?
(৪) বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতিগুলি কি ছিল ?
(৫) জাতক কাহিনী বলিতে কি বোঝায় ?
(৬) বৌদ্ধ-সংগীতি বলিতে কি বোঝায় ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—

(১) জৈন ধর্মের শিক্ষা কি কি ? কয়েকখানি জৈন ধর্মগ্রন্থের নাম উল্লেখ করে তাঁদের গুরুত্ব আলোচনা কর।

(২) জৈন ধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ধর্মের নাম জৈন হলো কেন? মহাবীরের জীবনী ও তাঁর ধর্মের মূল নীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।
(৩) ব্রাহ্মণ্য জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর।
(৪) গৌতম-বুদ্ধ কে ছিলেন? তিনি কি ভাবে 'বুদ্ধত্ব' লাভ করেন? তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

(১) অবন্তী রাজ্যের রাজা কে ছিলেন?
(২) উদয়ন কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?
(৩) নন্দ বংশের শেষ নৃপতির নাম কি?
(৪) মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি?
(৫) 'অর্থশাস্ত্র' কার লেখা?
(৬) অশোক কত খৃঃ পূঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন?
(৭) কলিঙ্গরাজ্য বর্তমানে কোথায় অবস্থিত?
(৮) অশোক রাজ্যজয়ের জন্য কোন নীতি অবলম্বন করেন?
(৯) কাইরাস কোন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?
(১০) আলেকজাণ্ডার কোন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন?
(১১) আলেকজাণ্ডারের সহিত পুরুর যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল?
(১২) ক্ষত্রপ বা মহা ক্ষত্রপ কাদের কে বল হয়?
(১৩) সাতবাহনরা কোন বংশোদ্ভব ছিলেন?
(১৪) কনিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল?
(১৫) গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
(১৬) কোন রাজার আমলে ফাহিয়েন ভারতে এসেছিলেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তরাভীত্তক প্রশ্ন :—

(১) 'ষোড়শ মহাজন পদ' বলিতে কি বোঝায়?
(২) বিম্বিসার কোন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?
(৩) অজাতশত্রু কি ভাবে সিংহাসন লাভ করলেন?
(৪) নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
(৫) 'মৌর্যবংশ' নাম হল কেন?
(৬) মেগাস্থিনিস রচিত গ্রন্থখানির নাম উল্লেখ কর।
(৭) অশোককে 'মহামতি' বলা হয় কেন?
(৮) অশোক কেন যুদ্ধ জয়ের নীতি ত্যাগ করেছিলেন?
(৯) অশোকের ধর্মানুরাগের পরিচয় কি ভাবে পাওয়া যায়?

(১০) আলেকজাণ্ডার কি ভাবে ভারতে প্রবেশ করেন ?
(১১) 'হিদাসপিসের যুদ্ধ' কেন বলা হয় ?
(১২) 'মিনান্দার কে ছিলেন ?
(১৩) রুদ্রদামন কে ছিলেন ?
(১৪) মর্যোত্তর যুগে সাধারণ মানুষের অবস্থা কিরূপ ছিল ?
(১৫) গান্ধার শিল্প কাকে বলে ?
(১৬) কুষাণ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান ?
(১৭) সাতবাহনদের অন্ধ্রপতি বলা হয় কেন ?
(১৮) সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি রচনা করেছিলেন কে ?
(১৯) নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন কাকে বলা হয় ?
(২০) ফা-হিয়েন কি উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ?
(২১) 'হূন' আক্রমণের ফলে ভারতীয় সামাজে কি পরিবর্তন দেখা দিয়ে ছিল ?
(২২) কেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হল ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—

(১) 'ষোড়শ মহাজনপদ' বলিতে কি বোঝ ? উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে মগধের ভূমিকা আলোচনা কর।
(২) মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? এ বংশের নাম মৌর্য হলো কেন ? চন্দ্রগুপ্তের শাসন ব্যবস্থা বর্ণনা কর। কি কি সূত্র থেকে তাঁর শাসন ব্যবস্থা জানা যায় ?
(৩) সম্রাট অশোকের ধর্মমত কি ছিল ? ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতের মধ্যে ও ভারতের বাইরে তিনি কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ?
(৪) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ও রাজ্যজয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। আক্রমণের ফলাফল বর্ণনা কর।
(৫) 'কুষাণ' কাদের বলা হয় ? ওই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতির নাম উল্লেখ কর ? তাঁর রাজত্বকাল কি কারণে স্মরণীয় ? বৌদ্ধধর্মের পৃষ্টপোষকতার জন্য তিনি কি কি করেছিলেন ?
(৬) সাম্রাজ্য স্থাপন ও প্রকৃত শাসক হিসাবে সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(১) হূণদের কোন শাখা ভারত আক্রমণ করেছিলো ?
(২) কোন্ গুপ্ত সম্রাট হূণ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন ?
(৩) হর্ষবর্ধন কি ভাবে থানেশ্বর ও কনৌজের অধিপতি হন ?
(৪) বাকপতিরাজ কার সভাকবি ছিলেন ? তাঁর লেখা গ্রন্থের নাম কি ?
(৫) মাৎস্যন্যায় কি ? কি প্রকারে বঙ্গদেশে তার অবসান হলো ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল ?
(২) হিউয়েন-সাঙ্ ভারতে কেন এসেছিলেন ? এ-সময়ে উত্তর ভারতের রাজা কে ছিলেন ?
(৩) কোন রাজার রাজত্বকালে পালবংশের গৌরব উচ্চ-শিখরে পেঁছৈছে ছিল ?
(৪) দু-জন হূণ নেতার নাম বল ? তাদের নিষ্ঠুর বলা হয় কেন ?
(৫) উত্তর ভারতের হূণ-আক্রমণ প্রতিরোধে অংশ নিয়েছিলেন, এমন তিনজন ভায়তীয় নৃপতির নাম লেখ ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(১) হর্ষবর্ধনের আমলে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
(২) ভারতের ইতিহাসে কোন যুগে ত্রি-শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল ? এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন্ কোন্ শক্তি অংশ গ্রহণ করেছিল ? কোন্ কোন্ পক্ষ লাভবান ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল ?
(৩) উত্তর-ভারতে গৌড়-বাংলার রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রথমে কে অগ্রসর হয়েছিলেন ? এখানে মাৎসন্যায় দেখাদিল কেন ? পালবংশ প্রতিষ্ঠা করলেন কে ? পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার কৃতিত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
(৪) চোল রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ ?

সপ্তম অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(১) অতীশ-দীপঙ্কর কে ছিলেন ? তিনি কি জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন ?
(২) রামচরিত গ্রন্থের লেখক কে ? তাঁর সময়ে পাল রাজা কে ছিলেন ?
(৩) পল্লব বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা কাকে বলবো ?
(৪) 'দক্ষিণপথনাথ' কাকে বলা হতো ? কেন বলা হতো ?
(৫) চোল রাজাদের রাজধানীর নাম কি ? গোপুরম্ কি ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) সেন রাজারা কোন ধর্মের পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন ?
(২) কোন বৈষ্ণব কবি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন ?
(৩) সপ্তরথ কোথায় নির্মিত হয়েছিল ? এটি কোন্ রাজবংশের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন ?
(৪) 'গঙ্গোই কোন্ড' উপাধি কে নিয়েছিলেন ?
(৫) চোল রাজাদের শাসন-ব্যবস্থার বিশিষ্ট অবদান কি ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(১) পাল ও সেন যুগের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর

(২) পাল যুগের কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্রের নাম লেখ ? পাল ও সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

(৩) প্রাচীনকালে বহির্বিশ্বের সাথে ভারতবর্ষের যোগাযোগ কি ভাবে স্থাপিত হয়েছিল ? এই প্রসংগে মধ্য এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সাংস্কৃতির প্রসারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

(৪) বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের প্রধান কারণ গুলি আলোচনা কর। মধ্য এশিয়ার কোন্ কোন্ স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল ? দূরবর্তী অঞ্চল থেকে ছাত্রেরা ভারতে অধ্যায়নের জন্য আসতেন কেন ? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভারতীয় উপনিবেশের নাম লেখ ? কম্বুজ রাজ্যের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ ?

অষ্টম অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(১) কোন অঞ্চলকে তুর্কীস্থান বলা হয় ?

(২) মহম্মদ ঘোরী কে ছিলেন ?

(৩) তরাইনের যুদ্ধকে ভারতের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা বলবো কেন ?

(৪) আলাউদ্দীন খলজী কি ভাবে সিংহাসন অধিকার করেন ?

(৫) দিল্লীর সুলতানী আমলে শ্রেষ্ঠ সুলতান কাকে বলবো ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) দাক্ষিণাত্যের মধ্যযুগীয় শিল্প-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি ?

(২) হুসেন শাহের দু-জন উচ্চ-পদস্থ হিন্দু-কর্মচারীর নাম লেখ।

(৩) দিল্লীর সুলতানেরা কি ভাবে রাজ্যশাসন করতেন ?

(৪) 'পদ্মাপুরাণ' ও 'মনসা বিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে কে ?

(৫) বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন সুলতান কে ছিলেন ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(১) দিল্লীর সুলতানী আমলের শাসন ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও ?

(২) মহম্মদ-তুঘলকের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও ? তাঁকে খাম খেয়ালী সুলতান বলা হয় কেন ?

(৩) তুর্কী সুলতানদের পৃষ্ঠ পোষক তায় সাহিত্য ও শিল্প কলার উন্নতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও ?

(৪) ইলতুৎমিস কি প্রকারে সুলতানী লাভ করলেন ? তিনি কি প্রকারে সুলতানী শাসন সুদৃঢ় করে তুললেন ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ—

(১) 'লাখবখ্স' কাকে বলা হয়েছে ?

(২) ইলতুৎমিসের সময়ে ভারতে মোঙ্গল আক্রমণ কারী কে ?

(৩) আলাউদ্দীনখিলজী সৈন্যদের ব্যয় ভার কি ভাবে বহণ করতেন ?
(৪) বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
(৫) ইলিয়াস শাহের রাজধানী কোথায় ছিল ?
(৬) আমীর খসরু কে ছিলেন ?
(৭) কুতুবমিনারের নির্মাণ কার্য কে শেষ করেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :—

(১) মহম্মদ বিন্ তুঘলক্ কোথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন ? কেন ?
(২) 'তামার নোট' কে প্রচলন করেছিলেন ? কেন ? প্রকল্পটি ব্যর্থ হলো কেন ?
(৩) ফিরুজ শাহ তুঘলক প্রতিষ্ঠিত তিনটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম লেখ ?
(৪) প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কোন সালে হয়েছিল ? এই যুদ্ধের পরিণতি কি হয়েছিল ?
(৫) মাহমুদ গাওয়ান কে ছিলেন ? তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দাও ?
(৬) দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি সুলতানী বংশের নাম কি কি ? কেমন করে পৃথক সুলতানীর উৎপত্তি হলো ?
(৭) 'শাহানা-ই-মণ্ডি' কাকে বলা হতো ? তাঁর কি দায়িত্ব ছিল ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :—

(১) সুলতানী আমলে বাংলার সাংস্কৃতি ও স্থাপত্য শিল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখ।
(২) 'ভক্তিবাদ' ও 'সুফী মতবাদ' আলোচনা করে সুলতানী আমলের সাংস্কৃতিক সমন্বয় কি ভাবে সাধিত হয়েছিল, তা আলোচনা কর।
(৩) বঙ্গদেশে ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।
(৪) কৃষ্ণদেব রায়কে বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয় কেন ?
(৫) নিকোলাকণ্টি ও আবদুর রজ্জাকের বর্ণনা অনুসারে বিজয় নগরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।
(৬) দাক্ষিণাত্যে বিজয় নগরের রাজ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

নবম অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

(১) সুলতানী আমলের পতন কার সময়ে হয়েছিল ?
(২) ভারতবর্ষে প্রথম মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন ;
(৩) প্রথম পানিপথের যুদ্ধে কে পরাজিত হয়েছিলেন ?
(৪) খানুয়ার যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল ? কোন পক্ষ জয়লাভ করেছিল ?
(৫) বাবরের প্রকৃত নাম কি ছিল ? তিনি কার বংশধর ছিলেন ?

(৬) 'দীন-ই-ইলাহি' কে প্রচার করেন ?
(৭) নাদির শাহ কত সালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন ?
(৮) পাট্টা ও কবুলিয়ত কি ?
(৯) আকবরের অভিভাবক কে ছিলেন ?
(১০) 'শাহজাহান' উপাধি কি ভাবে লাভ করা হলো ?
(১১) ঔরঙ্গজেব কি উপাধি গ্রহণ করে দিল্লীর মসনদে আরোহন করেন ?
(১২) মুঘল যুগের দুইজন ঐতিহাসিকের নাম লেখ ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—

(১) বাবরকে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন ?
(২) হুমায়ুনের রাজত্বকালে মুঘল শক্তি কি প্রকারে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল ?
(৩) শের খাঁ কি প্রকারে শের শাহ্ হলেন ?
(৪) আকবরের রাজসভার দুজন বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণীর নাম লেখ।
(৫) হলদিঘাটের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ? এই যুদ্ধে কোন পক্ষ জয়লাভ করেছিল ?
(৬) জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দিকে কে কে বিদ্রোহী হলেন ? কেন ?
(৭) শাহজাহানের রাজত্বকালের তিনটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য-নিদর্শনের নাম লেখ। সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনটি কি ?
(৮) ঔরঙ্গজেব কিভাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন ?
(৯) 'নুরজাহান' নামটির অর্থ কি ? তিনি কার মহিষী ছিলেন ?
(১০) মুঘল আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কাকে বলবে ? কেন বলবে ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ—

(১) শেরশাহ ভূমি-রাজস্বের কিরূপ ব্যবস্থা করেন ? তাঁর অন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আলোচনা কর।
(২) আকবর কি প্রকারে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন ? আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি ও ধর্মনীতির বিশেষ কয়েকটি সাফল্যমূলক দৃষ্টান্তের বর্ণনা দাও ? তাঁকে 'মহামতি আকবর' বলা হয় কেন ?
(৩) জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দাও।
(৪) ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কেন বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ? দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহ দমনে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন কেন ?
(৫) মুঘল আমলে আগত তিনজন ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণী থেকে সেই সময়কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে কি জানা যায় ?
(৬) মুঘল আমলের স্থাপত্য শিল্প, চিত্রকলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
(৭) মুঘল শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

দশম অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(১) শিবাজী কে ছিলেন ?
(২) শিবাজী কাদের নিয়ে প্রথমে সৈন্যদল গঠন করেন ? তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল ?
(৩) শিবাজী বিজাপুরের কোন দুর্গ প্রথমে অধিকার করলেন ?
(৪) আফজল খাঁ কে ছিলেন ? শিবাজীর সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর কি পরিণতি হয়েছিল ?
(৫) শিবাজীর রাজ্যাভিষেক কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ? তিনি কি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ?
(৬) 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' কি ?
(৭) ঔরঙ্গজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন কোন সেনাপতিকে প্রেরণ করেছিলেন ?
(৮) ঔরঙ্গজেব 'জিজিয়া কর' কাদের উপর স্থাপন করেছিলেন ?
(৯) কার আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটেছিল ?
(১০) অ-মুসলমানদের প্রতি ঔরঙ্গজেব কিরূপ আচরণ করতেন ?
(১১) ভাস্কো-দা-গামা কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এলেন ? কি প্রকারে তিনি এখানে এসেছিলেন ?
(১২) কার সময়ে ভারতে পর্তুগীজ প্রভুত্বের সর্বাধিক বিস্তার ঘটেছিল ?
(১৩) ওলন্দাজ কারা ? ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় তারা কুঠি স্থাপন করেছিল ?
(১৪) 'মনসবদারী' প্রথা কি ? এই প্রথা কে প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন ?
(১৫) টোডরমল কেন বিখ্যাত হয়েছিলেন ?
(১৬) 'সরকার' বা জেলায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব কার উপর ছিল ?
(১৭) 'শরিয়তের' বিধানগুলিকে কি বলা হত ?
(১৮) "পঞ্চায়েৎ" এর উপর কি দায়িত্ব দেওয়া হত ?
(১৯) মুঘল আমলে রাজস্বের প্রধান উৎস কি ছিল ?
(২০) 'রায়ত-ওয়ারি' বা 'রাইয়ৎ-ওয়ারি' ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় ?
(২১) আবুল ফজল কে ছিলেন ? তাঁর লিখিত দুখানি গ্রন্থের নাম লেখ ?
(২২) বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরিত একজন ইংরেজ রাজদূতের নাম উল্লেখ কর ?
(২৩) শাহজাহানের সময়ে ভারতবর্ষে ফরাসী দেশ থেকে আগত একজন পর্যটকের নাম উল্লেখ কর ?
(২৪) মুঘল আমলের তিনটি প্রসিদ্ধ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনের নাম লেখ ?
(২৫) মুঘল আমলের চিত্রকলায় কোন কোন শিল্পরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল ?
(২৬) মুঘল আমলের দুজন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীর নাম লেখ ?
(২৭) এ যুগে বাংলা ভাষায় রচিত তিনখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম লেখ ?

(২৮) ফার্সী ভাষায় কাব্য রচনা করে কে বিখ্যাত হয়েছিলেন ?

(২৯) হুমায়ুন নামা' কে রচনা করেছিলেন ?

(৩০) 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবরনামা' গ্রন্থের লেখক কে ছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) শিবাজীর মন্ত্রি-পরিষদকে কি বলা হতো ? তিনজন প্রধান সচিবের নাম বল ?

(২) পেশোয়া কাকে বলা হতো ? তাঁর উপরে কি দায়িত্ব থাকতো ?

(৩) পুরন্দরের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে ও কাদের মধ্যে হয়েছিল ? সন্ধির ফল—কি হয়েছিল ?

(৪) শিবাজীকে 'পার্বত্যমূষিক' আখ্যা কে দিয়ে ছিলেন ? কেন দিয়ে ছিলেন ?

(৫) 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি' কি ? কে এটি সঙ্কলন করেছিলেন ? এই সঙ্কলনে তাঁর কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

(৬) ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যের সামরিক বাহিনী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গ্রান্ট ডামং কি বলেছেন ?

(৭) ইংরেজরা কার কাছ থেকে বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেছিল ? এতে তাদের কি কি সুবিধা হয়েছিল ?

(৮) ইংরেজরা ভারতের কোথায় কোথায় কুঠি স্থাপন করেছিল ? পূর্ব উপকূলের দুটি প্রধান কুঠির নাম কর ।

(৯) 'গোল্ডেন ফরমান' কাকে বলা হয় ? কেন বলা হয় ?

(১০) 'ফোর্ট-সেণ্ট-জর্জ' নামে দুর্গটি কোথায় স্থাপিত হয়েছিল ? কার নামানুসারে স্থাপিত হয়েছিল ?

(১১) মুঘল-শাসনে সর্বোচ্চ পদে কে থাকতেন ? তাঁকে কি বলা হতো ?

(১২) সেনা-সরবরাহে দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য আকবর কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ?

(১৩) মুঘল আমলে অভিজাতদের কি বলা হতো ?

(১৪) আকবরের আমলে মুঘল-সাম্রাজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল ?

(১৫) বিচারকগণের কোন বিধান মেনে বিচার করতে হত ? বিচারকদের কি বলা হত ?

(১৬) কত খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল তাঁর বিখ্যাত রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন ? তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ছিল ?

(১৭) রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য টোডরমল জমিগুলিকে কয়ভাগে বিভক্ত করেছিলেন ? কি কি ?

(১৮) মুঘল যুগের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় এমন তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কর ? এর লেখকদের নাম লেখ ?

(১৯) মুঘল যুগে বিশ্বের "সপ্তাশ্চর্য" জিনিসটি কি ছিল ? কে কার স্মরণে এটি তৈরী করেছিলেন ?

(২০) বিখ্যাত ইন্দো-পারসিক স্থাপত্য রীতির বিস্ময়কর জিনিস দুটি কি কি ? কার সময়ে এগুলি নির্মিত হয়েছিল ?

(২১) মুঘলযুগের বিখ্যাত দুজন হিন্দু ও দুজন মুসলমান চিত্র শিল্পীর নাম লেখ ? এরা কার রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন ?

(২২) 'রায় জুনাকর' উপাধি কে পেয়েছিলেন ? তিনি কোন ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিলেন ?

(২৩) মুঘল আমলের কয়েকটি বিখ্যাত প্রাদেশিক স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন উল্লেখ কর ?

(২৪) মুঘল আমলে আগত একজন ওলন্দাজ পর্যটকের নাম লেখ ? তিনি কার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ?

(২৫) কাঁফি খাঁ কে ছিলেন ? তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম লেখ ?

(২৬) আবুল ফজল কার সভা কবি ছিলেন ? তিনি কি জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন ?

(২৭) মুঘল আমলে প্রাদেশিক ভাষায় রচিত যে কোন চারটি বিখ্যাত সাহিত্যের নাম উল্লেখ কর ? তাঁর লেখকদের নাম লেখ ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(১) শিবাজীর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(২) উপযুক্ত তথ্যাদিসহ শিবাজীর শাসন ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(৩) শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। তাঁকে একজন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন ?

(৪) ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যের নীতি বর্ণনা কর। এই নীতির সুদূর প্রসারী ফল কি কি হয়েছিল। তা আলোচনা কর।

(৫) ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। এই নীতির ফলে তাঁর শাসনকালে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ?

(৬) মুঘল আমলে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যের সম্প্রসারণ কি শুরু হয়েছিল, তা আলোচনা কর।

(৭) মুঘল বাদশাহদের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্যাদি উল্লেখ করে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লেখ।

(৮) আকবরের ভূমি ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(৯) মুঘল আমলের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

(১০) মুঘল আমলের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

(১১) "রায়ত-ওয়ারি" বা "রাইয়ৎ-ওয়ারি" ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লেখ ?

(১২) রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য টোডরমল যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সেই সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(১৩) মুঘল আমলের স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লেখ ?

(১৪) মুঘল যুগের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(১৫) মুঘল যুগের ইতিহাস লিখন ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

দশম অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

(১) ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে কোন কোন সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ?

(২) রাজসিংহ কে ছিলেন ?

(৩) ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মারাঠাদের যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলা হয় কেন ?

(৪) অ-মুসলমান সম্প্রদায় বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে কেন গিয়েছিল ?

(৫) ঔরঙ্গজেব কোন শিখগুরুকে হত্যা করেছিলেন ?

(৬) মুঘল-আমলে অভিজাত সম্প্রদায় কটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ?

(৭) কি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অভিজাত শ্রেণী এ সময়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল ?

(৮) "জায়গীরদার" কাদের বলা হতো ?

(৯) "সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়" কাকে কাকে বলা হত ?

(১০) বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময়ে গুজরাটের শাসনকর্তা কে ছিলেন ?

(১১) বাহাদুর শাহ ও জাহান্দার শাহকে সিংহাসন লাভে কারা সাহায্য করেছিলেন ?

(১২) জাহান্দার শাহকে হত্যা করে কে মসনদে আরোহণ করেছিলেন ?

(১৩) বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন কার আমলে নির্মিত হয়েছিল ?

(১৪) আহমেদ শাহ আবদালীর কি উপাধি ছিল ?

(১৫) আহমেদ শাহ আবদালী কত সালে প্রথমে দিল্লী আক্রমণ করেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

(১) মুঘল আমলে রাজস্ব আদায়ের চাপ কোন শ্রেণীর উপরে বেশি পড়তো ?

(২) 'ইজার প্রথা' কি ? কোন সময়ে এটি প্রবর্তিত হয়েছিল ?

(৩) মুঘল আমলে জায়গীরদারদের জায়গীর পরিবর্তনে বাধ্য করা হত কেন ?

(৪) জায়গীরের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও রাজস্বের হার কমে যেত কেন ?

(৫) ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু কত সালে হয়েছিল ? কোথায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ?

(৬) ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কি ? তিনি কি প্রকারে সিংহাসন দখল করলেন ?

(৭) কার সাহায্যে জাহান্দার শাহ সিংহাসন লাভ করেছিলেন ?

(৮) বাদশাহ তৈরীর রঙ্গমঞ্চের দুই প্রধান নট কারা ছিলেন ? কি প্রকারে তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতার অবসান হয় ?

(৯) আর্থিক দিক দিয়ে মুঘল আমলে কোন কোন প্রদেশকে কেন্দ্রীয় শক্তির "প্রাণস্বরূপ" বলা হত? কেন বলা হত?

(১০) মুঘল সাম্রাজ্যর ভাঙন শুরু হয়েছিল কোন বাদশাহের সময় থেকে?

(১১) ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মুঘল সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের জন্য প্রধানতঃ কোন তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন?

(১২) দুটি কারণের উল্লেখ করে দেখাও যে অভিজাত শ্রেণীই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল?

(১৩) কোন কোন বৈদেশিক আক্রমণের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন দ্রুত ঘটলো?

(১৪) নাদিরশাহ কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন?

(১৫) আহ্মদ শাহ্ আবদালীকে দুররানী বলা হয় কেন? তার আক্রমণের ফলে কি হয়েছিল?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

(১) বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের আমলে আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখ।

(২) 'ইজারা প্রথা' ও 'জায়গীর প্রথা' কি? মুঘল আমলের ভুমিরাজস্ব ব্যবস্থা আলোচনা কর।

(৩) বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করে তোমার নিজস্ব মন্তব্য লিখ।

(৪) বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানে বিপর্যয় কেন ঘটেছিল? প্রধান প্রধান কারণগুলি উল্লেখ কর।

(৫) মুঘল সাম্রাজ্য পতনের ক্ষেত্রে অভিজাত সম্প্রদায়ের ভূমিকা কি ছিল, তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(৬) মুঘল আমলে বাদশাহদের দরবারে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল? এ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(৭) মুঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য ঔরঙ্গজেবের দুর্বল উত্তরাধিকারিদের দায়ী করা হয় কেন?

(৮) মুঘল বাদশাহীর শেষদিকে দেশীয় আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণ কি কি? প্রশাসন ব্যবস্থার কি কি ত্রুটির জন্য সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন ঘটেছিল?

(৯) মুঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য তিনটি বিশেষ কারণ উল্লেখ কর। এই কারণগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলবে কেন?

(১০) মুঘল যুগে রাজশক্তির পতন কিভাবে শুরু হয়েছিল তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

(১১) বাদশাহের আভ্যন্তরীন শাসন ব্যবস্থায় কি কি ত্রুটি ছিল? সাম্রাজ্যের পতনে ঐগুলির গুরুত্ব আলোচনা কর।

(১২) প্রদেশে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অবসান কিভাবে ঘটেছিল? বাংলা ও হায়দরাবাদে স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(১৩) মুঘল আমলে ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

একাদশ অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(১) আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যের উত্থান কখন হয়েছিল ?

(২) মুর্শীদকুলী খাঁ কে ছিলেন ? তিনি কোন দেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন ?

(৩) মুর্শীদকুলী খাঁকে বাংলার সুবেদার হিসাবে কে নিযুক্ত করেছিলেন ?

(৪) মুঘল আমলে বাংলার রাজধানী কোথায় ছিল ? কখন মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়েছিল ? কেন হয়েছিল ?

(৫) বিহার প্রদেশকে বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত কে করে ছিলেন ?

(৬) কার সময়ে বাংলা সুবা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়েছিল ?

(৭) হায়দরাবাদে স্বাধীন নিজামশাহীর প্রতিষ্ঠা কে করে ছিলেন ? 'নিজামশাহী' বলা হয় কেন ?

(৮) নিজাম-উল্-মুল্কের পূর্ব নাম কি ছিল ? বাদ্শাহ তাঁকে কি উপাধি দিয়েছিলেন ?

(৯) সা-আদাত্-খান ও সফ্দরজং কে ছিলেন ?

(১০) স্বাধীন মহীশূর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোন সময়ে হয়েছিল ?

(১১) হায়দার আলী কত খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর রাজ্য অধিকার করেছিলেন ?

(১২) 'শিখ' কথাটির অর্থ কি ?

(১৩) প্রথম শিখগুরু কে ছিলেন ?

(১৪) 'সুবর্ণ মন্দির' বা 'গুরুদ্বার' কখন নির্মিত হয়েছিল ?

(১৫) শিখদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি ? কে এটি সংকলন করেছিলেন ?

(১৬) মারাঠা শক্তির বিস্তার কোন সময়ে শুরু হয়েছিল ?

(১৭) প্রথম পেশোয়া কে ছিলেন ?

(১৮) মারাঠাদের পাঁচটি সামন্ত রাজ্য কি কি ?

(১৯) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) মুর্শীদকুলী খাঁ কোথায় কোথায় রাজস্ব বিভাগ পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন ? রাজস্ব ব্যবস্থা-পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি কার পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন ?

(২) মহম্মদ শাহ কোন সময়ে বাদশাহী মস্নদে উপবেশন করলেন ? তাঁর উজীর বা প্রধানমন্ত্রী কে নিযুক্ত হলেন ?

(৩) মহম্মদ শাহ্ নিজাম্-উল্-মুলককে কি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন ? কেন করে ছিলেন ?

(৪) অযোধ্যায় স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠা কখন শুরু হয়েছিল ? কিভাবে হয়েছিল ?

(৫) হায়দরআলী কে ছিলেন ? তিনি কিভাবে মহীশূর রাজ্য গঠন করলেন ?

(৬) শিখদের দশম ও শেষ গুরু কে ছিলেন ? তিনি কোন প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন ? কেন করেছিলেন ?

(৭) 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' সৃষ্টিতে কে উদ্যোগী হয়েছিলেন ? তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল ?

(৮) প্রথম বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর কে পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ? এই সময় 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহীর' আদর্শ পরিত্যক্ত হয়েছিল কেন ?

(৯) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কাদের মধ্যে ঘটেছিল ? এই যুদ্ধে কোন পক্ষ জয়লাভ করেছিল ? যুদ্ধের ফলে কি হয়েছিল ?

(১০) কোন যুদ্ধের ফলে মারাঠারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ? ভারতের ইতিহাসে যুদ্ধটির কি গুরুত্ব ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(১) আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

(২) স্বাধীন নিজামশাহীর প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

(৩) ভারতবর্ষে শিখ শক্তির অভ্যুত্থান কি ভাবে সম্ভব হলো ? উক্ত ভারতের রাজনৈতিক অবস্থায় কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

(৪) পেশোয়াতন্ত্র বলতে কি বুঝতে পার ? মারাঠা শক্তির বিস্তারে পেশোয়ামের ভূমিকা আলোচনা কর।

(৫) পেশোয়া প্রথম বাজীরাও-এর আমলে মারাঠা শক্তির বিস্তার সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। তাঁর রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্বন্ধে তোমার অভিমত লিখ।

(৬) মারাঠাদের সামন্ত রাজ্য কি কি ? সামন্ত রাজ্য কি ভাবে সৃষ্টি হলো ? এর ফলে মারাঠা-রাজনীতিতে কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

(৭) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখ। এ যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(১) ইউরোপ থেকে জলপথে ভারতে কে প্রথমে এসেছিলেন ? তিনি কোন সালে ভারতে এসেছিলেন ?

(২) ভারতের কোন কোন অঞ্চলে পর্তুগীজদের কুঠি প্রথমে নির্মিত হয়েছিল ?

(৩) ওলন্দাজ কাদের বলা হত ?

(৪) 'ইউনাইটেড্ ইস্ট ইণ্ডিয়া' কোম্পানী কারা প্রতিষ্ঠা করেছিল ?

(৫) ওলন্দাজরা কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন ?

(৬) সামুদ্রিক বাণিজ্যে পর্তুগীজদের প্রধান প্রতিপক্ষ কারা ছিল ?

(৭) দিনেমাররা কোথায় কোথায় কুঠি স্থাপন করেছিল ?

(৮) ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কার রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

(৯) টমাস রো কে ছিলেন? তিনি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের থেকে কি কি সুবিধা সংগ্রহ করেছিলেন?

(১০) কলকাতা নগরীর গোড়া পত্তন করেছিলেন কে?

(১১) কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ কার নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

(১২) ফরাসীরা কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল? কি জন্য এসেছিল?

(১৩) সুরাটে কে প্রথম ফরাসী কুঠি স্থাপন করেন? কোথায় কোথায় ফরাসীকুঠি স্থাপিত হয়েছিল?

(১৪) কর্ণাটকে স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠা করেন কে?

(১৫) পণ্ডিচেরীর ফরাসী শাসনকর্তা কে ছিলেন?

(১৬) 'অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়? এ যুদ্ধের প্রভাব ভারতে পড়লো কেন?

(১৭) প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল?

(১৮) রবার্ট ক্লাইভ কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন? কি চাকুরী নিয়ে তিনি এখানে আসেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) ওলন্দাজেরা কোন শক্তিকে পরাজিত করেছিল? তার ফলে কোন ইউরোপীয় শক্তির সুবিধা হয়েছিল?

(২) দিনেমাররা সর্বপ্রথম কোথায় কুঠি স্থাপন করেছিল? এবং পরে কুঠিগুলি কাদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে ছিলো?

(৩) ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ কোথায় নির্মিত হয়েছিল? কারা কোন অজুহাতে এটি নির্মাণ করেছিলেন? এর ফলে তাদের কি কি সুবিধা হয়েছিল?

(৪) ফরাসী 'ইস্ট-ইণ্ডিয়া' কোম্পানী কত খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়? ফরাসীরা ভারতের কোথায় কোথায় কুঠি নির্মাণ করেছিলেন?

(৫) ইংরেজ ও ফরাসীরা বাণিজ্য-সম্প্রসারণের জন্য কোথায় কোথায় নতুন শহর ও বন্দর তৈরী করেছিল? ইংরাজ ও ফরাসীদের প্রধান সামরিক ঘাঁটি কোথায় কোথায় ছিল?

(৬) কটি কর্ণাটকের যুদ্ধ হয়েছিল? কর্ণাটকের নবাব তখন কে ছিলেন? কর্ণাটকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এমন দুজন ফরাসী ও একজন ইংরেজ সেনাপতির নাম লেখ।

(৭) ডুপ্লে কে ছিলেন? তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল? তাঁর উদ্দেশ্য কেন ব্যর্থ হয়েছিল?

(৮) অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ কাদের মধ্যে শুরু হয়েছিল? কোন সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের সাময়িক বিরতি হয়েছিল?

(৯) প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধে ফরাসী নৌ-সেনাপতি কে ছিলেন? তিনি কোন শহরটি দখল করে ছিলেন? এর ফলে কি হয়েছিল?

(১০) নিজামের মৃত্যুর পরে কারা হায়দরাবাদের সিংহাসন দাবী করলেন? ইংরেজ ও ফরাসীরা কোন কোন পক্ষ সমর্থন করলেন?

(১১) কর্ণাটকের মহম্মদআলী কাদের আশ্রয় গ্রহণ করলেন ? ফলে কি হলো ?

(১২) রবার্ট ক্লাইভ কি প্রকারে আর্কট দখল করলেন ? এর ফলে কি হয়েছিল ?

(১৩) তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ কোন সময়ে শুরু হয়েছিল ? এই যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসী সেনাপতি কারা ছিলেন ? এই সময়ে ইউরোপে কোন বিখ্যাত যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ?

(১৪) ইউরোপের সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়েছিল ? এর ফলে ইংরেজদের কি সুবিধা হয়েছিল ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

(১) ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন কি ভাবে হয়েছিল এই সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

(২) বাংলাদেশে ইংরেজ প্রভুত্বের সূত্রপাত সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(৩) 'ফরাসী 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' কোম্পানী কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ? ভারতে ফরাসী প্রভুত্ব স্থাপনে ডুপ্লের অবদান আলোচনা কর।

(৪) দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি ভাবে শুরু হয়েছিল ? এর ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(৫) ভারতে প্রতিপত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য ইংরেজ ও ফরাসী বণিক কোম্পানীর সংঘর্ষের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(৬) ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(৭) ভারতে ফরাসী-শক্তির ব্যর্থতার কারণ গুলি আলোচনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

(১) ইংরেজরা কোথায় কোথায় তাঁদের নৌ-শক্তির কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন ?

(২) 'চার্টার' বা পার্লামেণ্টের' আইন বলতে কি বোঝায় ?

(৩) মিঃ হ্যামিলটন্ কে ছিলেন ? তিনি কাকে কঠিন রোগ থেকে সারিয়ে তুলেছিলেন ?

(৪) ইংরেজরা কত খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাদশাহী "ফরমান্" লাভ করে ?

(৫) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব কে ছিলেন ?

(৬) সিরাজ-উদ্-দৌলা কোন সময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদ লাভ করেন ?

(৭) সিরাজ-উদ্-দৌলার সাথে ইংরেজদের বিরোধ শুরু হয়েছিল কেন ?

(৮) নবাব কত খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা অধিকার করলেন ? এই সময়ে ইংরেজ দুর্গাধিপতি কে ছিলেন ?

(৯) 'অন্ধকূপ হত্যার' কাহিনী কে রটনা করলো ?

(১০) কলকাতা পুনরুদ্ধার করলেন কে ?

(১১) নবাব ফরাসীদের মুর্শিদাবাদে আশ্রয় দিলেন কেন ?

(১২) সিরাজ-উদ্-দৌলার মসনদ লাভে কারা অসন্তুষ্ট হলো ? কেন ?

(১৩) নবাবের বিরুদ্ধে ক্লাইভ কাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ?

(১৪) পলাশীর যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ?

(১৫) নবাবের পক্ষে দুজন বীর সেনাপতির নাম লেখ ?

(১৬) ইংরেজ কোম্পানীর মূল লক্ষ্য কি ছিল ?

(১৭) পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয় হয়েছিল কেন ? বিশ্বাসঘাতকতায় এ পরাজয় ঘটলো ?

(১৮) মীরজাফর কাদের অনুগ্রহে নবাবী লাভ করলেন ?

(১৯) বাংলাদেশের শেষ স্বাধীনচেতা নবাব কে ছিলেন ?

(২০) ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কত খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভ করে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

(১) বাদশাহী "ফরমান" লাভ করে ইংরেজরা কি কি সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিলেন ?

(২) সিরাজ-উদ্-দৌলার সাথে ইংরেজদের বিরোধের কি কি কারণ ছিল ?

(৩) নবাব কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন কেন ? তিনি ইংরেজদের কোন কুঠি দখল করেছিলেন ?

(৪) মীরজাফরের সঙ্গে কি শর্তে ক্লাইভ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ?

(৫) কার কথায় নবাব যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য মোহন পালকে আদেশ দিয়েছিলেন ? এর ফল কি হয়েছিল ?

(৬) পলাশীর যুদ্ধে কিভাবে ইংরেজরা জয়লাভ করেছিল ?

(৭) মীরকাশিম কে ছিলেন ? তিনি কত খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব হয়েছিলেন ? তিনি ইংরেজদের কোন কোন জেলার জমিদারী দান করেছিলেন ?

(৮) কি উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেছিলেন ?

(৯) মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল কেন ? এর কারণগুলি উল্লেখ কর।

(১০) বক্সারের যুদ্ধ কত খ্রীস্টাব্দে কাদের মধ্যে শুরু হয়েছিল ? এই যুদ্ধে কোন পক্ষ জয়লাভ করেছিল ?

(১১) কোন কোন স্থানে নবাব মীরকাশিমের পরাজয় ঘটেছিল ? নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি কে ছিলেন ?

(১২) নবাব মীরকাশিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয়ের জন্য কার কার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন ? এই সম্মিলিত বাহিনী কোন যুদ্ধে কার কাছে পরাজিত হয়েছিল ?

(১৩) বক্সার যুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি ছিল ? এর ফলে ইংরেজদের কি সুবিধা হয়েছিল ?

(১৪) কার কাছ থেকে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করেছিল ? এই সময়ে বাংলার গভর্ণর কে ছিলেন ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

(১) বাংলাদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য বিস্তার ও বাদশাহী সনদ লাভ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

(২) নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলার সাথে ইংরেজদের বিরোধের কারণগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

(৩) পলাশীর যুদ্ধের একটি সংক্ষিত বর্ণনা দাও।

(৪) পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(৫) নবাব হিসাবে মীরকাশিমের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

(৬) বক্সারের যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ণয় কর।

(৭) ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলগুলি আলোচনা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

(১) ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে কোন ঘটনাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয় ?

(২) ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত কে করেন ?

(৩) লর্ড ওয়েলেসলী কোন নীতির সমর্থক ছিলেন ?

(৪) মারাঠাদের লুপ্তগৌরব কিছুটা উদ্ধার করেছিলেন কে ?

(৫) নানা ফড়নবিশ ও মহাদেওজী সিন্ধিয়া কে ছিলেন ?

(৬) সুরাটের সন্ধি কত খ্রীস্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় ?

(৭) প্রথম মারাঠা যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল ?

(৮) পুরন্দরের সন্ধি কাদের মধ্যে কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় ?

(৯) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল ?

(১০) 'সল বাই-এর সন্ধি' কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?

(১১) 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি কে প্রবর্তন করেছিলেন ? কেন ?

(১২) দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল ?

(১৩) তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় গভর্ণর জেনারেল কে ছিলেন ?

(১৪) কটি ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল ?

(১৫) টিপু সুলতান কে ছিলেন ?

(১৬) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় ?

(১৭) কোন যুদ্ধে মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটেছিল ?

(১৮) গোর্খাদের সঙ্গে যুদ্ধে সেনাপতি কে ছিলেন ?

(১৯) পিণ্ডারী দস্যুদের দমন করলেন কে ?

(২০) বিবদমান শিখ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস কে করেছিলেন ?

(২১) রণজিৎ সিংহ কার কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি লাভ করলেন ?

(২২) শতদ্রুর পূর্বতীরস্থ শিখেরা রণজিৎ এর বিরুদ্ধে কার সাহায্য প্রার্থনা করলেন ?

(২৩) কার সময়ে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ঘটে ?

(২৪) দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের সময় ভারতের বড়লাট কে ছিলেন ?

(২৫) ডাক ও তার বিভাগের পত্তন কে করেছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় ইংরেজরা কোন বিপ্লবের সুফল লাভ করেছিলেন ? ইংরেজরা কেন ভারতের বাজার দখল করতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল ?

(২) কার সময়ে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বেশী বিস্তার লাভ ঘটেছিল ? কি ভাবে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার করেছিলেন ?

(৩) মারাঠা রাজনীতিতে আগত একজন বিখ্যাত কুটনীতি বিশারদের নাম কর ? তিনি কাকে সিংহাসনে বসিয়ে কিভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন ?

(৪) প্রথম মারাঠা যুদ্ধ কেন শুরু হয়েছিল ? কোন সন্ধির মাধ্যমে এই যুদ্ধ শেষ হয়েছিল ? সন্ধির শর্তগুলি উল্লেখ কর।

(৫) পুরন্দরের সন্ধি কেন স্বাক্ষরিত হয়েছিল ? এই সন্ধির শর্তগুলি কি কি ?

(৬) কোন যুদ্ধে মারাঠাদের হাতে ইংরেজদের পরাজয় ঘটেছিল ? কোন সন্ধির দ্বারা যুদ্ধ শেষ হয়েছিল ? সন্ধির শর্তগুলি কি কি ?

(৭) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ কাদের মধ্যে এবং কেন শুরু হয়েছিল ? এই সময় গভর্ণর জেনারেল কে ছিলেন ? মারাঠা নেতা নানা ফড়নবীশের কি ভুমিকা ছিল ?

(৮) সলবাইয়ের সন্ধি কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ? সন্ধির শর্তগুলি উল্লেখ কর।

(৯) 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি বলতে কি বুঝবো ? ভারতের কি উদ্দেশ্যে এই নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল ?

(১০) তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল ? এই যুদ্ধে কাদের পরাজয় হয়েছিল ? ফল কি হয়েছিল ?

(১১) মহীশূর রাজ্যের গৌরব প্রতিষ্ঠার মূলে কে ছিলেন ? তাঁর অভ্যুত্থানকে ইংরেজরা কেন সুনজরে দেখেন নি ?

(১২) প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ কাদের মধ্যে কত খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল ? কোন পক্ষ জয়লাভ করেছিল ?

(১৩) ম্যাঙ্গালোরের চুক্তির শর্তগুলি উল্লেখ কর।

(১৪) তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সময় বাংলার গভর্ণর জেনারেল কে ছিলেন ? এই সময়ে কোন সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ? শর্তগুলি কি ছিল ?

(১৫) চতুর্থ ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ কেন শুরু হয়েছিল ? টিপু সুলতান কেন শ্রীরঙ্গপত্ত সন্ধি মেনে নিতে পারেন নি ? এর ফল কি হয়েছিল।

(১৬) সগৌলীর সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ? এই সন্ধির শর্তগুলি কি কি ছিল ?

(১৭) 'য়ান্দাবুর, সন্ধি কাদের সঙ্গে কত সালে হয়েছিল ? সন্ধির শর্ত কি কি ছিল ?

(১৮) সিন্ধুদেশ জয় করলেন কে ?

(১৯) অমৃতসরের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ? সন্ধির শর্তগুলি কি কি ছিল ?

(২০) লাহোরের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ? এই সন্ধির শর্তগুলি কি ছিল ?

(২১) দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল ?

(২২) ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী নীতির নাম কি ? সর্বপ্রথম কে এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন ?

(২৩) ভারতে সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রথম কে করেছিলেন ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে ওয়ারেন হেস্টিংয়ের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

(২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় লর্ড ওয়েলেসলীর কৃতিত্ব আলোচনা কর।

(৩) মারাঠাদের রাজনীতিতে নানা ফড়নবীশ ও মহাদজী সিন্ধিয়ার কৃতিত্ব আলোচনা কর ?

(৪) প্রথম ও তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।

(৫) অধীনতামূলক নীতির সুদূর প্রসারি ফল কি হয়েছিল ?

(৬) মারাঠা শক্তির পতনের কারণগুলি আলোচনা কর। এর ফল কি হয়েছিল ?

(৭) হায়দরআলী ও টিপু সুলতানের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও স্বদেশ প্রীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

(৮) রণজিৎ সিংহ কিভাবে বিচ্ছিন্ন শিখ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন ? রণজিৎ সিংহের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দাও।

(৯) পাঞ্জাব সম্বন্ধে ডালহৌসীর ঘোষণা পত্রটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

(১০) ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফল কি হয়েছিল ? এই নীতির দ্বারা কোন কোন রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়েছিল ?

(১১) ডালহৌসীর জনহিতকর কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(১) কোম্পানীর প্রথম আমলের শাসনব্যবস্থাকে নেতিবাচক বলবো কেন ?

(২) দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন ?

(৩) 'বোর্ড অব কন্ট্রোল' কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?

(৪) ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় রাজকোষ কোথায় স্থানান্তরিত হয়েছিল ?

(৫) ওয়ারেন হেস্টিংস জেলার খাজনা আদায়ের ভার কাদের উপর দিয়েছিলেন ?
(৬) 'কর্ণওয়ালিস কোড' কি ?
(৭) "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" প্রবর্তন করেন কে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভীত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থার ফলে কি হয়েছিল ?

(২) কোন সালের দুর্ভিক্ষকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয় কেন ? ঐতিহাসিক হান্টার ও রাজ প্রতিনিধি বেচার এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কি বলেছেন ?

(৩) দুর্ভিক্ষের বছরে কোম্পানী কি ভাবে রাজস্ব আদায় করেছিল ? পরের বছরে রাজস্বের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল ?

(৪) লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্টের ফলে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিপদ বৃদ্ধি পেল কেন ?

(৫) 'বোর্ড অব কণ্ট্রোল কোথায় এবং কখন গঠিত হয় ? বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সদস্য সংখ্যা কত ছিল ?

(৬) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার কি কি সংস্কার সাধিত হয়েছিল ?

(৭) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কারা উপকৃত হয়েছিল ? এবং কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(১) লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও পিটের ভারত শাসন আইনের ধারাসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। পিটের আইনটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা হয় কেন ?

(২) ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

(৩) কর্ণওয়ালিস ও বেণ্টিঙ্কের সময়ে প্রসাশনিক ও বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবরণী লেখ।

(৪) বেণ্টিঙ্কের সামাজিক সংস্কারগুলি আলোচনা কর।

(৫) কি উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয় ? এই ব্যবস্থার ফলাফল আলোচনা কর।

ষোড়শ অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(১) 'ইনভেস্টমেণ্ট' বা 'লগনী' কাকে বলা হত ?
(২) চীনদেশে ইংরেজরা কি প্রকারে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করেছিল ?
(৩) 'দস্তক' কাকে বলা হয় ?
(৪) দেশীয় সুতীবস্ত্রের ব্যবসা বন্ধ করতে ইংরেজ কোম্পানী 'দাদনের' প্রচলন করলো কেন ?

(৫) কোন কোন স্থানের তাঁতীরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

(৬) কোন কোন স্থানের সূতী ও রেশমীবস্ত্র বিখ্যাত ছিল।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

(১) 'ইনভেস্টমেণ্ট' বা লগ্নী কোন সময়ে প্রবর্তিত হয়েছিল? এই প্রথায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল কারা ?

(২) 'দস্তক প্রথা' কোন সময়ে প্রবর্তিত হয় ? কি ভাবে তার অপব্যবহার করা হতো ?

(৩) দেশীয় সূতী বস্ত্রে লাভজনক ব্যবসা কারা বন্ধ করেছিল ? কিভাবে করেছিল ?

(৪) দেশীয় শিল্পের পতন ঘটাতে ইংরেজ সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

(১) নতুন জমিদার শ্রেণী কি উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল ? এই ব্যবস্থায় ইংরেজ সরকারের কি কি সুবিধা হয়েছিল ?

(২) 'ইনভেস্টমেণ্ট' বা 'লগ্নী'কে পৃথক করে রাখা হত কেন ? এ ব্যবস্থায় ইংরেজ সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য কিভাবে বৃদ্ধি হয়েছিল ? এই ব্যবস্থায় কারা বেশী লাভবান হয়েছিল ?

(৩) 'দস্তক' প্রথা কোন সময়ে প্রবর্তিত হয়েছিল ? কারা কিভাবে তার অপব্যবহার করতেন ? এর ফল কি হয়েছিল ?

(৪) কোম্পানীর বিরুদ্ধে দেশীয় তাঁতীদের প্রতিক্রিয়ার কি কি পরিচয় পেয়েছ ?

(৫) ভারতের সূতীবস্ত্র ও রেশমীবস্ত্র বিলাতের ও বিদেশের অন্যান্য বাজারে বন্ধ করার জন্য বিলাতের পার্লামেণ্ট কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিল ? তার ফল কি হয়েছিল ?

(৬) ইংলন্ডের বস্ত্রশিল্পের চাহিদা ভারতে বৃদ্ধি করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ?

সপ্তদশ অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

(১) ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কোন আমলে প্রবর্তিত হয় ?

(২) ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় কি কি ব্যবহারিক বিষয় শেখানো হত ?

(৩) দেশীয় শিক্ষা বলতে কি বোঝ ?

(৪) খ্রীষ্টান মিশনারীরা কি উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন ?

(৫) পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের জন্য ডেভিড হেয়ার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ?

(৬) বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ?

(৭) ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছিল ?

(৮) জি. সি. পি. আই কখন প্রতিষ্ঠিত হয় ? কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
(৯) "চ্যারিটি স্কুল" কাকে বলা হতো ?
(১০) 'শ্রীরামপুর ত্রয়ী' কাদের বলা হতো ?
(১১) শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বাংলা ভাষায় কি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন ?
(১২) রাজা রামমোহনকে যুগোপযোগী বলা হয় কেন ?
(১৩) ডিরোজিও কে ছিলেন ? তিনি কি কারণে ছাত্রমহলে জনপ্রিয় ছিলেন ?
(১৪) ডিরোজিও সমসাময়িক বাঙালী যুবকদের অন্তরে কি নতুন ভাবধারার সৃষ্টি করলেন ?
(১৫) ১৮৩৩ সালের 'সনদ আইনে' শিক্ষাখাতে কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল ?
(১৬) মেকলে সাহেব ভাষা-বিতর্কে কোন পক্ষ নিয়েছিলেন ?
(১৭) বেণ্টিঙ্কের সিদ্ধান্তে কোন ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হল ?
(১৮) 'চার্লস উড্' কে ছিলেন ?
(১৯) শিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা কি ছিল ?
(২০) 'উইলিয়ম অ্যাডাম' দেশীয় শিক্ষার বিস্তারে কি কি কাজ করেছিলেন ?
(২১) দেশীয় শিক্ষার পতনের কারণগুলি উল্লেখ কর ?
(২২) সতীদাহ প্রথা কি ? এ প্রথা বন্ধের জন্য পূর্বে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ?
(২৩) রাজা রামমোহন রায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?
(২৪) বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্য ভাষার জনক বলা হয় কেন ?
(২৫) নারী শিক্ষার জন্য কেশবচন্দ্র কি কি কাজ করেছিলেন ?
(২৬) 'প্রার্থনা সমাজ'-কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। বৌদ্ধ যুগের তিনটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর।

(২) হিন্দু কলেজ কত খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ? হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কারা ছিলেন ?

(৩) রাজা রামমোহন বড়লাট লর্ড আমর্হাস্টকে চিঠি দিয়ে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন ? এই প্রস্তাবটির গুরুত্ব কি ?

(৪) শিক্ষাবিস্তারে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কি কি বিশেষ অবদান ছিল ?

(৫) এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? কত খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?

(৬) ডেভিড হেয়ার কে ? তিনি কখন কি উদ্দেশ্যে ভারতে এলেন ?

(৭) "ইয়ংবেঙ্গল" কাদের বলা হয় ? ডিরোজিওর কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালী ছাত্রের নাম লেখ। তাঁদের প্রধান অবদান কি ছিল ?

(৮) চার্লস উডের 'নির্দেশনামা'য় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে কি কি প্রস্তাব করা হয়েছিল ?

(৯) নারী-শিক্ষার জন্য ইংরেজ আমলে প্রথম যুগে কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছিল ?

(১০) অ্যাডাম সাহেব 'গৃহবিদ্যালয়' বলতে কি বুঝেছিলেন ? তিনি দেশীয় বিদ্যালয়গুলির প্রশংসা করেছিলেন কেন ?

(১১) ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে জনশিক্ষার হার কমে গেল কেন ?

(১২) পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ভারতবাসী আকৃষ্ট হলো কেন ? তার ফলে সমাজে কি কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল ?

(১৩) ইংরাজী শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ?

(১৪) ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ এবং তাঁর সহকর্মীরা কি কি কাজ করেছিলেন ?

(১৫) সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করলেন কে ? এই কাজে তাকে কে সাহায্য করেছিলেন ?

(১৬) 'ঠগী' দমন করলেন কে ? কি নামে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন ?

(১৭) রাজা রাধাকান্ত দেব কে ছিলেন ? তাঁকে রক্ষণশীল বলা হয় কেন ?

(১৮) 'ব্রাহ্ম সমাজ' গঠনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কি কি কাজ করেছিলেন ? বোলপুরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর আশ্রমটির নাম কি ?

(১৯) ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেনের ভূমিকা কি ছিল ? তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজকে কি নাম দেওয়া হয়েছিল ?

(২০) বিদ্যাসাগরকে গদ্য ভাষার জনক বলা হয় কেন ? তাঁর রচিত কয়েকখানি পুস্তকের নাম লেখ ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

(১) পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে মিশনারীদের ভূমিকা আলোচনা কর।

(২) পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে মেকলে সাহেবের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

(৩) ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে কোন কোন সংস্থা কি কি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ? পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে বেণ্টিঙ্কের সিদ্ধান্তটির গুরুত্ব আলোচনা কর।

(৪) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জানা যায়। সূত্রগুলি উল্লেখ কর।

(৫) সমাজ সংস্কারে বেণ্টিঙ্কের বিভিন্ন কাজগুলি উল্লেখ করে তাঁর কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

(৬) শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনে অ্যাডামের সুপারিশসমূহ আলোচনা করে জাতীয় শিক্ষাগঠনে তাঁর অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(৭) শিক্ষা সংস্কার ও ধর্মসংস্কারে রাজা রামমোহন রায় কি কি প্রস্তাব করেছিলেন ? রাজা রামমোহনকে আধুনিক ভারতের জনক বলা হয় কেন ?

(৮) সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগরের প্রধান প্রধান অবদান আলোচনা কর।

(৯) 'প্রার্থনা সমাজ' ও 'বিধবা বিবাহ সমিতি' কে প্রতিষ্ঠা করেন? প্রার্থনা সমাজ গঠনে গোবিন্দ রানাডের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(১) 'হফ্‌তম্' আইনের ফলে কি হলো?
(২) 'ওয়াহাবী' মতবাদটি কি? এই আন্দোলন কত সালে কোথায় শুরু হয়?
(৩) তিতুমীর কার কাছ থেকে এই মতবাদটি গ্রহণ করেছিলেন?
(৪) কারা 'ওয়াহাবী' মতের বিরোধিতা করেছিলেন?
(৫) ওয়াহাবী আন্দোলন কেন জনপ্রিয় হলো?
(৬) তিতুমীর ইংরেজ শাসনকে অস্বীকার করে কি ঘোষণা করলেন?
(৭) তিতুমীরের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকদের কারা সাহায্য করেছিলেন?
(৮) তিতুমীরের নির্দেশে গণফৌজ কি কি কাজ করল?
(৯) ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রধান ফল কি ছিল?
(১০) 'ফরোয়েজী' আন্দোলন কত সালে শুরু হয়?
(১১) 'ফরোয়েজী' আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?
(১২) কোন কোন অঞ্চল ফরোয়েজী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল?
(১৩) কয়েকটি কৃষক-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী উপজাতির নাম লিখ।
(১৪) কোলেরা কোন অঞ্চলে বসবাস করত?
(১৫) সাঁওতালরা কোন অঞ্চলে বাস করতো? অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য তারা কোন পথ বেছে নিল?
(১৬) পশ্চিমঘাট অঞ্চলের ভিল সর্দারেরা ইংরেজ বিদ্বেষী হয়েছিল কেন?
(১৭) 'ভগ্‌না-ডিহির নির্দেশ বলতে কি বোঝ?
(১৮) সাঁওতালেরা কোন সালে ইংরেজ শাশন অস্বীকার করল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরীভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) 'রায়তারি' প্রথা বলতে কি বুঝতে পার? এই প্রথা বন্ধ হওয়ায় রাজস্বের চাপ কাদের উপর পড়ল?

(২) তিতুমীর কি প্রকারে 'গণফৌজ' গঠন করলেন? কারা এই গণফৌজে যোগ দিয়েছিল?

(৩) গণফৌজের মর্যাদা কি প্রকারে বৃদ্ধি পেল?

(৪) তিতুমীরের বাঁশের কেল্লাটি কোথায় নির্মিত হয়েছিল? কি প্রকারে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করা হলো?

(৫) 'ওয়াহাবী' ও 'ফরোয়েজী' আন্দোলনকে 'কৃষক আন্দোলন' বলবো কেন?

(৬) কোন কোন অঞ্চল ফরোয়েজী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল? ফরোয়েজী আন্দোলন সরকার কিভাবে দমন করলেন?

(৭) কোল-হো-মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল কেন? তাদের বিদ্রোহকে 'কৃষক বিদ্রোহ' বলবো কেন?

(৮) সাঁওতালেরা কোন অঞ্চলে বসবাস করতো? তাঁদের কি বৃত্তি ছিল? সাঁওতালেরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হলো কেন?

(৯) সাঁওতাল আন্দোলনকে শ্রেণী-আন্দোলন বলবো কেন? কোন শ্রেণী এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে ছিল?

(১০) বীরসিংহ মাঝি কে ছিলেন? কারা তাঁর উপরে অত্যাচার করেছিল?

(১১) 'ভগ্‌নাডিহির' আন্দোলনে কারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন? ভগ্‌নাডিহির কৃষক সভা থেকে কি কি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল?

(১২) 'মোপলা' কাদের বলা হতো? কোন অঞ্চলে মোপলারা বাস (করত? মোপলা আন্দোলনকে অ-সাম্প্রদায়িক বলবো কেন?

(১৩) মোপলাদের উপর কারা শোষণ চালাত? কি ভাবে তাঁরা অত্যাচারিত হত?

(১৪) মোপলা আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলন বলবো কেন? মোপলারা কোন সময়ে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল?

(১৫) বিদ্রোহী মোপলারা শাসকদের বিরুদ্ধে কি প্রকার সংগ্রাম চালিয়েছিল?

(১৬) মোপলা বিদ্রোহ কেমন করে দমন করা হলো?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

(১) 'ওয়াহাবী' আন্দোলনের কারণগুলি লেখ। আন্দোলনের ফল কি হয়েছিল?

(২) 'ওয়াহাবী' আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। এই আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলন বলবো কেন?

(৩) ফারায়েজী আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? 'ওয়াহাবী' আন্দোলনের সাথে এই আন্দোলনের কি কি সাদৃশ্য রয়েছে? কিভাবে আন্দোলনটি দমন করা হল?

(৪) উপজাতি আন্দোলনের কি কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কোল-আন্দোলন এবং সাঁওতাল আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

(৫) সাঁওতাল আন্দোলনের কারণগুলি লিখ। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(৬) ওয়াহাবী, ফরোয়েজী ও সাঁওতাল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল বর্ণনা কর।

(৭) মোপলা বিদ্রোহের কারণগুলি লিখ। এই আন্দোলনের প্রকৃতিটি কিরূপ ছিল? আন্দোলনের ফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উনবিংশ অধ্যায়

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(১) কোন সালে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল ?
(২) সিপাহী যুদ্ধে প্রথম দুজন শহীদের নাম কর।
(৩) সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের বড়লাট কে ছিলেন ?
(৪) শ্বেতাঙ্গ ইংরেজরা ভারতীয়দের উপর কিরূপ আচরণ করত ?
(৫) ইংরেজ সামরিক কর্মচারীরা ভারতীয় সিপাহীদের উপর কিরূপ আচরণ করত ?
(৬) ভারতীয় সিপাহীদের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হল কেন ?
(৭) আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল সমূহে গণ-বিক্ষোভের কারণ হিসাবে কি বলেছেন ?
(৮) অযোধ্যার অভ্যুত্থানকে লর্ড ক্যানিং কি নামে অভিহিত করেছেন ?
(৯) বিহারের বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন কে ?
(১০) মীরাটে কখন থেকে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ?
(১১) উত্তর ভারত ও মধ্যভারতের বিদ্রোহের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির নাম কর।
(১২) কোন কোন ভারতীয় রাজা ও নবাবেরা ইংরেজের পক্ষে ছিল ?
(১৩) মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রটি কবে প্রকাশিত হয় ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) ডালহৌসি পেশোয়ার দত্তক পুত্রের ভাতা বন্ধ করলেন কেন ? রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর ভাতাও বা কেন বন্ধ করা হল ?
(২) ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের ঘোষণাপত্রে কি প্রচারিত হয়েছিল ?
(৩) ব্রিটিশ রাজস্ব নীতির ফলে দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের কি কি ক্ষতি হয়েছিল ?
(৪) সিপাহী বিদ্রোহকে কৃষক-বিদ্রোহ বলা যেতে পারে কেন ?
(৫) ইংরেজদের জনহিতকর কাজগুলিকে ভারতবাসীরা সন্দেহের চোখে দেখতেন কেন ?
(৬) '১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সর্বশ্রেণী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল'—এটা বলা হয় কেন ?
(৭) কানপুরে সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক কে ছিলেন ? কেন তিনি বিদ্রোহী হয়েছিলেন ?
(৮) নানা সাহেব দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সহযোগিতা লাভে ব্যাকুল হয়েছিলেন কেন ?
(৯) তাঁতিয়া তোপী এই বিদ্রোহে কি ভাবে অংশ নিয়েছিলেন ?
(১০) বিদ্রোহের নেত্রী হিসাবে লক্ষ্মীবাঈ-এর কৃতিত্বের কি পরিচয় পাও ?

(১১) বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ পক্ষে কি কি সুবিধা ছিল ? অপরদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সিপাহীদের কি কি অসুবিধা ছিল ?

(১২) গোটা ভারতবর্ষে সিপাহী যুদ্ধ গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করতে পারেনি কেন ?

(১৩) বিনায়কদামোদর সাভারকর '১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ' কে, কি নামে অভিহিত করেছেন ?

(১৪) কোন কোন ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত যুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

(১) সিপাহী বিদ্রোহের রাজনৈতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

(২) সিপাহী বিদ্রোহের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

(৩) সিপাহী বিদ্রোহের আর্থিক কারণগুলি উল্লেখ করে অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে এটিকে কৃষক বিদ্রোহ বলা যেতে পারে কেন ?

(৪) কি কি কারণে ভারতীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল ? বিদ্রোহের বিভিন্ন ঘটনাবলী উল্লেখ করে সিপাহীদের পরাজয়ের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

(৫) বিদ্রোহের প্রকৃতি আলোচনা কর। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের অভিমত উল্লেখ করে, এই বিদ্রোহে জাতীয়তা বোধের কি কি পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ?

(৬) বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলসমূহ আলোচনা কর। এই বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উল্লেখ কর।

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. T. Road